

একটি সংক্ষিপ্ত
কুরআনের ভাষ্য:
মনের শান্তির
পথ - অধ্যায় ৩
আলী ইমরান



ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা
মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

একটি সংক্ষিপ্ত কুরআনের ভাষ্য: মনের শান্তির পথ – অধ্যায় ৩
আলী ইমরান

শায়খপড বই

শায়খপড বুকস, ২০২৫ দ্বারা প্রকাশিত

যদিও এই বইটি তৈরিতে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, তবুও এখানে থাকা তথ্য ব্যবহারের ফলে কোনও ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য, অথবা ক্ষতির জন্য প্রকাশক কোনও দায়ভার গ্রহণ করবেন না।

একটি সংক্ষিপ্ত কুরআনের ভাষ্য: মনের শান্তির পথ – অধ্যায় ৩ আলী ইমরান

প্রথম সংস্করণ। ১৭ মার্চ, ২০২৫।

কপিরাইট © ২০২৫ শায়খপড বই।

শায়খপড বুকস কর্তৃক লিখিত।

সুচিপত্র

[সুচিপত্র](#)

[স্বীকৃতি](#)

[কম্পাইলারের নোটস](#)

[ভূমিকা](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, শ্লোক ১](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ২-৬](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ৭-৯](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১০-১৩](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৪-১৭](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৮-২২](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ২৩-২৫](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ২৬-২৭](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ২৮-৩২](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ৩৩-৪৪](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ৪৫-৬৪](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ৬৫-৬৮](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ৬৯-৭৪](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ৭৫-৭৮](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ৭৯-৮৫](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ৮৬-৯২](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ৯৩-৯৭](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ৯৮-১০১](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১০২-১০৯](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১১০-১১৭](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১১৮-১২০](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১২১-১২৯](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৩০-১৩৬](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৩৭-১৪৮](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৪৯-১৫১](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৫২-১৫৮](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৫৯-১৬০](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৬১-১৬৪](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৬৫-১৭৫](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৭৬-১৭৮](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৭৯-১৮৬](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৮৭-১৮৯](#)

[অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, ২০০ এর ১৯০-২০০ আয়াত](#)

ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক

অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া

স্বীকৃতি

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, যিনি আমাদের এই খণ্ডটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক, যাঁর পথ আল্লাহ মানবজাতির মুক্তির জন্য বেছে নিয়েছেন।

আমরা সমগ্র শায়খপড পরিবারের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের ছোট্ট তারকা ইউসুফের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ শায়খপড বইয়ের উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিতপ্রাণ সহায়তা শায়খপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করুন এবং এই কিতাবের প্রতিটি অক্ষর তাঁর মহিমাম্বিত দরবারে কবুল করুন এবং শেষ দিবসে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দিন।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং অফুরন্ত দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ এবং সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

কম্পাইলারের নোটস

আমরা এই খণ্ডে ন্যায়বিচার করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি, তবে যদি কোনও ত্রুটি পাওয়া যায় তবে সংকলক ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে তার জন্য দায়ী।

এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় আমরা ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনা মেনে নিই। আমরা হয়তো অসচেতনভাবে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তা সাদরে গৃহীত হবে। ShaykhPod.Books@gmail.com ঠিকানায় গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

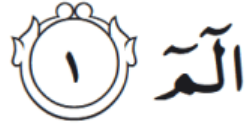
ভূমিকা

পবিত্র কুরআনের ৩য় সূরা আলে ইমরানের একটি সম্পূর্ণরূপে উল্লেখিত এবং সহজে বোধগম্য সংক্ষিপ্ত তাফসীর (তাফসীর) নিচে দেওয়া হল। এটি বিশেষভাবে তুলে ধরেছে এবং আলোচনা করে যে, মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য কোন ভালো গুণাবলী গ্রহণ করা উচিত এবং কোন খারাপ গুণাবলী এড়িয়ে চলা উচিত।

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে মানসিক শান্তি আসে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, শ্লোক ১



"আলিফ, লাম, মীম।"

এই আয়াতের সঠিক অর্থ অজানা। কিন্তু এই আয়াতটি এই সত্যটি নির্দেশ করতে পারে যে পবিত্র কুরআন আরবি অক্ষর এবং শব্দ দ্বারা গঠিত যা আরবরা, যারা প্রথম এটি শুনেছিল, তারা খুব পরিচিত ছিল। এর অর্থ হল পবিত্র কুরআনের সত্যতা গ্রহণ করা ছাড়া তাদের আর কোন অজুহাত ছিল না, কারণ তারা এর অলৌকিক শব্দগুলি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পেরেছিল, যে শব্দগুলি অর্থ, সৌন্দর্য এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের সাথে মেলে না, যদিও তারা আরবি ভাষার উপর দক্ষ ছিল এবং নিজেদেরকে সবচেয়ে মার্জিত বক্তা বলে উল্লেখ করেছিল। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩:

"আর যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বিশেষ বান্দার উপর নাযিল করেছি, তাহলে তোমরা এর মতো একটি সূরা নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

এমনকি যদি কেউ একটি মার্জিত এবং ছন্দময় আরবি বাক্য তৈরি করে, তবুও তারা এর গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাথে কখনই মিল পাবে না, যা মানব প্রকৃতি, মন এবং মনোভাবের মূল মর্মকে অনুপ্রবেশ করে। তারা এর সহজে বোধগম্য হওয়ার এবং ব্যবহারিকভাবে কারও জীবনে প্রয়োগ করার ক্ষমতার সাথে মেলে না, এমনকি অশিক্ষিত লোকেরাও। যেহেতু এটি মানুষের প্রকৃতিকে সম্বোধন করে, তাই এটি একটি কালজয়ী উপদেশ যা প্রতিটি ব্যক্তি, স্থান এবং প্রজন্মের জন্য উপকারী। পবিত্র কুরআনের একটিও আয়াত এই ক্ষেত্রে মিলিত হতে পারে না বা হবে না। এর ঐশ্বরিক উৎপত্তির আরেকটি প্রমাণ।

পবিত্র কুরআনের বাক্যাংশগুলি অতুলনীয় এবং এর অর্থগুলি সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর শব্দ এবং আয়াতগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অন্য কোনও গ্রন্থ এটিকে

অতিক্রম করতে পারে না। পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী জাতিগুলির ইতিহাস বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছে যদিও মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) ইতিহাসে শিক্ষিত ছিলেন না। এটি প্রতিটি সংকাজের আদেশ দেয় এবং প্রতিটি মন্দকে নিষেধ করে। যা একজন ব্যক্তি এবং সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে, যাতে ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা এবং শান্তি প্রতিটি ঘর এবং সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা যেকোনো মিথ্যা এড়িয়ে চলে, কবিতা, গল্প এবং উপকথার বিপরীতে। সমস্ত আয়াত উপকারী এবং ব্যবহারিকভাবে একজনের জীবনে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এমনকি যখন পবিত্র কুরআনে একই গল্প পুনরাবৃত্তি করা হয়, তখনও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরা হয়। অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থের বিপরীতে, পবিত্র কুরআন বারবার অধ্যয়ন করলে একজন ব্যক্তিকে বিরক্ত করে না। পবিত্র কুরআন প্রতিশ্রুতি এবং সতর্কীকরণ প্রদান করে এবং অনস্বীকার্য এবং স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে তাদের সমর্থন করে। পবিত্র কুরআন যখন এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যা বিমূর্ত বলে মনে হতে পারে, যেমন ধৈর্য্য অবলম্বন করা, তখন এটি সর্বদা এটিকে তার জীবনে বাস্তবায়নের একটি সহজ এবং ব্যবহারিক উপায় প্রদান করে। এটি মানুষকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে উৎসাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে, যার ফলে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। এটি উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং প্রকৃত সাফল্য কামনাকারী ব্যক্তির জন্য সরল পথকে স্পষ্ট এবং আকর্ষণীয় করে তোলে। পবিত্র কুরআনের জ্ঞান চিরন্তন কারণ এটি প্রতিটি সমাজ এবং যুগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি প্রতিটি মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক সমস্যার জন্য একটি নিরাময় যখন এটি সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়। এটি একজন ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি সমস্যার সমাধান প্রদান করে। কেবল ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করা এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়নকারী সমাজগুলি কীভাবে এর সর্বব্যাপী এবং কালজয়ী শিক্ষা থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। শতাব্দী পেরিয়ে গেছে কিন্তু পবিত্র কুরআনের একটি অক্ষরও পরিবর্তন করা হয়নি, যেমনটি আল্লাহ তাআলা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইতিহাসের অন্য কোনও গ্রন্থে এই গুণটি নেই। অধ্যায় ১৫ আল হিজর, আয়াত ৯:

"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ, কুরআন] নাযিল করেছি এবং অবশ্যই, আমরাই এর রক্ষণাবেক্ষণকারী।"

মহান আল্লাহ তাআলা একটি সমাজের মূল সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলোর সকলের বাস্তব প্রতিকারের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। মূল সমস্যাগুলো সংশোধন করার মাধ্যমে, এগুলো থেকে উদ্ভূত অসংখ্য শাখা-প্রশাখার সমস্যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআন এভাবেই একজন ব্যক্তি এবং সমাজের উভয় জগতে সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ের সমাধান করেছে। সূরা আন নাহল, আয়াত ৮৯:

"...এবং আমরা আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি সবকিছুর স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ..."

এটি মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর দান করা সর্বশ্রেষ্ঠ কালজয়ী অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু যারা সত্যের সন্ধান করে এবং তার উপর আমল করে, কেবল তারাই এর দ্বারা উপকৃত হবে, আর যারা তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং এর থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করে, তারা উভয় জগতেই কেবল ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অধ্যায় ১৭ আল-ইসরা, আয়াত ৮২:

"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু এটি জালেমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১:

"আলিফ, লাম, মীম।"

জ্ঞানের প্রধান উপাদান হলো অক্ষর। অতএব, এই আয়াতটি জ্ঞানের গুরুত্ব নির্দেশ করতে পারে। সুনান ইবনে মাজাহ, ২২৪ নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, ইসলামে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা সকলের উপর কর্তব্য। অজ্ঞতা কেবল পাপ ও পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করে, কারণ জ্ঞান ছাড়া পাপ এড়ানো যায় না এবং তা ছাড়া সঠিক পথনির্দেশনা পাওয়া যায় না। একজনকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা তাদের জ্ঞানের উপর আমল করে, কারণ জ্ঞান নিজে নিজে কার্যকর হয় না যতক্ষণ না এটির উপর আমল করা হয়। ঠিক যেমন গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য মানচিত্র ব্যবহার না করা পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য মানচিত্র কার্যকর হয় না, তেমনি অনুশীলন ছাড়া জ্ঞান সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে না। ৬২ সূরা আল জুমু'আহ, আয়াত ৫:

"...এবং তারপর এটা গ্রহণ করিনি (জ্ঞান অনুসারে কাজ করেনি) হল সেই গাধার মতো যে [বইয়ের] বই বহন করে..."

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ২-৬

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٢﴾

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾

مِّن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو

أَنْقَامٍ ﴿٤﴾

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٥﴾

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾

“ আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ।

তিনি তোমার উপর, [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম],
উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিতাব নাযিল করেছেন, যা পূর্ববর্তী কিতাবগুলির সত্যায়ন
করে এবং তিনি তাওরাত ও ইঞ্জিল নাযিল করেছেন।

পূর্বে, মানুষের জন্য পথনির্দেশনা হিসেবে। এবং তিনি ফয়সালাকারী [অর্থাৎ,
কুরআন] নাযিল করেছেন। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের
জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে পৃথিবীতে এবং আসমানে কোন কিছুই গোপন নেই।

তিনিই তোমাদেরকে গর্ভে যেমন ইচ্ছা গঠন করেন। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই,
তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

ইসলাম মানবজাতিকে শিক্ষা দেয় যে, প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক, মহান আল্লাহ তায়ালারই আনুগত্য করতে হবে। অধ্যায় ৩, আলে ইমরান, আয়াত ২:

" আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই.."

বাস্তবে, কেউ যার আনুগত্য করে এবং তার জীবনকে মডেল করে, সে তারই উপাসনা করে, এমনকি যদি সে দাবি করে যে সে কোনও দেবতাকে বিশ্বাস করে না। মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যেখানে তাকে অবশ্যই কিছু না কিছু মানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। তা সে অন্য মানুষ হোক, সোশ্যাল মিডিয়া হোক, ফ্যাশন হোক, সংস্কৃতি হোক বা এমনকি তাদের নিজস্ব ইচ্ছা হোক। ২৫তম অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

একজন ব্যক্তি যা-ই হোক বা যা-ই হোক, তারই উপাসনা করে। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে কাজে সমর্থন করতে হবে, অন্য সকল পরিস্থিতির উপর আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলার মাধ্যমে। এর মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা। যে ব্যক্তি এইভাবে

আচরণ করবে তাকে পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য দান করা হবে। ২য় সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৬৩:

"আর তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, যিনি পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।"

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর একত্ববাদকে প্রত্যাখ্যান করে এবং পরিবর্তে অন্য জিনিসের আনুগত্য ও উপাসনা করে, সে উভয় জগতের শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় রহমত থেকে বঞ্চিত হবে, এমনকি যদি তারা সমগ্র পৃথিবী অধিকার করে এবং আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে, কারণ কেউই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ এবং কর্তৃত্ব থেকে বাঁচতে পারে না। সূরা তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ্ বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"]

অধ্যায় ৩: আলে ইমরান, আয়াত ২:

" আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ..."

যখন কেউ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং অসংখ্য নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মহাবিশ্ব সৃষ্টিকারী এবং টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব একমাত্র একজনই পালন করেন। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী থেকে সূর্যের নিখুঁত

দূরত্ব একটি স্পষ্ট লক্ষণ, কারণ সূর্য যদি পৃথিবী থেকে সামান্য কাছে বা আরও দূরে থাকত তবে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হত। একইভাবে, পৃথিবীকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যা একটি সুষম এবং বিশুদ্ধ বায়ুমণ্ডল তৈরি করে যা এতে জীবনকে বিকাশের সুযোগ দেয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন..."

দিন ও রাতের নিখুঁত সময় এবং সারা বছর ধরে তাদের বিভিন্ন দৈর্ঘ্য মানুষকে তাদের থেকে সর্বাধিক সুবিধা পেতে সাহায্য করে। যদি দিনগুলি দীর্ঘ হত, তাহলে মানুষ দীর্ঘ ঘন্টার জন্য ক্লান্ত হয়ে পড়ত। যদি রাতগুলি দীর্ঘ হত, তাহলে মানুষের জীবিকা নির্বাহ এবং জ্ঞানের মতো অন্যান্য দরকারী জিনিসপত্র অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকত না। যদি রাতগুলি ছোট হত, তাহলে মানুষ সর্বোত্তম স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে পারত না। দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ফসলের উপরও প্রভাব ফেলত, যা মানুষ এবং প্রাণীর জীবিকার উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলত। মহাবিশ্বের মধ্যে দিন ও রাত এবং অন্যান্য ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা নিখুঁত সামঞ্জস্যের সাথে কাজ করে তাও স্পষ্টভাবে আল্লাহর একত্বকে নির্দেশ করে, কারণ একাধিক ঈশ্বর বিভিন্ন জিনিস কামনা করবেন, যা মহাবিশ্বের মধ্যে বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 21 আল আশ্বিয়া, আয়াত 22:

"যদি তাদের মধ্যে [অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের] আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত..."

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... এবং [বড়] জাহাজ যা সমুদ্রে চলাচল করে যা মানুষের উপকার করে এবং যা আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন..."

যখন কেউ পুরোপুরি সুষম জলচক্র পর্যবেক্ষণ করে, তখন এটি স্পষ্টভাবে একজন স্রষ্টার ইঙ্গিত দেয়। সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয়, উপরে উঠে ঘনীভূত হয়ে পাহাড়ের উপর নেমে আসে অম্লীয় বৃষ্টিপাতের জন্য। এই পর্বতগুলি অম্লীয় বৃষ্টিপাতকে নিষ্ক্রিয় করে যাতে মানুষ এবং প্রাণীরা তা ব্যবহার করতে পারে। যদি এই নিখুঁত সুষম ব্যবস্থায় কোনও পরিবর্তন আনা হয়, তাহলে তা পৃথিবীর মানুষ এবং প্রাণীদের জন্য বিপর্যয়ের কারণ হবে। সমুদ্রের লবণ সমুদ্রের মৃত প্রাণীদের এটি দূষিত হতে বাধা দেয়। যদি সমুদ্রকে দূষিত হতে দেওয়া হয়, তাহলে সমুদ্রের জীবন সম্ভব হবে না এবং সমুদ্রের অপবিত্রতা স্থলভাগের জীবনকেও আচ্ছন্ন করে ফেলবে। সমুদ্র এবং সমুদ্রের মধ্যে জল এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে সমুদ্রের জীবন এর মধ্যে বিকাশ লাভ করতে পারে এবং ভারী জাহাজগুলি এর উপরে চলাচল করতে পারে। যদি জলের গঠন কিছুটা ভিন্ন হত, তাহলে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিত যার ফলে হয় সমুদ্রের জীবন জলের মধ্যে বিকাশ লাভ করত অথবা জাহাজগুলিকে এর উপরে চলাচল করতে দিত, তবে উভয়ই একই সাথে সম্ভব হত না। এমনকি আজও, সমুদ্রপথে পরিবহন এখনও বিশ্বজুড়ে পণ্য পরিবহনের সবচেয়ে সাধারণ উপায়। তাই পৃথিবীতে জীবনের জন্য এই নিখুঁত ভারসাম্য অপরিহার্য।

বিবর্তন হলো এক ধরনের মিউটেশন, যা স্বভাবতই অসম্পূর্ণ। কিন্তু যখন কেউ অসংখ্য প্রজাতি পর্যবেক্ষণ করে, তখন তারা দেখতে পাবে যে তাদের সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তারা যে পরিবেশে বাস করে সেখানেই

তারা বেঁচে থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উটকে উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করার এবং জল পান না করে দীর্ঘ সময় ধরে বেঁচে থাকার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। তারা মরুভূমির জীবনের জন্য নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছে। অধ্যায় ৮৮ আল গাশিয়াহ, আয়াত ১৭:

"তাহলে কি তারা উটের দিকে তাকায় না - কিভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে?"

ছাগলটিকে এমন নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে তার শরীরের ভেতরের দূষিত পদার্থগুলি তার উৎপাদিত দুধ থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়। দুটির মিশ্রণ দুধকে পান করার অযোগ্য করে তুলবে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৬৬:

"আর অবশ্যই, তোমাদের জন্য পশুপালনের ক্ষেত্রে একটি শিক্ষা রয়েছে। আমরা তোমাদেরকে তাদের পেটের মধ্যে যা আছে তা থেকে - মলমূত্র ও রক্তের মধ্যে - বিশুদ্ধ দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।"

প্রতিটি প্রজাতির একটি নির্দিষ্ট জীবনকাল দেওয়া হয়েছে যা একটি প্রজাতিকে অন্য প্রজাতিকে পরাজিত করতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, মাছদের জীবনকাল খুবই কম, ৩-৪ সপ্তাহ, এবং তারা ৫০০টি ডিম পাড়ে। যদি তাদের জীবনকাল দীর্ঘ হত, তাহলে মাছদের সংখ্যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যেত এবং তারা এই পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত প্রজাতিকে ছাপিয়ে যেত। অন্যদিকে, অন্যান্য প্রাণী যাদের জীবনকাল খুব দীর্ঘ তাদের মাত্র কয়েকটি সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে। আবার এটি তাদের

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ করে দেয়। এই সবকিছুই দুর্ঘটনা হতে পারে না এবং বিবর্তনের প্রক্রিয়াও এর ব্যাখ্যা দিতে পারে না। ২য় সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... এবং [তাঁরা] আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বাতাস এবং মেঘের পরিচালনা..."

বায়ু পরাগায়নের জন্য বাতাস অপরিহার্য, যা ফসল, গাছপালা এবং গাছের বংশবৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়। প্রাচীনকালে, সমুদ্র ভ্রমণের জন্য বাতাস অপরিহার্য ছিল, যা আজও বিশ্বজুড়ে পণ্য পরিবহনের প্রধান মাধ্যম। সৃষ্টির জন্য জল সরবরাহ করার জন্য বৃষ্টির মেঘগুলিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরিত করার জন্য বাতাসের প্রয়োজন হয়, যা ছাড়া তারা বাঁচতে পারে না। পৃথিবীর মধ্যে বাতাসের একটি নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়, কারণ বাতাসের অভাব সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং বাতাসের বৃদ্ধিও সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। একইভাবে, বৃষ্টিও পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ, কারণ খুব কম বৃষ্টিপাত খরা এবং দুর্ভিক্ষের দিকে পরিচালিত করে এবং খুব বেশি বৃষ্টিপাত ব্যাপক বন্যার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় ২৩ আল মু'মিনুন, আয়াত ১৪:

"আর আমরা আকাশ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং তা পৃথিবীতে স্থাপন করেছি। এবং অবশ্যই, আমরা তা প্রত্যাহার করতে সক্ষম।"

এই নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা এলোমেলো হতে পারে না এবং স্পষ্টভাবে স্রষ্টার হাত দেখায়। যিনি এই সমস্ত নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার উপর চিন্তা করেন তিনি

যুক্তিসঙ্গতভাবে এমন একক স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারেন না যিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

অধ্যায় ৩: আলে ইমরান, আয়াত ২:

" আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ..."

বাস্তবে, যে ব্যক্তি মৃত্যু অনুভব করতে পারে এবং অন্য কিছু বা কারো দ্বারা প্রতিপালিত হয়, সে উপাস্য হতে পারে না। এই বাস্তবতাই স্বর্গ ও পৃথিবীর সকল সত্তার জন্য দেবত্বকে বাতিল করে দেয়, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। উপরন্তু, যেহেতু একমাত্র মহান আল্লাহ জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকে প্রতিপালন করেন, তাই তিনিই আনুগত্যের যোগ্য। যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জীবিকার কিছু দিক, যেমন তাদের বাসস্থান, যত্ন নেয়, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যোগ্য। অতএব, যেহেতু মহান আল্লাহ এই মহাবিশ্বের প্রতিটি নিয়ামত মানুষকে দান করেছেন, তাই কেবল ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত যে মানুষ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। নিজের ইচ্ছায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করা। যে ব্যক্তি অন্য কারণে কাজ করে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ভালো নিয়তের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যে একজন ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে কোনও প্রশংসা বা প্রতিদান আশা করে না বা আশা করে না। জিহ্বা দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হল ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা। আর কারো কর্মের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হলো, তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য, যেমনটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর ফলে উভয় জাহানে আশীর্বাদ বৃদ্ধি পায় এবং পরিণামে মানসিক শান্তি লাভ হয়। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব..."

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

অধিকন্তু, যখন কোন ব্যক্তি কোন বস্তুর মালিক হয়, তখন তার জন্য সেই বস্তুটি যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করা সঠিক এবং স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ, মানুষ সহ, মহাবিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, মালিক এবং বজায় রেখেছেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন যে মহাবিশ্বের মধ্যে কী ঘটবে এবং কী ঘটবে না। অতএব, একজন ব্যক্তির জন্য কেবল মহান আল্লাহ, তাঁর আনুগত্য করা ন্যায়সঙ্গত, কারণ তিনিই সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক, যার মধ্যে তারাও রয়েছে।

একইভাবে, যখন কেউ অন্য কাউকে তার মালিকানাধীন জিনিস ধার দেয়, তখন তার মালিকের ইচ্ছানুযায়ী জিনিসটি ব্যবহার করাই ন্যায্য। মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির প্রতিটি নিয়ামতকে ঋণ হিসেবে দিয়েছেন। তিনি তাকে উপহার হিসেবে দেননি। পার্থিব ঋণের মতো, এই ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এই ঋণ পরিশোধের একমাত্র উপায় হল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এগুলো ব্যবহার করা। অন্যদিকে, যেহেতু জান্নাতের নিয়ামত একটি উপহার, তাই মানুষ সেগুলো তাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে স্বাধীন থাকবে। ৭ম সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ৪৩:

"...এবং তাদেরকে বলা হবে, "এটি সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ তোমাদের কর্মের জন্য।"

অতএব, একজন ব্যক্তির উচিত জান্নাতের উপহারের সাথে ধার করা পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

অধ্যায় ৩: আলে ইমরান, আয়াত ২:

" আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মহান আল্লাহ চিরঞ্জীব, এই সত্যটি তাদের নিজেদের নশ্বরতার কথা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত। যেহেতু এই পৃথিবীতে প্রত্যেকের সময় সীমিত, তাই তাদের সময় শেষ হওয়ার আগেই তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। এই উদ্দেশ্য হল ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা। সূরা আল-মুলক, আয়াত ২:

" যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম..."

যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করে তাদের জীবনকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়, সে লক্ষ্যহীন এবং অর্থহীন জীবনযাপন করবে, এমনকি যদি তারা পার্থিব সাফল্য অর্জন করতেও সক্ষম হয়। ফলস্বরূপ, তারা কখনও মানসিক শান্তি পাবে না, এমনকি যদি তাদের কাছে আনন্দের মুহূর্ত থাকে। ঠিক যেমন একটি আবিষ্কার যা তার সৃষ্টির মূল কাজটি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, এমনকি যদি তার কিছু ভালো গুণ থাকে, তবে তাকে ব্যর্থতা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, এমনকি যদি সে কিছু পার্থিব সাফল্যও অর্জন করে। এই ব্যর্থতা একটি শূন্যতা হিসাবে অনুভব করা হয় যা সকল মানুষ তাদের জীবনে, শীঘ্র বা বিলম্বে অনুভব করে এবং ফলস্বরূপ এটি তাদের মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেয়।

অধ্যায় ৩: আলে ইমরান, আয়াত ২:

" আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেহেতু মহান আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সৃষ্টিকে লালন-পালন করেন, তাই তাঁর কাছ থেকে সমস্ত ভালো পার্থিব ও ধর্মীয় জিনিস চাওয়া উচিত। এটি কেবল তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। উপরন্তু, যেহেতু মানুষ অত্যন্ত অদূরদর্শী এবং খুব কম জ্ঞানের অধিকারী, তাই তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছ থেকে সাধারণ পার্থিব জিনিস চাওয়া উচিত, কারণ তারা জানে না কোনটি তাদের জন্য ভালো হবে কি হবে না। মানুষের জীবনে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে তারা এমন কিছু চেয়েছিল যা কেবল তাদের জন্য চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এবং যখন তারা এমন কিছু অপছন্দ করেছিল যাতে কেবল তা তাদের জন্য ভালোর উৎস হয়ে ওঠে। অতএব, মহান আল্লাহর কাছ থেকে নির্দিষ্ট জিনিস চাওয়ার পরিবর্তে সাধারণ ভালো জিনিস চাওয়া উচিত। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০০-২০১:

"আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে দান করুন", আর আখেরাতে তার কোন অংশ নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"

উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে তার সৃষ্ট সম্ভাবনা অনুসারে মহান আল্লাহর স্বয়ংসম্পূর্ণ ঐশ্বরিক গুণাবলীর উপর কাজ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে সৃষ্টি থেকে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করা এবং শুধুমাত্র মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করা। এটি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ এমন অলস মনোভাব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে

যেখানে সে তার চাহিদা এবং দায়িত্ব পূরণের জন্য প্রদত্ত সম্পদ, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি, ব্যবহার করার পরিবর্তে মানুষের উপর নির্ভর করে। কেবল যখন তার সম্পদ শেষ হয়ে যায় তখনই তার অন্যদের সাহায্য চাওয়া উচিত।

পরিশেষে, উপাসনার অর্থ হলো বিনীতভাবে অন্য কারোর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং তার আনুগত্য করা। অতএব, যাকে উপাসনা করা হচ্ছে তাকে সম্মান ও ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হবে এবং কোনও ত্রুটি ছাড়াই নিখুঁত হতে হবে। অতএব, যা কিছু তার নিজস্ব সত্তাকে টিকিয়ে রাখতে পারে না এবং অস্তিত্বের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল, সে সহজাত শক্তি এবং পরিপূর্ণতার অধিকারী হতে পারে না। অর্থাৎ, তার সমস্ত গুণাবলী এবং ক্ষমতা অন্য একজন তাকে দিয়েছেন। অতএব, যে সমস্ত জিনিস নিজে থেকে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, যেমন একটি মূর্তি বা ব্যক্তি, সেগুলি উপাসনার যোগ্য হতে পারে না। উপাসনার যোগ্য একমাত্র সত্তা হলেন তিনি যিনি সর্বদা বিদ্যমান এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। যিনি সহজাতভাবে শক্তি এবং পরিপূর্ণতার অধিকারী। তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন, তিনি সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য ও উপাসনা করার অধিকার নেই, তা প্রতিষ্ঠিত করার পর, মহান আল্লাহ ব্যাখ্যা করেন যে তিনি সর্বদা ঐশ্বরিক ওহী নাযিল করেছেন যাতে মানুষ সঠিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে পারে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩-৪:

"তিনি তোমাদের উপর উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিতাব নাযিল করেছেন, যা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন করে। এবং তিনি তওরাত ও ইঞ্জিল নাযিল করেছেন, পূর্বে,

মানুষের জন্য পথনির্দেশনা হিসেবে। এবং তিনি ফয়সালাকারী [অর্থাৎ, কুরআন] নাযিল করেছেন..."

পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর জন্য প্রথমে এর উল্লেখ করা হয়েছে এবং তারপর পূর্ববর্তী দুটি ঐশ্বরিক গ্রন্থ, তাওরাত এবং বাইবেলের পরে এটি আবার উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এটি স্পষ্ট হয় যে পবিত্র কুরআনই চূড়ান্ত ঐশ্বরিক ওহী যা শেষ যুগ পর্যন্ত অনুসরণ করা আবশ্যিক। এছাড়াও, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উভয়েরই উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস উভয়ের উপরই আমল করতে হবে। পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এবং ৫৯তম অধ্যায় আল হাশর, ৭ম আয়াত:

"... আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৮০:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৩-৪:

"তিনি তোমাদের উপর উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিতাব নাযিল করেছেন, যা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন করে। এবং তিনি তওরাত ও ইঞ্জিল নাযিল করেছেন, পূর্বে, মানুষের জন্য পথনির্দেশনা হিসেবে। এবং তিনি ফয়সালাকারী [অর্থাৎ, কুরআন] নাযিল করেছেন..."

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসের উদ্দেশ্য হলো মানবজাতিকে অনুসরণ করার জন্য নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করা যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। যখন কেউ ইসলামী আচরণবিধি অনুসরণ করে, তখন এটি নিশ্চিত করে যে তারা তাদের প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং এটি নিশ্চিত করে যে তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেয় এবং পরকালে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুতি নেয়। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। পবিত্র কুরআন এমন একটি মানদণ্ড যা উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জন এবং চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলায় ভরা জীবনের মধ্যে

স্পষ্টভাবে পার্থক্য করে। পরেরটি ঘটে যখন কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, ফলস্বরূপ তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে না এবং তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুলভাবে স্থান দেয় এবং পরকালে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হয়। এটি তাদের উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে। অতএব, একজন ব্যক্তির নিজের জন্য ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তার উপর কাজ করা উচিত, এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের অবশ্যই একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তা মেনে চলেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। ঠিক যেমন এই বিজ্ঞ রোগী ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তা মেনে চলেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান কখনই এই ফলাফল অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে তাদের পরামর্শ সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসের আকারে মানবজাতিকে এটি দান করেছেন। এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি কে ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের প্রেসক্রাইব করা ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই অন্ধভাবে তাদের ডাক্তারের উপর বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষার উপর চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা অন্ধভাবে ইসলামের শিক্ষার উপর বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৩-৪:

"তিনি তোমাদের উপর উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিতাব নাযিল করেছেন, যা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন করে। এবং তিনি তওরাত ও ইঞ্জিল নাযিল করেছেন, পূর্বে,

মানুষের জন্য পথনির্দেশনা হিসেবে। এবং তিনি ফয়সালাকারী [অর্থাৎ, কুরআন] নাযিল করেছেন..."

পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থগুলির সঠিক শিক্ষাগুলিকে নিশ্চিত করেছে এবং সময়ের সাথে সাথে মানুষের দ্বারা সম্পাদিত পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থগুলির শিক্ষাগুলিকে সংশোধন করেছে। পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থগুলির শিক্ষাগুলি সম্পাদনা করা হয়েছিল যাতে পণ্ডিতরা নেতৃত্ব এবং সম্পদের মতো পার্থিব জিনিসগুলি পেতে পারেন। পবিত্র কুরআন সম্পাদনা করা যায় না, কারণ মহান আল্লাহ এটিকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা এর অলৌকিক উৎপত্তির আরেকটি লক্ষণ। সূরা ১৫ আল হিজর, আয়াত ৯:

"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ, কুরআন] নাযিল করেছি এবং অবশ্যই, আমরাই এর রক্ষণাবেক্ষণকারী।"

যদিও এটি সম্পাদনা করা যায় না, তবুও এর ভুল ব্যাখ্যা করা যেতে পারে নেতৃত্ব এবং সম্পদের মতো পার্থিব জিনিস অর্জনের জন্য। আহলে কিতাবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি উভয় জগতেই কেবল সমস্যা সৃষ্টি করে। এইভাবে যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করা হয় তা উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ, ঝামেলা এবং দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনান ইবনে মাজাহ, ২৫৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই ব্যক্তিকে জাহান্নামের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। এবং এই ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করে অন্যদের বিভ্রান্ত করার ফলে, কতজন লোক তাদের ব্যাখ্যা অনুসরণ

করে তার উপর নির্ভর করে তাদের পাপ বৃদ্ধি পাবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অধিকন্তু, আহলে কিতাবদের মধ্যকার পণ্ডিতরা যেহেতু পবিত্র কুরআনের লেখককে চিনতে পেরেছিলেন কারণ তারা তাঁর সাথে পরিচিত ছিলেন এবং যেহেতু তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-কে চিনতে পেরেছিলেন, কারণ তাদের ঐশী গ্রন্থে উভয়েরই আলোচনা করা হয়েছে, তাই তাদের ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার কোনও কারণ ছিল না। সূরা আল আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

আহলে কিতাবরা এই সত্যে ঈর্ষান্বিত ছিল যে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ভাই হযরত ইসহাকের বংশধর না হয়ে বরং হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। যেহেতু

তাদের পুরো ধর্ম বংশের গুরুত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, যা তাদের মতে অন্যান্য মানবজাতির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিল, তাই তারা এমন একজন নবী (সাঃ)-কে গ্রহণ এবং অনুসরণ করতে পারত না, যিনি ভিন্ন বংশ থেকে এসেছিলেন। এটি কেবল তাদের তৈরি শ্রেষ্ঠত্বের জটিলতাকে ধ্বংস করবে। উপরন্তু, তারা জানত যে ইসলাম গ্রহণের অর্থ হল নেতৃত্ব এবং সম্পদের মতো পার্থিব জিনিসপত্র অর্জনের জন্য তারা আর তাদের ঐশ্বরিক শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য ও উপাসনা করার অধিকার নেই এবং তিনি মানবজাতিকে মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করেছেন, এই সত্য প্রতিষ্ঠা করার পর, আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, মানবজাতিকে এই আচরণবিধি অনুসরণ না করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেন। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৪:

"...নিশ্চয়ই, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি..."

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইসলামী আচরণবিধি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, সে তার প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্য বজায় রাখতে বাধা দেবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে বাধা দেবে। এই মনোভাব তাদেরকে বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতেও বাধা দেবে। অতএব, এই মনোভাব তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেবে, এমনকি যদি তারা বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে। সূরা তওবার ৯ম আয়াত, ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলা সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, যার মধ্যে রয়েছে মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, তাই ইসলামী শিক্ষা অনুসারে যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয় তাদের জন্য এই পরিণতি এড়ানো যায় না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

এবং অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৪:

"... আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যখন কেউ তাদের প্রদত্ত নিয়ামতের অপব্যবহার করে, তখন সে অনিবার্যভাবে আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করবে। বিচারের দিনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে, অন্যায়কারীকে তাদের নেক আমলগুলি তাদের শিকারের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করা হবে এবং প্রয়োজনে, অন্যায়কারী তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে অন্যায়কারীকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা তাদের প্রদত্ত নিয়ামতের সঠিকভাবে ব্যবহার করছে যাতে তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের অধিকার পূরণ করতে পারে। যেহেতু মহান আল্লাহ, সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং সর্বজ্ঞ, তাই বিচারের দিনে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করা অনিবার্য। ৩য় অধ্যায় আলী ইমরান, আয়াত ৫:

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে পৃথিবীতে এবং আসমানে কোন কিছুই গোপন নেই।"

অতএব, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত, যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে।

এরপর মহান আল্লাহ আরেকটি বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেন যা মানুষকে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে উৎসাহিত করবে। অধ্যায় ৩, আলে ইমরান, আয়াত ৬:

"তিনিই তোমাদেরকে গর্ভে যেমন ইচ্ছা গঠন করেন। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

এটি নবী ঈসা (আঃ)-এর মতো মানুষকে ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণের ধারণাকে খণ্ডন করে। কোন ঐশ্বরিক সত্তাকে সৃষ্টি করা হয় না, বরং তিনিই সৃষ্টি করেন। কোন ঐশ্বরিক সত্তাকে অন্য কোন সত্তা দ্বারা জোর করে কোন নির্দিষ্ট রূপে ধারণ করা হয় না। একজন মানুষের একটি শুরু এবং শেষ আছে এবং সে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে একজন মানুষ কখনই ঐশ্বরিক হতে পারে না এবং তাই সে উপাসনার যোগ্য নয়।

উপরন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের লালন-পালন করেন, তাই একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করা উচিত। যিনি তাদেরকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন, তাকে উপেক্ষা করা একজন ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতা। উপরন্তু, যেমন একজন ব্যক্তি যার কাছে কোন জিনিস

আছে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে সে তার সাথে কী করবে এবং তার মালিকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি করার অধিকার কারো নেই, তেমনি একজন মানুষ যাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং লালন-পালন করেছেন এবং তাই তিনিই তার মালিক, তার আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের বিরুদ্ধে আপত্তি করার কোনও অধিকার নেই। পরিশেষে, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারভুক্ত এবং তার অধীনে, একজন ব্যক্তির তাঁর নিয়ম মেনে চলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট দেশের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তবে সে সমস্যার সম্মুখীন হবে, তেমনি মহাবিশ্বের মালিকের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতেই সমস্যা পড়বে। একজন ব্যক্তি যদি দেশটির নিয়ম-কানুন পছন্দ না করেন, তাহলে তিনি দেশ ত্যাগ করতে পারবেন, কিন্তু তিনি এমন কোন স্থানে পালিয়ে যেতে পারবেন না যেখানে মহান আল্লাহর আইন ও এখতিয়ার প্রযোজ্য হবে না। একজন ব্যক্তি তার সমাজের নিয়ম-কানুন পরিবর্তন করতে পারবেন, কিন্তু তিনি কখনই মহান আল্লাহর আইন-কানুন পরিবর্তন করতে পারবেন না। উপরন্তু, যেমন একজন ব্যক্তি যার একটি বাড়ির মালিক, তিনি ঘরের নিয়ম-কানুন ঠিক করেন, এমনকি অন্যরা এই নিয়ম-কানুন মেনে চলেও, একইভাবে, মহাবিশ্ব আল্লাহর, এবং তাই, তিনিই একমাত্র এই মহাবিশ্বের নিয়ম-কানুন ঠিক করেন, মানুষ এই নিয়মগুলি পছন্দ করুক বা না করুক। অতএব, একজনকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে সে আল্লাহর আইন-কানুন মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে, তাঁর প্রতি আনুগত্য বর্ণিত হোক। ৬ নং আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, একজন ব্যক্তি হয় মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পেছনের হিকমত শেখার চেষ্টা করতে পারে, যাতে সে বুঝতে পারে যে কীভাবে সে তার এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য উপকারী এবং কীভাবে সে উভয় জগতে মানসিক ও শারীরিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, অথবা সে তার কামনা-বাসনার উপাসনা করতে পারে এবং ইসলামের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, ৬ নং আয়াত:

"তিনিই তোমাদেরকে গর্ভে যেমন ইচ্ছা গঠন করেন। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলামী নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তার উচিত উভয় জগতেই তার পছন্দের পরিণতি ভোগ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং কোন আপত্তি, প্রতিবাদ বা অভিযোগ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। সূরা আল কাহফ, আয়াত ২৯:

"আর বলো, "সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, অতএব যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক; আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।" নিশ্চয়ই, আমরা জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে ঘিরে থাকবে। আর যদি তারা সাহায্যের জন্য ডাকে, তবে তাদের সাহায্যের জন্য ঘোলা তেলের মতো পানি ব্যবহার করা হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দেবে। পানীয় কত নিকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট।"

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ৭-৯

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ۚ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٩﴾

“তিনিই তোমার প্রতি, [নবী মুহাম্মদ, সা.], কিতাব নাযিল করেছেন। এতে এমন আয়াত রয়েছে যা সুনির্দিষ্ট - এগুলো কিতাবের ভিত্তি - এবং অন্যগুলো অস্পষ্ট। যাদের অন্তরে [সত্য থেকে] বিচ্যুতি রয়েছে, তারা এর অস্পষ্ট আয়াতের অনুসরণ করে, বিভেদের সন্ধানে এবং [তাদের জন্য উপযুক্ত] ব্যাখ্যার সন্ধানে। আর আল্লাহ ছাড়া এর [সত্য] ব্যাখ্যা কেউ জানে না। আর জ্ঞানে দৃঢ় যারা, তারা বলে, "আমরা এতে বিশ্বাস করি। [এটা] সবই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে।" আর বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ উপদেশ পাবে না।

[যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদেরকে পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে বক্র করো না এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমিই দাতা।"]

"হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি অবশ্যই মানুষকে এমন এক দিনে একত্রিত করবে, যার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।"

অধ্যায় ৩: আলে ইমরান, আয়াত ৭:

" তিনিই তোমার উপর, [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], কিতাব নাযিল করেছেন..."

এই সত্যটি মদিনায় বসবাসকারী আহলে কিতাব এবং মক্কার অমুসলিম উভয়ের কাছেই খুব স্পষ্ট ছিল। আহলে কিতাবদের পণ্ডিতরা পবিত্র কুরআনের লেখক, মহান আল্লাহকে স্বীকৃতি দেওয়ার সাথে সাথে ইসলামের সত্যতা স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, কারণ তারা তাদের ঐশী গ্রন্থগুলিতে তাঁর বাণী অধ্যয়ন করেছিলেন। এছাড়াও, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং পবিত্র কুরআন উভয়ই তাদের ঐশী গ্রন্থগুলিতে আলোচনা করা হয়েছিল। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

মক্কার অমুসলিমরা আরবি ভাষার উপর দক্ষ ছিল, তাই তারা জানত যে পবিত্র কুরআন কোন সৃষ্টির বাণী নয়। এবং যেহেতু তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ঘোষণার আগে চল্লিশ বছর তাঁর সাথে কাটিয়েছিল, তাই তারা জানত যে তিনি মিথ্যাবাদী নন। অধ্যায় ১০ ইউনুস, আয়াত ১৬:

"... কারণ আমি এর আগে তোমাদের মধ্যে এক জীবনকাল কাটিয়েছি। তাহলে কি তোমরা বুঝতে পারবে না?"

অবশেষে, আহলে কিতাব এবং মক্কার অমুসলিম উভয়ই জানত যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) পূর্ববর্তী ঐশী কিতাব অধ্যয়ন করেননি এবং তাই তাঁর পক্ষে পবিত্র কুরআন জাল করা অসম্ভব ছিল। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ৪৮:

"আর তুমি এর আগে কোন কিতাব পাঠ করেনি এবং তোমার ডান হাতে কোন কিতাব লিখে রাখেনি। তাহলে [অর্থাৎ, অন্যথায়] মিথ্যাবাদীদের সন্দেহের কারণ হত।"

অধ্যায় ৩: আলে ইমরান, আয়াত ৭:

" তিনিই তোমার উপর, [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], কিতাব নাযিল করেছেন..."

সর্বদা মনে রাখা উচিত যে পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য হলো মানবজাতিকে পথ প্রদর্শন করা। এই নির্দেশনা বোঝা এবং তার উপর আমল করা ছাড়া সম্ভব নয়। অতএব, যদি কেউ এর নির্দেশনা থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হতে চায়, তাহলে তাকে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার, বোঝার এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা তাদের প্রদত্ত সমস্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের জীবনের মধ্যে প্রত্যেককে এবং সবকিছুকে সঠিকভাবে স্থান দেবে এবং পরকালে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হবে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসবে।

যেহেতু পবিত্র কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি পথনির্দেশিকা এবং এটি কেবল পণ্ডিতদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়, তাই পূর্বে আলোচনা করা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন দিক পূরণ করা প্রত্যেকের পক্ষে সহজেই অর্জনযোগ্য। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৭:

"তিনিই তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন; এতে আয়াতসমূহ [যা] সুনির্দিষ্ট - এগুলো কিতাবের ভিত্তি..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৮৫:

রমজান মাস [সেই] মাস যাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য পথনির্দেশনা এবং হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন এবং পার্থক্যকারী..."

এখানে উল্লেখিত সুনির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট আয়াতগুলি হল সেই আয়াতগুলি যা স্পষ্ট এবং সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে এবং যার অর্থ বাস্তবসম্মতভাবে ভুল ব্যাখ্যা করা যায় না। এই আয়াতগুলি পবিত্র কুরআনের মূল ভিত্তি গঠন করে। এগুলি এমন আয়াত যা পবিত্র কুরআন যে উদ্দেশ্যের জন্য নাজিল হয়েছিল তা পূরণ করে। এগুলিতে স্পষ্ট উপদেশ এবং নির্দেশনা রয়েছে পাশাপাশি বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস এবং অনুশীলনের খণ্ডনও রয়েছে। এগুলিতে প্রকৃত ঈমানের মূলনীতিও রয়েছে। বিশ্বাস, ইবাদত এবং সৎ চরিত্রের পাশাপাশি কর্তব্য এবং নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত শিক্ষা। এই আয়াতগুলি সত্য-অনুসন্ধানকারীকে উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে।

ইসলামের কিছু অংশ, যেমন আইনশাস্ত্রের বিষয়, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গভীর বোধগম্যতা এবং পটভূমি জ্ঞানের প্রয়োজন, যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান। এই ক্ষেত্রে, তাদের বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা পাওয়ার জন্য একজন নির্ভরযোগ্য আলেমের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৭:

"...কিতাব; এতে এমন আয়াত রয়েছে যা [সঠিক] - এগুলি কিতাবের ভিত্তি - এবং অন্যগুলি অস্পষ্ট..."

অস্পষ্ট আয়াতগুলির কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে এবং তাই বাস্তবিকভাবে এগুলি ভুল ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু এই আয়াতগুলি ইসলামের মূল অংশ নয় এবং মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার জন্য কাউকে তাদের ব্যাখ্যা অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। পরিবর্তে, স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট আয়াতগুলির আলোকে এগুলি বিশ্বাস করতে হবে এবং বিবেচনা করতে হবে, এমনকি যদি অস্পষ্ট আয়াতগুলির প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট না হয়।

অতএব, পবিত্র কুরআনে কিছু আয়াত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অন্যগুলো কম স্পষ্ট অর্থের, সেগুলোর একাধিক ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত। এই কম স্পষ্ট আয়াতগুলির মধ্যে কিছু আয়াত গভীর ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির বুঝতে পারেন এবং অন্যগুলো বোঝা যায় না, যেমন যেগুলো মহান আল্লাহর কিছু ঐশ্বরিক গুণাবলীর কথা উল্লেখ করে। শেষ ধরনের আয়াতগুলির পিছনে একটি হিকমত হল পরীক্ষা করা যে কে এমন কিছুতে বিশ্বাস করবে যা তারা বোঝে না এবং কে তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ভুল ব্যাখ্যা করবে। যে ব্যক্তি সঠিক উপায়ে পবিত্র কুরআনের কাছে যায় সে স্পষ্ট এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের দ্বারা স্পষ্ট করা বিষয়গুলি শেখার, বোঝার এবং সেগুলি অনুসরণ করার চেষ্টা করবে এবং কেবল সেই আয়াতগুলিতে বিশ্বাস করে যা বোঝা যায় না।

অতএব, সঠিক পটভূমি জ্ঞান ছাড়া পবিত্র কুরআনের এই অনির্দিষ্ট অংশগুলিতে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা এড়িয়ে চলা উচিত, অন্যথায় তারা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। কিন্তু যাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় কলুষিত তারা পবিত্র কুরআনের এই অনির্দিষ্ট আয়াতগুলিকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যাখ্যা করার জন্য অনুসরণ করবে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৭:

"... যাদের অন্তরে সত্য থেকে বিচ্যুতি আছে, তারা তার অস্পষ্ট বিষয়ের অনুসরণ করবে, বিবাদের খোঁজে এবং [তাদের জন্য উপযুক্ত] ব্যাখ্যার খোঁজে..."

আহলে কিতাবদের মত ইসলামের শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ এটি উভয় জগতেই ঝামেলার দিকে পরিচালিত করে। এর মাধ্যমে যে পার্থিব জিনিসগুলি পাওয়া যায়, যেমন সম্পদ এবং নেতৃত্ব, তা উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ, ঝামেলা এবং দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনান ইবনে মাজাহের ২৫৩ নম্বর হাদিসে এই ব্যক্তিকে জাহান্নামের বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, একজন মুসলিমকে পবিত্র কুরআনের সুনির্দিষ্ট এবং সরল আয়াতগুলি বুঝতে হবে এবং সেগুলি অনুসরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে পণ্ডিতদের কাছ থেকে অনির্দিষ্ট আয়াতগুলির ব্যাখ্যা চাইতে হবে। এবং পণ্ডিতদের তাদের জ্ঞান এবং বোধগম্যতার অভাব স্বীকার করে এবং তাদের ব্যাখ্যা বিতর্ক এবং গঠনমূলক সমালোচনার জন্য উন্মুক্ত বলে স্বীকার করে তাদের যথাসাধ্য ইসলামের শিক্ষার সঠিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৭-৮:

“... যাদের অন্তরে সত্য থেকে বিচ্যুতি আছে, তারা এর অস্পষ্ট বিষয়ের অনুসরণ করবে, বিবাদের খোঁজে এবং [তাদের জন্য উপযুক্ত] ব্যাখ্যার খোঁজে। আর আল্লাহ ছাড়া এর [সত্য] ব্যাখ্যা কেউ জানে না। আর জ্ঞানে দৃঢ় যারা, তারা বলে, "আমরা এতে বিশ্বাস করি। [এটা] সবই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে।" আর বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির ছাড়া আর কেউ উপদেশ পাবে না।”

এর থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি তার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বোঝে এবং গ্রহণ করে, সে প্রকৃত জ্ঞানী। অন্যদিকে, অজ্ঞ ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে সে সম্পূর্ণ জ্ঞানী। তাই জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য নম্রতা অবলম্বন করা এবং তাদের সীমাবদ্ধতাগুলি বোঝা এবং গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি তাকে অহংকার গ্রহণ থেকে বিরত রাখবে।

অধ্যায় ৩: আলে ইমরান, ৮ম আয়াত:

" [যারা বলে], "হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদেরকে পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে বক্র করো না এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমিই দাতা।”

এই প্রার্থনা মুসলমানদের মনে করিয়ে দেয় যে, নিষ্পাপ হওয়ার কোনও কারণ নেই, কারণ কেবলমাত্র নবীগণ, তাঁদের উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক না কেন, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে পথভ্রষ্টতা থেকে সুরক্ষিত। অতএব, যত জ্ঞানই থাকুক না কেন, তাঁরা পথভ্রষ্ট হতে পারেন। অতএব, সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে এবং মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা। তাদের অলস মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে এবং কখনও বিশ্বাস করতে হবে না যে তারা যথেষ্ট ভালো কাজ করেছে, কারণ তারা জানে না কোন ভালো কাজ আল্লাহ, মহান কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং কোনগুলো তাদের পক্ষ থেকে কোনও ত্রুটির কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তাদের ধর্মীয় ছাড়ের উপর অতিরিক্ত কাজ করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং মৃত্যু না আসা পর্যন্ত সর্বোচ্চ ক্ষমতার সাথে আল্লাহ, মহানের আনুগত্য করার চেষ্টা করতে হবে।
অধ্যায় ১৫ আল হিজর, আয়াত ৯৯:

"আর তোমার রবের ইবাদত করো যতক্ষণ না তোমার কাছে নিশ্চিত (অর্থাৎ মৃত্যু) আসে।"

এবং ৪১ ফুসসিলাত অধ্যায়, ৩০ নং আয়াত:

"নিশ্চয়ই, যারা বলেছে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ", তারপর সঠিক পথে অবিচল রয়েছে, তাদের কাছে ফেরেশতারা অবতীর্ণ হবে এবং বলবে, "ভয় করো না এবং দুঃখ করো না এবং তোমাদেরকে যে জ্ঞানাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ গ্রহণ করো।"

অতএব, এটি এই বোকামিপূর্ণ ভুল ধারণা দূর করে যে বিশ্বাস করা যে কেউ সাফল্য এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে, কিন্তু আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য না করলেও।

অধ্যায় ৩: আলে ইমরান, ৮ম আয়াত:

" [যারা বলে], "হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদেরকে পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে বক্র করো না এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমিই দাতা।"

এটি আরও ইঙ্গিত করে যে, ইসলামে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাই সাফল্য এবং মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। সঠিক পথে চলার জন্য একজনকে অবশ্যই ভালো কাজের মাধ্যমে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করতে হবে। কারণ ঈমান হলো একটি গাছের মতো যাকে ভালো কাজের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে যাতে সে বেড়ে ওঠে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি না পেলে মারা যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও বৃদ্ধি পাবে না এবং ভালো কাজের মাধ্যমে পুষ্ট না হলে মারা যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা, যেমনটি সঠিকভাবে প্রদত্ত হয়েছে।

অধ্যায় ৩: আলে ইমরান, ৮ম আয়াত:

"...হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদেরকে পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে বিকৃত করো না এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমিই দাতা।"

এটি মুসলমানদের মনে করিয়ে দেয় যে, মহান আল্লাহকে মেনে চলার অনুপ্রেরণা, ক্ষমতা, সুযোগ এবং জ্ঞান সবকিছুই তাঁর কাছ থেকে আসে। অতএব, তাদের সংকর্ম বা তাদের পার্থিব মর্যাদা নিয়ে কখনও গর্ব করা উচিত নয় এবং ধরে নেওয়া উচিত যে উভয় জগতেই তাদের জন্য ক্ষমা ও করুণা নিশ্চিত। পরিবর্তে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করে সর্বদা মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার সন্ধান করা উচিত এবং যখনই তারা কোনও পাপ করে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত, কারণ কেউই নিখুঁত নয়। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে দোষী বোধ করা, মহান আল্লাহ এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লজ্জিত যেকোনো অধিকার পূরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে উভয় জগতেই মহান আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা লাভ করবে, যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে।

এছাড়াও, সাধারণভাবে বলতে গেলে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছ থেকে রহমত কামনা করে, তার উচিত সৃষ্টির প্রতি রহমত প্রদর্শন করা। সুনানে আবু দাউদের ৪৯৪১ নম্বর হাদিসে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, মহান আল্লাহ মানুষের সাথে সেভাবেই আচরণ করেন যেমন তারা অন্যদের সাথে করে।

দোয়ার পরবর্তী অংশটি ইঙ্গিত দেয় যে, যখন কেউ বিচারের দিনে তার জবাবদিহিতা সর্বদা স্মরণ করবে, তখন সে সঠিক পথে এবং মনোভাবের উপর দৃঢ় থাকবে। যে ব্যক্তি মনে রাখবে যে, তার প্রতিটি উদ্দেশ্য, কথা এবং কাজের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে, সে সর্বদা সেগুলি সংশোধন করার চেষ্টা করবে যাতে সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৯:

"হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি অবশ্যই মানুষকে এমন এক দিনে একত্রিত করবে, যার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।"

কিয়ামতের দিন মানুষের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা অস্বীকার করা একটি অদ্ভুত দাবি, যখন দিন, মাস এবং বছর জুড়ে পুনরুত্থানের অনেক উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ বৃষ্টি ব্যবহার করে একটি মৃত অনুর্বর ভূমিকে জীবন দান করেন এবং সৃষ্টির জন্য একটি মৃত বীজকে জীবন্ত করে তোলেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ, মানুষ নামক মৃত বীজকে, যাকে মাটিতে সমাহিত করা হয়, জীবন দান করতে পারেন এবং করবেন, যেমন মৃত বীজ থেকে জীবিত হয়ে ওঠে। ঋতু পরিবর্তন স্পষ্টভাবে পুনরুত্থানকে দেখায়। উদাহরণস্বরূপ, শীতকালে, গাছের পাতা মারা যায় এবং ঝরে পড়ে এবং গাছটি প্রাণহীন দেখায়। কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে, পাতাগুলি আবার গজায় এবং গাছটি প্রাণে পূর্ণ দেখায়। সমস্ত প্রাণীর ঘুম জাগরণ চক্র পুনরুত্থানের আরেকটি উদাহরণ। ঘুম মৃত্যুর বোন, কারণ ঘুমন্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় কেটে ফেলা হয়। মহান আল্লাহ, তারপর একজন ব্যক্তির আত্মা তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন যদি তারা বেঁচে থাকার জন্য নির্ধারিত হয় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিকে আবার জীবন দান করে। অধ্যায় ৩৭ আয-যুমার, আয়াত ৪২:

"আল্লাহ মানুষের আত্মা তাদের মৃত্যুর সময় কবজ করেন এবং যারা মারা যায় না তাদের নিদ্রাকালে কবজ করেন। অতঃপর যাদের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদের তিনি ধরে রাখেন এবং অন্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

যুক্তিসঙ্গতভাবে বলতে গেলে, বিচার দিবস এমন একটি জিনিস যা অবশ্যই ঘটবে। কেউ যদি মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করে তবে সে ভারসাম্যের অনেক উদাহরণ দেখতে পাবে। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী সূর্য থেকে একটি নিখুঁত এবং সুষম দূরত্বে অবস্থিত। পৃথিবী যদি সূর্যের একটু কাছে বা আরও দূরে থাকত তবে এটি বসবাসের অযোগ্য হত। একইভাবে, জলচক্র, যার মধ্যে সমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে জলের বাষ্পীভবন জড়িত যা পরে বৃষ্টিপাতের জন্য ঘনীভূত হয়, পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ যাতে সৃষ্টি পৃথিবীতে বসবাস চালিয়ে যেতে পারে। ভূমি একটি সুষম উপায়ে তৈরি করা হয়েছিল যাতে দুর্বল শাখা এবং বীজের অঙ্কুরগুলি সৃষ্টির জন্য ফসল সরবরাহ করার জন্য এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারে তবে একই ভূমি তার উপরে নির্মিত ভারী ভবনগুলি সহ্য করার জন্য যথেষ্ট শক্ত। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যা কেবল স্পষ্টভাবে একজন স্রষ্টাকেই নির্দেশ করে না, ভারসাম্যকেও নির্দেশ করে। তবে এই পৃথিবীতে একটি প্রধান জিনিস রয়েছে যা স্পষ্টভাবে ভারসাম্যহীন, তা হল মানবজাতির কর্মকাণ্ড। প্রায়শই অত্যাচারী এবং অত্যাচারী মানুষদের দেখা যায় যারা এই পৃথিবীতে শাস্তি থেকে বাঁচে। বিপরীতে, এমন অসংখ্য মানুষ আছে যারা অন্যদের দ্বারা নিপীড়িত হয় এবং অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন হয় কিন্তু তাদের ধৈর্যের জন্য তাদের পূর্ণ পুরস্কার পায় না। অনেক মুসলিম যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে, তারা প্রায়শই এই পৃথিবীতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং পুরস্কারের সামান্য অংশ পায়, অন্যদিকে যারা প্রকাশ্যে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়, তারা এই পৃথিবীর বিলাসিতা উপভোগ করে এবং কেবল কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। ঠিক যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতে একটি ভারসাম্য স্থাপন করেছেন, তেমনি কর্মের পুরস্কার এবং শাস্তিরও ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কিন্তু

এটি স্পষ্টতই এই পৃথিবীতে ঘটে না, তাই এটি অন্য সময়ে, অর্থাৎ প্রতিদানের দিনে অর্থাৎ বিচারের দিনে ঘটতে হবে।

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতেই পূর্ণ পুরস্কার এবং শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে পূর্ণ শাস্তি না দেওয়ার পেছনের একটি প্রজ্ঞা হল, মহান আল্লাহ তাদেরকে সুযোগের পর সুযোগ দিয়ে থাকেন যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তাদের আচরণ সংশোধন করে। তিনি এই পৃথিবীতে মুসলিমদের পূর্ণ পুরস্কার দেন না কারণ এই পৃথিবী জান্নাত নয়। উপরন্তু, অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস করা, অর্থাৎ পরকালে একজন মুসলিমের জন্য অপেক্ষা করা পূর্ণ পুরস্কার, ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্যের উপর বিশ্বাসই ঈমানকে বিশেষ করে তোলে। এমন কিছুতে বিশ্বাস করা যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়, যেমন এই পৃথিবীতে পূর্ণ পুরস্কার পাওয়া, এত বিশেষ হবে না।

পূর্ণ শাস্তির ভয় এবং পরকালে পূর্ণ প্রতিদান পাওয়ার আশা একজনকে পাপ থেকে বিরত থাকতে এবং সৎকর্ম করতে উৎসাহিত করবে।

এই বস্তুগত জগতের প্রতিফল দিবস শুরু হতে হলে অবশ্যই শেষ হতে হবে। কারণ শাস্তি এবং পুরস্কার কেবল তখনই দেওয়া যেতে পারে যখন প্রত্যেকের কর্ম শেষ হয়ে যায়। অতএব, মানুষের কর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিফল দিবস সংঘটিত হতে পারে না। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, বস্তুগত জগতের অবশ্যই শেষ হতে হবে, শীঘ্র হোক বা কাল।

এই আলোচনার উপর চিন্তা করলে, কেয়ামতের প্রতি তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হবে এবং এর ফলে তারা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২২:

" কারণ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে একটি উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রতিটি প্রাণী তার কৃতকর্মের প্রতিফল পায় এবং কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৯:

"হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি অবশ্যই মানুষকে এমন এক দিনে একত্রিত করবে, যার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যারা পবিত্র কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে, তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করবে। কারণ এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেয়। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই

একমাত্র সবকিছু জানেন, তাই তিনিই একমাত্র নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা এই ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সংকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

অথচ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব, অদূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের কারণে, সমস্ত মানবসৃষ্ট আচরণবিধি কখনই একজন ব্যক্তিকে উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করতে পারে না, এমনকি যদি তারা বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে এবং অনেক পার্থিব বিলাসিতা লাভ করে। অধ্যায় ৯, আত তাওবাহ, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্ব্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ্ বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"]

অতএব, একজন ব্যক্তির অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা উচিত, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার বিরোধিতা করেও। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..'"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১০-১৩

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ

النَّارِ ﴿١٠﴾

كَذَّابٍ ءَالٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

﴿١١﴾

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾

قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِتْنَتِیِ التَّقَاتِ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ

يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً

لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾

“নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে, তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে তাদের কোন কাজে আসবে না। আর তারাই আগুনের ইন্ধন।

[তাদের] রীতি ফেরাউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের রীতির মতো। তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছিল, তাই আল্লাহ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। আর আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

যারা অবিশ্বাস করে তাদের বলো, "তোমরা পরাজিত হবে এবং জাহান্নামে একত্রিত হবে, আর তা কতই না নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।"

[বদরের যুদ্ধে] যে দুটি সৈন্যদলের মুখোমুখি হয়েছিল, তাদের মধ্যে তোমাদের
জন্য নিদর্শন রয়েছে - একটি আল্লাহর পথে লড়াই করছে এবং অন্যটি
কাফেরদের। তারা [কাফেররা] তাদের [মুসলিমদের] [তাদের] দৃষ্টিতে দ্বিগুণ দেখতে
পেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর বিজয় দিয়ে সাহায্য করেন। অবশ্যই এতে
দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।"

মানুষ ইসলামের সত্যতা প্রত্যাখ্যান করার প্রধান কারণ হলো তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা পূরণের প্রতি ভালোবাসা। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস অনুসারে ইসলাম মানুষকে প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শেখায়, তাই ইসলাম সরাসরি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং ফলস্বরূপ তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু সর্বদা মনে রাখতে হবে যে এই পৃথিবীতে নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল মনের শান্তি অর্জন করা। এবং মনের শান্তি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করে এবং যখন তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেয়। জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার অভাব, অদূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের কারণে কোনও মানব-রচিত আচরণবিধি এই ফলাফল অর্জন করতে পারে না। এটি স্পষ্ট হয় যখন কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে এবং অনেক পার্থিব বিলাসিতা অর্জন করেও তারা কীভাবে দুঃখজনক জীবনযাপন করে তা দেখে। অধ্যায় ৯ তওবার ৮২ নম্বর আয়াতে:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলাই এমন একজন যিনি এমন একটি নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করার জ্ঞান রাখেন যা মনের শান্তির দিকে পরিচালিত করে। আর তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসের মাধ্যমে মানবজাতিকে এই নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করেছেন। অতএব, মনের ও শরীরের শান্তি অর্জনের জন্য নিজের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই সামান্য মূল্য, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি সুস্বাস্থ্য অর্জনের জন্য তার খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি তার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করার পরেও মানসিক শান্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, তার জন্য জীবন এক অন্ধকার কারাগারে পরিণত হয়।

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলা সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান, যার মধ্যে রয়েছে মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে মনের শান্তি পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[মানুষকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ[অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

এবং অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১০:

" নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কখনোই তাদের কোন কাজে আসবে না..."

অতএব, একজন ব্যক্তির অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা উচিত, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার বিরোধিতা করেও। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

কিন্তু যারা ইসলামের স্পষ্ট প্রমাণ গ্রহণ করতে এবং তার উপর আমল করতে অস্বীকৃতি জানায় যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে, তারা দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা যে পার্থিব জিনিসপত্র অর্জন করে, তা উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ, উদ্বেগ এবং দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি যদি তারা বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে। যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাদের দেখলে এটি বেশ স্পষ্ট। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১০:

" নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কখনোই তাদের কোন কাজে আসবে না..."

যদি কেউ এই মনোভাব ধরে রাখে, তাহলে তারা এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি পাবে না এবং পরকালে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হবে। অতএব, তারা এই পৃথিবীতে দুঃখের জীবন এবং পরকালে দুঃখের জীবন যাপন করবে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১০:

"...এবং তারাই আগুনের ইন্ধন।"

এই পরিণতি এড়ানো সম্ভব যদি কেউ কেবল ইতিহাস এবং তাদের নিজস্ব সময়ের মানুষদের পর্যবেক্ষণ করে যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এবং

ফলস্বরূপ কীভাবে তারা মানসিক শান্তি লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১১:

"[তাদের] রীতি ফেরাউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের রীতির মতো। তারা আমার নিদর্শনগুলিকে অস্বীকার করেছিল, তাই আল্লাহ তাদের পাপের জন্য তাদের পাকড়াও করেছিলেন। আর আল্লাহর শাস্তি কঠোর।"

ইসলাম পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে পাওয়া নিদর্শনসমূহ দ্বারা গঠিত, যা মহান আল্লাহকে মেনে চলার গুরুত্ব এবং মহাবিশ্বের মধ্যে নিদর্শনসমূহ, যেমন পূর্ববর্তী প্রজন্মের ভাগ্য, নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তির জন্য উভয় নিদর্শনকে উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। অতএব, একজন ব্যক্তির উচিত একটি পর্যবেক্ষণশীল মনোভাব গ্রহণ করা যাতে তারা অন্য মানুষের সিদ্ধান্ত এবং তাদের পছন্দের পরিণতি পর্যবেক্ষণ করে। এটি তাদের ভুল পছন্দ করা এড়াতে এবং পরিবর্তে জীবনে সঠিক পথ বেছে নিতে উৎসাহিত করবে যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। কিন্তু যারা তাদের উপলব্ধি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয় তারা ইতিহাস বা তাদের চারপাশের মানুষদের কাছ থেকে শিক্ষা নেবে না। পরিবর্তে, তারা তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ইসলামের সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে অন্ধভাবে বিভ্রান্ত লোকদের অনুসরণ করবে। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে যদি তারা তাদের পূর্ববর্তী বিপথগামী লোকদের মতো একই পথ বেছে নেয়, তাহলে তারা উভয় জগতেই একই পরিণতি ভোগ করবে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১২:

"যারা অবিশ্বাস করে তাদের বলো, "তোমরা পরাজিত হবে এবং জাহান্নামে একত্রিত হবে, আর তা কতই না নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।"

পরিশেষে, সমগ্র সৃষ্টি মহান আল্লাহর আওতাধীন এবং তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারাধীন, একজন ব্যক্তির তাঁর নিয়ম মেনে চলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট দেশের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তেমনি মহাবিশ্বের মালিকের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতেই তার সমস্যা হবে। একজন ব্যক্তি যদি তার নিয়ম মেনে চলতে না পারে তবে একটি দেশ ছেড়ে যেতে পারে কিন্তু এমন জায়গায় পালিয়ে যেতে পারবে না যেখানে মহান আল্লাহর নিয়ম ও এখতিয়ার প্রযোজ্য হয় না। একজন ব্যক্তি তার সমাজের নিয়ম পরিবর্তন করতে সক্ষম হতে পারে কিন্তু তারা কখনও মহান আল্লাহর নিয়ম পরিবর্তন করতে পারবে না। উপরন্তু, ঠিক যেমন একজন বাড়ির মালিক ঘরের নিয়ম নির্ধারণ করে, এমনকি অন্যরা এই নিয়মের প্রতি আপত্তি জানালেও, একইভাবে, মহাবিশ্ব মহান আল্লাহর, এবং তাই, তিনিই একমাত্র এই মহাবিশ্বের নিয়ম নির্ধারণ করেন, মানুষ এই নিয়ম পছন্দ করুক বা না করুক। অতএব, এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে, নিজের স্বার্থে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে সে মহান আল্লাহর নিয়ম মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। একজন ব্যক্তি হয় আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পিছনের হিকমতগুলি শেখার চেষ্টা করতে পারে, যাতে সে বুঝতে পারে যে কীভাবে সেগুলি তাদের এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য উপকারী এবং কীভাবে তারা উভয় জগতে মানসিক ও শারীরিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, অথবা সে তার আকাঙ্ক্ষার উপাসনা করতে পারে এবং ইসলামের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলামী নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তার উচিত উভয় জগতেই তার পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং কোনও আপত্তি, প্রতিবাদ বা অভিযোগ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ২৯:

"আর বলো, "সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, অতএব যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক; আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।" নিশ্চয়ই, আমরা জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে ঘিরে থাকবে। আর যদি তারা সাহায্যের জন্য ডাকে, তবে তাদের সাহায্যের জন্য ঘোলা তেলের মতো পানি ব্যবহার করা হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দেবে। পানীয় কত নিকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট।"

এরপর আল্লাহ তাআলা বদরের যুদ্ধের কথা আলোচনা করেন, যা ছিল মক্কার মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে প্রথম বড় যুদ্ধ। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩ :

"তোমাদের জন্য অবশ্যই দুটি সৈন্যদলের মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে যারা [বদরের যুদ্ধে] মুখোমুখি হয়েছিল - একটি আল্লাহর পথে লড়াই করেছে এবং অন্যটি কাফেরদের। তারা তাদের দৃষ্টিতে দ্বিগুণ দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর বিজয় দিয়ে সাহায্য করেন। অবশ্যই এতে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।"

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর দ্বিতীয় বছরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মক্কার অমুসলিমদের একটি কাফেলা আক্রমণ করার পথে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানানো হয় যে মক্কার অমুসলিম নেতারা মুসলমানদের মোকাবেলা করার জন্য একটি সেনাবাহিনী গঠন করেছেন। আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, প্রথমে সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, অমুসলিমদের দৃষ্টিতে সংখ্যা কম দেখিয়েছিলেন যাতে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সত্য মিথ্যার উপর জয়লাভ করে। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, আল্লাহ, মহান, সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, অমুসলিমদের দ্বিগুণ সংখ্যায় দেখিয়েছিলেন যাতে তাদের

হৃদয়ে ভয় সঞ্চারিত হয় এবং মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, সাহায্য করেন। সূরা ৮ আল আনফাল, আয়াত ৪৪:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমরা মুখোমুখি হলে তিনি তোমাদের চোখে তাদেরকে কম দেখিয়েছিলেন এবং তাদের চোখে তোমাদেরকে কম দেখিয়েছিলেন যাতে আল্লাহ পূর্বে নির্ধারিত কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন..."

এবং অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৩:

"তোমাদের জন্য অবশ্যই দুটি বাহিনীর মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে যারা [বদরের যুদ্ধে] মুখোমুখি হয়েছিল - একটি ছিল আল্লাহর পথে যুদ্ধকারী এবং অন্যটি ছিল কাফেরদের। তারা তাদের দৃষ্টিতে তাদের দ্বিগুণ দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর বিজয় দিয়ে সাহায্য করেন। অবশ্যই এতে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৬৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, একজন ব্যক্তির অবশ্যই একটি পর্যবেক্ষণশীল মানসিকতা গ্রহণ করতে হবে যার মাধ্যমে তারা অতীতের ঘটনাবলী এবং তাদের চারপাশের লোকেদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে, যাতে তারা জীবনে সঠিক পথ বেছে নিতে পারে এবং অন্যদের করা ভুলগুলি এড়াতে পারে যা তাদের মানসিক শান্তি থেকে বঞ্চিত করে, যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে মানুষের সন্তুষ্টির পিছনে ছুটতে এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করা। মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাঁর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে, তিনি নিশ্চিত করবেন যে তারা তাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠবে যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করতে পারে। অধ্যায় 65 তালুক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই সাফল্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে নয়। এটি সর্বদা মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অনুসারে। অতএব, এই সাফল্য সেই অনুযায়ী ঘটে যখন এটি মানুষের জন্য সর্বোত্তম এবং এমনভাবে যা তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, এই জেনে রাখা উচিত যে, তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য দান করা হবে, কোন না কোনভাবে, তা তাদের কাছে স্পষ্ট হোক বা না হোক। এই আনুগত্যের মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সংকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৪-১৭

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَآبِ ﴿١٤﴾

﴿ قُلْ أَوْفَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾
الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِيتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

"মানুষের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতি ভালোবাসা সুশোভিত করা হয়েছে- নারী, পুত্র, সোনা ও রূপার স্তূপীকৃত রত্ন, উন্নতমানের ঘোড়া, গবাদি পশু এবং চাষাবাদ করা জমি। এটাই পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর কাছেই রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান।"

বলুন, "আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম কিছুর সংবাদ দেব? যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এবং পবিত্র স্ত্রী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ [তাঁর] বান্দাদের দেখেন।"

যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের
পাপ ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করো।"

ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, যারা[আল্লাহর পথে] ব্যয় করে এবং যারা ভোর
হওয়ার আগে ক্ষমা প্রার্থনা করে।"

এই পৃথিবীর জীবন হলো একটি পরীক্ষা যেখানে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে মানুষ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করবে কিনা তা জড়িত। সূরা আল-মুলক, আয়াত ২:

" যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম..."

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, ১৪ নম্বর আয়াত:

"মানুষের জন্য তাদের আকাউক্ষার প্রতি ভালোবাসা সুশোভিত করা হয়েছে - নারী, পুত্র, সোনা ও রূপার স্তূপ, উন্নতমানের ঘোড়া, গবাদি পশু এবং চাষযোগ্য জমি..."

যে ব্যক্তি এই পরীক্ষাটি বোঝে, সে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। কারণ এই মনোভাব একজনকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে সাহায্য করবে এবং ১৪ নং আয়াতে উল্লেখিত সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে, একই সাথে বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেবে। অতএব, এই মনোভাব উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যেহেতু একমাত্র মহান আল্লাহই সবকিছু জানেন, তাই তিনিই সর্বোত্তম আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা এই ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে। জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার অভাব, অদূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের কারণে মানবসৃষ্ট সমস্ত আচরণবিধি এবং জীবনধারা কখনই এই ফলাফল অর্জন করতে পারে না। অতএব, যে ব্যক্তি ইসলাম থেকে ভিন্ন জীবনধারা গ্রহণ করে সে অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে এবং তাদের জীবনের সকলকে এবং সবকিছুকে ভুল স্থানে ফেলবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হবে। এর ফলে তারা মানসিক চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলায় ভরা জীবনযাপন করবে, এমনকি যদি তারা বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে এবং পার্থিব বিলাসিতা লাভ করে। অধ্যায় ৯, তওবার আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিসহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ্ বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"]

যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করে এবং যারা করে না তাদের দেখলে এই দুটি জীবনযাত্রার মধ্যে পার্থক্য বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের নিজস্ব স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে, এমনকি যদি তা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতাও করে। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেন তিনিও ভালো থাকবেন। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন, মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

অতএব, যে ব্যক্তি উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে চায়, তাকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। এটি হলো মহান আল্লাহকে ভয় করা এবং পরকালে নিজের জবাবদিহিতাকে ভয় করার ফলাফল। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে উভয় জগতে এই মানসিক শান্তি অর্জনের সাথে অনেক পার্থিব জিনিসপত্র থাকার কোনও সম্পর্ক নেই, বরং এটি মূলত একজন ব্যক্তি কীভাবে তাকে প্রদত্ত জিনিসপত্র ব্যবহার করে, এমনকি যদি তার কাছে মাত্র কয়েকটি পার্থিব জিনিসপত্র থাকে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪-১৫:

" মানুষের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতি ভালোবাসা সুশোভিত করা হয়েছে - নারী, পুত্র, সোনা-রূপার স্তূপীকৃত রত্ন, সূক্ষ্ম ঘোড়া, গবাদি পশু এবং চাষাবাদ করা জমি। এটাই পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। বলুন,

"আমি কি তোমাদের এর চেয়ে উত্তম কিছুর খবর দেব? যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে জান্নাত রয়েছে যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এবং পবিত্র স্ত্রী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি..."

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কেউ যখন তাদের এবং তাদের প্রিয়জনদের সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত এবং হুকুমকে অনুমোদন করবে, তখনই কেবল তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবেন। সূরা ৮৯, আল ফজর, আয়াত ২৭-৩০:

"[সৎকর্মশীলদের বলা হবে], "হে প্রশান্ত আত্মা! তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাও, সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্ট হয়ে। এবং আমার [সৎকর্মশীল] বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"

অতএব, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ সর্বদা সকলের জন্য যা সর্বোত্তম তা নির্ধারণ করেন, এমনকি যদি তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

এই সত্যটি মনে রাখলে তা আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে সাহায্য করবে, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। স্বাচ্ছন্দ্য এবং অসুবিধা উভয় সময়েই এই মনোভাব গ্রহণ করা এই পৃথিবীতে জীবনযাপনের পরীক্ষার একটি অংশ।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৪-১৫:

"মানুষের জন্য তাদের আকাউক্ষার প্রতি ভালোবাসা সুশোভিত করা হয়েছে - নারী, পুত্র, সোনা-রূপার স্তূপীকৃত রত্ন, সূক্ষ্ম ঘোড়া, গবাদি পশু এবং চাষাবাদ করা জমি। এটাই পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। বলুন, "আমি কি তোমাদের এর চেয়ে উত্তম কিছু খবর দেব? যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে জান্নাত রয়েছে যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এবং পবিত্র স্ত্রী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি..."

এই জিনিসগুলো মানুষের দৃষ্টিতে বিভিন্ন উৎস থেকে সুশোভিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা এই জিনিসগুলোকে এমনভাবে সুশোভিত করেছেন যা মানুষকে সঠিক উপায়ে এগুলো ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিপরীত লিঙ্গকে সন্তান ধারণের পাশাপাশি মানুষের জন্যও সুশোভিত করা হয়েছে যাতে মানুষ বৈধ উপায়ে এই জিনিসগুলো অর্জন করে এবং তাদের পরিবারকে সঠিকভাবে পরিচালনা ও লালন-পালন করে যাতে তারা উভয় জগতেই তাদের জন্য কল্যাণের উৎস হয়ে ওঠে। ২৫ সূরা আল ফুরকান, আয়াত ৭৪:

"এবং যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে আমাদের চোখের শীতলতা দান করুন..."

আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে উল্লেখিত একই জিনিসগুলি শয়তান, সমাজ, সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো অন্যান্য উৎস দ্বারাও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, সৌন্দর্যবর্ধন প্রক্রিয়া মানুষকে অবৈধ উপায়ে এই জিনিসগুলি অর্জন করতে উৎসাহিত করে, যা উভয় জগতে একজন ব্যক্তির জন্য চাপ এবং অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে উল্লেখিত জিনিসগুলিকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে বিবেচনা করা উচিত যাতে তারা উভয় জগতে তাদের জন্য সান্ত্বনা এবং শান্তির উৎস হয়ে ওঠে।

মনে রাখতে হবে যে তারা এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চায় বা না চায়, উভয় জগতেই তাদের পছন্দের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে কারণ কেউই মহান আল্লাহর জ্ঞান এবং নিয়ন্ত্রণ থেকে রেহাই পেতে পারে না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫:

"... আর আল্লাহ[তঁার] বান্দাদের দেখেন।"

পরকালে জবাবদিহি করা স্পষ্ট, অন্যদিকে এই পৃথিবীতে জবাবদিহি করা প্রায়শই সূক্ষ্ম। যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, সে দেখতে পাবে যে

মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করে, তা উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ, দুর্দশা এবং ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি যদি তাদের বিনোদনের মুহূর্ত থাকে। এই ফলাফলটি বেশ স্পষ্ট যখন কেউ ধনীদের দেখে এবং তারা কীভাবে মানসিক ব্যাধিতে ডুবে থাকে, যেমন হতাশা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতা, যদিও তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন যারা এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করে যাতে মুসলমানরা তাদের মনোভাব এবং আচরণ গ্রহণ করতে পারে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬:

" যারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের পাপ ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করো।"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, জীবনে সঠিক মনোভাব গ্রহণ করা একটি বাস্তবিক বিষয়, যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। অতএব, এই আয়াতে উল্লেখিত বিশ্বাস কর্মের মাধ্যমে ব্যক্তির ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। পরবর্তী আয়াত দ্বারা এটি আরও সমর্থিত। এটি করতে ব্যর্থ হওয়া ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়, যার ইসলামে কোনও মূল্য নেই। ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা হল মহান আল্লাহর অবাধ্যতা চালিয়ে যাওয়া, যার অর্থ উভয় জগতে রহমত, সুরক্ষা এবং ক্ষমার আশা করা। অন্যদিকে, মহান আল্লাহর উপর আশা করা হল আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা এবং যখনই কেউ পাপ করে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া এবং তারপর উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমত, সুরক্ষা এবং ক্ষমার আশা করা। জামে আত

তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে আশা এবং ইচ্ছাপূরণের মধ্যে পার্থক্য এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, অনুতপ্ত হওয়ার অর্থ হল অপরাধবোধ করা, মহান আল্লাহ এবং যার উপর অন্যায় করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একজনকে আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তিনি আবার একই বা অনুরূপ পাপ করবেন না এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লজ্জিত যেকোনো অধিকারের ক্ষতিপূরণ দেবেন। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমান এমন একটি উদ্ভিদ যার বিকাশের জন্য আনুগত্যের কাজ প্রয়োজন। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, তা বৃদ্ধি পাবে না এবং অবশেষে মারা যাবে, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও বৃদ্ধি পাবে না এবং যদি তা আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট না হয় তবে মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকবে। এই আনুগত্যের কিছু কাজ পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৭:

" রোগী..."

ধৈর্য হলো যখন কেউ তাদের কাজ বা কথার মাধ্যমে তাদের অসুবিধা সম্পর্কে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলে এবং তাদের কঠিন পরীক্ষার সময় মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট করে। ধৈর্যশীল হওয়ার মূল হল ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা। কেউ যত বেশি ইসলামী জ্ঞান শিখবে এবং তার উপর আমল করবে, তত বেশি তারা বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ যা কিছু বেছে নেন তা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই সর্বোত্তম, এমনকি যদি তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়, কারণ তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তার পিছনে রয়েছে জ্ঞান যা তাদের কাছ থেকে লুকানো থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী শিক্ষার

মধ্যে এমন অনেক ঘটনা আলোচনা করা হয়েছে, যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের গল্প, যাকে তার ভাইয়েরা অল্প বয়সেই তার পিতামাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, অন্ধকার ও গভীর কূপে ফেলে দিয়েছিল, শিশু দাস হিসেবে বিক্রি করে দিয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু এই প্রতিটি ঘটনা তাকে কিছু শিক্ষা অর্জন করতে সাহায্য করেছিল যা তাকে মিশরের জনগণকে এক বিশাল দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত করেছিল। যদি তিনি তার মুখোমুখি হওয়া কষ্টগুলো সহ্য না করতেন, তাহলে তিনি লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচাতে পারতেন না। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

এই জ্ঞানের উপর বিশ্বাস রাখা এবং তাই, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা, ঈমানের একটি অংশ। সুখের সময় মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখা এবং তাঁর প্রশংসা করা সহজ, কিন্তু আসল পরীক্ষা তখনই হয় যখন কেউ সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তবুও তাঁর আনুগত্য করে এবং তাঁর প্রশংসা করে।

ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করলে একজন ব্যক্তি তাদের কষ্টের তুলনা অন্যদের সাথে করতে পারে, যারা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ছিল এবং যারা আরও বেশি কষ্ট সহ্য করেছিল। এই তুলনা তাদের নিজেদের কষ্টকে ছোট করে দেখতে সাহায্য করে যা তাদের ধৈর্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। এটি তখনও অর্জন করা যেতে পারে যখন কেউ তাদের সময়ের মধ্যে অন্যান্য মানুষদের পর্যবেক্ষণ করে যারা তাদের চেয়েও বেশি কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছে।

ইসলামী শিক্ষা একজনকে ভাগ্যের গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করে এবং কীভাবে তার জীবনে প্রতিটি ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে, তা সে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা কঠিন, তা অনিবার্য। অনিবার্য এবং অনিবার্য কিছু নিয়ে অভিযোগ করার ফলে কোনও কল্যাণ হবে না। একজন ব্যক্তি কেবল সেই অগণিত প্রতিদান হারাতে যা সে পেতে পারে যদি সে অনিবার্য সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। সূরা আয-যুমার, আয়াত ১০:

"...ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান বিনা হিসাব[অর্থাৎ, সীমা] দেওয়া হবে।"

অতএব, একজন ব্যক্তির সামনে ধৈর্যের সাথে একটি অনিবার্য ঘটনার মুখোমুখি হয়ে অগণিত পুরস্কার লাভ করা অথবা অধৈর্যের সাথে একটি অনিবার্য ঘটনার মুখোমুখি হয়ে তার প্রাপ্ত পুরস্কার হারাবার মধ্যে একটি পছন্দ করার সুযোগ রয়েছে। যেভাবেই হোক তারা অনিবার্য ঘটনার মুখোমুখি হবে, তাই উভয় জগতেই এর থেকে লাভবান হওয়া যুক্তিসঙ্গত। আল হাদিদ অধ্যায় ৫৭, আয়াত ২২-২৩:

"পৃথিবীতে অথবা তোমাদের উপর এমন কোন বিপদ আসে না যা আমরা তা সৃষ্টি করার পূর্বেই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকে - নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর জন্য সহজ। যাতে তোমরা যা হারিয়ে ফেলেছ তার জন্য হতাশ না হও..."

ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করলে একজন ব্যক্তি বুঝতে পারে যে এই পৃথিবীতে তারা যা চায় তা তাদের জন্য সর্বোত্তম নয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

প্রতিটি ব্যক্তির জীবনেই এই সত্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে। এমন অনেক জিনিস আছে যা একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে চান যে এটি তার জন্য সর্বোত্তম, তবে সেই জিনিসগুলি তার জন্য চাপের কারণ হয়ে ওঠে। এবং এমন অনেক জিনিস আছে যা একজন ব্যক্তি অপছন্দ করেন যে এটি তার জন্য খারাপ, কেবল সেই জিনিসগুলি তার জন্য মঙ্গলের কারণ হয়ে ওঠে। যে ব্যক্তি এটি বোঝে সে তার আকাঙ্ক্ষার বিপরীত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সময় কম অধৈর্য হবে, কারণ সে বুঝতে পারে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া তার জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তার কাছে স্পষ্ট নাও হয়।

উপরন্তু, যেমন তাপের মাধ্যমে সোনাকে বিশুদ্ধ করা হয়, তেমনি মানুষ অসুবিধার মুখোমুখি হয়ে মানসিক শক্তি অর্জন করে। যারা সহজ জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তারা বিবাহের সমস্যার মতো সাধারণ এমনকি ছোটখাটো সমস্যার মুখোমুখি হলে প্রায়শই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। পরীক্ষার মাধ্যমে, মহান আল্লাহ একজন মুসলিমের মানসিক অবস্থাকে শক্ত করেন যাতে তারা ভবিষ্যতের অসুবিধাগুলি সহজেই মোকাবেলা করতে পারে।

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, সকল পরিস্থিতিতে, এমনকি স্বস্তির সময়েও ধৈর্য ধারণ করা আবশ্যিক। স্বস্তির সময়ে, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে যাতে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ, যেমন সুস্বাস্থ্য বা বেতন বৃদ্ধি, অপব্যবহার থেকে বিরত থাকে।

এই পৃথিবীতে সমস্যা মোকাবেলা করার পিছনে আরও অনেক জ্ঞান রয়েছে যা ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, মুসলমানদের জন্য এটি অধ্যয়ন করা, শেখা এবং সেগুলি অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করে যাতে তারা উভয় জগতেই অগণিত প্রতিদান লাভ করতে পারে। একজন ব্যক্তির প্রতিটি পরিস্থিতিতে ধৈর্যশীল থাকা উচিত, ঠিক যেমন একজন জ্ঞানী রোগী তার ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং তার উপর কাজ করে জেনে যে এটি তার জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাকে তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়।

ধৈর্য মানে একজন ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন না। ধৈর্যের একটি দিক হল পরিস্থিতি মোকাবেলা করা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তা সংশোধন করার চেষ্টা করা। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্ত্রী যিনি তার স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন, তার নিজেকে এবং তার সন্তানদের রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, যেমন তার স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। এইভাবে আচরণ করা ধৈর্যের পরিপন্থী নয়, অন্যদিকে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার সাথে ধৈর্য বা ইসলামের কোনও সম্পর্ক নেই। একইভাবে, কান্নার মতো আবেগ প্রকাশ করা ধৈর্যের পরিপন্থী নয় কারণ নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর শোকে এত বেশি কেঁদেছিলেন যে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তবুও তিনি কখনও মহান আল্লাহ কর্তৃক সমালোচিত হননি।
অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ৮৪:

" আর তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, "হায়, ইউসুফের জন্য আমার দুঃখ!" এবং দুঃখে তার চোখ সাদা হয়ে গেল, কারণ সে[এটা] দমনকারী ছিল।"

এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে মহানবী (সাঃ) তাঁর পুত্র ইব্রাহিম (রাঃ)-এর মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন। সুনানে আবু দাউদের ৩১২৬ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কারো কথা ও কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা প্রদর্শন ধৈর্যের পরিপন্থী। এর বাইরে অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য এবং মানব প্রকৃতির অংশ, যেমন কান্নাকাটি এবং দুঃখ অনুভব করা।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, কঠিন পরিস্থিতির শুরু থেকেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হবে। সহিহ বুখারির ১৩০২ নম্বর হাদিসে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ধৈর্য ধরা প্রকৃত ধৈর্য নয়, বরং এটি কেবল গ্রহণযোগ্যতা যা স্বাভাবিকভাবেই সকলের সাথে ঘটে। একজন মুসলিমকে কঠিন পরিস্থিতির শুরু থেকেই ধৈর্য ধরে তাদের কথাবার্তা এবং কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে তারা অধৈর্যের লক্ষণ না দেখায় এবং এই মনোভাব বজায় রাখতে হবে যতক্ষণ না তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, কারণ অধৈর্য দেখানোর মাধ্যমে কেউ সহজেই ধৈর্যের প্রতিদান হারাতে পারে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৭:

" রোগী, সত্য..."

সত্যবাদী তারাই যারা তাদের নিয়ত, কথা এবং কাজে সত্যবাদিতা অবলম্বন করে। নিয়তে সত্যবাদিতা বলতে কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা বোঝায়। যে ব্যক্তি অন্য কোনও কারণে ভালো কাজ করে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে কোনও প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ভালো নিয়তের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যে একজন ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে কোনও কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদান আশা করে না বা আশা করে না। কথার সত্যবাদিতা বলতে ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা বোঝায়। বক্তৃতাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি হল মন্দ কথা যা যেকোনো মূল্যে এড়িয়ে চলতে হবে। দ্বিতীয়টি হল ভালো কথা যা উপযুক্ত সময়ে বলা উচিত। বক্তৃতার শেষ বিভাগ হল অসার কথা। এই ধরনের বক্তৃতাকে পাপ বা সৎ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না তবে যেহেতু এই ধরনের বক্তৃতা খারাপ কথার দিকে পরিচালিত করে তাই এটি এড়িয়ে চলাই ভালো। এছাড়াও, অসার কথাবার্তা বিচারের দিন একজন ব্যক্তির জন্য অনুশোচনার কারণ হবে যখন তারা অসার কথাবার্তায় তাদের সময় নষ্ট করার সুযোগ এবং সময় লক্ষ্য করবে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত হয় ভালো কথা বলা অথবা নীরব থাকা। সহীহ মুসলিমের ১৭৬ নম্বর হাদীসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমেই কর্মে সত্যবাদিতা প্রকাশ পায়। যে ব্যক্তি সত্যবাদিতার এই দিকগুলো ধারণ করে, সে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে একজন মহান সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি তাদের নিয়ত, কথা এবং কাজে সত্যবাদিতা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হবে, সে আল্লাহ তাআলার কাছে তাদেরকে একজন মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে। জামে আত তিরমিযী, ১৯৭১ নম্বর হাদীসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই দুই ধরনের মানুষের কী হবে তা নির্ধারণ করার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৭:

"ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, বাধ্য..."

মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা আন্তরিকভাবে শেখা এবং তার উপর আমল করা জড়িত। অতএব, পবিত্র কুরআন বোঝার এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করা উচিত এবং কেবল এমন ভাষায় তেলাওয়াত করা এড়িয়ে চলা উচিত যা তারা বোঝে না, কারণ না বুঝলে আনুগত্য সম্ভব নয়। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর আনুগত্যের মধ্যে তাঁর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে আন্তরিকভাবে জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা জড়িত। অতএব, আনুগত্য কেবল মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা দাবি করার চেয়েও বেশি কিছু, বরং তাঁর জীবন ও শিক্ষাকে উপেক্ষা করার চেয়েও বেশি কিছু। ৪র্থ সূরা আন-নিসা, আয়াত ৮০:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

এই আনুগত্য নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি তার প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য

পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। এটি উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 69:

"আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবী, সত্যবাদী, শহীদ এবং সংকর্মশীল। আর সঙ্গী হিসেবে তারাই উত্তম।"

আনুগত্যের মধ্যে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই দায়িত্বপ্রাপ্তদের আনুগত্য করাও অন্তর্ভুক্ত। যতক্ষণ না কেউ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসের বিরোধিতা না করে এবং ধর্মে নতুন কিছু উদ্ভাবন না করে, ততক্ষণ তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই দায়িত্বপ্রাপ্তদের আনুগত্য করা উচিত। সূরা ৪ আন নিসা, আয়াত ৫৯:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদেরও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস রাখো। এটাই সর্বোত্তম [পদ্ধতি] এবং ফলাফলের দিক থেকেও উত্তম।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৭:

"ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, যারা [আল্লাহর পথে] ব্যয় করে..."

এই ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থার মাধ্যমে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করার মাধ্যমে প্রত্যেককে এবং সবকিছুকে সঠিকভাবে তাদের জীবনের মধ্যে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির মানসিক শান্তি অর্জন নিশ্চিত করবে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

তাই, নিজেদের স্বার্থে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতাও করে। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, এই জেনে যে তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম। এই রোগী যেমন সুস্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন তিনি উভয় জগতেই মানসিক ও শারীরিক শান্তি অর্জন করবেন।

এছাড়াও, সর্বদা মনে রাখতে হবে যে তাদের যে আশীর্বাদ আছে তা মহান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঋণ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন, উপহার হিসেবে নয়। পার্থিব ঋণের মতোই, এই ঋণও পরিশোধ করতে হবে। ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক পদ্ধতিতে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো পরিশোধ করতে হবে। অন্যদিকে, মুসলমানদের জান্নাতে উপহার হিসেবে নিয়ামাত দেওয়া হবে, ঋণ হিসেবে নয়। অতএব, তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সেই আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করতে স্বাধীন থাকবে। ৭ম সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ৪৩:

"... এবং তাদেরকে বলা হবে, "এটি সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ তোমাদের কর্মের জন্য।"

অতএব, এই বাস্তবতাটি মনে রাখা উচিত যাতে তারা এই পৃথিবীতে প্রদত্ত আশীর্বাদ হিসেবে ঋণ পরিশোধ করতে উৎসাহিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি পার্থিব ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, সে যেমন শান্তির সম্মুখীন হয়, তেমনি যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, সেও শান্তির সম্মুখীন হয়। তাদের কাছে থাকা পার্থিব সম্পদই তখন উভয় জগতে তাদের জন্য চাপ, দুর্দশা এবং ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক ব্যবহার করে যারা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তাদের দেখলে এটি স্পষ্ট হয়।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৭:

"ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং যারা ভোর হওয়ার আগে ক্ষমা প্রার্থনা করে।"

আন্তরিক তওবার মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার উপর অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার পূরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

এছাড়াও, ১৭ নম্বর আয়াতে রাতের নফল নামাজের গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে। সহীহ বুখারীতে ১১৪৫ নম্বর আয়াতে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম মহিমা অনুযায়ী প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং মানুষকে তাদের চাহিদা পূরণের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করার আহ্বান জানান যাতে তিনি তা পূরণ করতে পারেন। রাতের নফল নামাজ আল্লাহর প্রতি মানুষের আন্তরিকতা প্রমাণ করে, কারণ অন্য কোন চোখ তাদের দেখছে না। এর অসংখ্য ফজিলত রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আন নাসায়ীতে ১৬১৪ নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে এটি সর্বোত্তম নফল নামাজ। উভয় জাহানে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির রাতের নফল নামাজ প্রতিষ্ঠা করেন, কারণ সর্বোচ্চ স্থান যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য সংরক্ষিত, তা সরাসরি রাতের নফল নামাজের সাথে সম্পর্কিত। ১৭ নম্বর আয়াত আল ইসরা, ৭৯ নম্বর আয়াত:

"আর রাতের[একাংশ] অংশে, এর সাথে সালাত(অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াত) পাঠ
করো, এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত[ইবাদত]; আশা করা যায় যে তোমার প্রতিপালক
তোমাকে প্রশংসিত স্থানে উত্থিত করবেন।"

রাতের বেলায় নেক দুআও সহজেই কবুল করা হয়। জামে আত তিরমিযী, ৩৪৯৯
নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নফল রাতের নামাজ প্রতিষ্ঠা
করা পাপ থেকে বিরত রাখে, অনর্থক ও পাপপূর্ণ সামাজিক সমাবেশ এড়াতে সাহায্য
করে এবং অনেক শারীরিক অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী,
৩৫৪৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়া পরিহার করে নফল রাতের
নামাজের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত, কারণ এটি অলসতা এবং ঘুমের কারণ হয়। দিনের
বেলায় অপ্রয়োজনীয় শারীরিক পরিশ্রম এড়িয়ে চলা উচিত। দিনের বেলায় একটি
ছোট ঘুম এতে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে, পাপ এড়িয়ে চলা উচিত এবং
ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহ তায়ালার
আনুগত্য করার চেষ্টা করা উচিত, কারণ আনুগত্যকারীরা নফল রাতের নামাজ
আদায় করা সহজ করে তোলে।

পরিশেষে, পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে উভয় জগতে মানসিক শান্তি
অর্জনের জন্য একজন ব্যক্তির অবশ্যই শারীরিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তার ঈমানের
মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করতে হবে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক
উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। অতএব, একজন ব্যক্তির আরও

পার্থিব জিনিসপত্র জমা করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়, বরং তাকে যা দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করার বিষয়ে আরও উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত যাতে সে উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে, কারণ মনের শান্তি নিহিত রয়েছে কীভাবে কেউ পার্থিব আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে , এটি অনেক পার্থিব জিনিসপত্র ধারণ করার মধ্যে নিহিত নয়। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪:

"মানুষের জন্য তাদের আকাউক্ষার প্রতি ভালোবাসা সুশোভিত করা হয়েছে - নারী, পুত্র, সোনা ও রূপার স্তূপীকৃত ধন, উন্নতমানের ঘোড়া, গবাদি পশু এবং চাষযোগ্য জমি। এটাই পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর কাছেই রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৮-২২

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ أَلِيسْلُمْ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيَّةَ أَسْلَمْتُ

فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ

يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ

مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٢﴾

“আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, এবং ফেরেশতাগণ
এবং জ্ঞানীরাও সাক্ষ্য দেন যে, ন্যায়বিচারে একনিষ্ঠ। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য
নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”

নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা জ্ঞান আসার পরই মতবিরোধ করেছিল, কেবল নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের কারণে। আর যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে, আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।

অতএব যদি তারা তোমার সাথে বিতর্ক করে, তবে বলো, "আমি [ইসলামে] আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি এবং যারা আমার অনুসারী তারাও।" আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে এবং [অশিক্ষিতদের] বলো, "তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ?" আর যদি তারা [ইসলামে] আত্মসমর্পণ করে, তাহলে তারা সঠিক পথ পাবে; আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব কেবল পৌঁছিয়ে দেওয়া। আর আল্লাহ [তাঁর] বান্দাদের দেখেন।

যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীতে অবিশ্বাস পোষণ করে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং যারা ন্যায়বিচারের আদেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।

এরাই হলো সেইসব লোক যাদের কর্মকাণ্ড দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।"

ইসলাম মানবজাতিকে শিক্ষা দেয় যে, প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক, মহান আল্লাহ তায়ালারই আনুগত্য করতে হবে। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৮:

" আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই.."

বাস্তবে, কেউ যার আনুগত্য করে এবং তার জীবনকে মডেল করে, সে তারই উপাসনা করে, এমনকি যদি সে দাবি করে যে সে কোনও দেবতাকে বিশ্বাস করে না। মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যেখানে তাকে অবশ্যই কিছু না কিছু মানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। তা সে অন্য মানুষ হোক, সোশ্যাল মিডিয়া হোক, ফ্যাশন হোক, সংস্কৃতি হোক বা এমনকি তাদের নিজস্ব ইচ্ছা হোক। ২৫তম অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

একজন ব্যক্তি যা-ই হোক বা যা-ই হোক, তারই উপাসনা করে। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে কাজে সমর্থন করতে হবে, অন্য সকল পরিস্থিতির উপর আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলার মাধ্যমে। এর মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা। যে ব্যক্তি এইভাবে

আচরণ করবে তাকে পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য দান করা হবে। ২য় সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৬৩:

"আর তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, যিনি পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।"

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর একত্ববাদকে প্রত্যাখ্যান করে এবং পরিবর্তে অন্য জিনিসের আনুগত্য ও উপাসনা করে, সে উভয় জগতের শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় রহমত থেকে বঞ্চিত হবে, এমনকি যদি তারা সমগ্র পৃথিবী অধিকার করে এবং আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে, কারণ কেউই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ এবং কর্তৃত্ব থেকে বাঁচতে পারে না। সূরা তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ্ বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"]

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮:

" আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই.."

যখন কেউ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং অসংখ্য নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মহাবিশ্ব সৃষ্টিকারী এবং টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব একমাত্র একজনই পালন করেন। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী থেকে সূর্যের নিখুঁত

দূরত্ব একটি স্পষ্ট লক্ষণ, কারণ সূর্য যদি পৃথিবী থেকে সামান্য কাছে বা আরও দূরে থাকত তবে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হত। একইভাবে, পৃথিবীকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যা একটি সুষম এবং বিশুদ্ধ বায়ুমণ্ডল তৈরি করে যা এতে জীবনকে বিকাশের সুযোগ দেয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন..."

দিন ও রাতের নিখুঁত সময় এবং সারা বছর ধরে তাদের বিভিন্ন দৈর্ঘ্য মানুষকে তাদের থেকে সর্বাধিক সুবিধা পেতে সাহায্য করে। যদি দিনগুলি দীর্ঘ হত, তাহলে মানুষ দীর্ঘ ঘন্টার জন্য ক্লান্ত হয়ে পড়ত। যদি রাতগুলি দীর্ঘ হত, তাহলে মানুষের জীবিকা নির্বাহ এবং জ্ঞানের মতো অন্যান্য দরকারী জিনিসপত্র অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকত না। যদি রাতগুলি ছোট হত, তাহলে মানুষ সর্বোত্তম স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে পারত না। দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ফসলের উপরও প্রভাব ফেলত, যা মানুষ এবং প্রাণীর জীবিকার উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলত। মহাবিশ্বের মধ্যে দিন ও রাত এবং অন্যান্য ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা নিখুঁত সামঞ্জস্যের সাথে কাজ করে তাও স্পষ্টভাবে আল্লাহর একত্বকে নির্দেশ করে, কারণ একাধিক ঈশ্বর বিভিন্ন জিনিস কামনা করবেন, যা মহাবিশ্বের মধ্যে বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 21 আল আশ্বিয়া, আয়াত 22:

"যদি তাদের মধ্যে [অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের] আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত..."

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... এবং [বড়] জাহাজ যা সমুদ্রে চলাচল করে যা মানুষের উপকার করে এবং যা আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন..."

যখন কেউ পুরোপুরি সুষম জলচক্র পর্যবেক্ষণ করে, তখন এটি স্পষ্টভাবে একজন স্রষ্টার ইঙ্গিত দেয়। সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয়, উপরে উঠে ঘনীভূত হয়ে পাহাড়ের উপর নেমে আসে অম্লীয় বৃষ্টিপাতের জন্য। এই পর্বতগুলি অম্লীয় বৃষ্টিপাতকে নিষ্ক্রিয় করে যাতে মানুষ এবং প্রাণীরা তা ব্যবহার করতে পারে। যদি এই নিখুঁত সুষম ব্যবস্থায় কোনও পরিবর্তন আনা হয়, তাহলে তা পৃথিবীর মানুষ এবং প্রাণীদের জন্য বিপর্যয়ের কারণ হবে। সমুদ্রের লবণ সমুদ্রের মৃত প্রাণীদের এটি দূষিত হতে বাধা দেয়। যদি সমুদ্রকে দূষিত হতে দেওয়া হয়, তাহলে সমুদ্রের জীবন সম্ভব হবে না এবং সমুদ্রের অপবিত্রতা স্থলভাগের জীবনকেও আচ্ছন্ন করে ফেলবে। সমুদ্র এবং সমুদ্রের মধ্যে জল এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে সমুদ্রের জীবন এর মধ্যে বিকাশ লাভ করতে পারে এবং ভারী জাহাজগুলি এর উপরে চলাচল করতে পারে। যদি জলের গঠন কিছুটা ভিন্ন হত, তাহলে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিত যার ফলে হয় সমুদ্রের জীবন জলের মধ্যে বিকাশ লাভ করত অথবা জাহাজগুলিকে এর উপরে চলাচল করতে দিত, তবে উভয়ই একই সাথে সম্ভব হত না। এমনকি আজও, সমুদ্রপথে পরিবহন এখনও বিশ্বজুড়ে পণ্য পরিবহনের সবচেয়ে সাধারণ উপায়। তাই পৃথিবীতে জীবনের জন্য এই নিখুঁত ভারসাম্য অপরিহার্য।

বিবর্তন হলো এক ধরনের মিউটেশন, যা স্বভাবতই অসম্পূর্ণ। কিন্তু যখন কেউ অসংখ্য প্রজাতি পর্যবেক্ষণ করে, তখন তারা দেখতে পাবে যে তাদের সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তারা যে পরিবেশে বাস করে সেখানেই

তারা বেঁচে থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উটকে উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করার এবং জল পান না করে দীর্ঘ সময় ধরে বেঁচে থাকার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। তারা মরুভূমির জীবনের জন্য নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছে। অধ্যায় ৮৮ আল গাশিয়াহ, আয়াত ১৭:

"তাহলে কি তারা উটের দিকে তাকায় না - কিভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে?"

ছাগলটিকে এমন নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে তার শরীরের ভেতরের দূষিত পদার্থগুলি তার উৎপাদিত দুধ থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়। দুটির মিশ্রণ দুধকে পান করার অযোগ্য করে তুলবে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৬৬:

"আর অবশ্যই, তোমাদের জন্য পশুপালনের ক্ষেত্রে একটি শিক্ষা রয়েছে। আমরা তোমাদেরকে তাদের পেটের মধ্যে যা আছে তা থেকে - মলমূত্র ও রক্তের মধ্যে - বিশুদ্ধ দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।"

প্রতিটি প্রজাতির একটি নির্দিষ্ট জীবনকাল দেওয়া হয়েছে যা একটি প্রজাতিকে অন্য প্রজাতিকে পরাজিত করতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, মাছদের জীবনকাল খুবই কম, ৩-৪ সপ্তাহ, এবং তারা ৫০০টি ডিম পাড়ে। যদি তাদের জীবনকাল দীর্ঘ হত, তাহলে মাছদের সংখ্যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যেত এবং তারা এই পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত প্রজাতিকে ছাপিয়ে যেত। অন্যদিকে, অন্যান্য প্রাণী যাদের জীবনকাল খুব দীর্ঘ তাদের মাত্র কয়েকটি সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে। আবার এটি তাদের

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ করে দেয়। এই সবকিছুই দুর্ঘটনা হতে পারে না এবং বিবর্তনের প্রক্রিয়াও এর ব্যাখ্যা দিতে পারে না। ২য় সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... এবং [তাঁরা] আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বাতাস এবং মেঘের পরিচালনা..."

বায়ু পরাগায়নের জন্য বাতাস অপরিহার্য, যা ফসল, গাছপালা এবং গাছের বংশবৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়। প্রাচীনকালে, সমুদ্র ভ্রমণের জন্য বাতাস অপরিহার্য ছিল, যা আজও বিশ্বজুড়ে পণ্য পরিবহনের প্রধান মাধ্যম। সৃষ্টির জন্য জল সরবরাহ করার জন্য বৃষ্টির মেঘগুলিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরিত করার জন্য বাতাসের প্রয়োজন হয়, যা ছাড়া তারা বাঁচতে পারে না। পৃথিবীর মধ্যে বাতাসের একটি নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়, কারণ বাতাসের অভাব সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং বাতাসের বৃদ্ধিও সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। একইভাবে, বৃষ্টিও পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ, কারণ খুব কম বৃষ্টিপাত খরা এবং দুর্ভিক্ষের দিকে পরিচালিত করে এবং খুব বেশি বৃষ্টিপাত ব্যাপক বন্যার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় ২৩ আল মু'মিনুন, আয়াত ১৪:

"আর আমরা আকাশ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং তা পৃথিবীতে স্থাপন করেছি। এবং অবশ্যই, আমরা তা প্রত্যাহার করতে সক্ষম।"

এই নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা এলোমেলো হতে পারে না এবং স্পষ্টভাবে স্রষ্টার হাত দেখায়। যিনি এই সমস্ত নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার উপর চিন্তা করেন তিনি

যুক্তিসঙ্গতভাবে এমন একক স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারেন না যিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮:

" আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই..."

অধিকন্তু, যেহেতু একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকে লালন-পালন করেন, তাই তিনিই আনুগত্যের যোগ্য। যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জীবিকার কিছু দিক, যেমন তাদের বাসস্থানের যত্ন নেয়, সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যোগ্য। অতএব, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলা এই মহাবিশ্বের প্রতিটি নিয়ামত মানুষকে দান করেছেন, তাই মানুষের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত। নিয়তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ কেবল আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করা। যে ব্যক্তি অন্য কারণে কাজ করে সে আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। সৎ নিয়তের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যে, একজন ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে কোনও প্রশংসা বা প্রতিদান আশা করে না বা আশা করে না। জিহ্বা দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা। এবং নিজের কর্মের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হলো পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলো এমনভাবে ব্যবহার করা যা আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করে। এর ফলে উভয় জগতে আশীর্বাদ বৃদ্ধি পায় এবং পরিণামে মানসিক শান্তি লাভ হয়। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব..."

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

অধিকন্তু, যখন কোন ব্যক্তি কোন বস্তুর মালিক হয়, তখন তার জন্য সেই বস্তুটি যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করা সঠিক এবং স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ, মানুষ সহ, মহাবিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, মালিক এবং বজায় রেখেছেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন যে মহাবিশ্বের মধ্যে কী ঘটবে এবং কী ঘটবে না। অতএব, একজন ব্যক্তির জন্য কেবল মহান আল্লাহ, তাঁর আনুগত্য করা ন্যায়সঙ্গত, কারণ তিনিই সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক, যার মধ্যে তারাও রয়েছে।

একইভাবে, যখন কেউ অন্য কাউকে তার মালিকানাধীন জিনিস ধার দেয়, তখন তার মালিকের ইচ্ছানুযায়ী জিনিসটি ব্যবহার করাই ন্যায্য। মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির প্রতিটি নিয়ামতকে ঋণ হিসেবে দিয়েছেন। তিনি তাকে উপহার হিসেবে দেননি। পার্থিব ঋণের মতো, এই ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এই ঋণ পরিশোধের একমাত্র উপায় হল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এগুলো ব্যবহার করা।

অন্যদিকে, যেহেতু জান্নাতের নিয়ামত একটি উপহার, তাই মানুষ সেগুলো তাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে স্বাধীন থাকবে। ৭ম সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ৪৩:

"...এবং তাদেরকে বলা হবে, "এটি সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ তোমাদের কর্মের জন্য।"

অতএব, একজন ব্যক্তির উচিত জান্নাতের উপহারের সাথে ধার করা পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮:

" আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই..."

অধিকন্তু, এই আয়াতটি সৃষ্টিকে বিনীত করে কারণ যদি তারা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিতে ব্যর্থ হয় তবে তারা বাস্তবতা পরিবর্তন করে না, যেমনটি সবচেয়ে সত্যবাদী, সর্বোচ্চ আল্লাহ নিজেই তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেন। অতএব, একজনকে অবশ্যই মহাবিশ্বের মধ্যে তাদের তুচ্ছ স্থান বুঝতে হবে এবং নিজের স্বার্থে সত্যকে গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে, উপাসনার অর্থ হলো বিনীতভাবে অন্য কারোর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং তার আনুগত্য করা। অতএব, যাকে উপাসনা করা হচ্ছে তাকে সম্মান ও ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হবে এবং কোনও ত্রুটি ছাড়াই নিখুঁত হতে হবে। অতএব, যা কিছু তার নিজস্ব সত্তাকে টিকিয়ে রাখতে পারে না এবং অস্তিত্বের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল, সে সহজাত শক্তি এবং পরিপূর্ণতার অধিকারী হতে পারে না। অর্থাৎ, তার সমস্ত গুণাবলী এবং ক্ষমতা অন্য একজন তাকে দিয়েছে। অতএব, যে সমস্ত জিনিস নিজে থেকে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, যেমন একটি মূর্তি বা ব্যক্তি, সেগুলি উপাসনার যোগ্য হতে পারে না। উপাসনার যোগ্য একমাত্র সত্তা হলেন তিনি যিনি সর্বদা বিদ্যমান এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। যিনি সহজাতভাবে শক্তি এবং পরিপূর্ণতার অধিকারী। তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন, তিনি সর্বশক্তিমান।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮:

" আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, এবং [তাই] ফেরেশতারাও..."

ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের উপাসনার যোগ্য বলে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার জন্য। মক্কার অনেক অমুসলিম ফেরেশতাদের উপাসনা করতো এই দাবি করে যে তারা আল্লাহর কন্যা, এবং তাই তাদের পক্ষে তাঁর দরবারে সুপারিশ করতো। তারা আল্লাহর বিনীত বান্দা, এই সত্যই এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে দূর করে দেয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত করেন যে, আল্লাহর একত্ববাদ সঠিকভাবে বুঝতে হলে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা আবশ্যিক। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮:

"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, এবং ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীরাও সাক্ষ্য দেন..."

যদিও কেউ অজ্ঞতাবশত অন্যদের, যেমন আত্মীয়স্বজনদের, অনুকরণ করে আল্লাহর একত্ববাদ গ্রহণ করতে পারে, তবুও তার বিশ্বাস দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। যখন একজন ব্যক্তির ঈমান দুর্বল হয়, তখন তার আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হলে সে সহজেই আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হয়। এর ফলে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধ্য হয়। এর ফলে তারা ভারসাম্যহীন মানসিক ও শারীরিক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং তাদের জীবনের সকল কিছুকে ভুল পথে চালিত করে। অতএব, দুর্বল ঈমান উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভে বাধা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার উপর আমল করে, সে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস গ্রহণ করবে। এই দৃঢ় বিশ্বাস তাদেরকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করতে উৎসাহিত করবে, এমনকি যদি তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয়, কারণ তারা জানে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম। তারা একজন জ্ঞানী রোগীর মতো আচরণ করবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে, জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের জীবনের প্রতিটি জিনিসকে সঠিকভাবে স্থাপন করে। এটি শেষ

পর্যন্ত উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে এই সঠিক মনোভাবকে ন্যায়বিচার হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ১৪:

" আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, এবং ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীরাও সাক্ষ্য দেন -- ন্যায়বিচারে একনিষ্ঠ..."

অধিকন্তু, এই আয়াতে উল্লেখিত ন্যায়বিচারের জন্যও মহান আল্লাহর প্রতি কৃতিত্ব দেওয়া যেতে পারে, কারণ তিনি ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সৃষ্টিকে রক্ষা করেন। সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহর ন্যায়বিচার সর্বদা মানুষের কাছে স্পষ্ট হয় না এবং তাদের সময়সূচী অনুসারে ঘটে না। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে ন্যায়বিচার কার্যকর করেন এবং তাই এমন একটি সময়ে যা মানুষের জন্য সর্বোত্তম এবং এমনভাবে যা তাদের জন্য সর্বোত্তম। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ১৮:

"... তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, এমনকি যদি তারা তাঁর পছন্দ এবং সিদ্ধান্তের পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে নাও পারে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮:

" আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, এবং ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীরাও সাক্ষ্য দেন -- ন্যায়বিচারে একনিষ্ঠ..."

এই আয়াতে উল্লেখিত ন্যায়বিচারের জন্য ফেরেশতাদেরও দায়ী করা যেতে পারে কারণ তারা সর্বদা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে এবং কখনও তাঁর অবাধ্য হয় না। ৬৬ তম অধ্যায় আত তাহরীম, ৬ নং আয়াত:

"... তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না, বরং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তা করে।"

অতএব, প্রত্যেক পরিস্থিতিতেই আল্লাহর আনুগত্যের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে ফেরেশতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে এবং তাদের ইচ্ছানুযায়ী কখন তাঁর আনুগত্য করতে হবে তা নির্বাচন করা এড়িয়ে চলতে হবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে কেবল নিজেরই উপাসনা করে, যদিও তারা অন্যথা দাবি করে।
অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য ও উপাসনা করার অধিকার নেই, এই সত্যের অর্থ হল, তাঁর সৃষ্টি এবং বান্দারা কোন জীবনধারা গ্রহণ করবে তা নির্ধারণ করার অধিকার একমাত্র তাঁরই রয়েছে। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮-১৯:

"... তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর দৃষ্টিতে জীবন ব্যবস্থা হল ইসলাম..."

যেহেতু মহান আল্লাহ অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী, তাই তিনিই একমাত্র মানুষের জন্য নিখুঁত জীবন ব্যবস্থা প্রদান করতে পারেন যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক ও শারীরিক শান্তি অর্জন করতে পারে। সমস্ত মানবসৃষ্ট আচরণবিধি এবং জীবনধারা কখনই এই ফলাফল অর্জন করতে পারে না কারণ তাদের জ্ঞানের অভাব, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের কারণে। অতএব, একমাত্র মহান আল্লাহই

মানুষকে শেখাতে পারেন কিভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয় যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে এবং পরকালে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে। এই নিখুঁত আচরণবিধি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের আকারে মঞ্জুর করা হয়েছে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের নিজের জন্য ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং সেগুলি অনুসরণ করতে হবে, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং সেগুলি অনুসরণ করে, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই জ্ঞানী রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণকারী এবং তার উপর আমলকারী ব্যক্তিও ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীরা তাদের প্রেসক্রাইব করা ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই অন্ধভাবে তাদের ডাক্তারের উপর বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষার উপর চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা অন্ধভাবে ইসলামের শিক্ষার উপর বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণের সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..'"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮-১৯:

"... তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর দৃষ্টিতে জীবন ব্যবস্থা হল ইসলাম..."

উপরন্তু, পরিশেষে, সমগ্র সৃষ্টি মহান আল্লাহর আওতাধীন এবং তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারাধীন, একজন ব্যক্তির তাঁর নিয়ম মেনে চলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট দেশের দায়িত্বে নিযুক্ত সরকারের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তবে সমস্যার সম্মুখীন হবে, তেমনি মহাবিশ্বের মালিকের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতেই তাদের সমস্যা

হবে। একজন ব্যক্তি যদি একটি দেশ ছেড়ে যেতে পারে তবে তার দেশ ছেড়ে যেতে পারে তবে সে এমন জায়গায় পালিয়ে যেতে পারবে না যেখানে আল্লাহর নিয়ম ও এখতিয়ার প্রযোজ্য হয় না। একজন ব্যক্তি তার সমাজের নিয়ম পরিবর্তন করতে সক্ষম হতে পারে কিন্তু সে কখনই আল্লাহর নিয়ম পরিবর্তন করতে পারবে না। উপরন্তু, ঠিক যেমন একজন বাড়ির মালিক ঘরের নিয়ম নির্ধারণ করে, এমনকি অন্যরা এই নিয়মগুলিতে আপত্তি জানালেও, একইভাবে, মহাবিশ্ব মহান আল্লাহর, এবং তাই, তিনিই একমাত্র এই মহাবিশ্বের নিয়ম নির্ধারণ করেন, মানুষ এই নিয়ম পছন্দ করুক বা না করুক। অতএব, এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে, নিজের স্বার্থে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে সে মহান আল্লাহর নিয়ম মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। একজন ব্যক্তি হয় আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পিছনের হিকমতগুলি শেখার চেষ্টা করতে পারে, যাতে সে বুঝতে পারে যে কীভাবে সেগুলি তাদের এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য উপকারী এবং কীভাবে তারা উভয় জগতে মানসিক ও শারীরিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, অথবা সে তার আকাঙ্ক্ষার উপাসনা করতে পারে এবং ইসলামের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলামী নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তার উচিত উভয় জগতেই তার পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং কোনও আপত্তি, প্রতিবাদ বা অভিযোগ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ২৯:

"আর বলো, "সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, অতএব যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক; আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।" নিশ্চয়ই, আমরা জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে ঘিরে থাকবে। আর যদি তারা সাহায্যের জন্য ডাকে, তবে তাদের সাহায্যের জন্য ঘোলা তেলের মতো পানি ব্যবহার করা হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দেবে। পানীয় কত নিকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৯:

" নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে জীবনের পথ হলো ইসলাম..."

এটি নির্দেশের দুটি উৎস: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীস আন্তরিকভাবে মেনে চলার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎস এড়িয়ে চলার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি আমল করা হবে, এমনকি যদি তা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে, তবুও তারা নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর তত কম আমল করবে, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে বিষয় দুটি নির্দেশনার উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করবেন। উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি আমল করা হবে, তত বেশি তারা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলিতে কাজ করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পা দেবে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর

অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন।
সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

এরপর আল্লাহ তাআলা মুসলিম জাতিকে সতর্ক করে বলেন যে, তারা যেন আহলে কিতাবদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, যারা আল্লাহর একত্ববাদ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে তাদের ঈমানের দাবি বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে ধর্ম হলো ইসলাম। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা জ্ঞান আসার পরই মতবিরোধ করেছে, কেবল তাদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের কারণে..."

আহলে কিতাবের অনেক পণ্ডিত ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশী গ্রন্থের শিক্ষা সম্পাদনা এবং ভুল ব্যাখ্যা করেছেন যাতে সম্পদ এবং নেতৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসপত্র পাওয়া যায়। মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যের ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি উভয় জগতেই সমস্যা সৃষ্টি করে। এই আচরণের মাধ্যমে যে পার্থিব জিনিসপত্র পাওয়া যায়, যেমন সম্পদ, তা তাদের জন্য চাপ, ঝামেলা এবং দুর্দশার উৎস হয়ে উঠবে, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। ফলস্বরূপ, তারা কখনও মানসিক শান্তি পাবে না, এমনকি যদি তারা বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে এবং পার্থিব বিলাসিতা অর্জন করে। অধ্যায় ৯ তওবার ৮২ নম্বর আয়াতে:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিসহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

এছাড়াও, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামী জ্ঞানের অপব্যবহার করে তাকে সুনান ইবনে মাজাহ, ২৫৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। অধিকন্তু, আলোচিত মূল আয়াতগুলি এই মনোভাবকে কুফরের সাথে যুক্ত করে। অধ্যায় ৩, আলে ইমরান, আয়াত ১৯:

"...আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা জ্ঞান আসার পরই মতবিরোধ করেছে, কেবল নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের কারণে। আর যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে..."

কারণ যখন কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ঐশী শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করে, তখন তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এই আচরণ তাদের বিশ্বাসকে বিষাক্ত করে তুলবে এবং এমনকি তারা অজান্তেই এটিকে মেরে ফেলতে পারে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমান একটি গাছের মতো যা বেঁচে থাকার জন্য পাপ থেকে রক্ষা করতে হবে। ঠিক যেমন একটি গাছ যা ক্ষতিকারক জিনিস থেকে রক্ষা পায় না তা মারা যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও মারা যেতে পারে যদি তারা পাপে লেগে

থাকা এড়িয়ে না যায়। অতএব, মুসলিমদের জন্য তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ঐশী শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করা এড়িয়ে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা তাদের ঈমান ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারে। এটি সবচেয়ে বড় ক্ষতি, কারণ এই ব্যক্তি এই পৃথিবী এবং পরকালে চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলার সম্মুখীন হবে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৭:

"... তাহলে, আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।"

এরপর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে এই পরিণতি এড়াতে এবং আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার জন্য স্মরণ করিয়ে দেন। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২০:

ইসলামে] আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি এবং যারা আমার অনুসরণ করে তারাও।"...

এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য বাস্তবে অনুসরণ না করে ইসলামে বিশ্বাস করা সাফল্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২০:

"... আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের এবং [অশিক্ষিতদের] বলো, "তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ?" আর যদি তারা [ইসলামে] আত্মসমর্পণ করে, তাহলে তারা সঠিক পথ পাবে; আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমাদের দায়িত্ব কেবল [আলোচনা করার]..."

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানবজাতির কাছে ইসলামের শিক্ষা ব্যাখ্যা করার এবং তাদের নিজস্ব চরিত্রে নিখুঁত আদর্শ প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন মানবজাতির উপর নির্ভর করছে যে তারা কি তাকে বাস্তবে অনুসরণ করবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে, নাকি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য জীবনধারা অনুসরণ করবে যা উভয় জগতেই কেবল চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলার দিকে পরিচালিত করে, কারণ এটি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল পথে পরিচালিত করতে উৎসাহিত করবে। যে পথ বেছে নেবে, তাকে নিঃসন্দেহে উভয় জগতেই এর জন্য দায়ী করা হবে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২০:

"... আর আল্লাহ [তাঁর] বান্দাদের দেখেন।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২০:

"... আর যদি তারা [ইসলামে] আত্মসমর্পণ করে, তাহলে তারা সঠিক পথ পাবে; আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব কেবল [তাদের] জ্ঞাত করা..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি বোঝার গুরুত্বকে নির্দেশ করে যে একজন মুসলিমের কর্তব্য হল তাদের মতামত বা বিশ্বাস অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়া নয়। বরং তাদের কাছ থেকে আশা করা হয় যে তারা ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত জ্ঞান এবং স্পষ্ট প্রমাণ অনুসারে সত্য ব্যাখ্যা করবে এবং তারপর মানুষকে তাদের জীবনের পথ বেছে নেওয়ার জন্য ছেড়ে দেবে। এমনকি পার্থিব বিষয়েও, জ্ঞান এবং প্রমাণ অনুসারে অন্যদের পরামর্শ দেওয়া এবং ব্যাখ্যা করা উচিত তবে অন্যদের উপর তাদের মতামত চাপিয়ে দেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। অতএব, ধর্মীয় বা পার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই একজন নিয়ন্ত্রকের মতো আচরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি একজন মুসলিমের কর্তব্য নয় এবং কেবল তাদের জন্য তর্ক এবং চাপের কারণ হয়।
অধ্যায় ৪৪ আল গাশিয়াহ, আয়াত ২১-২২:

"সুতরাং স্মরণ করিয়ে দাও যে তুমি কেবল একটি স্মরণ করিয়ে দাও। তুমি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নও।"

আল্লাহ্, সর্বশক্তিমান, এরপর সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, যখন কেউ তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা, যেমন নেতৃত্ব এবং সম্পদ অর্জনের জন্য, ইসরাইলের সন্তানদের মতো ইসলামী শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন তারা অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে, যার ফলে সমাজের মধ্যে পাপ, অপরাধ এবং দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়বে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২১:

"যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীতে অবিশ্বাস করে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং যারা মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচারের আদেশ দেয় তাদের হত্যা করে..."

এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে জীবনের দুটি প্রধান পথ আছে। একটি হলো, যখন কেউ আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে। ফলস্বরূপ, তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং সবকিছু এবং সকলকে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আল্লাহ তাআলা এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে। মানুষের ক্ষেত্রে, তাদের অধিকার পূরণের একটি দিক হল তাদের ক্ষতি করা এড়ানো। অতএব, এই মনোভাব সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার এবং শান্তির প্রসার ঘটাবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করে তাদের প্রদত্ত অনুগ্রহগুলোর অপব্যবহার করে, সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে না এবং তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল স্থানে স্থাপন করবে। ফলস্বরূপ, তারা আল্লাহ তাআলা বা মানুষের অধিকার পূরণ করবে না। অতএব, তারা অনিবার্যভাবে মানুষের উপর অন্যায় করবে, এমনকি যদি তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। এই মনোভাব অনিবার্যভাবে সমাজের মধ্যে অন্যায় এবং দুর্নীতি ছড়িয়ে দেবে। অতএব, একটি সমাজ শান্তি ও ন্যায়বিচার অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ না তার সদস্যরা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মেনে চলে, এমনকি যদি তাদের একটি ভালো আইন ব্যবস্থাও থাকে। যখন কেউ বিশ্বাস করে না বা আল্লাহকে ভয় করে না, তখন তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে, বিশেষ করে যখন তারা বিশ্বাস করে যে তারা তাদের দেশের আইন ব্যবস্থা থেকে বাঁচতে পারবে। অতএব, সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার এবং শান্তি অর্জনের জন্য মহান আল্লাহর আনুগত্য এবং একটি ভালো আইন ব্যবস্থা প্রয়োজন। এবং ইসলামী শিক্ষায় এই উভয় বিষয়ই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু যখন কেউ ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করে এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তখন তারা অনিবার্যভাবে

সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতির দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন থেকে বিরত থাকবে কারণ তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে হারিয়ে ফেলবে। এটি বেশ স্পষ্ট যখন কেউ দেখে যে যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, এমনকি তারা বিনোদনের মুহূর্ত উপভোগ করে এবং পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। অধ্যায় ৯ তওবার ৮২ নম্বর আয়াতে:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ্ বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

এবং অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ২১-২২:

"যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীতে অবিশ্বাস পোষণ করে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়বিচারের আদেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। এরাই তারা যাদের কর্মকাণ্ড দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।"

২১ নং আয়াতের শেষে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে সে মানসিক শান্তি অর্জন করবে না এবং তাই তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে যাবে, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। অতএব, সম্পদ এবং নেতৃত্ব অর্জনের মতো পার্থিব মানদণ্ড অনুসারে সাফল্য বিচার করা এড়িয়ে চলা উচিত এবং পরিবর্তে উভয় জগতের মানসিক শান্তি অর্জনের ভিত্তিতে সাফল্য বিচার করা উচিত। যদি কেউ এইভাবে সাফল্য বিচার করতে ব্যর্থ হয় তবে সে অনিবার্যভাবে তাদের প্রচেষ্টাকে ভুল জায়গায় স্থাপন করবে এবং তাই তাদের প্রচেষ্টা, সম্পদ এবং জীবনকে অজান্তেই নষ্ট করবে।

এবং অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ২১-২২:

"যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীতে অবিশ্বাস পোষণ করে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়বিচারের আদেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। এরাই তারা যাদের কর্মকাণ্ড দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।"

মদিনায় বসবাসকারী আহলে কিতাবদের কুফরী প্রমাণিত করার জন্য, মহান আল্লাহ তাদেরকে পবিত্র নবীগণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যাদের পূর্বপুরুষরা জেনেশুনে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন এবং শহীদ হয়েছিলেন, যা ছিল তাদের ঐশী কিতাবগুলির প্রতি স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ এবং তাদের কুফরী প্রমাণ। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ৮৭:

"...কিন্তু এটা কি [নয় যে] যখনই তোমাদের কাছে কোন রসূল এসেছিল, তোমাদের আত্মা যা চাইত না, তখনই তোমরা অহংকার করেছিলে? আর তোমরা একদল [রসূলদের] মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে এবং একদলকে হত্যা করেছিলে।"

যদিও মদিনায় বসবাসকারী আহলে কিতাবরা পূর্ববর্তী নবীদের হত্যা করেনি, তবুও আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন কারণ তারা তাদের পূর্বপুরুষদের তিরস্কার বা সমালোচনা করেননি। বরং তারা তাদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান বর্ষণ করেছেন। সুনানে আবু দাউদের ৪৩৪৫ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের সময় উপস্থিত থাকে এবং তা নিন্দা করে, সে যেন সেই ব্যক্তির মতো যে উপস্থিত ছিল না। কিন্তু যে ব্যক্তি অনুপস্থিত ছিল এবং মন্দ কাজের অনুমোদন করেছিল, সে যেন সেই ব্যক্তির মতো যে সেই মন্দ কাজের সময় উপস্থিত ছিল।

উপরন্তু, তাদের এইভাবে সমালোচনা করা হয়েছিল কারণ তারা তাদের পূর্বপুরুষদের মতো একই আচরণ করছিল, প্রকাশ্যে নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতা করে, যদিও তারা স্পষ্টভাবে তাঁকে এবং তাঁকে প্রদত্ত ঐশ্বরিক কিতাবকে চিনত। ষষ্ঠ সূরা আল-আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা একে [পবিত্র কুরআন] চিনে যেমন তারা তাদের [নিজের] সন্তানদের চিনে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই আহলে কিতাবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, যারা মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনার দাবি করেছিল, যদিও তারা তাঁর পবিত্র নবীদের বিরোধিতা করেছিল। এই বিরোধিতা তখনই ঘটে যখন একজন মুসলিম তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষা আন্তরিকভাবে মেনে চলতে এবং অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এবং ৫৯তম অধ্যায় আল হাশর, ৭ম আয়াত:

"... আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৮০:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ২৩-২৫

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

"তুমি কি তাদের কথা ভাবো না যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে? তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকা হয়েছে যাতে এটি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়; কিন্তু তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা অস্বীকার করে।"

এটা এজন্য যে, তারা বলে, "জাহান্নাম আমাদেরকে [কয়েক] দিন ছাড়া কখনও স্পর্শ করবে না" এবং [কারণ] তারা যা মিথ্যা বলেছিল তা তাদের ধর্ম সম্পর্কে তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল।

"অতএব, যখন আমরা তাদেরকে এমন এক দিনের জন্য একত্রিত করব, যার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, তখন কেমন হবে তাদের অবস্থা? এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ২৩ নং আয়াতের শুরুতে এমন আত্মমগ্ন মনোভাব এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে যেখানে কেউ কেবল নিজের জীবন এবং বিশেষ করে নিজের সমস্যা নিয়েই চিন্তা করে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২৩:

"তুমি কি বিবেচনা করো না..."

যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে সাধারণ ইতিহাস, তার নিজস্ব ব্যক্তিগত ইতিহাস এবং তার চারপাশের মানুষের অবস্থার মধ্যে পাওয়া শিক্ষাগুলি কাজে লাগাতে ব্যর্থ হবে। এই বিষয়গুলি থেকে শিক্ষা নেওয়া হল সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়গুলির মধ্যে একটি যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার আচরণ উন্নত করতে পারে এবং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এড়াতে পারে যাতে সে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে দেখে এবং ফলস্বরূপ তারা কীভাবে চাপ, মানসিক ব্যাধি, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতায় জর্জরিত হতে দেখে, যদিও তারা আনন্দের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে এবং এই পৃথিবীর বিলাসিতা উপভোগ করে, সে পর্যবেক্ষককে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করতে শেখাবে এবং তারা নিশ্চিত হবে যে মনের শান্তি অনেক পার্থিব জিনিসপত্র রাখার মধ্যে নিহিত নয়। অথবা যখন একজন ব্যক্তি একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখে, তখন তাদের নিজের সুস্থাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এবং এটি হারানোর আগে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা উচিত। অতএব, ইসলাম নিয়মিতভাবে মুসলমানদেরকে তাদের নিজস্ব বিষয়ে মগ্ন মানুষ হওয়ার পরিবর্তে পর্যবেক্ষণশীল মানুষ হতে উৎসাহিত করে যারা অন্য কোনও কিছুর প্রতি মনোযোগ দেয় না। ৪৭তম অধ্যায় মুহাম্মদ, আয়াত ১০:

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি যে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল?"...

এরপর আল্লাহ তাআলা মদীনায় বসবাসকারী আহলে কিতাবদের সমালোচনা করেন, যারা তাদের প্রদত্ত তাওরাতের সঠিক ও অপরিবর্তিত শিক্ষা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাদের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের রায় মেনে নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা এইভাবে আচরণ করেছিলেন, যদিও তারা পবিত্র কুরআনের ঐশ্বরিক উৎসকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন কারণ তারা এর লেখকের সাথে পরিচিত ছিলেন এবং এই সত্যটিও জানতেন যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস উভয়ই তাদের ঐশ্বরিক কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা ৬ আল-আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

এবং অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২৩:

" তোমরা কি তাদের কথা ভাবো না, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে? তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকা হয় যাতে এটি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে; কিন্তু তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা অস্বীকার করে।"

আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে আলেমদের অভ্যাস ছিল যখনই তারা অন্যদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হত, তখনই তারা বিচারের জন্য নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে আসতেন, কেবল তখনই যখন তারা নিশ্চিত থাকতেন যে তিনি তাদের পক্ষে রায় দেবেন। কিন্তু যদি তারা নিশ্চিত থাকতেন যে তিনি তাদের বিরুদ্ধে রায় দেবেন, তাহলে তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে আসা এড়িয়ে চলতেন এবং তাদের নিজস্ব ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থ, তাওরাতের রায়কেও উপেক্ষা করতেন। ৫ম অধ্যায় আল মায়িদা, আয়াত ৪২-৪৩:

"... তাহলে যদি তারা তোমার কাছে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে বিচার করো অথবা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। আর যদি তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তারা কখনো তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তুমি বিচার করো, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচারের সাথে বিচার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন। কিন্তু তারা তোমার কাছে বিচারের জন্য আসে যখন তাদের কাছে তাওরাত আছে, যার মধ্যে আল্লাহর বিধান রয়েছে? তারপর তারা তার পরেও মুখ ফিরিয়ে নেয়; কিন্তু তারা [প্রকৃতপক্ষে] বিশ্বাসী নয়।"

মুসলমানদের অবশ্যই আহলে কিতাবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে, কখন তারা ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করবে এবং কখন তারা তা উপেক্ষা করবে তা তাদের ইচ্ছানুযায়ী বেছে নেবে। এই মনোভাবকে পবিত্র কুরআনের প্রতি অবিশ্বাস হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর ফলে উভয় জগতেই অসুবিধা এবং শান্তির সম্মুখীন হতে হয়। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ৮৪-৮৫:

“ আর [স্মরণ করো] যখন আমরা তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, “তোমরা [একে অপরের] রক্তপাত করো না এবং একে অপরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিও না।” তারপর তোমরা সাক্ষী থাকা অবস্থায় স্বীকার করেছ। তারপর, তোমরাই তারা যারা একে অপরকে হত্যা করছো এবং তোমাদের একদল লোককে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছিলে, পাপ ও সীমালঙ্ঘনে তাদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করছিলে। আর যদি তারা তোমাদের কাছে বন্দী হয়ে আসে, তাহলে তোমরা তাদের মুক্তি দিয়ে মুক্তি দাও, যদিও তাদের বের করে দেওয়া তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশে অবিশ্বাস করো? তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা এমন করে তাদের শান্তি পার্থিব জীবনে অপমান ছাড়া আর কী হতে পারে? এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোরতম শান্তির দিকে ফিরিয়ে পাঠানো হবে। তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।”

যে ব্যক্তি কোন ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করবে এবং কোনটি উপেক্ষা করবে তা বেছে নেয়, সে অনিবার্যভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বাধা দেবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে। উদ্ধৃত আয়াতগুলি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই মনোভাব উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলার দিকে পরিচালিত করে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলাম একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি যা জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা আবশ্যিক। অতএব, এটিকে এমন একটি পোশাকের মতো ব্যবহার করা উচিত নয় যা কেউ তার ইচ্ছা অনুসারে পরতে এবং খুলতে পারে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে কেবল তার ইচ্ছার পূজা করছে, যদিও তারা অন্যথা দাবি করে। অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

অতএব, যে ব্যক্তি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে চায় এবং সবকিছু এবং সকলকে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দিতে চায় যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে, তাকে অবশ্যই সমস্ত ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতাও করে। তাকে একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তার ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেন, যদিও তাকে তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়। ঠিক যেমন এই বিজ্ঞ রোগী ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেন। কারণ একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান কখনই এই ফলাফল অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না, সমস্ত গবেষণা সত্ত্বেও, কারণ তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান আছে

এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণের সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..'"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২৩:

" তোমরা কি তাদের কথা ভাবো না, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে? তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকা হয় যাতে এটি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে; কিন্তু তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা অস্বীকার করে।"

এই আয়াতটি আরও স্পষ্ট করে যে, সকল আহলে কিতাব এই ধরনের আচরণ করতেন না। তাদের অনেকেই আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলেন, যার অর্থ হল, আল্লাহকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টিজনক, যেমন ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এটি সেই গোষ্ঠীর কিছু সদস্যের কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীর বিচার না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ এটি প্রায়শই বৈষম্যের দিকে পরিচালিত করে, যেমন বর্ণবাদ।

এরপর মহান আল্লাহ তাঁর করুণা ও ক্ষমা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ এবং ধর্মের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবনের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন, কারণ উভয়ই একজন ব্যক্তিকে ঐশ্বরিক শিক্ষার উপর কাজ করা এড়াতে উৎসাহিত করে, যা তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে পরিচালিত করবে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২৩-২৪:

"... তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে যাতে এটি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে; কিন্তু তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা অস্বীকৃতি জানায়। এর কারণ হল তারা বলে, "[কয়েক] দিন ছাড়া আগুন আমাদের কখনও স্পর্শ করবে না" এবং [কারণ] তারা যা উদ্ভাবন করছিল তা তাদের ধর্মে বিভ্রান্ত করেছিল।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইচ্ছাপূরণ বলতে বোঝায় আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকা, একই সাথে উভয় জাহানে তাঁর রহমত ও ক্ষমার আশা করা। ইসলামে এই মনোভাবের কোন মূল্য নেই। অন্যদিকে, প্রকৃত আশা বলতে বোঝায় আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং নিজের আচরণ সংশোধন করা এবং তারপর উভয় জাহানে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করা। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পার্থক্যটি আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, এই পার্থক্যটি উপলব্ধি করা উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার প্রকৃত আশা গ্রহণ করে এবং ইচ্ছাপূরণ এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ ইসলামে এর কোন মূল্য নেই।

আহলে কিতাবরা যে ইচ্ছাশক্তির ধারণা গ্রহণ করেছিল এবং অনেক মুসলমানকে প্রভাবিত করেছে, তা হল মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে বিশেষ হওয়ার মিথ্যা বিশ্বাস। সূরা ৫, আল মায়িদা, আয়াত ১৮:

"কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, "আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়জন।" বলুন, "তাহলে তিনি তোমাদের পাপের জন্য কেন শাস্তি দেন?" বরং তোমরা তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন..."

ফলস্বরূপ, তারা বিশ্বাস করে যে তারা হয় পরকালে ন্যূনতম শাস্তির সম্মুখীন হবে অথবা সম্পূর্ণরূপে এ থেকে বেঁচে যাবে, তারা এই পৃথিবীতে যেভাবেই কাজ করুক না কেন, কারণ মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের বিশেষ মর্যাদা তাদেরকে অন্যান্য বিপথগামী লোকদের উপর প্রদত্ত গুরুতর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। এই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা মহান আল্লাহর প্রতি গুরুতর অসম্মান, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তিনি অন্যায় এবং অন্যায়। অর্থাৎ, তারা দাবি করে যে, মহান আল্লাহ, মানুষের সাথে ভিন্ন আচরণ করবেন, তারা যে জাতির উপর নির্ভর করে, যার ফলে তারা মহান আল্লাহর প্রতি বর্ণবাদ আরোপ করে। উপরন্তু, তাদের মিথ্যা বিশ্বাস আরও ইঙ্গিত দেয় যে, মহান আল্লাহ, তাদের অন্যায়কারীদের সাথে সৎকর্মকারীর সমান আচরণ করবেন। সূরা ৪৫ আল জাসিয়াহ, আয়াত ২১:

"যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমি তাদেরকে তাদের মতো করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান করে দেব? তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না মন্দ।"

এটি সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর ন্যায়বিচার ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস কেবল মহান আল্লাহর আনুগত্যকে উপেক্ষা করতে উৎসাহিত করে, কারণ তারা ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে জান্নাতে তাদের স্থান ইতিমধ্যেই তাদের জন্য সংরক্ষিত। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম একই ধরনের বিশ্বাস গ্রহণ করেছে,

কারণ তারা মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্ব এবং একটি বিশেষ মর্যাদা দাবি করে, কারণ তারা পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী।

ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার আরেকটি দিক হলো যখন মানুষ জাহান্নামের ভয়াবহতাকে অবমূল্যায়ন করে এবং বিশ্বাস করে যে এর শাস্তি এত কঠোর নয়। তারা একে পার্থিব কারাগারের সাথে তুলনা করে, যার ফলে তারা নিজেদেরকে বোকা বানিয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা চালিয়ে যায়। বাস্তবে, জাহান্নামের এক মুহূর্তও অসহনীয়, তাই কীভাবে কেউ এর চেয়ে বেশি সময় সেখানে থাকার উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারে, এমনকি যদি তারা অবশেষে মুক্তি পায়? এই মিথ্যা বিশ্বাস দূর করার জন্য, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে জাহান্নাম এবং এর ভয়াবহতা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার আরেকটি দিক হল যখন লোকেরা ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা আজ মুসলিম, তাই তাদের বিশ্বাস সহকারে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। ফলস্বরূপ, তারা দাবি করে যে তারা যদি জাহান্নামে যায়, তবুও তা সীমিত সময়ের জন্য হবে। পূর্ববর্তী জাতিগুলিও একই রকম দাবি করেছে। সূরা আল বাকারা, আয়াত ৮০:

"আর তারা বলে, "জাহান্নাম আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না, [কয়েক] দিন ছাড়া।" বলুন, "তোমরা কি আল্লাহর সাথে কোন অঙ্গীকার করেছ? কারণ আল্লাহ কখনও তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে এমন কিছু বল যা তোমরা জানো না?"

তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে, কেউই তাদের ঈমান নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে, এই নিশ্চয়তা নেই এবং যত বেশি কেউ আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অটল থাকবে, তত বেশি তাদের ঈমান ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। কারণ ঈমান হলো একটি গাছের মতো যাকে ভালো কাজের মাধ্যমে লালন-পালন করতে হবে এবং পাপ থেকে রক্ষা করতে হবে। ঠিক যেমন একটি গাছ যা ক্ষতিকারক জিনিস থেকে রক্ষা পায় না এবং সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, সে মারা যাবে, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও মারা যেতে পারে যদি সে পাপ করে চলে এবং সৎকর্ম করতে ব্যর্থ হয়।

ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার আরেকটি দিক হল যখন কেউ মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করে যে সে পাপের উপর অটল থাকতে পারবে এবং অন্য কেউ তার পক্ষে সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে রক্ষা করবে, যেমন মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যদিও তার সুপারিশ একটি সত্য, তবুও কিছু মুসলিম জাহান্নামে যাবে। এটি কিয়ামতের দিন তার সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনা করা হাদিসগুলিতে নিশ্চিত করা হয়েছে, যেমন সুনান ইবনে মাজাহ, ৪৩০৮ নম্বরে পাওয়া যায়। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, জাহান্নামের একটি মুহূর্তও অসহনীয় এবং তাই এটি এড়িয়ে চলা উচিত। উপরন্তু, যে ব্যক্তি এইভাবে সুপারিশের বাস্তবতাকে উপহাস করে, সে বিচারের দিনে তা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২৩-২৪:

"... তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে যাতে এটি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে; কিন্তু তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা অস্বীকৃতি জানায়।

এর কারণ হল তারা বলে, "[কয়েক] দিন ছাড়া আগুন আমাদের কখনও স্পর্শ করবে না" এবং [কারণ] তারা যা উদ্ভাবন করছিল তা তাদের ধর্মে বিভ্রান্ত করেছিল।"

ধর্মীয় উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে, মুসলমানদের অবশ্যই নির্দেশনার দুটি উৎস কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীস, এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর আমল করা এড়িয়ে চলতে হবে। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি আমল করা হবে, এমনকি যদি তা সংকর্মের দিকে পরিচালিত করে, তবুও তারা নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর আমল করা তত কম করবে, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে বিষয় দুটি নির্দেশনার উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করবেন। উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর আমল করা যত বেশি আমল করা হবে, তত বেশি তারা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলিতে আমল করা শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পা দেবে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

পরিশেষে, আলোচ্য মূল আয়াতগুলি স্পষ্ট করে যে, যখন কেউ ধর্মে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে, তখন তা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার দিকে পরিচালিত করে, যা পরিণামে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে। এই অবাধ্যতার মধ্যে রয়েছে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার। এটি একজন ব্যক্তিকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেবে, তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল স্থানে ফেলবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে বাধা দেবে। অতএব, ধর্মীয় উদ্ভাবন এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা উভয় জগতেই চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে। পরবর্তী আয়াতে এই সত্যটি নির্দেশ করা হয়েছে। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, ২৫ নং আয়াত:

" তাহলে কেমন হবে যখন আমরা তাদেরকে এমন এক দিনের জন্য একত্রিত করব, যার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই? এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"

অতএব, মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা সম্পর্কে ধর্মীয় উদ্ভাবন এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য শিখতে এবং তার উপর আমল করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। এর ফলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করা সম্ভব হবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকা সম্ভব হবে। অতএব, এই আচরণ মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে, এমনকি যদি কারো আকাঙ্ক্ষা ইসলামী শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। বাস্তবে, উভয় জগতে মানসিক ও শারীরিক শান্তি অর্জনের জন্য নিজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা একটি সামান্য মূল্য, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি সুস্বাস্থ্য অর্জনের জন্য তার খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করলেও মনের শান্তি পেতে ব্যর্থ হয় তার জন্য জীবন একটি অন্ধকার কারাগারে পরিণত হয়। ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের দেখলে এটি বেশ স্পষ্ট হয়।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২৫:

"তাহলে কেমন হবে যখন আমরা তাদেরকে এমন এক দিনের জন্য একত্রিত করব, যার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই? এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"

কিয়ামতের দিন মানুষের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা অস্বীকার করা একটি অদ্ভুত দাবি, যখন দিন, মাস এবং বছর জুড়ে পুনরুত্থানের অনেক উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে একটি মৃত অনূর্বর ভূমিকে জীবন দান করেন এবং সৃষ্টির জন্য একটি মৃত বীজকে জীবন্ত করে তোলেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ, মানুষ নামক মৃত বীজকে, যাকে মাটিতে সমাহিত করা হয়, জীবন দান করতে পারেন এবং করবেন, যেমন মৃত বীজ থেকে জীবিত হয়ে ওঠে। ঋতু পরিবর্তন স্পষ্টভাবে পুনরুত্থানকে দেখায়। উদাহরণস্বরূপ, শীতকালে, গাছের পাতা মারা যায় এবং ঝরে পড়ে এবং গাছটি প্রাণহীন দেখায়। কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে, পাতাগুলি আবার গজায় এবং গাছটি প্রাণে পূর্ণ দেখায়। সমস্ত প্রাণীর ঘুম জাগ্রত চক্র পুনরুত্থানের আরেকটি উদাহরণ। ঘুম মৃত্যুর বোন, কারণ ঘুমন্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলি কেটে ফেলা হয়। মহান আল্লাহ, তারপর একজন ব্যক্তির আত্মা তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন যদি তারা বেঁচে থাকার জন্য নির্ধারিত হয় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিকে আবার জীবন দান করে। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ মানুষের আত্মা তাদের মৃত্যুর সময় কবজ করেন এবং যারা মারা যায় না তাদের নিদ্রাকালে কবজ করেন। অতঃপর যাদের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদের তিনি ধরে রাখেন এবং অন্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

তাছাড়া, বিচার দিবস এমন একটি বিষয় যা অবশ্যই ঘটবে। কেউ যদি মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করে, তাহলে সে ভারসাম্যের অনেক উদাহরণ দেখতে পাবে। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী সূর্য থেকে নিখুঁত এবং সুষম দূরত্বে অবস্থিত। পৃথিবী যদি সূর্যের একটু কাছে বা আরও দূরে থাকত, তাহলে এটি বসবাসের অযোগ্য হত। একইভাবে, জলচক্র, যার মধ্যে সমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে জলের বাষ্পীভবন জড়িত যা পরে বৃষ্টিপাতের জন্য ঘনীভূত হয়, পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ যাতে সৃষ্টি পৃথিবীতে বসবাস চালিয়ে যেতে পারে। ভূমিকে একটি সুষম উপায়ে তৈরি করা হয়েছিল যাতে দুর্বল শাখা এবং বীজের অঙ্কুরগুলি সৃষ্টির জন্য ফসল সরবরাহ করার জন্য এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু একই ভূমি তার উপরে নির্মিত ভারী ভবন সহ্য করার জন্য যথেষ্ট শক্ত। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যা কেবল একজন স্রষ্টাকেই স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে না, ভারসাম্যকেও নির্দেশ করে। কিন্তু এই পৃথিবীতে একটি প্রধান জিনিস রয়েছে যা স্পষ্টতই ভারসাম্যহীন, তা হল মানবজাতির কর্মকাণ্ড। প্রায়শই অত্যাচারী এবং অত্যাচারী মানুষদের দেখা যায় যারা এই পৃথিবীতে শাস্তি থেকে বেঁচে যায়। বিপরীতে, এমন অসংখ্য মানুষ আছে যারা অন্যদের দ্বারা নিপীড়িত হয় এবং অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন হয় কিন্তু তাদের ধৈর্যের পূর্ণ প্রতিদান পায় না। অনেক মুসলিম যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে, তারা প্রায়শই এই পৃথিবীতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং পুরস্কারের সামান্য অংশ পায়, অন্যদিকে যারা প্রকাশ্যে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়, তারা এই পৃথিবীর বিলাসিতা উপভোগ করে এবং কেবল কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। ঠিক যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতে একটি ভারসাম্য স্থাপন করেছেন, তেমনি কর্মের পুরস্কার এবং শাস্তিরও ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কিন্তু স্পষ্টতই এটি এই পৃথিবীতে ঘটে না, তাই এটি অন্য সময়ে, অর্থাৎ প্রতিফল দিবসে ঘটতে হবে।

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতেই পূর্ণ পুরস্কার এবং শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে পূর্ণ শাস্তি না দেওয়ার পেছনের একটি প্রজ্ঞা হল, মহান আল্লাহ তাদেরকে সুযোগের পর সুযোগ দিয়ে থাকেন যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তাদের আচরণ সংশোধন করে। তিনি এই পৃথিবীতে মুসলিমদের পূর্ণ পুরস্কার দেন না কারণ এই পৃথিবী জান্নাত নয়। উপরন্তু, অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস করা, অর্থাৎ

পরকালে একজন মুসলিমের জন্য অপেক্ষা করা পূর্ণ পুরস্কার, ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্যের উপর বিশ্বাসই ঈমানকে বিশেষ করে তোলে। এমন কিছুতে বিশ্বাস করা যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়, যেমন এই পৃথিবীতে পূর্ণ পুরস্কার পাওয়া, এত বিশেষ হবে না।

পূর্ণ শান্তির ভয় এবং পরকালে পূর্ণ প্রতিদান পাওয়ার আশা একজনকে পাপ থেকে বিরত থাকতে এবং সৎকর্ম করতে উৎসাহিত করবে।

এই বস্তুগত জগতের প্রতিফল দিবস শুরু হতে হলে অবশ্যই শেষ হতে হবে। কারণ শান্তি এবং পুরস্কার কেবল তখনই দেওয়া যেতে পারে যখন প্রত্যেকের কর্ম শেষ হয়ে যায়। অতএব, মানুষের কর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিফল দিবস সংঘটিত হতে পারে না। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, বস্তুগত জগতের অবশ্যই শেষ হতে হবে, শীঘ্র হোক বা কাল।

যখন কেউ এই আলোচনার উপর চিন্তা করে, তখন এটি বিচার দিবসের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে এর জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করবে, যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২২:

"কারণ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে একটি উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রতিটি প্রাণী তার কৃতকর্মের প্রতিফল পায়। এবং কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।"

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ২৬-২৭

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ
وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

“বলুন, হে আল্লাহ, সার্বভৌমত্বের মালিক। তুমি যাকে ইচ্ছা সার্বভৌমত্ব দান করো
এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা সার্বভৌমত্ব কেড়ে নাও। তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত
করো এবং যাকে ইচ্ছা বিনীত করো। তোমার হাতেই [সকল] কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি
সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

তুমি রাতকে দিনে প্রবেশ করাও, আর দিনকে রাতে প্রবেশ করাও; তুমি মৃত থেকে
জীবিতকে বের করে আন, আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করে আন। আর তুমি
যাকে ইচ্ছা অগণিত রিযিক দান করো।”

যেহেতু একমাত্র মহান আল্লাহই সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান, তাই প্রতিটি পরিস্থিতিতে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করতে হবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২৬:

"বলুন, "হে আল্লাহ, সার্বভৌমত্বের মালিক..."

এই আনুগত্যের মধ্যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এই আনুগত্য বা এর অভাবই নির্ধারণ করবে যে কেউ জীবনের সমস্ত অসুবিধা এবং পরীক্ষা অতিক্রম করার শক্তি পাবে কিনা যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২৬:

"...তুমি যাকে ইচ্ছা সার্বভৌমত্ব দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা সার্বভৌমত্ব কেড়ে নাও..."

এটি তাদের জন্যও একটি সতর্কবাণী যারা মহান আল্লাহ প্রদত্ত কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্বের অপব্যবহার করে। মহান আল্লাহ অসংখ্য জাতিকে মহান ক্ষমতা দান করেছিলেন কিন্তু তারা যখন এর অপব্যবহার করেছিল, তখন তিনি তাদের কাছ থেকে তা কেড়ে নিয়েছিলেন এবং উভয় জগতে তাদের অপমানিত করেছিলেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২৬:

"...তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করো এবং যাকে ইচ্ছা বিনীত করো..."

অতএব, অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যে তারা তাদের প্রদত্ত সমস্ত আশীর্বাদ, যেমন তাদের কর্তৃত্ব, সঠিকভাবে ব্যবহার করছে, তা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার আগে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিতভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে, সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে। এটি উভয় জগতে সম্মান এবং মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলির অপব্যবহার করবে সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে না এবং তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল স্থানে রাখবে। এটি তাদের উভয় জগতে সম্মান এবং মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে। যেহেতু মহান আল্লাহ, একমাত্র, সবকিছু জানেন, তাই তিনিই মানবজাতির জন্য অনুসরণ করার জন্য নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যাতে তারা উভয় জগতে সম্মান এবং মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। অন্যদিকে, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের অভাবের কারণে কোনও মানব-নির্মিত আচরণবিধি কখনই এই ফলাফল অর্জন করতে পারে না। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ২৬:

“বলুন, হে আল্লাহ, সার্বভৌমত্বের মালিক! তুমি যাকে ইচ্ছা সার্বভৌমত্ব দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা সার্বভৌমত্ব কেড়ে নাও। তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করো এবং যাকে ইচ্ছা বিনীত করো। তোমার হাতেই [সকল] কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।”

অতএব, একজন ব্যক্তির অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা উচিত, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার বিরোধিতা করেও। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..'"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২৬:

"বলুন, "হে আল্লাহ, সার্বভৌমত্বের মালিক। তুমি যাকে ইচ্ছা সার্বভৌমত্ব দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা সার্বভৌমত্ব কেড়ে নাও। তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করো এবং যাকে ইচ্ছা বিনীত করো। তোমার হাতেই [সকল] কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

এটি আরও ইঙ্গিত করে যে সমাজে কর্তৃত্ব ও প্রভাব লাভ করা অবশ্যই আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত হওয়ার লক্ষণ নয়, কারণ এই আয়াতে কর্তৃত্ব ও সম্মান পৃথক করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ, মহিমান্বিত, কাউকে কর্তৃত্ব প্রদান করতে পারেন কিন্তু তাকে অপমান করার জন্য এটি ব্যবহার করতে পারেন। এবং আল্লাহ, মহিমান্বিত, কাউকে সমাজের মধ্যে সম্মান প্রদানের সময় প্রভাব থেকে সরিয়ে দিতে পারেন। অতএব, মুসলমানদের জন্য জীবনের সঠিক সংজ্ঞা অনুসারে জীবনযাপন করা গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় তারা তাদের প্রচেষ্টাকে ভুল জায়গায় স্থাপন করবে এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। উদাহরণস্বরূপ, পার্থিব মান অনুসারে, সুখ এবং মানসিক শান্তি খুঁজে পাওয়া নিজের ইচ্ছা পূরণের মধ্যে নিহিত। অন্যদিকে, সত্য হল, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, মনের শান্তি অর্জন কেবলমাত্র ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহারের মধ্যে নিহিত। পার্থিব মান অনুসারে সাফল্য পরিমাপ করা হয় সম্পদ এবং পার্থিব বিলাসিতা দ্বারা। অন্যদিকে, সত্য হল যে প্রকৃত সাফল্য উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জনের মধ্যে নিহিত কারণ যার পার্থিব বিলাসিতা আছে সে যদি মানসিক শান্তি না পায় তবে এখনও

দুঃখী থাকবে। অতএব, একজনকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা শিখতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে যাতে তারা জীবনের সঠিক সংজ্ঞা বুঝতে পারে এবং তাদের প্রচেষ্টাকে সঠিক জায়গায় পরিচালিত করতে পারে এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২৬:

"বলুন, "হে আল্লাহ, সার্বভৌমত্বের মালিক! তুমি যাকে ইচ্ছা সার্বভৌমত্ব দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা সার্বভৌমত্ব কেড়ে নাও। তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করো এবং যাকে ইচ্ছা বিনীত করো। তোমার হাতেই [সকল] কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

এই আয়াতে আহলে কিতাবদেরও সমালোচনা করা হয়েছে, যাদের বিষয়ে পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রথমে তাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু তারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঐশী কিতাব অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তাদের পদ থেকে সরিয়ে মুসলিম জাতিকে তাদের জায়গায় আনা হয়েছিল। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়ে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে। এই কর্তব্য তখনই পূর্ণ হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য শিখে এবং তার উপর আমল করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করছে, যার মধ্যে মানুষের অধিকার পূরণ করা জড়িত। এর

ফলে সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার ও শান্তির প্রসার ঘটবে এবং বাইরের বিশ্বের কাছে ইসলামের আসল চেহারা দেখাবে। যখন কেউ এই কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়, তখন তারা সমাজের মধ্যে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেবে, কারণ তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে, যা তাদেরকে মানুষের অধিকার পূরণ করতে বাধা দেবে। উপরন্তু, তারা অমুসলিম এবং অন্যান্য মুসলিমদের ইসলাম গ্রহণ এবং তার উপর কাজ করা থেকে বিরত রাখবে কারণ তারা ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে। আল্লাহ, মহিমান্বিতকে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করার এই দায়িত্ব প্রতিটি মুসলিমকে পালন করতে হবে, অন্যথায় তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত দ্বারা অপমানিত হবে এবং অন্যদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। অধ্যায় ৫ আল মায়িদা, আয়াত ৫৪:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় বের করবেন যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসবে [যারা] মুমিনদের প্রতি বিনয়ী, কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর; তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং নিন্দুকের নিন্দার ভয় করে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২৬:

"বলুন, "হে আল্লাহ, সার্বভৌমত্বের মালিক! তুমি যাকে ইচ্ছা সার্বভৌমত্ব দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা সার্বভৌমত্ব কেড়ে নাও। তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করো এবং যাকে ইচ্ছা বিনীত করো। তোমার হাতেই [সকল] কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

পরিশেষে, সমগ্র সৃষ্টি মহান আল্লাহর আওতাধীন এবং তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারাধীন, একজন ব্যক্তির তাঁর নিয়ম মেনে চলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট দেশের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তেমনি মহাবিশ্বের মালিকের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতেই তার সমস্যা হবে। একজন ব্যক্তি যদি তার নিয়ম মেনে চলতে না পারে তবে একটি দেশ ছেড়ে যেতে পারে কিন্তু এমন জায়গায় পালিয়ে যেতে পারবে না যেখানে মহান আল্লাহর নিয়ম ও এখতিয়ার প্রযোজ্য হয় না। একজন ব্যক্তি তার সমাজের নিয়ম পরিবর্তন করতে সক্ষম হতে পারে কিন্তু তারা কখনও মহান আল্লাহর নিয়ম পরিবর্তন করতে পারবে না। উপরন্তু, ঠিক যেমন একজন বাড়ির মালিক ঘরের নিয়ম নির্ধারণ করে, এমনকি অন্যরা এই নিয়মের প্রতি আপত্তি জানালেও, একইভাবে, মহাবিশ্ব মহান আল্লাহর, এবং তাই, তিনিই একমাত্র এই মহাবিশ্বের নিয়ম নির্ধারণ করেন, মানুষ এই নিয়ম পছন্দ করুক বা না করুক। অতএব, এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে, নিজের স্বার্থে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে সে মহান আল্লাহর নিয়ম মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। একজন ব্যক্তি হয় আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পিছনের হিকমতগুলি শেখার চেষ্টা করতে পারে, যাতে সে বুঝতে পারে যে কীভাবে সেগুলি তাদের এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য উপকারী এবং কীভাবে তারা উভয় জগতে মানসিক ও শারীরিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, অথবা সে তার আকাঙ্ক্ষার উপাসনা করতে পারে এবং ইসলামের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলামী নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তার উচিত উভয় জগতেই তার পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং কোনও আপত্তি, প্রতিবাদ বা অভিযোগ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ২৯:

"আর বলো, "সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, অতএব যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক; আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।" নিশ্চয়ই, আমরা জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে ঘিরে থাকবে। আর যদি তারা সাহায্যের জন্য ডাকে, তবে তাদের সাহায্যের জন্য ঘোলা তেলের মতো পানি ব্যবহার করা হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দেবে। পানীয় কত নিকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট।"

মহান আল্লাহর অসীম ও চরম ক্ষমতা বিভিন্ন উপায়ে উপলব্ধি করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে এবং বিভিন্ন জাতির সাথে তাঁর আচরণের মাধ্যমে এটি উপলব্ধি করা যেতে পারে এবং আকাশ ও পৃথিবী পর্যবেক্ষণ করে এটি উপলব্ধি করা যেতে পারে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২৭:

"তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও, আর দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করাও..."

দিন এবং রাত্রির মধ্যে নিখুঁত সমন্বয় সাধন একজন একক নিয়ন্ত্রকের ইঙ্গিত দেয়, কারণ অনেক দেবতা বিভিন্ন জিনিস কামনা করবেন, যা মহাবিশ্বের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। অধ্যায় ২১ আল আশ্বিয়া, আয়াত ২২:

"যদি তাদের মধ্যে [অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের] আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত..."

অধিকন্তু, মহান আল্লাহ সুনিশ্চিত করেন যে দিন ও রাত্রি যথাযথ ব্যবধানে ঘটে কারণ অতিরিক্ত দিনের আলো বা অতিরিক্ত রাত্রি সৃষ্টির জন্য ক্ষতিকর। উদাহরণস্বরূপ, অতিরিক্ত দিনের আলো মানুষকে কখন তাদের রিজিক অর্জন করতে হবে, দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা করতে হবে এবং কখন বিশ্রাম নিতে হবে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে বাধা দেয়। অতএব, মানুষ যাতে বিশ্রাম নিতে পারে তার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ রাত্রি প্রয়োজন। যদি অতিরিক্ত রাত্রি থাকে এবং পর্যাপ্ত দিনের আলো না থাকে, তাহলে এটি ফসলের বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করবে, যা সৃষ্টির রিজিক প্রদানের জন্য প্রয়োজন এবং উপযুক্ত দিনের আলো প্রয়োজন যাতে মানুষ তাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং তাদের রিজিক অনুসন্ধান করতে পারে। অধ্যায় ২৮ আল কাসাস, আয়াত ৭১-৭৩:

"বলুন, "তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তোমাদের জন্য রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন উপাস্য আছে যে তোমাদের আলো এনে দিতে পারে? তাহলে কি তোমরা শুনতে পাবে না?" বলো, "তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তোমাদের জন্য দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন উপাস্য আছে যে তোমাদের জন্য এমন একটি রাত এনে দিতে পারে যেখানে তোমরা বিশ্রাম নিতে পারো? তারপর কি তোমরা দেখতে পাবে না?" আর তিনি তাঁর রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পারো এবং [দিনে] তাঁর অনুগ্রহ অব্বেষণ করতে পারো এবং [যাতে] তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"

এই আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায়, মহান আল্লাহ মানুষের জন্য দিন ও রাত্রি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন তা স্বীকার করা তাঁর অসীম ক্ষমতার ইঙ্গিত দেয় এবং মানুষকে তাঁর

প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উৎসাহিত করা উচিত। নিয়তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হলো কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা। কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হলো ভালো কথা বলা অথবা নীরব থাকা। আর কর্মে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হলো পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা আল্লাহকে খুশি করে।

এরপর মহান আল্লাহ তাঁর অসীম ক্ষমতার আরেকটি দিক নির্দেশ করেন যা একজনকে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে উৎসাহিত করবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২৭:

"...এবং তুমি মৃতের ভেতর থেকে জীবিতকে বের করো, এবং জীবিতের ভেতর থেকে মৃতকে বের করো..."

জীবন ও মৃত্যুর উৎস একমাত্র মহান আল্লাহ। তিনি মৃত থেকে জীবন বের করেন, যেমন একটি প্রাণহীন বীজ থেকে প্রাণের উৎপত্তি ঘটান অথবা একটি মৃত ভূমিতে জীবন দান করেন যাতে কেউ তা থেকে ফসল ও উদ্ভিদের জন্ম দেখতে পারে। তিনি জীবিতদের মৃত্যু দান করেন, যেমন মানুষের মৃত্যু এবং বছরের নির্দিষ্ট ঋতুতে ফসল, উদ্ভিদ এবং গাছের মৃত্যু। তিনি প্রতিদিন মানুষকে ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যু এবং জীবন দান করেন এবং আবার জেগে ওঠেন। সূরা ৩৯ আয-যুমার, আয়াত ৪২:

"আল্লাহ মানুষের আত্মা তাদের মৃত্যুর সময় কবজ করেন এবং যারা মারা যায় না তাদের নিদ্রাকালে কবজ করেন। অতঃপর যাদের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদের তিনি ধরে রাখেন এবং অন্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

এরপর মহান আল্লাহ তাঁর অসীম ক্ষমতার আরেকটি দিক নির্দেশ করেন যা একজনকে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে উৎসাহিত করবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২৭:

"... আর তুমি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করো।"

মহামহিম আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সকল প্রাণীর জন্য রিজিক বরাদ্দ করে রেখেছিলেন। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। মহাবিশ্বে অসংখ্য প্রাণী রয়েছে, তবুও তাদের সকলকে আল্লাহ তাআলা রিজিক প্রদান করেন। তাদের অধিকাংশই তাদের রিজিক সঞ্চয় করে না এবং প্রতিদিন তা অনুসন্ধান করে, তবুও তারা সকলেই তা খুঁজে পেতে সক্ষম হয়। ২৯ সূরা আল আনকাবুত, আয়াত ৬০:

"আর কত প্রাণীই না তাদের নিজস্ব রিযিক বহন করে। আল্লাহই তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও রিযিক দান করেন। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

কিছু মানুষ আছে যারা সম্পদের মতো রিজিক অর্জনের জন্য অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু শুধুমাত্র চাহিদা অনুযায়ীই তা অর্জন করে। অন্যদিকে, কিছু মানুষ আছে যারা ন্যূনতম প্রচেষ্টায় অতিরিক্ত রিজিক, যেমন সম্পদ, অর্জন করে। এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে একজন নিয়ন্ত্রক আছেন যিনি প্রতিটি ব্যক্তির প্রচেষ্টা নির্বিশেষে, কতটা রিজিক পাবেন তা নির্ধারণ করেন। উপরন্তু, মানুষ প্রায়শই তাদের রিজিক, যেমন তাদের দৈনন্দিন খাবার, এমনভাবে পান যা তারা কখনও আশা করেনি বা পরিকল্পনা করেনি। সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন ব্যক্তির কর্তব্য হল তাদের প্রদত্ত উপায়, যেমন তাদের শক্তি, ব্যবহার করে তাদের বৈধ রিজিক অনুসন্ধান করা এবং উপার্জন করা এবং অবৈধ উপায় এড়িয়ে চলা, আত্মবিশ্বাসী থাকা যে তাদের নির্ধারিত রিজিক তাদের কাছে পৌঁছাবে, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়।

পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই পৃথিবীর সকল মানুষের লক্ষ্য, তাদের বিশ্বাস যাই হোক না কেন, মানসিক শান্তি অর্জন করা। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এটি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি অর্জন করা একজন ব্যক্তির কাছে কত পার্থিব জিনিসপত্র, যেমন সম্পদ, তার সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং, মানসিক শান্তি অর্জন করা তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি কীভাবে ব্যবহার করে তার সাথে সম্পর্কিত। অতএব, একজন দরিদ্র ব্যক্তিও মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে কারণ তাদের কেবল ইসলামী শিক্ষা অনুসারে আল্লাহ, মহিমান্বিত, যা কিছু দিয়েছেন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। বাস্তবে, এটি এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষা, অর্থাৎ, একজন ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হিসাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে কিনা। জীবনের পরীক্ষা একজন ব্যক্তি কতটা পার্থিব জিনিস পেতে পারে তা নয়। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2:

"যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম..."

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২৭:

"তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও, আর দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করাও; আর তুমি মৃত থেকে জীবিতকে বের করে আন, আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করে আন। আর তুমি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করো।"

যে ব্যক্তি এই আয়াতের বাস্তবতা উপলব্ধি করবে, সে অবশ্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহকে মেনে চলার চেষ্টা করবে, কারণ তিনি সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, যার মধ্যে রয়েছে মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল। এই আনুগত্যের মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তার জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব, এই সবকিছু উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সূরা 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়ে প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করে, সে মানসিক ও শারীরিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা লাভ করতে পারে না এবং সে তার জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুলভাবে স্থান দেয়। এর ফলে উভয় জগতেই তার জন্য চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলার সৃষ্টি হবে, এমনকি যদি সে বিনোদনের মুহূর্ত উপভোগ করে এবং পার্থিব বিলাসিতা লাভ করে। ৯ম অধ্যায়, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার

কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে
ভুলে যাওয়া হবে।"

অধ্যায় ৩ - আলী ইমরান, আয়াত ২৮ - ৩২

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُ وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

قُلْ إِنْ تَخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ بُدُّوا يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

"মুমিনরা যেন মুমিনদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে বন্ধু [সমর্থক বা অভিভাবক] হিসেবে গ্রহণ না করে। আর যে কেউ [তোমাদের মধ্যে] এমনটি করে, তার আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তবে সাবধানতার সাথে তাদের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা ছাড়া। আর আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং আল্লাহর দিকেই [চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন]।"

বলো, "তোমরা তোমাদের অন্তরের কথা গোপন রাখো অথবা প্রকাশ করো, আল্লাহ তা জানেন। আর তিনি জানেন যা কিছু আসমানে আছে এবং যা কিছু জমিনে আছে। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।"

যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সৎকর্ম এবং মন্দকর্ম উপস্থিত পাবে, সেদিন সে কামনা করবে যে, যদি তার এবং ঐ মন্দকর্মের মধ্যে অনেক দূরত্ব থাকতো। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে সতর্ক করছেন, আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

বলুন, [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

"বলুন, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আল্লাহ কাফেরদের পছন্দ করেন না।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২৮:

"মুমিনরা যেন মুমিনদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে মিত্র [অর্থাৎ, সমর্থক বা অভিভাবক] হিসেবে গ্রহণ না করে। আর যে [তোমাদের মধ্যে] এমনটি করে তার আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তবে বিচক্ষণতার সাথে তাদের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা ছাড়া..."

এই আয়াতের অর্থ এই নয় যে, একজন মুসলিম একজন অমুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে না কারণ এই বিশেষ আয়াত এবং অনুরূপ আয়াতগুলি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়ে অমুসলিমদের কথা উল্লেখ করেছে। ২৮ নং আয়াতে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে, কারণ সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করার অনুমতি পেয়েছিলেন। ইসলামের ধ্বংস কামনাকারী অমুসলিমদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা সেই সময়ে বিশেষভাবে বিপজ্জনক ছিল, কারণ অমুসলিমরা ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অর্জনের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করত।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে উপদেশ দেয় যে, মহান আল্লাহ অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন না। ৬০ তম সূরা আল মুমতাহানা, আয়াত ৮:

"যারা ধর্মের কারণে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের সাথে সদাচরণ করতে এবং তাদের সাথে ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন।"

বাস্তবে, মূল আয়াতটি মুসলমানদের সতর্ক করে যে, যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করতে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। বাস্তবে এটি মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৩৩ নম্বর হাদিসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, একজন মুসলিম তার বন্ধুর জীবনের পথে। এর অর্থ হল, একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীদের মধ্যে থাকা ভালো বা খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করবে, তা তার কাছে স্পষ্ট হোক বা না হোক। অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের সাহচর্য গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে উৎসাহিত করে।

তাছাড়া, মুসলিম ও অমুসলিম সকলের সাথে সদয় আচরণ করা একজন প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। একজন প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি এবং তার সম্পদ থেকে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি দূরে রাখে। সুনানে আন নাসায়ীর ৪৯৯৮ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, অন্যদের সাথে সুস্থ সামাজিক আচরণ এবং অন্যদের সাথে গভীর বন্ধুত্বের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গভীর বন্ধুত্ব সর্বদা একজন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করবে, সে তা বুঝতে পারুক বা না পারুক এবং এটি তার সঙ্গীর প্রতি ভালোবাসার

কারণে তার বিশ্বাসের সাথে আপোষ করতে পারে, অন্যদিকে, অন্যদের সাথে ভালো সামাজিক আচরণ কখনই তাকে এই পর্যায়ে নিয়ে যাবে না। অতএব, মুসলমানদের সকলের সাথে ভালো চরিত্র এবং আচরণ গ্রহণ করা উচিত, তবে তাদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব সংরক্ষণ করা উচিত যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের দিকে উৎসাহিত করবে। কেবলমাত্র একজন মুসলিমই অন্য মুসলিমের জন্য এটি করতে পারে। অন্যদিকে, একজন অমুসলিম, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর অবাধ্য হতে উৎসাহিত করবে, যদিও তারা এটির ইচ্ছা নাও করে। এর কারণ হল একজন অমুসলিম একজন মুসলিমের সাথে আলাদা আচরণবিধি মেনে চলে। এবং একজন অমুসলিমের কাছে যে আচরণ গ্রহণযোগ্য তা ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর ভয় এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার ভয় গ্রহণ করে, সে একজন খারাপ সঙ্গীর নেতিবাচক পরিণতি বুঝতে পারবে এবং তাই তাদের এড়িয়ে চলবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২৮:

"... আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে সতর্ক করেন, আর আল্লাহর দিকেই [চূড়ান্ত] গন্তব্য।"

কারণ, যে ব্যক্তি তার সঙ্গীদের দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়, সে অনিবার্যভাবে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হবে, কারণ সে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এর ফলে মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে, যার ফলে সে তার জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় স্থাপন করবে এবং কিয়ামতের দিন জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারবে না। অতএব, একজন খারাপ সঙ্গী

একজন ব্যক্তিকে এই পৃথিবীতে বা পরকালে মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেবে। এই পৃথিবীতে, এই পরিণতি স্পষ্ট কারণ বেশিরভাগ অপরাধ এবং পাপ কারো সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে শুরু হয়। ২৫তম অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত ২৭-২৮:

" আর যেদিন জালেম তার হাত কামড়াবে[অনুতাপে], সেদিন সে বলবে, "হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে কোন পথ অবলম্বন করতাম! হায়, আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি তাকে বন্ধু হিসেবে না নিতাম!"

যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলা সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত, তাই প্রতিটি সম্পর্কের জন্য এবং সেই সম্পর্ক তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মকে কীভাবে প্রভাবিত করে তার জন্য একজনকে জবাবদিহি করতে হবে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২৯:

"বল, "তোমরা তোমাদের অন্তরের কথা গোপন রাখো অথবা প্রকাশ করো, আল্লাহ তা জানেন। আর তিনি জানেন যা কিছু আসমানে আছে এবং যা কিছু জমিনে আছে। আর আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

এছাড়াও, খারাপ সাহচর্যের নেতিবাচক প্রভাব, অথবা ইসলামে যা কিছু বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে, তা যদি কেউ উপলব্ধি নাও করে, তবুও তাকে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে কারণ মহান আল্লাহ তাআলা জানেন যে তাদের জন্য কোনটা উত্তম, কারণ তিনি সবকিছু জানেন। এই ধরনের

ক্ষেত্রে, একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তার ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাকে তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাস দেওয়া হয়। ঠিক যেমন এই বিজ্ঞ রোগী সুস্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার উপর আমল করেন তিনি উভয় জগতেই মানসিক ও শারীরিক শান্তি অর্জন করবেন। কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই আছে। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও এত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ তাদের জীবনের প্রতিটি জিনিস এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে না, কারণ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসের আকারে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইসলামের শিক্ষাগুলি নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। কিন্তু এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি...'"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২৯:

"... আর আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

এরপর আল্লাহ তাআলা মানুষকে কিয়ামতের দিনের অনুশোচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যা সংশোধন করা সম্ভব নয় কারণ একজন ব্যক্তি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর দ্বিতীয় কোন সুযোগ থাকে না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩০:

"যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সৎকর্ম এবং মন্দকর্ম উপস্থিত পাবে, সেদিন সে কামনা করবে যে, যদি তার এবং ঐ মন্দকর্মের মধ্যে অনেক দূরত্ব থাকত..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই জগতের অনুশোচনার চেয়ে বিচার দিনের অনুশোচনা সম্পর্কে বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত। কারণ এই জগতের অনুশোচনা প্রায়শই সংশোধন করা যেতে পারে, এগুলি এত সুদূরপ্রসারী নয় এবং এগুলি এত গুরুতর নয়, কারণ মৃত্যু অনিবার্যভাবে ব্যক্তিকে এই পৃথিবী এবং তাদের অনুশোচনা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। যদিও বিচার দিনের অনুশোচনাগুলি সংশোধন করা যায় না, সেগুলি সুদূরপ্রসারী এবং অত্যন্ত গুরুতর কারণ এগুলি জাহান্নামে প্রবেশ বা জান্নাত পাওয়ার মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। অতএব, এই জগতের অনুশোচনার চেয়ে বিচার দিনের অনুশোচনা কমিয়ে আনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। যদিও একজন ব্যক্তি অন্য লোকেদের দ্বারা পার্থিব অনুশোচনা সম্পর্কে চিন্তিত হতে ভয় পাবে, তবুও একজনের উচিত আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং এই পৃথিবীতে তার পছন্দের পরিণতি সম্পর্কে ভয় করা। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ৩০:

"... আর আল্লাহ তোমাদের নিজের সম্পর্কে সতর্ক করছেন..."

যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে পার্থিব অনুশোচনার নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩০:

"... আর আল্লাহ[তঁার] বান্দাদের প্রতি দয়ালু।"

এবং ৬৫তম অধ্যায়ে তলাক, আয়াত ২:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৩০:

"যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সৎকর্ম এবং মন্দকর্ম উপস্থিত পাবে, সেদিন সে কামনা করবে যে, যদি তার এবং ঐ মন্দকর্মের মধ্যে অনেক দূরত্ব থাকত..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন ব্যক্তির কখনই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তারা কিয়ামতের দিন আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে বা অন্য কোনও কিছু মাধ্যমে তার আচরণ সংশোধন করবে। মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন কোনও অজুহাত বা তাঁকে খুশি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন না, কারণ আন্তরিক অনুতাপ এবং নিজের অবাধ্যতা সংশোধনের জন্য

অন্যান্য পদক্ষেপ নেওয়ার সময় কেবল এই পৃথিবীতেই। অধ্যায় 30 আর রুম, আয়াত 57:

"অতএব, সেদিন তাদের ওজর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না যারা অন্যায় করেছে এবং তাদেরকে [আল্লাহকে] সন্তুষ্ট করতে বলা হবে না।"

অতএব, মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার উপর প্রকৃত আশা গ্রহণ করা উচিত এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ ইসলামে এর কোন মূল্য নেই। প্রকৃত আশার মধ্যে রয়েছে তাঁর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং যখনই তারা কোনও পাপ করে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহ এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লিঙ্ঘিত যেকোনো অধিকারের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতেও আশা এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 30:

"... আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে সতর্ক করেন, আর আল্লাহ [তাঁর] বান্দাদের প্রতি দয়ালু।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষকে অসংখ্য নেয়ামত দান করে চলেছেন, তাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই সঠিক এবং ন্যায্য। নিয়তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা। কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা। আর কর্মে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে খুশি করার জন্য যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে, তা ব্যবহার করা। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতার এই দিকগুলো ধারণ করে, তাকে উভয় জাহানে আরও বেশি পুরস্কার, আশীর্বাদ এবং মানসিক শান্তি দেওয়া হবে। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব..."

কৃতজ্ঞতার এই পথ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে কারণ এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব, কৃতজ্ঞতার এই পথটি উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের পথ এবং এই পথের শারীরিক আদর্শ আর কেউ নন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। ৩য় অধ্যায় আলী ইমরান, আয়াত ৩১:

“ [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন, “যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।”

এই আয়াতটি মানুষকে আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমানের মৌখিক ঘোষণা বাস্তবায়িত করতে উৎসাহিত করে। এই আনুগত্যের মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত সঠিক আশীর্বাদ ব্যবহার করা জড়িত। উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য ব্যক্তির মৌখিক ঈমানের ঘোষণার উপর শারীরিকভাবে কাজ করাই প্রমাণ এবং মুদ্রা। কারণ ঈমান হল এমন একটি উদ্ভিদের মতো যাকে ভালো কাজের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে এবং পাপ থেকে রক্ষা করতে হবে যাতে সে বৃদ্ধি পায়। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা ক্ষতিকারক জিনিস থেকে সুরক্ষিত থাকে না এবং সূর্যালোকের মতো পুষ্টি পায় না, সে বৃদ্ধি পাবে না এবং সম্ভবত মারা যাবে, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধি পাবে না এবং পাপ চালিয়ে গেলে এবং সৎকর্ম করতে ব্যর্থ হলে মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। অতএব, এমন ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলতে হবে যার মাধ্যমে তারা আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা দাবি করে, কিন্তু আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের মৌখিক দাবি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়। অতএব, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করে সে এই পৃথিবীতে বা পরকালে মানসিক শান্তি বা সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার প্রকৃত আশা গ্রহণ করে, আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্যের উপর অটল থেকে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে, সে উভয় জগতেই মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভ করবে যাতে সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

“ [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন, “যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের

ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।”

অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই কার্যত মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসরণ করতে হবে, তাদের উপর অর্জিত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতাও করে। কেবলমাত্র এটিই তাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থাকে সুষম করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করার সাথে সাথে তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে। মনের শান্তি এবং শরীরের শান্তি অর্জনের জন্য নিজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা একটি ছোট মূল্য, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি সুস্বাস্থ্য অর্জনের জন্য তাদের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে। সূরা আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি তার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করার পরেও মানসিক শান্তি পেতে ব্যর্থ হয়, তার জন্য জীবন একটি অন্ধকার কারাগারে পরিণত হয়, কারণ তার মনোভাব তাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেয় এবং এটি তাকে তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় নিয়ে যায়। ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে চলেছেন, তাদের দেখলে এটি বেশ স্পষ্ট হয়। সূরা তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"[নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এই আয়াতটি আরও ইঙ্গিত করে যে, যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মহানবী (সাঃ) এর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এবং তার উপর আমল করে, সে পরকালেও তার সাথে মিলিত হবে। এটা বোঝা যুক্তিসঙ্গত যে, যদি কেউ অন্যের একই পথ অনুসরণ করে, তাহলে তারা তাদের গন্তব্যে একত্রিত হবে। কিন্তু যদি কোন মুসলিম মহানবী (সাঃ) থেকে ভিন্ন পথ এবং জীবনধারা বেছে নেয়, তাহলে তারা পরকালে তার সাথে একত্রিত হবে না। মনে রাখা উচিত যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলিও তাদের পবিত্র নবীদের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার দাবি করে, কিন্তু তারা পরকালে তাদের সাথে একত্রিত হবে না কারণ তারা কার্যত তাদের অনুসরণ করেনি।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

“ [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন, “যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।”

এই আয়াতটি সর্বদা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পথ কঠোরভাবে অনুসরণ করার এবং অন্যান্য সকল পথ এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে। তাঁর পথের মধ্যে রয়েছে নির্দেশনার দুটি উৎস: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য। অতএব, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য সকল উৎস এড়িয়ে চলা উচিত, এমনকি যদি তা সংকর্মের দিকে পরিচালিত করে। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের

উপর যত বেশি কেউ আমল করবে, এমনকি যদি তা সংকর্মের দিকে পরিচালিত করে, ততই তারা নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর আমল করবে না, যা ফলস্বরূপ পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বর হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে বিষয় দুটি নির্দেশনার উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন। উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি আমল করবে, তত বেশি তারা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতাকারী বিষয়গুলিতে আমল করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পড়ে যাবে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষার সাথে চ্যালেঞ্জ করে। তারা এমনকি আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"... সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

মূল আয়াতগুলিতে আলোচিত দুটি পথের মধ্যে পার্থক্য: আনুগত্যের পথ যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে এবং অবাধ্যতার পথ যা উভয় জগতে অসুবিধা এবং চাপের দিকে পরিচালিত করে, পরবর্তী আয়াতে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৩২:

"বলুন, 'আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করো। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আল্লাহ কাফেরদের পছন্দ করেন না।"

মনে রাখতে হবে যে আনুগত্য একটি বাস্তবিক বিষয় এবং তাই কেবল আধ্যাত্মিক হৃদয়ে বিশ্বাস রাখার চেয়েও বেশি কিছু। মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সংকল্প লওয়া। যে ব্যক্তি অন্য কারণে কাজ করে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি

হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে পবিত্র কুরআন শেখা এবং তার উপর আমল করাও জড়িত। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে তাঁর জীবন ও শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করা। যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর আনুগত্য করে, সে নিশ্চিত করবে যে সে তার প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করছে। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে এবং নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেয় এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হয়। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যারা কার্যত আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য করে না, তাদেরকে আল্লাহ তাদের ঈমান ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার বিষয়ে সতর্ক করে দেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩২:

" বলুন, "আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করো। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আল্লাহ কাফেরদের পছন্দ করেন না।"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এর কারণ হল বিশ্বাস হল একটি গাছের মতো যাকে ভালো কাজের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা সূর্যের আলোর মতো পুষ্ট পোষে ব্যর্থ হয়, সে মারা যায়, ঠিক তেমনি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসও মারা যেতে পারে যদি তারা আনুগত্যের মাধ্যমে তা পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ৩৩-৪৪

❖ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

﴿٣٥﴾

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي

سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُؤُا أَنَّىٰ لَٰكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ

يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ

وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾

قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ ءَايَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا وَادَّكُرَّ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٤١﴾

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَأِكَةُ يَمْرِيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ ﴿٤٢﴾

يَمْرِيْمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَأِكَةُ يَمْرِيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ ﴿٤٤﴾

يَمْرِيْمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴿٤٥﴾

“নিশ্চয়ই, আল্লাহ আদম, নূহ, ইব্রাহিমের পরিবার এবং ইমরানের পরিবারকে বিশ্বজগতের উপর মনোনীত করেছেন।

বংশধর, তাদের কেউ কেউ অন্যদের থেকে। আর আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।

[স্মরণ করো], যখন ইমরানের স্ত্রী বললো, "হে আমার পালনকর্তা, আমার গর্ভে যা আছে তা আমি তোমার কাছে উৎসর্গ করেছি, তোমার সেবার জন্য, অতএব তুমি আমার কাছ থেকে এটি গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

কিন্তু যখন সে তাকে প্রসব করল, তখন সে বলল, "হে আমার পালনকর্তা, আমি একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি।" আর আল্লাহই ভালো জানেন সে কী প্রসব করেছে, আর পুত্র সন্তানটি কন্যা সন্তানের মতো নয়। "আর আমি তার নাম রাখলাম মরিয়ম, এবং আমি তোমার কাছে তার এবং তার বংশধরদের জন্য [আল্লাহর রহমত থেকে] বিতাড়িত শয়তানের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে উত্তমভাবে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তমভাবে লালন-পালন করলেন এবং তাকে যাকারিয়ার লালন-পালনের অধীনে রাখলেন। যতবারই জাকারিয়া তার কাছে নামাজের ঘরে প্রবেশ করতেন, তার কাছে খাবার পেতেন। তিনি বলতেন, "হে মরিয়ম, তোমার কাছে এটা কোথা থেকে এসেছে?" তিনি বললেন, "এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিনা হিসাব রিযিক দান করেন।"

তখন জাকারিয়া তার প্রতিপালককে ডেকে বললেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে তোমার পক্ষ থেকে একটি সৎ সন্তান দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।"

তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বললেন, যখন সে কক্ষ নামাযে দাঁড়িয়ে ছিল, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহিয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যিনি আল্লাহর বাণীর সত্যায়নকারী, নেতা, সংযত থাকবেন এবং সৎকর্মপরায়ণদের মধ্য থেকে একজন নবী।"

সে বলল, "হে আমার প্রতিপালক, আমার পুত্র সন্তান কেমন করে হবে, যখন আমি বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে গেছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা?" ফেরেশতা বললেন, "আল্লাহ, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।"

সে বলল, "হে আমার পালনকর্তা, আমার জন্য একটি নিদর্শন নির্ধারণ করুন।" সে বলল, "তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারার মাধ্যমে কথা বলতে পারবে না। আর তোমার পালনকর্তাকে বেশি বেশি স্মরণ করো এবং সন্ধ্যায় ও সকালে পবিত্রতা বর্ণনা করো।"

আর [স্মরণ করো] যখন ফেরেশতারা বললো, হে মারইয়াম, আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং তোমাকে বিশ্বজগতের নারীদের উপর মনোনীত করেছেন।

হে মরিয়ম, তোমার প্রতিপালকের প্রতি একনিষ্ঠভাবে আনুগত্য প্রকাশ করো এবং রুকুকারীদের সাথে সিজদা ও রুকু করো।"

এটা অদৃশ্যের সংবাদ যা আমরা তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমে পাঠাচ্ছি, [নবী মুহাম্মদ, তাঁর উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক]। আর তুমি তাদের সাথে ছিলে না যখন তারা তাদের কলম নিষ্ক্ষেপ করছিল যে তাদের মধ্যে কে মরিয়মের দায়িত্ব নেবে। আর তুমি তাদের সাথে ছিলে না যখন তারা বিতর্ক করছিল।"

মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের গুরুত্ব এবং উভয় জাহানে মানসিক প্রশান্তি কীভাবে আসে তা দেখানোর জন্য প্রায়শই ইতিহাস ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী নবীগণ, তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর অন্যান্য নেক বান্দাদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যাতে লোকেরা বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য কীভাবে উভয় জাহানে মানসিক প্রশান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৩-৩৪:

ইব্রাহিমের পরিবার এবং ইমরানের পরিবারকে বিশ্বজগতের উপর মনোনীত করেছেন। তাদের বংশধর, যাদের কেউ কেউ অন্যদের থেকে এসেছে..."

মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, এই মানুষগুলো তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের কারণেই তাঁর আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে ঐশী কিতাবগুলিতে বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। মহান আল্লাহ এই মিথ্যা বিশ্বাসকে মুছে ফেলেন যে তারা বংশ বা সামাজিক মর্যাদার মতো অন্য কোনও কারণে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়েছিল, অন্যথায় তাদের সমস্ত বংশধরকেই নির্বাচিত এবং আশীর্বাদপ্রাপ্ত করা হত, কেবল তাদের মধ্যে কিছু লোকের পরিবর্তে, অর্থাৎ যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহকে আনুগত্য করেছিল। আহলে কিতাবরা, বিশেষ করে ইহুদিরা, বংশের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাটি তৈরি করেছিল। তারা দাবি করে যে তারা বাকি মানবজাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ কারণ তারা পবিত্র নবী ইব্রাহিমের নাতি ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধর। ৫ম অধ্যায় আল মায়িদা, আয়াত ১৮:

"কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, "আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়জন।" বলুন, "তাহলে তিনি তোমাদের পাপের জন্য কেন শাস্তি দেন?" বরং তোমরা তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন..."

দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম ভুলভাবে একই ধরনের মনোভাব গ্রহণ করেছে, যেখানে তারা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারী বলে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে। কেউ কেউ এমনকি বিশ্বাস করে যে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুপারিশের মাধ্যমে তাদের জান্নাত দেওয়া হবে, যদিও তারা কার্যত আল্লাহকে মান্য করে না। যদিও বিচারের দিনে তাঁর সুপারিশ একটি সত্য, তবুও যে ব্যক্তি এইভাবে এটিকে উপহাস করে, সে হয়তো তাদের পক্ষে সুপারিশ করার পরিবর্তে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে। ২৫ অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত ৩০:

" আর রাসূল বলেছেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

এই আয়াতে মুসলিমদের কথা বলা হয়েছে কারণ তারাই একমাত্র পবিত্র কুরআন গ্রহণ করেছে এবং গ্রহণ করেছে। অমুসলিমরা পবিত্র কুরআন পরিত্যাগ করতে পারে না কারণ তারা প্রথমে এটি গ্রহণ করেনি বা গ্রহণ করেনি। কিয়ামতের দিন যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাদের কী হবে তা নির্ধারণ করার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই। অতএব, মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য ব্যতীত অন্য কিছুতে শ্রেষ্ঠত্ব, সাফল্য এবং উভয় জগতের শান্তি নিহিত রয়েছে এই মিথ্যা বিশ্বাস গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

ইসলাম স্পষ্ট করে যে, মহান আল্লাহ তাআলা মানুষকে একটি মাত্র মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিচার করেন: তারা কতটা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে।

এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত সঠিক উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। সূরা ৪৯, আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

মানুষের মর্যাদা বিচারের অন্যান্য সকল মানদণ্ডের কোন মূল্য নেই, যেমন লিঙ্গ, জাতিগততা এবং সামাজিক শ্রেণী, এবং মুসলমানদের অবশ্যই এগুলি উপেক্ষা করতে হবে, অন্যথায় এটি মুসলিম জাতির মধ্যে বর্ণবাদ এবং অনৈক্যের জন্ম দেয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যেহেতু একজনের উদ্দেশ্য অন্যদের থেকে গোপন থাকে, তাই তারা বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে অন্যদেরকে অন্যদের চেয়ে ভালো বলে বিচার করতে পারে না এবং তাই অন্যদের বা নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে দাবি করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ একমাত্র আল্লাহই সকল মানুষের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মকাণ্ড জানেন। আন নাজম, আয়াত ৩২:

"...তাই তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করো না; তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁকে ভয় করবে।"

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, ৩৪ আয়াত:

"... আর আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।"

এরপর মহান আল্লাহ কিছু মানুষের উদাহরণ আলোচনা করেন যারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করেছিলেন এবং কীভাবে এটি তাদেরকে উভয় জগতে সাফল্য এবং মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করেছিল। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৫:

ইমরানের স্ত্রী বললো, "হে আমার পালনকর্তা, আমার গর্ভে যা আছে তা আমি তোমার কাছে উৎসর্গ করেছি, তোমার সেবার জন্য, অতএব তুমি আমার কাছ থেকে এটি গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

মরিয়মের মা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তার ভবিষ্যৎ সন্তানকে মহান আল্লাহর সেবায় উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। এরপর এই শিশুটি পার্থিব শিক্ষা বা জীবিকা অর্জনের মতো পার্থিব ব্যস্ততা থেকে মুক্ত থাকবে এবং পরিবর্তে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা এবং সময় ধর্মীয় জ্ঞান এবং ইবাদত শেখার এবং তার উপর আমল করার জন্য উৎসর্গ করবে। ইসলাম আরও ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি শেখায় যেখানে একজনের উচিত তাদের সন্তানকে ধর্মীয় এবং পার্থিব উভয় শিক্ষা অর্জনের জন্য উৎসাহিত করা। পার্থিব শিক্ষার জন্য একটি বৈধ চাকরি অর্জন করা প্রয়োজন যা একজনের চাহিদা এবং দায়িত্ব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয়। পিতামাতাদের উচিত তাদের সন্তানকে সারা জীবন ধর্মীয় পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা, পাশাপাশি পার্থিব পড়াশোনার উপরও মনোযোগ দেওয়া। এই ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতিটি এমন চরম মানসিকতা গ্রহণের চেয়ে বেশি সুবিধা নিয়ে আসে যেখানে কেউ হয় সম্পূর্ণরূপে পার্থিব শিক্ষায় মনোনিবেশ করে অথবা সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় শিক্ষায়

মনোনিবেশ করে। উপরন্তু, একটি বৈধ চাকরি থাকা একজনকে অন্যদের থেকে আর্থিকভাবে স্বাধীন হতে সাহায্য করে, বিশেষ করে তাদের ধর্মীয় পড়াশোনার সময়। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ যারা তাদের আর্থিকভাবে সহায়তা করে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মসজিদের ইসলামী শিক্ষক, যার কোন পার্থিব কাজ নেই যার মাধ্যমে তারা তাদের চাহিদা এবং দায়িত্ব পূরণের জন্য তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে এবং পরিবর্তে কেবল মসজিদ থেকে উপার্জিত আয়ের উপর নির্ভর করে, মসজিদের সদস্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমন কিছু বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন যা ইসলামী শিক্ষক একমত নাও হতে পারেন। যেহেতু তারা তাদের আয় হারানোর ভয় পান, তাই তারা তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং শিক্ষার সাথে আপস করতে পারেন।

প্রাচীনকালে, কেবলমাত্র পুরুষরাই আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং তাঁর ধর্মের সেবায় নিবেদিত থাকত। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৬:

"অতঃপর যখন সে তাকে প্রসব করল, তখন সে বলল, "হে আমার পালনকর্তা, আমি একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি।" আর আল্লাহই ভালো জানেন যে সে কী প্রসব করেছে, আর পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মতো নয়..."

যখন মরিয়মের মা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তাকে জন্ম দেন, তখন তিনি এমন এক পুত্র সন্তানের প্রত্যাশা করেছিলেন যিনি মহান আল্লাহর সেবায় নিবেদিতপ্রাণ হবেন। কিন্তু তবুও, তিনি তার মানত পূরণ করেন এবং মরিয়ম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, কে আল্লাহ এবং তাঁর ধর্মের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ করেন।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৩৬:

"... আর পুরুষটি নারীর মতো নয়..."

এই আয়াত বা ইসলাম দাবি করে না যে পুরুষরা নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশ করার একমাত্র মানদণ্ড হল একজন ব্যক্তি কতটা মহান আল্লাহকে মেনে চলেন, এবং তাই লিঙ্গ বা অন্য কোনও কিছুর সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। এই আনুগত্যের মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে বর্ণিত সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৩৬:

"... আর পুরুষটি নারীর মতো নয়..."

উপরন্তু, এই আয়াতটি ইঙ্গিত দিতে পারে যে সমাজ এবং পরিবারের মধ্যে প্রতিটি লিঙ্গের নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মায়ের ভূমিকা পরিবারের মধ্যে বাবার ভূমিকার মতো নয়। তাই প্রতিটি ব্যক্তির উচিত তাদের শক্তি এবং প্রচেষ্টা তাদের পরিবার এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের ভূমিকা পালনের জন্য নিবেদিত করা এবং তাদের কর্তব্য এবং ভূমিকাকে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে তর্ক করার উপায় হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এটি কেবল মানুষের মধ্যে চাপ এবং উত্তেজনার দিকে পরিচালিত করে। পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই তাদের বৈধ পছন্দগুলি অনুসরণ করতে স্বাধীন, যেমন আরও শিক্ষা এবং চাকরি, কিন্তু যারা তাদের পরিবারের মধ্যে তাদের ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করে, যেমন একজন গৃহিণী, তাদের অবমূল্যায়ন এবং লজ্জিত করা উচিত নয়, কারণ পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে তাদের পরিবারের জন্য একটি স্থিতিশীল এবং শান্তিপূর্ণ ঘর তৈরি করার জন্য তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলকভাবে পুরুষদের সাথে নারীদের ক্রমাগত তুলনা করা কেবল তাদের পরিবার এবং সমাজের উপকারের জন্য একসাথে কাজ করতে বাধা দেয়। পুরুষ এবং মহিলাদের ভূমিকা একটি ক্রীড়া দলের মতো যেখানে দলের সাফল্য অর্জনের জন্য প্রতিটি সদস্যকে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে। এই সাফল্য অর্জনের জন্য প্রতিটি ব্যক্তি এবং তাদের প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যদি দলের সদস্যরা একই ভূমিকার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকে, তাহলে দলটি কার্যকরভাবে একসাথে কাজ করবে না এবং তাই তারা সাফল্য পাবে না। অতএব, প্রতিটি পুরুষ এবং মহিলার উচিত তাদের পরিবারের মধ্যে তাদের ভূমিকা চিহ্নিত করা এবং একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করার পরিবর্তে তা পালন করার চেষ্টা করা। এতে পরিবার এবং সমগ্র সমাজের উপকার হবে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৩৬:

"...আর আমি তার নাম রেখেছি মরিয়ম, এবং আমি তোমার কাছে এবং তার বংশধরদের জন্য [আল্লাহর রহমত থেকে] বিতাড়িত শয়তানের কবল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

মুসলমানদের অবশ্যই মরিয়মের মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শয়তান থেকে সঠিক উপায়ে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। সঠিক উপায় হলো সন্তানকে ইসলামী শিক্ষা শিখতে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে উৎসাহিত করা যাতে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। এই শিক্ষার মধ্যে ছোটবেলা থেকেই শিশুকে ব্যাখ্যা করা অন্তর্ভুক্ত যে, কেন আল্লাহ কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের আদেশ দেন, যেমন ফরজ নামাজ, এবং কেন তিনি কিছু বিষয় নিষেধ করেন, যেমন বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক। যখন একটি শিশু এই জ্ঞানে সজ্জিত থাকে, তখন শয়তান তাদের বিশ্বাস করাতে পারবে না যে ইসলাম তাদের সুখী হতে বাধা দেয় এবং তাই তাদের ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করা উচিত নয়। যখন একটি শিশুর এই জ্ঞান থাকে না, তখন তারা সহজেই শয়তান, সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলামের শিক্ষা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে কারণ তারা এই সত্যটি উপলব্ধি করবে না যে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে, কারণ একমাত্র মহান আল্লাহই জ্ঞান এবং দূরদর্শিতা রাখেন যাতে মানুষ এমন আচরণবিধি প্রদান করতে পারে যা এই পরিণতির দিকে পরিচালিত করে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে, সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেওয়ার সাথে সাথে তারা সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে তাদের জীবনের মধ্যে রাখবে। অতএব এই মনোভাব উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। ইসলামী শিক্ষা হল একজন ব্যক্তি এবং তার সন্তানদের শয়তানের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করার মূল চাবিকাঠি।

আল্লাহ তাআলা মরিয়মের মাতার মানত কবুল করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাকে তার চাচা, হযরত যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) এর কাছে লালন-পালন করার দায়িত্ব দিয়েছেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৭:

"অতএব তার পালনকর্তা তাকে উত্তমভাবে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তমভাবে প্রতিপালন করলেন এবং তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখলেন..."

এটি সন্তানের অভিভাবক, যেমন একজন পিতামাতা, তাদের সন্তানের জন্য একজন ভালো আদর্শ হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন পিতামাতাকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য শিখতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে, যাতে তারা তাদের সন্তানের জন্য একটি আদর্শ আদর্শ হয়ে ওঠে, যাতে তারা তাদের পালন ও অনুসরণ করতে পারে। এটা বোঝা যুক্তিসঙ্গত যে যখন একজন পিতামাতা তাদের কর্মের মাধ্যমে তাদের মৌখিক উপদেশের বিরোধিতা করেন, তখন তারা তাদের সন্তানকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে অকার্যকর হবেন। উদাহরণ দ্বারা নেতৃত্ব দেওয়া হল সমস্ত পবিত্র নবীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যগুলির মধ্যে একটি, কারণ তাদের লক্ষ্য ছিল তাদের অনুসারীদের জন্য ব্যবহারিক আদর্শ হওয়া। অতএব, পিতামাতাদের এই ঐতিহ্য অনুসারে কাজ করা উচিত কারণ তাদের সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালিত করা তাদের কর্তব্য। উদাহরণ দ্বারা নেতৃত্ব দেওয়া একজন পিতামাতাকে তাদের সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষা দিতেও সহায়তা করবে, কারণ তারা কেবল ধর্মীয় শিক্ষকদের উপর নির্ভর না করে তাদের নিজস্ব জ্ঞান, বক্তৃতা এবং কর্মের মাধ্যমে তাদের শিক্ষিত করে। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম পিতামাতা তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করার জন্য মসজিদে ধর্মীয় শিক্ষকদের উপর নির্ভর করে, যদিও তাদের সন্তানরা এই ধর্মীয় শিক্ষকদের সাথে খুব কম সময় ব্যয় করে। একটি শিশুর জন্য ধর্মীয় শিক্ষার প্রাথমিক উৎস অবশ্যই তাদের পিতামাতা। অতএব, প্রতিটি পিতামাতার অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা শিখতে হবে

এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে যাতে তারা তাদের সন্তানের জন্য একটি বাস্তব আদর্শ হয়ে ওঠে এবং পিতামাতা তাদের সন্তানকে সঠিকভাবে শিক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারে। শুধুমাত্র যখন একজন পিতামাতা তাদের সন্তানের জন্য একজন ভালো আদর্শ হিসেবে আচরণ করেন এবং তাদেরকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দেন, তখনই তাদের সন্তান যদি সঠিক নির্দেশনার পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা বেছে নেয়, তাহলে তাদের ক্ষমা করা যেতে পারে।

এরপর মহান আল্লাহ ব্যাখ্যা করেন যে, যারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে, তিনি তাদের জন্য এমনভাবে রিযিক দান করেন যা তারা কখনও আশা করতে পারে না যাতে তারা এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি পায়। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৭:

"... যখনই জাকারিয়া নামাযের ঘরে তার কাছে প্রবেশ করতেন, তখনই তিনি তার কাছে খাবার দেখতে পেতেন। তিনি বলতেন, "হে মরিয়ম, এটা কোথা থেকে তোমার কাছে আসছে?" তিনি বলতেন, "এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিনা হিসাব রিজিক দান করেন।"

হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর বিস্ময় ইঙ্গিত করে যে, মরিয়ম (আঃ)-কে অলৌকিকভাবে রিযিক দেওয়া হয়েছিল। তবুও, এই ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে, যখন কেউ আন্তরিকভাবে আল্লাহ, মহিমাম্বিত, ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তখন তিনি উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করবেন। ৬৫তম অধ্যায়: তালাক, ২য় আয়াত:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই ফলাফল মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে হয় না। এটি সর্বদা মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অনুসারে হয়। অতএব, এই ফলাফল সেই অনুযায়ী ঘটে যখন এটি মানুষের জন্য সর্বোত্তম এবং এমনভাবে যা তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, এই জেনে যে, তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য দান করা হবে, কোন না কোনভাবে, তা তাদের কাছে স্পষ্ট হোক বা না হোক। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সংকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

মরিয়ম (আঃ) কে প্রদত্ত অলৌকিক রিযিক প্রত্যক্ষ করার পর, যাকারিয়া (আঃ) একটি অলৌকিক সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যে তার কাছ থেকে নবুয়তের উত্তরাধিকারী হবে যাতে তার মিশন অব্যাহত থাকে। অধ্যায় ৩, আলী ইমরান, আয়াত ৩৭-৩৮:

“... যখনই জাকারিয়া (আঃ) তার কাছে নামাজের ঘরে প্রবেশ করতেন, তখনই তিনি তার কাছে খাবার দেখতে পেতেন। তিনি বলতেন, “হে মরিয়ম, এটা কোথা থেকে তোমার কাছে আসছে?” তিনি বললেন, “এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিনা হিসাবে রিযিক দান করেন।” তখন জাকারিয়া তার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, “হে আমার প্রভু, আমাকে তোমার কাছ থেকে একটি পুণ্যবান সন্তান দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।”

পবিত্র কুরআন থেকে স্পষ্ট যে, হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম কোন স্বাভাবিক শিশুর জন্য প্রার্থনা করছিলেন না। বরং তিনি একজন নবীর জন্য প্রার্থনা করছিলেন, যিনি তাঁর মিশন অব্যাহত রাখবেন। অতএব, তিনি কোন পার্থিব জিনিসের জন্য প্রার্থনা করেননি বরং মহান আল্লাহর কাছ থেকে ধর্মীয় আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। সূরা ১৯ মারইয়াম, আয়াত ৪-৬:

“সে বলল, “হে আমার পালনকর্তা, আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গেছে, আমার মাথা সাদা হয়ে গেছে, আর আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করে কখনও হতাশ হইনি, হে আমার পালনকর্তা। আর আমি আমার পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের ভয় করি, আর

আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। অতএব, তুমি আমাকে তোমার পক্ষ থেকে একজন উত্তরাধিকারী দান করো। যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুবের বংশধরদেরও উত্তরাধিকারী হবে। আর হে আমার পালনকর্তা, তাকে তোমার কাছে সন্তোষজনক করো।”

এই দোয়ায় উল্লিখিত উত্তরাধিকার এই ধর্মীয় লক্ষ্যকে নির্দেশ করে, পার্থিব জিনিসপত্রকে নয়, কারণ পবিত্র নবীগণ (সাঃ) সম্পদ উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি, বরং জ্ঞান রেখে যান। সুনান ইবনে মাজাহ, ২২৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

এই প্রার্থনা মুসলমানদের তাদের নিয়ত সংশোধন করতেও শেখায়। তাদের আকাউফা কেবল বস্তুগত জগতের সাথে নয়, পরকালের সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একজন বিবাহিত দম্পতির উচিত পৃথিবীতে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি সন্তানের আকাউফা করা, পার্থিব কারণে নয়। এটি কেবল তখনই অর্জন করা যায় যখন কেউ তাদের সন্তানদের ইসলামের শিক্ষা অনুসারে লালন-পালন করে। কিন্তু এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন একজন পিতামাতা ইসলামী জ্ঞান শেখেন এবং তার উপর কাজ করেন যাতে তারা তাদের সন্তানের অনুসরণ করার জন্য একটি ব্যবহারিক আদর্শ হয়ে ওঠে। উপরন্তু, একজন মুসলিম যিনি ধর্মীয় বিষয়গুলি চান তিনি কেবল আল্লাহকে খুশি করার জন্যই তা করেন। এবং যদি আল্লাহ, মহান, তাদের সেই জিনিসটি, যেমন একটি শিশুকে না দিতে চান, তাহলে তাদের ধৈর্যের সাথে তাঁর পছন্দ গ্রহণ করা উচিত, কারণ এটিই আল্লাহকে খুশি করে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৩৮-৩৯:

"তখন জাকারিয়া তার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, "হে আমার প্রভু, আমাকে তোমার পক্ষ থেকে একটি সৎ সন্তান দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।" তাই ফেরেশতারা তাকে ডেকে বললেন, যখন সে কক্ষে নামাজে দাঁড়িয়ে ছিল, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহিয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই প্রার্থনাকে আনুগত্যের একটি কার্যের সাথে, অর্থাৎ প্রার্থনার সাথে একত্রিত করা হয়েছে। একইভাবে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যে প্রতিটি প্রার্থনা আনুগত্যের সাথে সম্পর্কিত। উপরন্তু, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি প্রার্থনা এমন একজন ব্যক্তি দ্বারা করা হয়েছিল যিনি আনুগত্যের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তারা তাদের জীবন জুড়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ, মহিমাম্বিতকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এটি বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে প্রার্থনা কেবল তখনই কার্যকর হয় যখন সেগুলি আনুগত্যের কাজের সাথে একত্রিত হয়। দুঃখের বিষয়, অনেক মুসলিম অলস মনোভাব গ্রহণ করেছে যার ফলে তারা প্রার্থনা করতে পারদর্শী কিন্তু কার্যত আল্লাহ, মহিমাম্বিতকে আনুগত্য করতে চায় না। এর কারণ হল, মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য ন্যূনতম শক্তি, সময় এবং অন্য কোনও সম্পদের প্রয়োজন হয় না, যেমন সম্পদ। ইসলামের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন থেকে স্পষ্ট যে, প্রার্থনা কার্যকর হওয়ার জন্য আনুগত্যের কার্য দ্বারা সমর্থিত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ স্পষ্টভাবে দেখায় যে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে তারা কীভাবে শারীরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করেছিলেন। তারা কখনও কেবল মুক্তি বা বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করতেন না, বরং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে অস্বীকৃতি জানাতেন। জামে আত তিরমিযী, ৩৪৯৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে, দিনের মধ্যে যে দুটি বিশেষ সময় আল্লাহ তাআলার দ্বারা ইতিবাচকভাবে প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়,

উভয়ই আনুগত্যের সাথে সম্পর্কিত। প্রথম সময়টি ফরজ নামাজের পরপরই এবং দ্বিতীয়টি রাতের শেষ অংশে, যখন একজনের নফল নামাজ আদায় করা উচিত। উপরন্তু, নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, সম্পূর্ণ এবং কার্যকর হওয়ার জন্য আনুগত্যের মাধ্যমে প্রার্থনাকে সমর্থন করা আবশ্যিক। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ১০:

"... তাঁর দিকেই উত্তম কথা আরোহণ করে, আর সৎকর্ম তা উন্নীত করে..."

আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে প্রার্থনার সমর্থন থাকা উচিত, তা না বোঝা মুসলমানদের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন না হওয়ার একটি প্রধান কারণ, কারণ তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্ম পরিবর্তন করতে হবে। অধ্যায় ১৩ আর রা'দ, আয়াত ১১:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে..."

এছাড়াও, তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য তাদের কাছে থাকা সম্পদ, যেমন তাদের শক্তি, ব্যবহার করা উচিত এবং কেবল প্রার্থনার উপর নির্ভর করা এড়িয়ে চলতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে বিবাহের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাকে সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সাহায্যের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। তারা কেবল মহান আল্লাহর

কাছে প্রার্থনার উপর নির্ভর করে বাস্তবিকভাবে পদক্ষেপ নেওয়া এড়িয়ে অলস আচরণ করতে পারে না। যেমনটি ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এই নিষ্ক্রিয় এবং ভুল মনোভাব ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৩৯:

"অতঃপর যখন তিনি কক্ষে নামাযে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহিয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যিনি আল্লাহর একটি বাণীর সত্যায়নকারী..."

হযরত ইয়াহইয়া হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মিশনকে সমর্থন ও সমর্থন করেছিলেন, যাকে এই আয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বাণী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ তিনি হযরত আদম আলাইহিস সালামের মতো প্রাকৃতিক উপায়ে নয় বরং আল্লাহর আদেশে বিশ্বাসী ছিলেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৯:

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ঈসার উদাহরণ আদমের মতো। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে বলেছেন, "হও", আর সে হয়ে গেল।"

এই আয়াতে, মহান আল্লাহ, নবী ঈসা (আঃ)-এর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেন, কারণ পবিত্র কুরআনের এই সূরাটি তাঁর অলৌকিক জন্ম এবং প্রকৃতি সম্পর্কেও আলোচনা করে, যা খ্রিস্টানরা ভুল ব্যাখ্যা করেছিল।

এরপর আল্লাহ তাআলা হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর কিছু গুণাবলীর তালিকা দেন, যা সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করার চেষ্টা করা উচিত। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৯:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাকে যোহিয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যিনি আল্লাহর একটি বাণীর সত্যায়নকারী এবং [যিনি] নেতা হবেন..."

এর অর্থ হতে পারে যে তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি অন্যদেরকে মৌখিকভাবে ভালো কাজ করার পরামর্শ দেওয়ার পরিবর্তে উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, নিজে তা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ, কারণ যে ব্যক্তি কেবল মৌখিকভাবে অন্যদের উপদেশ দেয় সে মানুষকে, যেমন তাদের সন্তানদের, মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে কম কার্যকর হবে। উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব না দেওয়া একটি প্রধান কারণ যার কারণে অনেক প্রচারক তাদের শ্রোতাদের ইসলামী জীবনধারা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে অকার্যকর হন, কারণ তারা যা অনুশীলন করেন না তা প্রচার করে। অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 2-3:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য বিষয় হলো, তোমরা যা বলো না, তা বলো।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৩৯:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাকে যোহনের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যিনি আল্লাহর একটি বাণীর সত্যায়নকারী এবং [যিনি] নেতা হবেন, বিরত থাকবেন..."

নবী ইয়াহিয়া (আঃ) এমন একটি জীবনযাপন গ্রহণ করেছিলেন যা বস্তুগত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। ইসলাম মুসলমানদেরকে বস্তুগত জগৎ থেকে আধ্যাত্মিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকতে উৎসাহিত করে এবং এটি জগৎ থেকে সম্পূর্ণ শারীরিক বিচ্ছিন্নতাকে উৎসাহিত করে না, যাকে সন্ন্যাসবাদ বলা হয় এবং প্রায়শই সন্ন্যাসীরা এটি অনুশীলন করেন। অধ্যায় ৫৭ আল হাদিদ, আয়াত ২৭:

“অতঃপর আমি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের রাসূলগণকে প্রেরণ করলাম এবং মরিয়ম পুত্র ইসাকে অনুসরণ করলাম এবং তাকে ইঞ্জিল দিলাম। যারা তাঁর অনুসারী হয়েছিল তাদের অন্তরে আমরা করুণা, করুণা এবং বৈরাগ্যবাদ স্থাপন করলাম, যা তারা নতুনভাবে আবিষ্কার করেছিল; আমরা তাদের উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া এটি ফরজ করিনি। কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাই তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদের আমরা তাদের প্রতিদান দিয়েছিলাম, কিন্তু তাদের অনেকেই অবাধ্য।”

বৈরাগ্যবাদের অর্থ হলো বস্তুগত জগৎ থেকে শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, যার মাধ্যমে সকল ধরণের পার্থিব দায়িত্ব এড়িয়ে চলা, যেমন বৈধ রিজিক অর্জন করা। যেহেতু মানুষকে এই পৃথিবীতেই বেঁচে থাকতে হয়, তাই ইসলাম বৈরাগ্যবাদের নির্দেশ দেয় না। পরিবর্তে, ইসলাম একটি আধ্যাত্মিক বিচ্ছিন্নতা শেখায় যেখানে একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্যে তাদের চাহিদা এবং দায়িত্ব পূরণ করে বস্তুগত জগতের সাথে যোগাযোগ করে। এটি তখনই অর্জন করা হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার না করে। এটি নিশ্চিত করবে যে বস্তুগত জগৎ তার হাতেই থাকবে এবং তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ে থাকবে না। যে ব্যক্তি তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে সে বস্তুগত জগতের সাথে সংযুক্ত থাকে, এমনকি যদি তার কাছে কিছু পার্থিব জিনিস থাকে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে, সে বস্তুগত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, এমনকি যদি তার কাছে সমগ্র পৃথিবী থাকে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৩৯:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাকে যাহিয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যিনি আল্লাহর বাণীর সত্যায়নকারী এবং নেতা, সংযত থাকবেন এবং সৎকর্মপরায়ণদের মধ্য থেকে একজন নবী।"

নবী ইয়াহিয়া (আঃ)-এর নবুওয়ত উল্লেখ করার আগে তাঁর গুণাবলী আলোচনা করা হয়েছে, যাতে বোঝা যায় যে, মানুষ তাঁকে কার্যত অনুসরণ করতে পারে এবং অবশ্যই অনুসরণ করবে, যদিও তিনি একজন নবী, তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কেউ কেউ এই ভুল বিশ্বাস গ্রহণ করে যে, নবী (আঃ)-কে ঐশ্বরিকভাবে পরিচালিত এবং সুরক্ষিত করা হয়েছে, অর্থাৎ তাদের কার্যত অনুসরণ করা সম্ভব নয়। এটি একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস কারণ নবী (আঃ)-এর উদ্দেশ্য হলো তাদের সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবহারিক আদর্শ হওয়া। নবী (আঃ)-রা হলেন এমন মানুষ যারা অন্যান্য মানুষের মতোই আবেগ অনুভব করে, যেমন রাগ, এবং এই কারণেই তাদের সম্প্রদায়ের জন্য আদর্শ হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

তাছাড়া, অনেক মুসলিম তাদের শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য পবিত্র নবী (সাঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন দিক, যেমন তাদের উচ্চ মর্যাদা এবং অলৌকিক ঘটনা, আলোচনা করার মনোভাব গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করা এড়িয়ে গেছেন, কারণ তারা ভুলভাবে বিশ্বাস করেন যে তাদের মানবিক গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলে তাদের মর্যাদা হ্রাস পায় এবং তাদের অত্যধিক মানবিক করে তোলে। এটি আরেকটি প্রধান কারণ যে অনেক মুসলিম কার্যত পবিত্র নবী (সাঃ) কে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হন, কারণ প্রচারকদের তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা না করার অভ্যাস রয়েছে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৩৯:

"...এবং সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে একজন নবী।"

এর থেকে এটাও বোঝা যায় যে, নবুওয়াতের মূল হলো ধার্মিকতা গ্রহণ করা। ধার্মিকতা হলো যখন কেউ ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে। অতএব, ধার্মিকতা এমন একটি বিষয় যা কেবল নবুওয়াতের সাথে সম্পর্কিত নয় এবং সকল মানুষের জন্য এটি গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৩৯:

"...এবং সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে একজন নবী।"

এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে সৎকর্ম অবলম্বন করতে উৎসাহিত করে যাতে তারা পরকালে পবিত্র নবীদের সাথে মিলিত হতে পারে। ৪র্থ সূরা আন নিসা, আয়াত ৬৯:

"আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবী, সত্যবাদী, শহীদ এবং সৎকর্মশীল। আর সঙ্গী হিসেবে তারাই উত্তম।"

অতএব, এটি আরও ইঙ্গিত দেয় যে, পরকালে নবীদের সাথে মিলিত হওয়া তাদের শিক্ষা এবং আচরণ বাস্তবে অনুসরণ না করে সম্ভব নয়। এমনকি পূর্ববর্তী

জাতিগুলিও তাদের পবিত্র নবীদের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের দাবি করে, কিন্তু তারা পরকালে তাদের সাথে একত্রিত হবে না কারণ তারা কার্যত তাদের অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অতএব, মুসলমানদের এই আচরণ এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে কার্যত নবীদের অনুসরণ করতে হবে, তাদের পবিত্র বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে যাতে তারা পরকালে তাদের সাথে একত্রিত হয়।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক জন্ম সম্পর্কে আলোচনা করার আগে, মহান আল্লাহ তায়াল্লা, তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কোন জৈবিক পিতার হস্তক্ষেপ ছাড়াই, হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-এর অলৌকিক জন্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং বন্ধ্যা পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪০:

"সে বলল, "হে আমার প্রতিপালক, আমার পুত্র সন্তান কেমন করে হবে, যখন আমি বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে গেছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা?" সে(ফেরেশতা) বলল, "আল্লাহ, তিনি যা চান তাই করেন।"

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে, স্বাভাবিক উপায়ের বাইরে সন্তানের জন্মের মতো একটি অলৌকিক ঘটনা, মহান আল্লাহর ক্ষমতা এবং ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত, যা অসীম। অতএব, এই ধরনের অলৌকিক ঘটনার অর্থ এই নয় যে জড়িত ব্যক্তির ঐশ্বরিক সত্তা।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি এও ইঙ্গিত দেয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে, ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে, আল্লাহ তাআলা নিশ্চিত করবেন যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করবে, কোন না কোনভাবে, এমনকি যদি তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। অধ্যায় ৬৫ তালকের ২ নং আয়াতে:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই সাফল্য আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অনুসারে ঘটে, মানুষের ইচ্ছা এবং পরিকল্পনা অনুসারে নয়। অতএব, এটি সর্বোত্তম সময়ে এবং সর্বোত্তম উপায়ে ঘটে, এমনকি যদি এটি মানুষের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৪১:

"সে বলল, "হে আমার পালনকর্তা, আমার জন্য একটি নিদর্শন নির্ধারণ করুন।" তিনি বললেন, "তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারার মাধ্যমে কথা বলতে পারবে না। আর তোমার পালনকর্তাকে বেশি বেশি স্মরণ করো এবং সন্ধ্যায় ও সকালে পবিত্রতা বর্ণনা করো।"

এই আয়াতটি ইঙ্গিত দেয় যে যখনই কোন ভালো ঘটনা ঘটে, যেমন সন্তানের জন্ম, তখন একজন ব্যক্তির উচিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম পার্থিব জিনিসের জন্য প্রার্থনা করে এবং যখন তারা তা পায়, তখন তারা প্রায়শই আল্লাহকে ভুলে যায়, যার ফলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় ১০ ইউনুস, আয়াত ১২:

"মানুষ যখন দুঃখ-কষ্টে ভোগে, তখন সে শুয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাদের ডাকে; কিন্তু যখন আমরা তার দুঃখ-কষ্ট দূর করি, তখন সে এমনভাবে চলতে থাকে যেন সে কখনও আমাদের কাছে এমন দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য ডাকেনি যা তাকে স্পর্শ করেছে। এভাবেই সীমালঙ্ঘনকারীদের কাছে তাদের কর্মকাণ্ড সুশোভিত করা হয়।"

এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে এবং বরং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা এবং কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, যাতে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে আশীর্বাদ, প্রতিদান এবং মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে। নিয়তে কৃতজ্ঞতা বলতে কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা বোঝায়। নিজের কথায় কৃতজ্ঞতা বলতে ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা বোঝায়। এবং কারও কর্মে কৃতজ্ঞতা বলতে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে খুশি করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা বোঝায়। এইভাবে

মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই তাঁর প্রশংসা করার উপায়। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪১:

" তিনি বললেন, "হে আমার পালনকর্তা, আমার জন্য একটি নিদর্শন নির্ধারণ করুন।" তিনি বললেন, "তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারার মাধ্যমে কথা বলতে পারবে না। আর তোমার পালনকর্তাকে বেশি বেশি স্মরণ করো এবং সন্ধ্যায় ও সকালে পবিত্রতা বর্ণনা করো।"

অধিকন্তু, ধৈর্যের অর্থ হলো নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, এই বিশ্বাসে যে তিনি কেবল তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক পথে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থন এবং করুণা লাভ করবে, যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৪১:

"সে বলল, "হে আমার পালনকর্তা, আমার জন্য একটি নিদর্শন নির্ধারণ করুন।" তিনি বললেন, "তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারার মাধ্যমে কথা বলতে পারবে না। আর তোমার পালনকর্তাকে বেশি বেশি স্মরণ করো এবং সন্ধ্যায় ও সকালে পবিত্রতা বর্ণনা করো।"

নবী জাকারিয়া (আঃ) সন্দেহের কারণে কোন নিদর্শন চাননি। তিনি কেবল তার ঈমানের দৃঢ়তাকে আরও দৃঢ় করার জন্য একটি নিদর্শন চেয়েছিলেন, যা পরবর্তীতে মহান আল্লাহর প্রতি তার আনুগত্যকে আরও দৃঢ় করবে। তাই এই ক্ষেত্রে, তিনি দৃঢ় ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহকে আনুগত্য করার ক্ষমতা অর্জনের জন্য অনুরোধ করছিলেন। অতএব, দৃঢ় ঈমান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে, স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময়, আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। দৃঢ় ঈমান তখনই অর্জন করা হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সাঃ) এর হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি শিখে এবং তার উপর আমল করে, যা ব্যাখ্যা করে যে, আন্তরিকভাবে আল্লাহকে আনুগত্য করলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ হয়। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তার ঈমান দুর্বল হয়ে যাবে। এই ব্যক্তি যখনই তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে, তখন সহজেই আল্লাহকে অমান্য করবে কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে এবং পরিবর্তে আল্লাহকে আনুগত্য করলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। অতএব, ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা

উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং তাদের জীবনের প্রতিটি জিনিসকে সঠিকভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৪১:

"তিনি বললেন, "হে আমার পালনকর্তা, আমার জন্য একটি নিদর্শন নির্ধারণ করুন।" তিনি বললেন, "তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারার মাধ্যমে কথা বলতে পারবে না। আর তোমার পালনকর্তাকে বেশি বেশি স্মরণ করো এবং সন্ধ্যায় ও সকালে পবিত্রতা বর্ণনা করো।"

পবিত্র কুরআনে যখন মহান আল্লাহ তায়ালা মাহিমা বর্ণনার কথা বলা হয়েছে, তখন প্রায়শই তাঁর প্রশংসার সাথে তা যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, কেবল মাহিমা বর্ণনার কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহ তায়ালা প্রতি নেতিবাচক কিছু আরোপ করা এড়ানো। শুধুমাত্র মাহিমা বর্ণনার কথা উল্লেখ করে, এই আয়াতটি ইঙ্গিত দেয় যে অলৌকিক ঘটনাগুলিতে, যেমন অলৌকিক উপায়ে সন্তানের জন্ম, এমন কিছু বিশ্বাস করা বা দাবি করা উচিত নয় যা মহান আল্লাহর একত্বকে চ্যালেঞ্জ করে, যেমন একটি অলৌকিক শিশুকে ঐশ্বরিক দাবি করা। পরিবর্তে, এই ধরনের নেতিবাচক কিছু আরোপ করা এড়িয়ে, মহান আল্লাহ তায়ালা মাহিমা বর্ণনা করা উচিত।

আল্লাহর একত্ববাদকে চ্যালেঞ্জ করে এমন কিছু দাবি না করার গুরুত্ব নির্দেশ করার পর, আয়াতগুলি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মাতা মরিয়ম (আঃ) সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪২:

" আর [স্মরণ করো] যখন ফেরেশতারা বললো, "হে মরিয়ম, আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং তোমাকে বিশ্বজগতের নারীদের উপর মনোনীত করেছেন।"

মরিয়ম (রাঃ) এই মর্যাদা এবং প্রতিদান লাভ করেছেন মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর অবিচল ও আন্তরিক আনুগত্যের কারণে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এছাড়াও, আধ্যাত্মিক হৃদয়ের পরিশুদ্ধির মধ্যে রয়েছে ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং উদারতার মতো ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত ভালো বৈশিষ্ট্যগুলি শেখা এবং গ্রহণ করা এবং হিংসা, অহংকার এবং লোভের মতো ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি এড়িয়ে চলা। যে ব্যক্তি তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে সে তাদের কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে মেনে চলবে। সুনান ইবনে মাজাহ, ৩৯৮৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি উভয় জগতে মানসিক শান্তি, নিরাপত্তা এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। ২৬শে অধ্যায় আশ শু'আরা, আয়াত ৮৮-৮৯:

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কারো কোন উপকারে আসবে না। কেবল সেই ব্যক্তিই লাভবান হবে যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৪২:

" আর [স্মরণ করো] যখন ফেরেশতারা বললো, "হে মরিয়ম, আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং তোমাকে বিশ্বজগতের নারীদের উপর মনোনীত করেছেন।"

অধিকন্তু, এইভাবে নির্বাচিত এবং পবিত্র হওয়া মানে মরিয়ম (আঃ) এর মতো দেবত্ব প্রকাশ করা নয়, কারণ তিনি মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করেছিলেন। যদি তিনি ঐশ্বরিক হতেন, তাহলে তিনি এইভাবে আচরণ করতেন না, যেমন ঐশ্বরিক সত্তাদের পূজা করা হয়, তারা অন্য কোন সত্তার উপাসনা বা আনুগত্য করে না।
অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ৪৩:

" হে মারইয়াম, তোমার প্রতিপালকের প্রতি একনিষ্ঠভাবে আনুগত্য প্রকাশ করো এবং রুকুকারীদের সাথে সিজদা করো ও রুকু করো।"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকাকালীন সবকিছু এবং প্রত্যেককে তার জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। এটি মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে

অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, এমনকি যদি তা তার আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকে। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার উপর কাজ করেন তিনিও ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন। কারণ একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলাই অর্জন করেন। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও এত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ তাদের জীবনের প্রতিটি জিনিস এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে না, কারণ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসের আকারে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইসলামের শিক্ষাগুলি নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। কিন্তু এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৪৩:

" হে মারইয়াম, তোমার প্রতিপালকের প্রতি একনিষ্ঠভাবে আনুগত্য প্রকাশ করো এবং রুকুকারীদের সাথে সিজদা করো ও রুকু করো।"

এটি মরিয়মকে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, ঈশ্বরত্ব আরোপ করার বিষয়টিকে আরও অস্বীকার করে, কারণ তিনি আল্লাহর আনুগত্য করতেন এবং তাঁর উপাসনা করতেন, ঠিক যেমনটি আল্লাহর অন্যান্য নেক বান্দারা করতেন। এছাড়াও, এই আয়াতটি ভালো সাহচর্যের গুরুত্বকেও নির্দেশ করে কারণ একজন ব্যক্তি সর্বদা তাদের সঙ্গীদের দ্বারা প্রভাবিত হবে, তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক এবং দৃশ্যত বা সূক্ষ্মভাবে। সহীহ বুখারী, ৫৫৩৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব, যারা আল্লাহকে মান্য করে তাদের সাথে থাকা উচিত, যাতে তারাও একই কাজ করতে উৎসাহিত হয়। অন্যদিকে, যারা আল্লাহকে অমান্য করে তাদের সাথে থাকা ব্যক্তি তাদের মনোভাব এবং আচরণ গ্রহণ করবে এবং তাই তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে আল্লাহকে অমান্য করতে থাকবে। এই মনোভাব তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল স্থানে ফেলবে। অতএব, এই মনোভাব তাদের মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেবে, এমনকি যদি তারা বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে এবং পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। ৯ম অধ্যায়, তওবা, ৮২ নং আয়াতে:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি

আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ্ বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"]

তাই, একজনকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ভালো মানুষদের সাথে থাকে এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের, যেমন তাদের সন্তানদের, একই কাজ করতে উৎসাহিত করে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৪৩:

" হে মারইয়াম, তোমার প্রতিপালকের প্রতি একনিষ্ঠভাবে আনুগত্য প্রকাশ করো এবং রুকুকারীদের সাথে সিজদা করো ও রুকু করো।"

এটি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে বাস্তব আনুগত্যের মাধ্যমে সমর্থন করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। কারণ ঈমান হলো এমন একটি উদ্ভিদের মতো যাকে বৃদ্ধি পেতে হলে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, তা বৃদ্ধি পেতে ব্যর্থ হয় এবং এমনকি মারাও যেতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমানও বৃদ্ধি পাবে না এবং মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বড় স্ক্রুটি।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৪৩:

" হে মারইয়াম, তোমার প্রতিপালকের প্রতি একনিষ্ঠভাবে আনুগত্য প্রকাশ করো এবং রুকুকারীদের সাথে সিজদা করো ও রুকু করো।"

এটি ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে রয়েছে সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ শর্তাবলী এবং শিষ্টাচার, যেমন সময়মতো আদায় করা। পবিত্র কুরআনে ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা প্রায়শই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে কারণ এটি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক প্রমাণ। উপরন্তু, যেহেতু প্রতিদিনের নামাজগুলি বিস্তৃত, তাই এগুলি বিচার দিনের ধ্রুবক স্মারক এবং এর জন্য ব্যবহারিকভাবে প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে, কারণ ফরজ নামাজের প্রতিটি স্তর বিচার দিনের সাথে সংযুক্ত। যখন কেউ সঠিক অবস্থানে দাঁড়ায়, তখন বিচারের দিনে সে এভাবেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। সূরা ৮৩ আল মুতাফিফিন, আয়াত ৪-৬:

"তারা কি ভাবে না যে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে? এক মহাদিনের জন্য, যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে?"

যখন তারা রুকু করে, তখন এটি তাদের সেই অনেক লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা পৃথিবীতে তাদের জীবদ্দশায় মহান আল্লাহর কাছে রুকু না করার জন্য বিচারের দিনে সমালোচিত হবে। সূরা ৭৭ আল মুরসালাত, আয়াত ৪৮:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'নামাজে রুকু করো', তখন তারা রুকু করে না।"

এই সমালোচনার মধ্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ না করাও অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ নামাজে সিজদা করে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিচারের দিনে মানুষকে মহান আল্লাহর কাছে সিজদা করার জন্য কীভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করার জন্য সঠিকভাবে সিজদা করেনি, তারা বিচারের দিনে এটি করতে সক্ষম হবে না। সূরা ৬৮ আল-কালাম, আয়াত ৪২-৪৩:

"যেদিন পরিস্থিতি কঠিন হবে, সেদিন তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের চোখ অবনত হবে, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। আর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় সিজদা করার জন্য ডাকা হত।"

যখন কেউ নামাযে হাঁটু গেড়ে বসে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে কিয়ামতের দিন তারা কীভাবে তাদের চূড়ান্ত বিচারের ভয়ে আল্লাহর সামনে এই অবস্থানে বসে থাকবে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২৮:

"আর তুমি প্রত্যেক জাতিকে [ভয়ে] নতজানু দেখবে। প্রত্যেক জাতিকে তার আমলনামার দিকে ডাকা হবে [এবং বলা হবে], "আজ তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।"

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নামাজ পড়বে, সে তার নামাজ সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে। এর ফলে তারা নামাজের মাঝখানে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। সূরা ২৯, আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫:

"...প্রকৃতপক্ষে, নামাজ অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

এরপর আল্লাহ তাআলা মক্কার অমুসলিমদের এবং মদিনায় বসবাসকারী আহলে কিতাবদের উভয়কেই স্মরণ করিয়ে দেন যে, যেহেতু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলি অধ্যয়ন করেননি, যা তারা অস্বীকার করেনি, তাই তিনি এই আয়াতগুলিতে বর্ণিত বিস্তারিত তথ্য জানতে পারতেন না যদি না আল্লাহ তাআলা তাকে ঐশ্বরিক ওহীর মাধ্যমে না বলতেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৪:

"এটা অদৃশ্যের সংবাদ থেকে যা আমরা তোমার কাছে ওহী করি, [অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ, তাঁর উপর আশীর্বাদ ও আশীর্বাদ। আর তুমি তাদের সাথে ছিলে না যখন

তারা তাদের কলম নিষ্ক্ষেপ করছিল যে তাদের মধ্যে কে মরিয়মের দায়িত্ব নেবে। আর তুমি তাদের সাথে ছিলে না যখন তারা বিতর্ক করছিল।"

আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে পণ্ডিতরা ইসলামের সত্যতা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন কারণ তারা পবিত্র কুরআনকে চিনতে পেরেছিলেন কারণ তারা এর লেখকের সাথে পরিচিত ছিলেন। এবং তারা পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং পবিত্র কুরআনকে চিনতে পেরেছিলেন যেমনটি তাদের ঐশী গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

আহলে কিতাবরা এই সত্যে ঈর্ষান্বিত ছিল যে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ভাই হযরত ইসহাকের বংশধর না হয়ে বরং তাঁর বংশধর ছিলেন। যেহেতু তাদের পুরো ধর্ম

বংশের গুরুত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, যা তাদের মতে অন্যান্য মানবজাতির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিল, তাই তারা এমন একজন নবী (সাঃ) কে গ্রহণ এবং অনুসরণ করতে পারত না, যিনি ভিন্ন বংশ থেকে এসেছিলেন। এটি কেবল তাদের তৈরি শ্রেষ্ঠত্বের জটিলতাকে ধ্বংস করবে।

মক্কার অমুসলিমরা আরবি ভাষার উপর দক্ষ ছিল, তাই তারা জানত যে পবিত্র কুরআন কোন সৃষ্টির বাণী নয়। এবং যেহেতু তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ঘোষণার আগে চল্লিশ বছর তাঁর সাথে কাটিয়েছিল, তাই তারা জানত যে তিনি মিথ্যাবাদী নন। অধ্যায় ১০ ইউনুস, আয়াত ১৬:

"... কারণ আমি এর আগে তোমাদের মধ্যে এক জীবনকাল কাটিয়েছি। তাহলে কি তোমরা বুঝতে পারবে না?"

মক্কার অমুসলিমদের মধ্যে যারা সম্ভ্রান্ত, তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে গ্রহণ ও অনুসরণ করে বেঁচে থাকতে পারত না, যিনি একজন দরিদ্র এতিম ছিলেন, যদিও তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। তারা নেতৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পদ কামনা করত, কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নবুওয়ত ঘোষণা করার পর তারা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে।

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ৪৫-৬৪

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
فَأَنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٤٨﴾

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ
كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي
الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن
كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ
وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٥٠﴾

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ

أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾

رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾

﴿ وَمَكْرُؤًا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴿٥٤﴾

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ
الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٦﴾

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾

﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا

وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا

مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

“[স্মরণ করো] যখন ফেরেশতারা বললো, হে মরিয়ম, আল্লাহ তোমাকে তাঁর এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হবে মসীহ, মরিয়মের পুত্র ঈসা, যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।”

সে দোলনায় এবং পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”

সে বলল, “হে আমার প্রতিপালক, আমার সন্তান কেমন করে হবে যখন কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি?” [ফেরেশতা] বললেন, “আল্লাহ, তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেন, তখন কেবল বলেন, ‘হও, আর তা হয়ে যায়।’”

আর তিনি তাকে কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দেবেন।

আর তাকে বনী ইসরাঈলের কাছে একজন রসূল হিসেবে নিয়োজিত করে, [যিনি বলবেন], ‘আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করি, অতঃপর তাতে ফুঁ দেই, আল্লাহর নির্দেশে তা পাখি হয়ে যায়। আর আমি অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করি, আর আল্লাহর নির্দেশে মৃতকে জীবিত করি। আর আমি তোমাদেরকে তোমাদের খাবার এবং তোমাদের ঘরে যা জমা করে রাখি, তা

তোমাদের জানিয়ে দেই। অবশ্যই এতে তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন রয়েছে,
যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

আর [আমি এসেছি] আমার পূর্বে যা তাওরাত ছিল তার সত্যায়ন করার জন্য এবং
তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল তার কিছু হলাল করার জন্য। আর আমি
তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি,
অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার এবং তোমাদেরও পালনকর্তা, অতএব তাঁরই উপাসনা
করো। এটাই সরল পথ।

কিন্তু যখন ঈসা (আঃ) তাদের কাছ থেকে অবিশ্বাস অনুভব করলেন, তখন তিনি
বললেন, “আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী কারা?” শিষ্যরা বললেন, “আমরা
আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে
আমরা মুসলিম [তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী]।”

হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা তোমার নাযিলকৃত বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি
এবং রাসূলের [ঈসা আলাইহিস সালাম] অনুসরণ করেছি, অতএব আমাদেরকে
[সত্যের] সাক্ষীদের মধ্যে তালিকাভুক্ত করো।”

আর তারা পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু আল্লাহ পরিকল্পনা করেছিলেন। আর
আল্লাহই সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী।

[স্মরণ করো] যখন আল্লাহ বললেন, “হে ঈসা, আমি অবশ্যই তোমাকে গ্রহণ করব
এবং তোমাকে আমার দিকে তুলে নেব এবং তোমাকে যারা অবিশ্বাস করে তাদের
থেকে পবিত্র করব এবং যারা তোমার অনুসরণ করে তাদেরকে [একমাত্র আল্লাহর
কাছে আত্মসমর্পণ করে] কিয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেব। তারপর
আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, এবং আমি তোমাদের মধ্যে যে বিষয়ে
তোমরা মতবিরোধ করছিলে তার বিচার করব।”

আর যারা কুফরী করেছে, আমি তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠোর শাস্তি
দেবো এবং তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।”

কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তিনি তাদের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন,
আর আল্লাহ জালেমদের পছন্দ করেন না।

[নবী মুহাম্মদ, তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক], আমরা আপনার কাছে
[আমাদের] আয়াত এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশ [কুরআন] পাঠ করছি।

নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে ঈসার উদাহরণ আদমের মতো, তিনি তাকে মাটি
থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে বলেছেন, "হও", আর তিনি হয়ে গেলেন।

সত্য তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, অতএব সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো
না।

তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে বিতর্ক করে,
তাকে বলো, "এসো, আমরা আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের, আমাদের
নারীদের এবং তোমাদের নারীদের, আমাদের নিজেদের এবং তোমাদের
নিজেদেরকে ডেকে আনি, তারপর আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি এবং মিথ্যাবাদীদের
উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ি।"

নিঃসন্দেহে, এটিই সত্য বর্ণনা। আর আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর
নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ নিশ্চয়ই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের
সম্পর্কে অবগত।

"বলুন, "হে আহলে কিতাবগণ, এমন একটি কথার দিকে এসো যা আমাদের ও
তোমাদের মধ্যে সমান - আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না, তাঁর
সাথে কাউকে শরীক করব না এবং আল্লাহ ছাড়া একে অপরকে রব হিসেবে গ্রহণ
করব না।" কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলো, "তোমরা সাক্ষী থাকো
যে আমরা মুসলিম।"

হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর অলৌকিক জন্ম, যার মধ্যে তাঁর দুই অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং বন্ধ্যা পিতামাতা তাঁকে জন্ম দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাআলার অলৌকিক জন্ম নিয়ে আলোচনা করার পর, হযরত ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক জন্ম নিয়ে আলোচনা করেন, যিনি জৈবিক পিতা ছাড়াই সৃষ্টি এবং জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই যুক্তিসঙ্গত ক্রমটি ইঙ্গিত দেয় যে যদিও উভয় জন্মই অলৌকিক ছিল, তবুও তাদের কেউই ঐশ্বরিক সত্তা ছিল না, কারণ উভয় অলৌকিক জন্মের পিছনেই ছিল মহান আল্লাহর শক্তি। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ৪৫:

"[স্মরণ করো] যখন ফেরেশতারা বললো, "হে মরিয়ম, আল্লাহ তোমাকে তাঁর এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হবে মসীহ, মরিয়মের পুত্র ঈসা..."

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর বাণী বলা হয়েছে, কারণ তিনি আল্লাহর আদেশ ও বাক্য দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিলেন, ঠিক যেমন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে অলৌকিকভাবে সৃষ্ট করা হয়েছিল। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৯:

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ঈসার উদাহরণ আদমের মতো। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে বলেছেন, "হও", আর সে হয়ে গেল।"

তাছাড়া, যদিও একজন ব্যক্তিকে তার পিতা বলে ডাকা ঐতিহ্যবাহী, কিন্তু যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ)-এর কোন পিতা নেই, তাই তাকে সর্বদা মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-এর নামেই ডাকা হয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা নবী ঈসা (আঃ)-এর কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন, এমনকি তাঁর নবুওতের কথা উল্লেখ করার আগেও, যাতে লোকেরা তাঁর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে কার্যত তাঁর অনুসরণ করতে উৎসাহিত হয়। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৫:

"... যার নাম হবে মসীহ, মরিয়মের পুত্র ঈসা, যিনি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত এবং আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।"

তিনি এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করার মাধ্যমে বিশিষ্ট হয়েছিলেন এবং ফলস্বরূপ, পরকালে তিনি মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হবেন। এই আনুগত্যের মধ্যে ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। যত বেশি কেউ এই বিষয়ে দৃঢ় থাকবে, তত বেশি তারা উভয় জগতে মনের শান্তি এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন আরেকটি কারণ যা আন্তরিকভাবে আল্লাহকে আনুগত্য করে তার জন্য মানসিক প্রশান্তি নিয়ে আসে। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যখন তাকে ভালোবাসে এমন কেউ তাদের নিকটবর্তী হয় তখন স্বাচ্ছন্দ্য এবং আশ্বস্ত বোধ করে, যখন একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, তখন তিনি সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর সুরক্ষা এবং করুণার কারণে স্বাচ্ছন্দ্য এবং আশ্বস্ত বোধ করেন, যা তাকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে ঘিরে রাখে। অধিকন্তু, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে, সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকাকালীন তারা সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে তাদের জীবনের মধ্যে রাখবে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসবে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ

করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, এমনকি যদি তা তার আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয়। তাদের এমন একজন বিচক্ষণ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকে। এই বিচক্ষণ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, তিনিও ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন। কারণ একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলাই অর্জন করবেন। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও এত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ তাদের জীবনের প্রতিটি জিনিস এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে না, কারণ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসের আকারে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইসলামের শিক্ষাগুলি নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। কিন্তু এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

এরপর আল্লাহ তাআলা নবী ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক ঘটনা উল্লেখ করেন, যখন তিনি শিশু অবস্থায় কথা বলেছিলেন এবং পৃথিবী ধ্বংসের আগে তাঁর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৬:

"তিনি দোলনায় এবং পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবেন..."

শিশু অবস্থায় কথা বলা একটি অলৌকিক ঘটনা, কিন্তু পরিণত বয়সে কথা বলা অলৌকিক ঘটনা নয়। অতএব, একজন পরিণত প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে কথা বলার উল্লেখ সম্ভবত সেই সময়ের ইঙ্গিত দেয় যখন তিনি মুসলিমদের নেতৃত্ব দেওয়ার এবং খ্রীষ্ট-বিদ্বেষীকে হত্যা করার জন্য সময় শেষ হওয়ার আগে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। অনেক হাদিসে তাঁর প্রত্যাবর্তনের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সহীহ মুসলিমের ৭৩ নম্বর ৮১ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। যেহেতু নবী ঈসা (আঃ) পৃথিবী থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন যখন তাঁর শত্রুরা তাঁকে হত্যা এবং ক্রুশবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল, তাই তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতিনিধি হিসেবে সময়ের শেষের আগে ফিরে আসবেন। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৫৫:

"[স্মরণ করো] যখন আল্লাহ বললেন, "হে ঈসা, আমি অবশ্যই তোমাকে গ্রহণ করব এবং আমার দিকে উঠিয়ে নেব..."

আল্লাহ, মহিমান্বিত, তারপর উল্লেখ করেন যে, নবী ঈসা (আঃ) তাঁর জীবনকাল ধরে ন্যায়পরায়ণতাকে আঁকড়ে ধরবেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৬:

"সে দোলনায় এবং পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সংকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

ন্যায়পরায়ণতা কেবল নবুওয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এবং সকলেরই তা গ্রহণ করা উচিত। ন্যায়পরায়ণতার অর্থ হলো ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে

ব্যবহার করা যাতে করে মানুষ আল্লাহ, মহিমাম্বিত ব্যক্তি এবং মানুষের অধিকার পূরণ করতে পারে। এর ফলে উভয় জাহানে মানসিক শান্তি আসে।

আল্লাহ, মহিমাম্বিত, এরপর জোর দিয়ে বলেন যে, নবী ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক জন্ম তাঁর সৃষ্টির ক্ষমতার কারণে হয়েছিল, যার ফলে তিনি মরিয়ম অথবা নবী ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করেছেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৭:

"সে বলল, "হে আমার প্রতিপালক, আমার সন্তান কেমন করে হবে যখন কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি?" [ফেরেশতা] বললেন, "আল্লাহ এমনই; তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেন, তখন কেবল বলেন, 'হু', আর তা হয়ে যায়।"

মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন, ঠিক যেমন তিনি অন্যান্য সকল মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, এটা আশ্চর্যজনক যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ মহান আল্লাহ তাআলা অন্য কোন সৃষ্টিকে এভাবে দেবত্বের সাথে যুক্ত করা হয়নি।

মহান আল্লাহ, নবী ঈসা আলাইহিস সালামকে আইন ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিয়েছিলেন যাতে তিনি তাঁর রাসূল ও নবী হিসেবে তাঁর লক্ষ্য পূর্ণ করতে পারেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৮:

"এবং তিনি তাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দেবেন।"

বইটি আইনের কথা বলতে পারে, যা এমন একটি আচরণবিধি যা মানুষকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে যাতে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মানসিক শান্তি অর্জন করবে এবং আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে। অতএব, এই আইন সমাজের মধ্যে শান্তি ও ন্যায়বিচারের বিস্তার নিশ্চিত করবে। জ্ঞানের প্রয়োজন কারণ এটি মানুষকে তাদের জ্ঞান, যেমন আইন, সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে শেখায়, যাতে এটি তাদের এবং উভয় জগতের অন্যান্য মানুষের উপকার করে। একটি ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য আইন এবং প্রজ্ঞা উভয়েরই প্রয়োজন। প্রজ্ঞা ছাড়া আইনের সহজেই ভুল ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কারণ মানুষ অন্যদের ভুল করার জন্য আইনের মধ্যে ফাঁক খুঁজে পেতে পারে। আইন ছাড়া জ্ঞান মানুষকে এমন একটি আচরণবিধি গ্রহণ করতে বাধ্য করবে যা সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত তার সংজ্ঞা অনুসারে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত পক্ষপাতের কারণে, সমস্ত মানবসৃষ্ট আচরণবিধি কখনই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে না। অতএব, আইন ছাড়া জ্ঞান মনের শান্তি অর্জনে বাধা সৃষ্টি করবে এবং সমাজের মধ্যে শান্তি ও ন্যায়বিচারের প্রসারকেও বাধাগ্রস্ত করবে, কারণ মানুষ অন্য মানুষের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হবে।

বনী ইসরাঈলরা চরম মানসিকতা গ্রহণ করেছিল, যার ফলে তারা তাওরাতের আইনের উপর অতিরিক্ত জোর দিত কিন্তু এর মধ্যে থাকা জ্ঞানকে উপেক্ষা করত। এর ফলে তাদের পণ্ডিতরা সম্পদ এবং নেতৃত্বের মতো পার্থিব লাভের জন্য তাওরাতের শিক্ষার অপব্যবহার করত। নবী ঈসা আলাইহিস সালামকে তাদের কাছে

সুসমাচার দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, যা জ্ঞান শিক্ষা দিত যাতে তারা আইন এবং জ্ঞানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে এবং সমাজের মধ্যে শান্তি ও ন্যায়বিচারের বিস্তার নিশ্চিত করতে পারে। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ৪৮-৪৯:

"এবং তিনি তাকে লেখা, প্রজ্ঞা, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দেবেন। এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল বানাবেন..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, নবীগণের (সাঃ) উদ্দেশ্য হলো তাদের সম্প্রদায়ের জন্য একটি বাস্তব আদর্শ হিসেবে কাজ করা। অতএব, নবীগণের (সাঃ) প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার দাবি, বাস্তবে তাদের অনুসরণ না করে, উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করবে না। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন ও শিক্ষা বাস্তবে শিখতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে এবং পূর্ববর্তী জাতিগুলির মনোভাব গ্রহণ করা এড়িয়ে চলতে হবে যারা তাদের নবীগণকে বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং সম্মান করার দাবি করে, কিন্তু বাস্তবে তাদের অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্ববর্তী জাতিগুলি তাদের নবীগণের (সাঃ) সাথে ঐক্যবদ্ধ হবে না, যেমন তারা কার্যত তাদের অনুসরণ করেনি, তেমনি যে মুসলিমগণ কার্যত নবীগণের (সাঃ) অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারাও ঐক্যবদ্ধ হবে না। ৪র্থ সূরা আন-নিসা, আয়াত ৬৯:

"আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবী, সত্যবাদী, শহীদ এবং সৎকর্মশীল। আর সঙ্গী হিসেবে তারাই উত্তম।"

এরপর মহান আল্লাহ নবী ঈসা আলাইহিস সালামের নবুওতের দাবির সমর্থনে তাঁকে প্রদত্ত কিছু অলৌকিক ঘটনা উল্লেখ করেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৯:

"... আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করি, তারপর তাতে ফুঁ দেই, আল্লাহর নির্দেশে তা পাখিতে পরিণত হয়। আর আমি অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করি, আর মৃতকে জীবিত করি - আল্লাহর নির্দেশে। আর আমি তোমাদেরকে তোমাদের খাবার এবং তোমাদের ঘরে যা জমা করে রাখি, তা জানিয়ে দেই। অবশ্যই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।"

প্রতিটি ক্ষেত্রেই, নবী ঈসা (আঃ) স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, এগুলো ছিল মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অলৌকিক ঘটনা। যদি তিনি ঐশ্বরিক হতেন, তাহলে তিনি মহান আল্লাহর সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনভাবে এই অলৌকিক ঘটনাগুলি সম্পাদন করতেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলিমদের জন্য পবিত্র নবীদের (সাঃ) অলৌকিক ঘটনাগুলি উপলব্ধি করা এবং এর পেছনের শিক্ষাগুলি শেখার চেষ্টা করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে সাহায্য করবে। এমন অলৌকিক ঘটনাগুলিকে বিনোদনমূলক গল্পে পরিণত করা উচিত নয় যেখানে দর্শকরা এই অলৌকিক ঘটনাগুলি দেখে অবাক হয় কিন্তু এর পিছনে কোন শিক্ষা

গ্রহণ করে না, অথবা অন্য কোন দরকারী ইসলামী জ্ঞান যেমন পবিত্র নবীদের (সাঃ) সৎ গুণাবলী শোনে না এবং চিন্তা করে না, যা সকল মুসলমানকে গ্রহণ করতে হবে।

এছাড়াও, যদিও এই আয়াতে একাধিক অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও এগুলোকে একটি মাত্র নিদর্শন বলা হয়েছে। এর অর্থ হতে পারে যে এগুলোকে সম্পূর্ণরূপে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। এইভাবে করা হলে, এই অলৌকিক ঘটনাগুলো বিচার দিবসের প্রমাণ। প্রথম অলৌকিক ঘটনা, মাটি থেকে জীবন্ত পাখি তৈরি, মানবজাতির সৃষ্টিকে প্রতিনিধিত্ব করে। পরবর্তী অলৌকিক ঘটনা, অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করা, এই পৃথিবীতে সকলের অভিজ্ঞতার অসুস্থতা এবং বার্ষিক্যকে প্রতিনিধিত্ব করে। পরবর্তী অলৌকিক ঘটনা, মৃতদের জীবন দান, বিচারের দিনে পুনরুত্থানের প্রতিনিধিত্ব করে। শেষ অলৌকিক ঘটনা, মানুষকে তাদের গোপন কর্ম সম্পর্কে অবহিত করে, বিচারের দিনে ব্যক্তির কর্মের জবাবদিহিতাকে প্রতিনিধিত্ব করে। ৪৯ নং আয়াতের শেষে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, একজন প্রকৃত মুমিন বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যখন তারা কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নেয়। ৩ নং অধ্যায় আলে ইমরান, ৪৯ নং আয়াত:

"... যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে এতে অবশ্যই তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন রয়েছে।"

বিচার দিবসের জন্য বাস্তবিক প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা। অতএব, মুসলমানদের বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস গ্রহণ করতে হবে যাতে তারা কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। যারা তা করতে ব্যর্থ হয়, তারা অন্তরে বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার উপর বিশ্বাস রাখতে পারে, কিন্তু তারা কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নিতে

ব্যর্থ হবে। এই কারণেই প্রায়শই এমন মুসলমানদের দেখা যায় যারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকে, যদিও দাবি করে যে তারা বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার উপর বিশ্বাস রাখে।

এছাড়াও, বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা সম্পর্কে সঠিক বিশ্বাস গ্রহণ করতে হবে। এমন ইচ্ছাপূরণমূলক চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলতে হবে যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে, অথচ ধরে নেয় যে, বিচার দিবসে তারা যেকোনোভাবে সফল হবে। মহান আল্লাহ কখনই ভালো কাজ করা ব্যক্তিকে মন্দ কাজ করার সাথে সমানভাবে ব্যবহার করবেন না, তাদের ঈমান যাই হোক না কেন। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২১:

"যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমি তাদেরকে তাদের মতো করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান করে দেব? তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না মন্দ।"

অতএব, আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করা উচিত যাতে তারা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হয় এবং তারপর আশা করে যে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করবে। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আশার মধ্যে পার্থক্য এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়াও, ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একজনকে আল্লাহর অবাধ্যতা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে, যার ফলে এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে একজন ব্যক্তি তার ঈমান হারাতে পারে। কারণ ঈমান একটি গাছের মতো যাকে বৃদ্ধি পেতে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন

একটি উদ্ভিদ যা সূর্যালোকের মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, তা বৃদ্ধি পেতে ব্যর্থ হয় এবং এমনকি মারাও যেতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে না এবং মৃত্যুর গুরুতর ঝুঁকিতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, বিচারের দিনে মানুষের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা অস্বীকার করা একটি অদ্ভুত দাবি, যখন দিন, মাস এবং বছর জুড়ে পুনরুত্থানের অনেক উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে একটি মৃত অনুর্বর ভূমিকে জীবন দান করেন এবং সৃষ্টির জন্য একটি মৃত বীজকে জীবন্ত করে তোলেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ, মানুষ নামক মৃত বীজকে, যাকে মাটিতে সমাহিত করা হয়, জীবন দান করতে পারেন এবং করবেন, যেমন মৃত বীজ থেকে জীবিত হয়ে ওঠে। ঋতু পরিবর্তন স্পষ্টভাবে পুনরুত্থানকে দেখায়। উদাহরণস্বরূপ, শীতকালে, গাছের পাতা মারা যায় এবং ঝরে পড়ে এবং গাছটি প্রাণহীন দেখায়। কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে, পাতাগুলি আবার গজায় এবং গাছটি প্রাণে পূর্ণ দেখায়। সমস্ত প্রাণীর ঘুম জাগ্রত চক্র পুনরুত্থানের আরেকটি উদাহরণ। ঘুম মৃত্যুর বোন, কারণ ঘুমন্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলি কেটে ফেলা হয়। মহান আল্লাহ, তারপর একজন ব্যক্তির আত্মা তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন যদি তারা বেঁচে থাকার জন্য নির্ধারিত হয় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিকে আবার জীবন দান করে। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ মানুষের আত্মা তাদের মৃত্যুর সময় কবজ করেন এবং যারা মারা যায় না তাদের নিদ্রাকালে কবজ করেন। অতঃপর যাদের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদের তিনি ধরে রাখেন এবং অন্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

তাছাড়া, বিচার দিবস এমন একটি বিষয় যা অবশ্যই ঘটবে। কেউ যদি মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করে, তাহলে সে ভারসাম্যের অনেক উদাহরণ দেখতে পাবে। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী সূর্য থেকে নিখুঁত এবং সুষম দূরত্বে অবস্থিত। পৃথিবী যদি সূর্যের একটু কাছে বা আরও দূরে থাকত, তাহলে এটি বসবাসের অযোগ্য হত। একইভাবে, জলচক্র, যার মধ্যে সমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে জলের বাষ্পীভবন জড়িত যা পরে বৃষ্টিপাতের জন্য ঘনীভূত হয়, পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ যাতে সৃষ্টি পৃথিবীতে বসবাস চালিয়ে যেতে পারে। ভূমিকে একটি সুষম উপায়ে তৈরি করা হয়েছিল যাতে দুর্বল শাখা এবং বীজের অঙ্কুরগুলি সৃষ্টির জন্য ফসল সরবরাহ করার জন্য এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু একই ভূমি তার উপরে নির্মিত ভারী ভবন সহ্য করার জন্য যথেষ্ট শক্ত। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যা কেবল একজন স্রষ্টাকেই স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে না, ভারসাম্যকেও নির্দেশ করে। কিন্তু এই পৃথিবীতে একটি প্রধান জিনিস রয়েছে যা স্পষ্টতই ভারসাম্যহীন, তা হল মানবজাতির কর্মকাণ্ড। প্রায়শই অত্যাচারী এবং অত্যাচারী মানুষদের দেখা যায় যারা এই পৃথিবীতে শাস্তি থেকে বেঁচে যায়। বিপরীতে, এমন অসংখ্য মানুষ আছে যারা অন্যদের দ্বারা নিপীড়িত হয় এবং অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন হয় কিন্তু তাদের ধৈর্যের পূর্ণ প্রতিদান পায় না। অনেক মুসলিম যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে, তারা প্রায়শই এই পৃথিবীতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং পুরস্কারের সামান্য অংশ পায়, অন্যদিকে যারা প্রকাশ্যে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়, তারা এই পৃথিবীর বিলাসিতা উপভোগ করে এবং কেবল কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। ঠিক যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতে একটি ভারসাম্য স্থাপন করেছেন, তেমনি কর্মের পুরস্কার এবং শাস্তিরও ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কিন্তু এটি স্পষ্টতই এই পৃথিবীতে ঘটে না, তাই এটি অন্য সময়ে, অর্থাৎ প্রতিদানের দিনে অর্থাৎ বিচারের দিনে ঘটতে হবে।

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতেই পূর্ণ পুরস্কার এবং শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে পূর্ণ শাস্তি না দেওয়ার পেছনের একটি প্রজ্ঞা হল, মহান আল্লাহ তাদেরকে সুযোগের পর সুযোগ দিয়ে থাকেন যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তাদের আচরণ সংশোধন করে। তিনি এই পৃথিবীতে মুসলিমদের পূর্ণ পুরস্কার দেন

না কারণ এই পৃথিবী জান্নাত নয়। উপরন্তু, অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস করা, অর্থাৎ পরকালে একজন মুসলিমের জন্য অপেক্ষা করা পূর্ণ পুরস্কার, ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্যের উপর বিশ্বাসই ঈমানকে বিশেষ করে তোলে। এমন কিছুতে বিশ্বাস করা যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়, যেমন এই পৃথিবীতে পূর্ণ পুরস্কার পাওয়া, এত বিশেষ হবে না।

পূর্ণ শাস্তির ভয় এবং পরকালে পূর্ণ প্রতিদান পাওয়ার আশা একজনকে পাপ থেকে বিরত থাকতে এবং সৎকর্ম করতে উৎসাহিত করবে।

এই বস্তুগত জগতের প্রতিফল দিবস শুরু হতে হলে অবশ্যই শেষ হতে হবে। কারণ শাস্তি এবং পুরস্কার কেবল তখনই দেওয়া যেতে পারে যখন প্রত্যেকের কর্ম শেষ হয়ে যায়। অতএব, মানুষের কর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিফল দিবস সংঘটিত হতে পারে না। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, বস্তুগত জগতের অবশ্যই শেষ হতে হবে, শীঘ্র হোক বা কাল।

যখন কেউ এই আলোচনার উপর চিন্তা করে, তখন এটি বিচার দিবসের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে এর জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করবে, যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২২:

"কারণ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে একটি উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রতিটি প্রাণী তার কৃতকর্মের প্রতিফল পায়। এবং কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।"

নবী ঈসা (আঃ) কে বনী ইসরাঈলের কাছে পাঠানো হয়েছিল, যাতে তারা তাওরাতের শিক্ষা সংশোধন করতে পারে, যা তাদের কিছু পণ্ডিত ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদনা এবং ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫০:

"এবং [আমি এসেছি] আমার পূর্বে যা তাওরাত ছিল তার সত্যায়নকারী এবং তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল তার কিছু হলাল করার জন্য..."

তাই মুসলমানদের উচিত সম্পদ এবং নেতৃত্বের মতো পার্থিব লাভের জন্য পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সাঃ)-এর হাদীসের ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা করে আহলে কিতাবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলা। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, এইভাবে আচরণ করে একজন ব্যক্তি যা কিছু অর্জন করে তা উভয় জগতেই তাদের জন্য কেবল চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। এটি তাদের মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেবে, এমনকি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও, কারণ তারা মহান আল্লাহর ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৫৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে জাহান্নামের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। পূর্ববর্তী জাতিগুলি যেমন এইভাবে আচরণ করে শান্তি থেকে বাঁচতে পারেনি, তেমনি যারা তা করে তারাও শান্তি থেকে বাঁচতে পারবে না।

এছাড়াও, এই আয়াতটি ধর্মের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবনের বিষয়েও সতর্কীকরণ হতে পারে, ঠিক যেমনটি বনী ইসরাঈল করেছিল। উদ্ভাবন গুরুতর পরিবর্তন আনতে পারে যার ফলে যা বৈধ তা পরে অবৈধ বলে গণ্য করা হয় অথবা যা অবৈধ তা পরে বৈধ বলে গণ্য করা হয়। যখন কেউ নির্দেশনার দুটি উৎস: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য শিখে এবং তার উপর আমল করা থেকে বিরত থাকে তখন উদ্ভাবন এড়ানো যায়। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি আমল করা হয়, এমনকি যদি তা সংকর্মের দিকে পরিচালিত করে, তবুও তারা নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর আমল করা তত কম করবে, যার ফলে পথভ্রষ্টতা সৃষ্টি হবে। এই কারণেই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনও বিষয় যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মূলে নেই তা আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করবেন। উপরন্তু, যে ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর আমল করবে তত বেশি তারা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতাকারী বিষয়গুলিতে আমল করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, একজন অসুবিধার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পড়ে যাবে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন করতে শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষার সাথে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফরি, যেমন কালো জাদু অনুশীলন করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

অধ্যায় ৩: আলে ইমরান, আয়াত ৫০:

"এবং [আমি এসেছি] আমার পূর্বে যা তাওরাত ছিল তার সত্যায়নকারী এবং তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল তার কিছু হালাল করার জন্য..."

অধিকন্তু, নবী ঈসা (আঃ) কে এমন কিছু জিনিস হালাল করার জন্য পাঠানো হয়েছিল যা আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলের উপর তাদের অবিরাম অবাধ্যতার কারণে নিষিদ্ধ করেছিলেন। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৪৬:

"আর যারা ইহুদী তাদের জন্য আমি প্রতিটি খুরবিহীন পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম; আর গরু ও ভেড়ার চর্বি তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম, কিন্তু যা তাদের পিঠে, অন্ধ্রে অথবা হাড়ের সাথে লেগে থাকে তা ছাড়া। [এর দ্বারা] আমরা তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য তাদেরকে এই প্রতিফল দিয়েছিলাম। আর অবশ্যই আমরা সত্যবাদী।"

মহান আল্লাহ হযরত ঈসা (আঃ)-কে প্রেরণ করে বনী ইসরাঈলের জন্য কাজ সহজ করে দিয়েছিলেন যাতে তারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫০:

"আর আমি এসেছি আমার পূর্বে যা তাওরাত ছিল তার সত্যায়ন করার জন্য এবং তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল তার কিছু হালাল করার জন্য। আর আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি, অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, নিয়তে কৃতজ্ঞতা বলতে কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করা বোঝায়। কথায় কৃতজ্ঞতা বলতে ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা বোঝায়। আর কাজের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা বলতে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করা বোঝায় যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। উপরন্তু, এই আয়াতটি নির্দেশ করে যে একটি জাতির তাদের পবিত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আন্তরিকভাবে আনুগত্য করা গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিমদের অবশ্যই বনী ইসরাঈলের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে যারা তাদের পবিত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অমান্য করেছিল এবং কার্যত তাঁকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কার্যত তাদের পবিত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে, তারা পরকালে তাদের সাথে একত্রিত হবে না। একইভাবে, যদি মুসলমানরা কার্যত মহান নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও শিক্ষা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা পরকালে তাঁর সাথে একত্রিত হবে না, যদিও তারা মৌখিকভাবে তাঁকে ভালোবাসা এবং সম্মান করার দাবি করে।

আল্লাহ, মহিমান্বিত, তারপর স্পষ্ট করে বলেন যে, নবী ঈসা (আঃ) মানুষকে কেবলমাত্র তাঁর মতোই মহান আল্লাহর উপাসনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যার ফলে তিনি নিজের প্রতি দেবত্ব আরোপ করা থেকে বিরত থাকতেন, কারণ একজন প্রকৃত উপাস্য অন্য কারো উপাসনা করেন না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫১:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ আমার এবং তোমাদেরও পালনকর্তা, অতএব তাঁরই উপাসনা করো। এটাই সরল পথ।"

সরল পথ হলো সকল পরিস্থিতিতেই তার স্রষ্টা ও প্রতিপালক, মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করা। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৫৫:

" আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই..."

বাস্তবে, কেউ যার আনুগত্য করে এবং তার জীবনকে মডেল করে, সে তারই উপাসনা করে, এমনকি যদি সে দাবি করে যে সে কোনও দেবতাকে বিশ্বাস করে না। মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যেখানে তাকে অবশ্যই কিছু না কিছু মানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। তা সে অন্য মানুষ হোক, সোশ্যাল মিডিয়া হোক, ফ্যাশন হোক, সংস্কৃতি হোক বা এমনকি তাদের নিজস্ব ইচ্ছা হোক। ২৫তম অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

একজন ব্যক্তি যা-ই হোক বা যা-ই হোক, তারই উপাসনা করে। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে কাজে সমর্থন করতে হবে, অন্য সকল পরিস্থিতির উপর আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলার মাধ্যমে। এর মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে তাকে পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য দান করা হবে। ২য় সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৬৩:

"আর তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, যিনি পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।"

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সংকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর একত্ববাদকে প্রত্যাখ্যান করে এবং পরিবর্তে অন্য জিনিসের আনুগত্য ও উপাসনা করে, সে উভয় জগতের শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় রহমত থেকে বঞ্চিত হবে, এমনকি যদি তারা সমগ্র পৃথিবী অধিকার করে এবং আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে, কারণ কেউই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ এবং কর্তৃত্ব থেকে বাঁচতে পারে না। সূরা তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিসহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৫৫:

" আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ..."

যখন কেউ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং অসংখ্য নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মহাবিশ্ব সৃষ্টিকারী এবং টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব একমাত্র একজনই পালন করেন। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী থেকে সূর্যের নিখুঁত দূরত্ব একটি স্পষ্ট লক্ষণ, কারণ সূর্য যদি পৃথিবী থেকে সামান্য কাছে বা আরও দূরে থাকত তবে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হত। একইভাবে, পৃথিবীকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যা একটি সুষম এবং বিশুদ্ধ বায়ুমণ্ডল তৈরি করে যা এতে জীবনকে বিকাশের সুযোগ দেয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন..."

দিন ও রাতের নিখুঁত সময় এবং সারা বছর ধরে তাদের বিভিন্ন দৈর্ঘ্য মানুষকে তাদের থেকে সর্বাধিক সুবিধা পেতে সাহায্য করে। যদি দিনগুলি দীর্ঘ হত, তাহলে মানুষ দীর্ঘ ঘন্টার জন্য ক্লান্ত হয়ে পড়ত। যদি রাতগুলি দীর্ঘ হত, তাহলে মানুষের জীবিকা নির্বাহ এবং জ্ঞানের মতো অন্যান্য দরকারী জিনিসপত্র অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকত না। যদি রাতগুলি ছোট হত, তাহলে মানুষ সর্বোত্তম স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে পারত না। দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ফসলের উপরও প্রভাব ফেলত, যা মানুষ এবং প্রাণীর জীবিকার উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলত। মহাবিশ্বের মধ্যে দিন ও রাত এবং অন্যান্য ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা নিখুঁত সামঞ্জস্যের সাথে কাজ করে তাও স্পষ্টভাবে আল্লাহর একত্বকে নির্দেশ করে, কারণ একাধিক ঈশ্বর বিভিন্ন জিনিস কামনা করবেন, যা মহাবিশ্বের মধ্যে বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 21 আল আশ্বিয়া, আয়াত 22:

"যদি তাদের মধ্যে [অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের] আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত..."

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... এবং [বড়] জাহাজ যা সমুদ্রে চলাচল করে যা মানুষের উপকার করে এবং যা আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন..."

যখন কেউ পুরোপুরি সুষম জলচক্র পর্যবেক্ষণ করে, তখন এটি স্পষ্টভাবে একজন স্রষ্টার ইঙ্গিত দেয়। সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয়, উপরে উঠে ঘনীভূত হয়ে পাহাড়ের উপর নেমে আসে অম্লীয় বৃষ্টিপাতের জন্য। এই পর্বতগুলি অম্লীয় বৃষ্টিপাতকে নিষ্ক্রিয় করে যাতে মানুষ এবং প্রাণীরা তা ব্যবহার করতে পারে। যদি এই নিখুঁত সুষম ব্যবস্থায় কোনও পরিবর্তন আনা হয়, তাহলে তা পৃথিবীর মানুষ এবং প্রাণীদের জন্য বিপর্যয়ের কারণ হবে। সমুদ্রের লবণ সমুদ্রের মৃত প্রাণীদের এটি দূষিত হতে বাধা দেয়। যদি সমুদ্রকে দূষিত হতে দেওয়া হয়, তাহলে সমুদ্রের জীবন সম্ভব হবে না এবং সমুদ্রের অপবিত্রতা স্থলভাগের জীবনকেও আচ্ছন্ন করে ফেলবে। সমুদ্র এবং সমুদ্রের মধ্যে জল এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে সমুদ্রের জীবন এর মধ্যে বিকাশ লাভ করতে পারে এবং ভারী জাহাজগুলি এর উপরে চলাচল করতে পারে। যদি জলের গঠন কিছুটা ভিন্ন হত, তাহলে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিত যার ফলে হয় সমুদ্রের জীবন জলের মধ্যে বিকাশ লাভ করত অথবা জাহাজগুলিকে এর উপরে চলাচল করতে দিত, তবে উভয়ই একই সাথে সম্ভব হত না। এমনকি আজও, সমুদ্রপথে পরিবহন এখনও বিশ্বজুড়ে পণ্য পরিবহনের সবচেয়ে সাধারণ উপায়। তাই পৃথিবীতে জীবনের জন্য এই নিখুঁত ভারসাম্য অপরিহার্য।

বিবর্তন হলো এক ধরনের মিউটেশন, যা স্বভাবতই অসম্পূর্ণ। কিন্তু যখন কেউ অসংখ্য প্রজাতি পর্যবেক্ষণ করে, তখন তারা দেখতে পাবে যে তাদের সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তারা যে পরিবেশে বাস করে সেখানেই তারা বেঁচে থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উটকে উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করার এবং জল পান না করে দীর্ঘ সময় ধরে বেঁচে থাকার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। তারা মরুভূমির জীবনের জন্য নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছে। অধ্যায় ৮৮ আল গাশিয়াহ, আয়াত ১৭:

"তাহলে কি তারা উটের দিকে তাকায় না - কিভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে?"

ছাগলটিকে এমন নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে তার শরীরের ভেতরের দূষিত পদার্থগুলি তার উৎপাদিত দুধ থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়। দুটির মিশ্রণ দুধকে পান করার অযোগ্য করে তুলবে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৬৬:

"আর অবশ্যই, তোমাদের জন্য পশুপালনের ক্ষেত্রে একটি শিক্ষা রয়েছে। আমরা তোমাদেরকে তাদের পেটের মধ্যে যা আছে তা থেকে - মলমূত্র ও রক্তের মধ্যে - বিশুদ্ধ দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।"

প্রতিটি প্রজাতির একটি নির্দিষ্ট জীবনকাল দেওয়া হয়েছে যা একটি প্রজাতিকে অন্য প্রজাতিকে পরাজিত করতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, মাছদের জীবনকাল খুবই কম, ৩-৪ সপ্তাহ, এবং তারা ৫০০টি ডিম পাড়ে। যদি তাদের জীবনকাল দীর্ঘ হত, তাহলে মাছদের সংখ্যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যেত এবং তারা এই পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত প্রজাতিকে ছাপিয়ে যেত। অন্যদিকে, অন্যান্য প্রাণী যাদের জীবনকাল খুব দীর্ঘ তাদের মাত্র কয়েকটি সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে। আবার এটি তাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ করে দেয়। এই সবকিছুই দুর্ঘটনা হতে পারে না এবং বিবর্তনের প্রক্রিয়াও এর ব্যাখ্যা দিতে পারে না। ২য় সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... এবং [তাঁরা] আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বাতাস এবং মেঘের পরিচালনা..."

বায়ু পরাগায়নের জন্য বাতাস অপরিহার্য, যা ফসল, গাছপালা এবং গাছের বংশবৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়। প্রাচীনকালে, সমুদ্র ভ্রমণের জন্য বাতাস অপরিহার্য ছিল, যা আজও বিশ্বজুড়ে পণ্য পরিবহনের প্রধান মাধ্যম। সৃষ্টির জন্য জল সরবরাহ করার জন্য বৃষ্টির মেঘগুলিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরিত করার জন্য বাতাসের প্রয়োজন হয়, যা ছাড়া তারা বাঁচতে পারে না। পৃথিবীর মধ্যে বাতাসের একটি নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়, কারণ বাতাসের অভাব সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং বাতাসের বৃদ্ধিও সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। একইভাবে, বৃষ্টিও পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ, কারণ খুব কম বৃষ্টিপাত খরা এবং দুর্ভিক্ষের দিকে পরিচালিত করে এবং খুব বেশি বৃষ্টিপাত ব্যাপক বন্যার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 23 আল মু'মিনুন, আয়াত 18:

"আর আমরা আকাশ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং তা পৃথিবীতে স্থাপন করেছি। এবং অবশ্যই, আমরা তা প্রত্যাহার করতে সক্ষম।"

এই নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা এলোমেলো হতে পারে না এবং স্পষ্টভাবে স্রষ্টার হাত দেখায়। যে ব্যক্তি এই সমস্ত নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার উপর চিন্তা করে সে যুক্তিসঙ্গতভাবে এমন একক স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে না যিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৫৫:

" আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ..."

বাস্তবে, যে ব্যক্তি মৃত্যু অনুভব করতে পারে এবং অন্য কিছু বা কারো দ্বারা প্রতিপালিত হয়, সে উপাস্য হতে পারে না। এই বাস্তবতাই স্বর্গ ও পৃথিবীর সকল সত্তার জন্য দেবত্বকে বাতিল করে দেয়, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। উপরন্তু, যেহেতু একমাত্র মহান আল্লাহ জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকে প্রতিপালন করেন, তাই তিনিই আনুগত্যের যোগ্য। যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জীবিকার কিছু দিক, যেমন তাদের বাসস্থান, যত্ন নেয়, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যোগ্য। অতএব, যেহেতু মহান আল্লাহ এই মহাবিশ্বের প্রতিটি নিয়ামত মানুষকে দান করেছেন, তাই কেবল ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত যে মানুষ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। নিজের ইচ্ছায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করা। যে ব্যক্তি অন্য কারণে কাজ করে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ভালো নিয়তের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যে একজন ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে কোনও প্রশংসা বা প্রতিদান আশা করে না বা আশা করে না। জিহ্বা দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হল ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা। আর কারো কর্মের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হলো, তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য, যেমনটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর ফলে উভয় জাহানে আশীর্বাদ বৃদ্ধি পায় এবং পরিণামে মানসিক শান্তি লাভ হয়। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব..."

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অধিকন্তু, যখন কোন ব্যক্তি কোন বস্তুর মালিক হয়, তখন তার জন্য সেই বস্তুটি যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করা সঠিক এবং স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ, মানুষ সহ, মহাবিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, মালিক এবং বজায় রেখেছেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন যে মহাবিশ্বের মধ্যে কী ঘটবে এবং কী ঘটবে না। অতএব, একজন ব্যক্তির জন্য কেবল মহান আল্লাহ, তাঁর আনুগত্য করা ন্যায়সঙ্গত, কারণ তিনিই সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক, যার মধ্যে তারাও রয়েছে।

একইভাবে, যখন কেউ অন্য কাউকে তার মালিকানাধীন জিনিস ধার দেয়, তখন তার মালিকের ইচ্ছানুযায়ী জিনিসটি ব্যবহার করাই ন্যায্য। মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির প্রতিটি নিয়ামতকে ঋণ হিসেবে দিয়েছেন। তিনি তাকে উপহার হিসেবে দেননি। পার্থিব ঋণের মতো, এই ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এই ঋণ পরিশোধের একমাত্র উপায় হল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এগুলো ব্যবহার করা। অন্যদিকে, যেহেতু জান্নাতের নিয়ামত একটি উপহার, তাই মানুষ সেগুলো তাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে স্বাধীন থাকবে। ৭ম সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ৪৩:

"...এবং তাদেরকে বলা হবে, "এটি সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ তোমাদের কর্মের জন্য।"

অতএব, একজন ব্যক্তির উচিত জান্নাতের উপহারের সাথে ধার করা পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৫১:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ আমার এবং তোমাদেরও পালনকর্তা, অতএব তাঁরই উপাসনা করো। এটাই সরল পথ।"

ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহর আনুগত্য করাই হলো সরল পথ, কারণ এটি উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে। এই সরল পথ এবং নিখুঁত আচরণবিধি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসতে পারে, কারণ তিনিই সবকিছু জানেন। অন্যদিকে, সমস্ত মানবসৃষ্ট আচরণবিধি উভয় জগতে সরল পথ এবং মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে না, কারণ তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের অভাব রয়েছে। অতএব, একজনকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয়, কারণ এটিই একমাত্র সরল পথ যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। তাদের একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ

গ্রহণ করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এই জ্ঞানী রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যারা ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণ করবেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করবেন তাদেরও ভালো মানসিক স্বাস্থ্য লাভ হবে। কিন্তু যে অজ্ঞ রোগী তার ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হন, তাদের শারীরিক স্বাস্থ্য যেমন খারাপ হয়, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা উপেক্ষা করেন, তিনি বিনোদনের মুহূর্ত উপভোগ করলেও এবং পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও উভয় জগতেই কখনও মানসিক শান্তি পাবেন না। যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করে এবং যারা তা করে না তাদের দেখলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ৯ম অধ্যায় তওবার আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ্ বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

মহান আল্লাহ সর্বদা স্পষ্ট করে বলেন যে, যদিও বনী ইসরাঈলের অনেকেই তাঁর অবাধ্যতার উপর অবিচল ছিল, তবুও তারা সর্বদা তাঁর আনুগত্যের উপর অবিচল ছিল। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫২:

“কিন্তু যখন ঈসা (আঃ) তাদের কাছ থেকে অবিশ্বাস অনুভব করলেন, তখন তিনি বললেন, “আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী কারা?” শিষ্যরা বললেন, “আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী...”

এই আয়াতটি একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীর কিছু সদস্যের কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে বিচার না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ এটি প্রায়শই বৈষম্যের দিকে পরিচালিত করে, যেমন বর্ণবাদ।

সাহাবীরা কার্যত নবী ঈসা (আঃ)-এর অনুসরণের মাধ্যমে কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং আনুগত্য প্রমাণ করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। তাদের ব্যবহারিক আনুগত্যের জন্যই তারা আল্লাহ, মহান এবং নবী ঈসা (আঃ)-কে সাক্ষ্য দিতে বলেছিলেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫২-৫৩:

“... শিষ্যরা বলল, “আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমরা মুসলিম [তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী]। হে

আমাদের পালনকর্তা, আমরা আপনার অবতীর্ণ বিধানে ঈমান এনেছি এবং রাসূলের [অর্থাৎ, যীশুর] অনুসরণ করেছি, অতএব আমাদেরকে [সত্যের পক্ষে] সাক্ষীদের মধ্যে তালিকাভুক্ত করুন।"

অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই এই শিষ্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে হবে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এই ব্যবহারিক আনুগত্য হলো উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণ এবং মুদ্রা, কারণ এটিই একমাত্র উপায় যা একজন ব্যক্তিকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেয়। যারা কার্যত তাদের ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় তাদের ভয় করা উচিত যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বিচারের দিনে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন, ঠিক যেমন নবী ঈসা (সাঃ) তাঁর উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, যারা তাঁকে সঠিকভাবে অনুসরণ করেনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন। ৫ম সূরা আল মায়িদা, আয়াত ১১৬-১১৮:

“আর[সেদিনের কথা মনে রেখো] যখন আল্লাহ বলবেন, “হে মরিয়ম পুত্র ঈসা, তুমি কি মানুষকে বলেছিলে, 'আল্লাহ ব্যতীত আমাকে এবং আমার মাকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করো?'” তিনি বলবেন, “তুমি কি পবিত্র! আমার এমন কথা বলা উচিত ছিল না যার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি তা বলতাম, তাহলে তুমি তা জানতে। তুমি আমার ভেতরে যা আছে তা জানো, আর তোমার ভেতরে যা আছে তা আমি জানি না। নিশ্চয়ই তুমি অদৃশ্যের জ্ঞানী। আমি তাদেরকে যা আদেশ করেছিলাম তা ছাড়া আর কিছুই বলিনি - আমার প্রতিপালক এবং তোমার প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত করো। আর আমি তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম যতক্ষণ আমি তাদের মধ্যে

ছিলাম; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই ছিলে তাদের উপর পর্যবেক্ষক এবং তুমিই সবকিছুর উপর সাক্ষী। যদি তুমি তাদের শাস্তি দাও, তাহলে তারা তোমার বান্দা; আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করো, তাহলে নিশ্চয়ই তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

এবং অধ্যায় 25 আল ফুরকান, আয়াত 30:

" আর রাসূল বলেছেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

এই আয়াতে মুসলিমদের কথা বলা হয়েছে কারণ তারাই একমাত্র পবিত্র কুরআন গ্রহণ করেছে এবং গ্রহণ করেছে। অমুসলিমরা পবিত্র কুরআন পরিত্যাগ করতে পারে না কারণ তারা প্রথমে কখনও এটি গ্রহণ করেনি বা গ্রহণ করেনি। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাদের কী হবে তা নির্ধারণ করার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনে সঠিকভাবে বিশ্বাস করতে হবে ঠিক যেমন সঠিক পথপ্রদর্শক শিষ্যরা তাদের ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাস করেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে নিয়মিত এবং সঠিকভাবে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা , এটি বোঝার জন্য প্রচেষ্টা করা এবং অবশেষে এর শিক্ষা অনুসারে কাজ করা। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম কেবল এমন ভাষায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে যা তারা বোঝে না এবং এটি বুঝতে এবং তার উপর আমল করতে অস্বীকার করে। যারা এইভাবে আচরণ করে তাদের ভয় করা উচিত যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, কারণ তারা এর অধিকার পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বনী ইসরাঈলের কিছু পণ্ডিত যখন শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা এবং ক্রুশবিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন মহান আল্লাহ তাঁর জন্য একটি অলৌকিক মুক্তির ব্যবস্থা করেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৪-৫৫:

“ আর তারা [অর্থাৎ, কাফেররা] চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আল্লাহ পরিকল্পনা করেছিলেন। আর আল্লাহই সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী। [স্মরণ করো] যখন আল্লাহ বললেন, "হে ঈসা, আমি অবশ্যই তোমাকে গ্রহণ করব এবং আমার দিকে উঠিয়ে নেব এবং তোমাকে পবিত্র করব [অর্থাৎ, কাফেরদের থেকে মুক্ত করব...]"

ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে, যখনই কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় ছিল, তখনই তাকে স্বস্তি এবং তাদের সমস্যা থেকে মুক্তির পথ দেওয়া হয়েছে। ৬৫তম অধ্যায়, তালাক, আয়াত ২:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই স্বস্তি আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে ঘটে, মানুষের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারে নয়। অতএব, এটি সর্বোত্তম সময়ে এবং সর্বোত্তম উপায়ে ঘটে, যদিও এটি মানুষের কাছে স্পষ্ট নয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

যারা কার্যত পবিত্র নবীদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, তাদের জন্যও মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্বের নিশ্চয়তা দিয়েছেন, যা মৌখিকভাবে তাদের প্রতি বিশ্বাসের দাবির চেয়েও বেশি। অধ্যায় ৩, আলে ইমরান, আয়াত ৫৫:

"... এবং যারা তোমার অনুসরণ করে [শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে] তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করো..."

যেহেতু সকল নবী-রাসূল (সাঃ) একই পথে চলতেন, তাই তাদের যে কোন একজনকে অনুসরণ করা মানে সকলকে অনুসরণ করা। অতএব, এই আয়াতটি সেইসব মুসলমানদের কথা বলতে পারে যারা কার্যত মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসরণ করে এবং সম্প্রসারিতভাবে অন্যান্য সকল নবী-রাসূল (সাঃ) যেমন মহানবী ঈসা (আঃ) এর অনুসরণ করে। অতএব, যদি মুসলমানরা এই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব চায় যাতে তারা সকল ধরনের নিপীড়ন থেকে রক্ষা পায় এবং মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করতে স্বাধীন হয়, তাহলে তাদের অবশ্যই কার্যত মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসরণ করতে হবে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ৫৫:

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে শাসক হিসেবে দান করবেন, যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে শাসক হিসেবে দান করেছিলেন এবং অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের ভয় ও নিরাপত্তার পরিবর্তে তাদের জন্য পরিবর্তন করবেন, কারণ তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা কুফরী করবে, তারাই পাপাচারী।”

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৩৯:

“সুতরাং তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, যদি তোমরা [সত্যিকারের] বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।”

যদি পৃথিবীতে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব না থাকে, তবে এর কারণ হল তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে প্রকৃত বিশ্বাস গ্রহণের শর্ত পূরণ করেনি। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৫৫:

"... এবং যারা তোমার অনুসরণ করে [শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে] তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করো..."

এই আয়াতটি তাদের কথাও বলতে পারে যারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে সঠিকভাবে অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে, তাদের যে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছিল তা ছিল আধ্যাত্মিক, কারণ ইতিহাস দেখায় যে তাদের সামাজিক ক্ষমতা এবং প্রভাব দেওয়া হয়নি। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদেরকে আরও ভালো কিছু দিয়ে প্রতিদান দিয়েছিলেন, মানবজাতির উপর আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব যা মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করেছিল।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৫৫:

"... এবং যারা তোমার অনুসরণ করে [শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে] তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করো..."

এই আয়াতটি সেই সময়ের কথাও বলতে পারে যখন নবী ঈসা আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে ফিরে আসবেন, অমুসলিমদের এবং তাদের নেতা, খ্রীষ্ট-শত্রুদের উপর

মুসলিমদের বিজয়ের দিকে পরিচালিত করার জন্য। এটি অনেক হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সহীহ মুসলিমের ৭৩৮১ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই, এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে, শারীরিক হোক বা আধ্যাত্মিক, শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাদেরই দেওয়া হয় যারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করে। কিন্তু যারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকে, তারা কখনই মানসিক শান্তি পাবে না, কারণ তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হবে এবং তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল স্থানে ফেলবে, এমনকি যদি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। আলোচ্য মূল আয়াতগুলি দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, এটি হতাশা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতার মতো অসংখ্য মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে। এই ফলাফল স্পষ্ট হয় যখন কেউ দেখে যে ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে। এই দুটি পথ মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং এখন মানুষের উপর নির্ভর করে কোনটি বেছে নেবে। তবে তাদের অবশ্যই বিজ্ঞতার সাথে বেছে নিতে হবে কারণ উভয় জগতেই তাদের পছন্দের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৫৫-৫৭:

"... অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে, আর আমি তোমাদের মধ্যে সেই বিষয়ের বিচার করব যেখানে তোমরা মতভেদ করছিলে। আর যারা কুফরী করেছে, আমি তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠোর শাস্তি দেব, আর তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তিনি তাদেরকে তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দান করবেন, আর আল্লাহ জালেমদের পছন্দ করেন না।"

এই আয়াতগুলিতে দুটি দলের কথা বলা হয়েছে: অমুসলিম এবং যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর মুসলিম যারা সৎকর্ম করে না তাদের কথা বলা হয়নি। অতএব, এই আয়াতগুলিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, যদি তারা তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে সৎকর্মের মাধ্যমে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে ঈমান হারানোর বিরাট বিপদের সম্মুখীন হবে। কারণ ঈমান হলো এমন একটি গাছের মতো যাকে বৃদ্ধি পেতে হলে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি পায় না, তা বৃদ্ধি পাবে না এবং এমনকি মারাও যেতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমানও বৃদ্ধি পাবে না এবং মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

এরপর আল্লাহ তাআলা মানুষকে উৎসাহিত করেন যে, যারা তাঁর অবাধ্যতার উপর অটল থাকে, তাদের পরিণতি, উভয় জগতের চাপ, ঝামেলা এবং দুর্দশার পরিণতি এড়াতে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসের স্পষ্ট প্রমাণাদি খোলা মনে অধ্যয়ন করে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে উভয় জগতের মানসিক শান্তি কেবল ইসলামী আচরণবিধি গ্রহণের মধ্যেই নিহিত। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৮:

"এটিই আমরা আপনাকে [নবী মুহাম্মদ, সা.]-এর আয়াত এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশ [অর্থাৎ কুরআন] পাঠ করে শোনাচ্ছি।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, পবিত্র কুরআনের বাক্যাংশগুলি অতুলনীয় এবং এর অর্থগুলি সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর শব্দ এবং আয়াতগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অন্য কোনও গ্রন্থ এটিকে অতিক্রম করতে পারে না। পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী জাতিগুলির ইতিহাস বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছে যদিও মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) ইতিহাসে শিক্ষিত ছিলেন না। এটি প্রতিটি সংকাজের আদেশ দেয় এবং প্রতিটি মন্দকে নিষেধ করে। যা একজন ব্যক্তি এবং সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে, যাতে ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা এবং শান্তি প্রতিটি ঘর এবং সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা যেকোনো মিথ্যা এড়িয়ে চলে, কবিতা, গল্প এবং উপকথার বিপরীতে। সমস্ত আয়াত উপকারী এবং ব্যবহারিকভাবে একজনের জীবনে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এমনকি যখন পবিত্র কুরআনে একই গল্প পুনরাবৃত্তি করা হয়, তখনও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরা হয়। অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থের বিপরীতে, পবিত্র কুরআন বারবার অধ্যয়ন করলে একজন ব্যক্তিকে বিরক্ত করে না। পবিত্র কুরআন প্রতিশ্রুতি এবং সতর্কীকরণ প্রদান করে এবং অনস্বীকার্য এবং স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে তাদের সমর্থন করে। পবিত্র কুরআন যখন এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যা বিমূর্ত বলে মনে হতে পারে, যেমন ধৈর্য্য অবলম্বন করা, তখন এটি সর্বদা এটিকে তার জীবনে বাস্তবায়নের একটি সহজ এবং ব্যবহারিক উপায় প্রদান করে। এটি মানুষকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে উৎসাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে, যার ফলে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। এটি উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং প্রকৃত সাফল্য কামনাকারী ব্যক্তির জন্য সরল পথকে স্পষ্ট এবং আকর্ষণীয় করে তোলে। পবিত্র কুরআনের জ্ঞান চিরন্তন কারণ এটি প্রতিটি সমাজ এবং যুগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি প্রতিটি মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক সমস্যার জন্য একটি নিরাময় যখন এটি সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়। এটি একজন ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি সমস্যার সমাধান প্রদান করে। কেবল ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করা এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়নকারী সমাজগুলি কীভাবে এর সর্বব্যাপী এবং কালজয়ী শিক্ষা থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। শতাব্দী পেরিয়ে গেছে কিন্তু পবিত্র কুরআনের একটি অক্ষরও পরিবর্তন করা হয়নি, যেমনটি আল্লাহ তাআলা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিলেন। ইতিহাসের অন্য কোনও গ্রন্থে এই গুণটি নেই। অধ্যায় ১৫ আল হিজর, আয়াত ৯:

"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ, কুরআন] নাযিল করেছি এবং অবশ্যই, আমরাই এর রক্ষণাবেক্ষণকারী।"

মহান আল্লাহ তাআলা একটি সমাজের মূল সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলোর সকলের বাস্তব প্রতিকারের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। মূল সমস্যাগুলো সংশোধন করার মাধ্যমে, এগুলো থেকে উদ্ভূত অসংখ্য শাখা-প্রশাখার সমস্যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআন এভাবেই একজন ব্যক্তি এবং সমাজের উভয় জগতে সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ের সমাধান করেছে। সূরা আন নাহল, আয়াত ৮৯:

"...এবং আমরা আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি সবকিছুর স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ..."

এটি মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর দান করা সর্বশ্রেষ্ঠ কালজয়ী অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু যারা সত্যের সন্ধান করে এবং তার উপর আমল করে, কেবল তারাই এর দ্বারা উপকৃত হবে, আর যারা তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং এর থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করে, তারা উভয় জগতেই কেবল ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অধ্যায় ১৭ আল-ইসরা, আয়াত ৮২:

"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু এটি জালেমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৫৮:

"এটিই আমরা আপনাকে [নবী মুহাম্মদ, সা.]-এর আয়াত এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশ [অর্থাৎ কুরআন] পাঠ করে শোনাচ্ছি।"

এই আয়াতে, মহান আল্লাহ মক্কার অমুসলিম এবং মদিনায় বসবাসকারী আহলে কিতাব উভয়কেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, যেহেতু মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলি অধ্যয়ন করেননি, যা তারা অস্বীকার করেনি, তাই তিনি এই আয়াতগুলিতে উল্লিখিত বিস্তারিত তথ্য জানতে পারতেন না যদি না আল্লাহ তাকে ঐশী ওহীর মাধ্যমে না বলতেন।

আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে পণ্ডিতরা ইসলামের সত্যতা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন কারণ তারা পবিত্র কুরআনকে চিনতে পেরেছিলেন কারণ তারা এর লেখকের সাথে পরিচিত ছিলেন। এবং তারা পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং পবিত্র কুরআনকে চিনতে পেরেছিলেন যেমনটি তাদের ঐশী গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।
সূরা আল আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

আহলে কিতাবরা এই সত্যে ঈর্ষান্বিত ছিল যে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ভাই হযরত ইসহাকের বংশধর না হয়ে বরং তাঁর বংশধর ছিলেন। যেহেতু তাদের পুরো ধর্ম বংশের গুরুত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, যা তাদের মতে অন্যান্য মানবজাতির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিল, তাই তারা এমন একজন নবী (সাঃ) কে গ্রহণ এবং অনুসরণ করতে পারত না, যিনি ভিন্ন বংশ থেকে এসেছিলেন। এটি কেবল তাদের তৈরি শ্রেষ্ঠত্বের জটিলতাকে ধ্বংস করবে।

মক্কার অমুসলিমরা আরবি ভাষার উপর দক্ষ ছিল, তাই তারা জানত যে পবিত্র কুরআন কোন সৃষ্টির বাণী নয়। এবং যেহেতু তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ঘোষণার আগে চল্লিশ বছর তাঁর সাথে কাটিয়েছিল, তাই তারা জানত যে তিনি মিথ্যাবাদী নন। অধ্যায় ১০ ইউনুস, আয়াত ১৬:

"... কারণ আমি এর আগে তোমাদের মধ্যে এক জীবনকাল কাটিয়েছি। তাহলে কি তোমরা বুঝতে পারবে না?"

মক্কার অমুসলিমদের মধ্যে যারা সম্ভ্রান্ত, তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে গ্রহণ ও অনুসরণ করে বেঁচে থাকতে পারত না, যিনি একজন দরিদ্র এতিম ছিলেন, যদিও তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। তারা নেতৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পদ কামনা করত, কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নবুওত ঘোষণা করার পর তারা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে।

এরপর মহান আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক জন্মকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের অলৌকিক সৃষ্টির সাথে তুলনা করে সকল ঐশ্বরিকতাকে অস্বীকার করেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৯:

" নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে ঈসার উদাহরণ আদমের মতো। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে বলেছেন, "হও", আর সে হয়ে গেল।"

হযরত ঈসা (আঃ)-এর সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রসারের কারণগুলির মধ্যে রয়েছে তাঁর অলৌকিক জন্ম, তাঁর জীবদ্দশায় সম্পাদিত অলৌকিক ঘটনা এবং তাঁর আসমানে আরোহণ। পবিত্র কুরআন হযরত ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক জন্মের

সত্যতা নিশ্চিত করে এবং তাঁর পিতৃহীন জন্মকে মহান আল্লাহর অসীম শক্তির নিদর্শন হিসেবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৭:

“তিনি[মারিয়াম, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট] বললেন, “হে আমার প্রতিপালক, আমার সন্তান কীভাবে হবে যখন কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি?” [ফেরেশতা] বললেন, “আল্লাহ এমনই, তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেন, তখন কেবল বলেন, 'হু', আর তা হয়ে যায়।”

মহান আল্লাহ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, ঠিক যেমন তিনি হযরত আদম আলাইহিস সালামকে পিতা বা মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। এই বাস্তবতার অর্থ এই নয় যে তারা ঐশ্বরিক। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৯:

“নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ঈসার উদাহরণ আদমের মতো। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে বলেছেন, “হু”, আর সে হয়ে গেল।”

এটা অদ্ভুত যে খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে হযরত ঈসা (আঃ) হলেন মহান আল্লাহর পুত্র, কারণ তিনি পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তারা হযরত আদম (আঃ)-কে মহান আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে না, যদিও তিনি পিতা বা মাতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মানসিকতা অনুসারে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর চেয়ে হযরত আদম (আঃ)-এর মহান আল্লাহর পুত্র বলে অভিহিত হওয়ার অধিকার বেশি,

কিন্তু তারা তা দাবি করে না। হযরত আদম (আঃ)-এর ক্ষেত্রে তারা যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে, কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে যুক্তি বা সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে না। এটা অদ্ভুত।

পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক ঘটনাগুলি যাচাই করা হয়েছে। তবে এটি স্পষ্ট করে যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি এবং আদেশে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এই অলৌকিক ঘটনাগুলি সম্পাদন করেছিলেন। যদি মহান আল্লাহর ইচ্ছা বা অনুমতির প্রয়োজন হত, তাহলে তাঁর জন্য মহান আল্লাহর ইচ্ছা বা অনুমতির প্রয়োজন হত না। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৪৯:

“আর [ঈসা আলাইহিস সালামকে] বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল বানাও, [যিনি বলবেন], 'আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করি, অতঃপর আমি তাতে ফুঁ দেই, আল্লাহর নির্দেশে তা পাখি হয়ে যায়। আর আমি অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করি এবং আল্লাহর নির্দেশে মৃতকে জীবিত করি। আর আমি তোমাদেরকে তোমাদের খাবার এবং তোমাদের ঘরে যা জমা করে রাখি তা জানিয়ে দেই..”

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম জীবিত অবস্থায় আসমানে আরোহণ করা আল্লাহর শক্তির আরও ইঙ্গিত দেয়, যখন তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে এই যাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন। যদি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ঐশ্বরিক হতেন, তাহলে তিনি তাঁর নিজস্ব সহজাত শক্তি দিয়ে এই যাত্রা করতে পারতেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৫:

"[স্মরণ করো] যখন আল্লাহ বললেন, "হে ঈসা, আমি অবশ্যই তোমাকে গ্রহণ করব এবং আমার দিকে উঠিয়ে নেব এবং তোমাকে পবিত্র করব [অর্থাৎ, কাফেরদের থেকে মুক্ত করব...]"

পবিত্র কুরআন খ্রিস্টানদের বলে যে, তাদের বিশ্বাসের বিপরীতে, নবী ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি। ক্রুশে যার ছবি দেখা গিয়েছিল তিনি নবী ঈসা (আঃ)-এর মতো দেখতে ছিলেন না, বরং তিনি এমন একজন ছিলেন যাকে তাঁর মতো করে তৈরি করা হয়েছিল। আল্লাহ, মহিমান্বিত, ইতিমধ্যেই নবী ঈসা (আঃ)-কে আকাশের দিকে তুলে নিয়েছিলেন। সূরা ৪ আন-নিসা, আয়াত ১৫৬-১৫৮:

"আর তাদের অবিশ্বাস এবং মরিয়মের বিরুদ্ধে তাদের বিরাট অপবাদ বলার জন্য। এবং তাদের এই কথার জন্য যে, "আমরা আল্লাহর রসূল মরিয়মের পুত্র মসীহ ঈসাকে হত্যা করেছি।" তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রুশেও চড়ায়নি; বরং তাদের কাছে তার অনুরূপ করা হয়েছিল... বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে তুলে নিয়েছেন।"

হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া মানে হত্যা করা, এই ভুল খ্রিস্টান বিশ্বাস নিজেই অদ্ভুত কারণ একজন প্রকৃত ঐশ্বরিক সত্তা মৃত্যু অনুভব করার চেয়ে অনেক বেশি দূরে। যদি কোন সত্তা মারা যেতে পারে, তবে তা ঐশ্বরিক হতে পারে না। তাই বাস্তবে, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে তাদের ভুল বিশ্বাস তাঁর ঐশ্বরিকতা সম্পর্কে তাদের ভুল বিশ্বাসকে অস্বীকার করে।

স্বভাবতই একটি ঐশ্বরিক সত্তা এমন একটি জিনিস যা স্বয়ংসম্পূর্ণ, অর্থাৎ তাদের অন্য কারো দ্বারা তাদের প্রতিপালনের প্রয়োজন হয় না। যদি একটি সত্তা অন্য কারো দ্বারা প্রতিপালিত হয় তবে তারা ঐশ্বরিক হতে পারে না। নবী ইসা (আঃ) এবং তাঁর মা মরিয়ম (আঃ) উভয়েই ঐশ্বরিক সত্তা ছিলেন না কারণ তাদের মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুষ্টির প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা ছিলেন না। ৫ম অধ্যায়

আল মায়িদা. আয়াত ৭৫:

"মরিয়মপুত্র মসীহ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না; তাঁর পূর্বে আরও রসূল গত হয়ে গেছেন। আর তাঁর মা ছিলেন সত্যবাদী। তাঁরা দুজনেই খাবার খেতেন। দেখো, আমি কীভাবে তাদের কাছে নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করি; তারপর দেখো, কীভাবে তারা বিভ্রান্ত হয়।"

তাছাড়া, কেউ দাবি করতে পারে না যে, যেহেতু ফেরেশতারা খায় না, তাই তাদেরকে ঈশ্বর হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বাস্তবে, তাদেরকেও আল্লাহ তাআলা ভিন্নভাবে রিযিক দান করেন, তাই তারাও স্বয়ংসম্পূর্ণ নন। অন্যান্য সৃষ্টির মতোই তাদেরও সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তারা মৃত্যু ভোগ করবে, এই সত্যই দেবত্বকে অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট।

একজন জৈবিক শিশু তার পিতামাতার সাথে সর্বদা কিছু বৈশিষ্ট্য ভাগ করে নেবে। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে, তিনি মহান আল্লাহর সাথে কোন গুণাবলী ভাগ করে নিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে, তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য অন্যান্য মানুষের সাথে ভাগ

করে নেওয়া হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে খাদ্য ও জল দ্বারা লালন-পালন করা হয়েছে, সে মারা যাবে এবং পুনরুত্থিত হবে, ঠিক অন্যান্য সমস্ত মানুষের মতো। তার বৈশিষ্ট্যগুলি ঐশ্বরিকতাকে অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট।

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী রোমানরা তাদের ধর্মে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঐশ্বরিক হওয়ার ধারণাটি প্রবর্তন করেছিল, যা তারা তাদের পূর্বের ধর্ম, পৌত্তলিকতা থেকে ধারণ করেছিল। তারা একজন মহান ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত নবী (সাঃ)-কে গ্রহণ করেছিল এবং তাঁর সাথে জিউস, হারকিউলিস এবং ওডেনের মতো উপকথা এবং পৌরাণিক কাহিনী স্থাপন করেছিল। কেবলমাত্র সামান্য সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন, যা বোঝার জন্য যে সত্তা অন্য কারো দ্বারা সৃষ্ট, প্রতিপালিত এবং মারা যেতে পারে, কখনও ঐশ্বরিক হতে পারে না, কারণ এই বিষয়গুলি ঐশ্বরিক সত্তার গুণাবলীর বিরোধিতা করে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৬০:

"সত্য তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, অতএব সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি ঈমানের দুর্বলতা এড়াতে উৎসাহিত করে যা সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে বাধা দেয়, বিশেষ করে যখন তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করা হয়। এটি তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে, কারণ তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে আলোচিত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি শিখলে এবং তার উপর কাজ করলে দৃঢ় ঈমান অর্জিত হয়, যা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে যে মনের শান্তি এবং সাফল্য কেবল ইসলামী আচরণবিধি গ্রহণের মধ্যেই নিহিত। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা

জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী শিক্ষাগুলি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে কীভাবে একমাত্র মহান আল্লাহ, উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে এমন নিখুঁত আচরণবিধি প্রদানের জ্ঞান রাখেন। তিনিই মানবজাতিকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থাপন করতে শেখাতে পারেন। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের কারণে সমস্ত মানবসৃষ্ট আচরণবিধি এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। অতএব, দৃঢ় ঈমান একজন ব্যক্তিকে সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে সাহায্য করবে, এমনকি যখন তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতাও হয়, কারণ তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতের সাফল্য ইসলামী আচরণবিধির মধ্যেই নিহিত।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৬০:

"সত্য তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, অতএব সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

এই আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির প্রমাণ প্রদান করে। যেখানে স্পষ্ট প্রমাণ থাকে যে কোনও কিছু সত্য এবং কেউ তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়, সমস্যাটি যাই হোক না কেন, তাদের অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে এর বিরোধিতাকারী সবকিছুই মিথ্যা এবং সেই বিরোধিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে যে কোনও যুক্তি ত্রুটিপূর্ণ, এমনকি যদি তারা ত্রুটিটি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। সেই যুক্তি খণ্ডন করতে অক্ষমতা তাদের নিশ্চিতভাবে তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয় কারণ সত্যের বিরোধিতাকারী যা কিছু তা মিথ্যা। যখন কেউ এই নীতি মেনে চলে তখন এটি তাদের লোকেদের দ্বারা উপস্থাপিত বিভ্রান্তিকর

যুক্তিগুলির মোকাবেলা করতে সহায়তা করবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমের তাদের সাথে তর্ক করা উচিত নয় এবং পরিবর্তে তাদের কাজের উপর মনোনিবেশ করা উচিত যা হল সত্যের উপর বিশ্বাস করা, অনুসরণ করা এবং অন্যদের পরামর্শ দেওয়া।

নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, একটি খ্রিস্টান প্রতিনিধি দল নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে দেখা করতে আসে। তারা নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খোদায়ীত্বের প্রতি তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে তাদের সাথে অনেক সময় বিতর্ক করে। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ, মহিমাম্বিত, সূরা আলে ইমরানের ৫৯-৬১ আয়াত নাজিল করেন:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে ঈসার উদাহরণ আদমের মতো। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি তাকে বললেন, "হও", আর সে হয়ে গেল। সত্য তোমার প্রভুর কাছে থেকে এসেছে, তাই সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। [এই] জ্ঞান তোমার কাছে আসার পরেও যে কেউ তোমার সাথে এ বিষয়ে বিতর্ক করে, তাকে বলা, "এসো, আমরা আমাদের পুত্রদের, তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের, তোমাদের নারীদের, আমাদের নিজেদের এবং তোমাদের নিজেদেরকে ডাকি, তারপর আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি এবং [আমাদের মধ্যে] মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ দেই।"

ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার", পৃষ্ঠা ৪৫০-৪৫২-এ এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন খ্রিস্টানদের কাছে প্রমাণ করেছে যে, নবী ঈসা (আঃ)-এর ঐশ্বরিকতায় বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তাদের যে যুক্তিগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল, তার কোনওটাই বৈধ ছিল না। নবী ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা বিশেষ ও অনন্যভাবে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর নবুওয়ত প্রমাণের জন্য তাঁকে কিছু অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা নবী ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছিলেন। নবী ঈসা (আঃ)-কে যদি ঐশ্বরিক হতেন, তাহলে এটি করার কোন প্রয়োজন হত না কারণ একজন ঐশ্বরিক সত্তা মৃত্যু ভোগ করেন না। যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর বান্দাদের সাথে আচরণ করেন, তাই নবী ঈসা (আঃ)-এর সাথে এই অসাধারণ আচরণ কীভাবে এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে পারে যে তিনি ঐশ্বরিক?

অধিকন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আহ্বান সকল নবীর আহ্বানের অনুরূপ, যার মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ) ও সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

অবশেষে, পবিত্র কুরআন এমনকি প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, নবী ঈসা (আঃ)-এর স্বর্গারোহণের পর, তাঁর শিষ্যদের ধর্ম একই ছিল, অর্থাৎ ইসলাম, যা এখন পবিত্র কুরআন দ্বারা সমর্থিত এবং আরও স্পষ্ট। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে খ্রিস্টানরা নবী ঈসা (আঃ)-এর শিক্ষা পরিত্যাগ করে এবং তার পরিবর্তে তাঁর আনা ধর্মে নতুন নতুন উদ্ভাবন প্রবর্তন করে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন যাতে তিনি পূর্ববর্তী নবীদের নির্দেশিত সরল পথে মানবতাকে পুনর্নির্মাণ করতে পারেন। পবিত্র কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কথা তাদের ঐশী গ্রন্থে বর্ণিত হলেও তারা সম্পদের লোভ এবং তাদের ঈমানের সাথে আপোষ করে প্রাপ্ত

সামাজিক মর্যাদার কারণে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অধ্যায় ৬ আল আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের[নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার পরও নাজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলটি সত্যকে একগুঁয়েভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের একগুঁয়েমির প্রতিক্রিয়া হিসেবে , আল্লাহ, তাদের বিশ্বাসকে আরও খণ্ডন করেছিলেন, তাদেরকে পারস্পরিক সমাবেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে যেখানে উভয় পক্ষই মিথ্যাবাদী দলের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষণ করবে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তার পরিবারকে ডেকে পাঠান: আলী বিন আবু তালিব, তার স্ত্রী এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কন্যা ফাতিমা এবং তাদের দুই পুত্র, হাসান এবং হুসাইন (রাঃ)। এটি দেখার পর, খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল এই সমাবেশে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানায় কারণ তারা পুরোপুরি জানত যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য কথা বলছেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মন্তব্য করেছিলেন যে যদি তারা পারস্পরিক অভিশাপে সম্মত হত তবে তাদের উপর

আগুন বর্ষিত হত। ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৩:৬১, পৃষ্ঠা ৩৩-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাফসির ইবনে কাসির, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮০-এ উদ্ধৃত আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি তারা সকলেই মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপের জন্য দুআ করত, তাহলে তারা বাড়ি ফিরে তাদের সম্পত্তি বা পরিবার খুঁজে পেত না।

যখন তারা এই পারস্পরিক অভিশাপে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানালো, তখন সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে নাজরানের খ্রিস্টধর্মের পুরোহিত এবং নেতারা, যাদের তাদের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ছিল, তারা এমন বিশ্বাস অনুসরণ করতো যার উপর তারা নিজেরাই সম্পূর্ণরূপে আস্থাশীল ছিল না। পবিত্র কুরআনে এই এককালীন ঘটনার সময় পারস্পরিক অভিশাপ দেওয়ার নির্দেশের পিছনে এই উদ্দেশ্য ছিল। অতএব, এই ঘটনাকে মুসলিমদের দ্বারা অমুসলিমদের সাথে পারস্পরিক অভিশাপ দেওয়ার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয় যখন তারা ইসলামের সাথে একমত নন। পরিবর্তে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের কথার চেয়ে তাদের চরিত্রের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণ মানুষের কাছে উপস্থাপন করা এবং অন্যদের সাথে তর্ক করা এড়িয়ে চলা কারণ এটি কেবল তাদের সত্য গ্রহণ থেকে আরও দূরে ঠেলে দেবে। পরবর্তী আয়াতগুলিতে এই সাধারণ মনোভাব এবং আচরণের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত 62-64:

"নিশ্চয়ই, এটিই সত্য বর্ণনা। আর আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে জানেন।" বলুন, "হে কিতাবধারীগণ, এমন একটি কথার দিকে এসো যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে সমান - আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর উপাসনা করব না, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না এবং আল্লাহর পরিবর্তে একে অপরকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না।" কিন্তু যদি তারা মুখ

ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলুন, "সাক্ষী থাকো যে আমরা মুসলিম [তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী]।"

পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আলোচনা আল্লাহর পবিত্র নবী হিসেবে তাঁর লক্ষ্য এবং মর্যাদার সত্য বর্ণনা। সূরা ৩, আলে ইমরান, আয়াত ৬২:

"নিশ্চয়ই এটিই সত্য বর্ণনা। আর আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই.."

কিন্তু যে ব্যক্তি অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করে, সে এই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবে। ইসলামে অন্ধ অনুকরণের সমালোচনা করার এটিই একটি প্রধান কারণ, কারণ এটি একজন ব্যক্তিকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করতে পারে। একজনকে সর্বদা খোলা মন গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের রায় দেওয়ার আগে জ্ঞান, যুক্তি এবং প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে হবে। এমনকি ইসলামের মধ্যে অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য থেকে ইসলামের স্পষ্ট প্রমাণগুলি বোঝার চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা নিশ্চিতভাবে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার উপর কাজ করে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি.."

এটি নিশ্চিত করবে যে তারা ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জন করবে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, ঈমানের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করবে যে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকবে, কারণ এটি জেনে রাখবে যে এটি উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, এমনকি যদি তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করা হয় বা অন্যরা তাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো ইসলামী শিক্ষা ত্যাগ করতে উৎসাহিত করে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৬২:

"নিশ্চয়ই, এটিই সত্য বর্ণনা। আর আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই.."

মহানবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত মর্যাদা প্রত্যাখ্যান করার আরেকটি কারণ হল, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য করতে হবে। কিন্তু যারা কেবল এই পৃথিবীতে তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করতে চান তারা বিশ্বাস করতে থাকবেন যে নবী হযরত ঈসা (আঃ)-ই ঐশ্বরিক কারণ এই বিশ্বাস তাদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী প্রদত্ত অনুগ্রহগুলো ব্যবহার করতে সাহায্য করে। কারণ তাদের বিশ্বাস তাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, উভয় জগতেই তাদের জন্য মুক্তি নিশ্চিত, কারণ নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর পাপের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে এবং তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে এবং পরকালেও জাম্নাত লাভ করতে স্বাধীন। অতএব, যে ব্যক্তি সত্যের চেয়ে তাদের আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দেয়, সে এই বিশ্বাসে অটল থাকবে এবং

পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করবে যা পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই ব্যক্তির জানা উচিত যে তারা তাদের পছন্দের পরিণতি থেকে কখনও রেহাই পাবে না এবং অন্য কেউ তাদের আল্লাহর একত্ববাদ প্রত্যাখ্যান করার শাস্তি থেকে রক্ষা করবে না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬২:

"... আর নিশ্চয়ই, আল্লাহ পরাক্রমশালী..."

কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ্ সহনশীল, তাই তিনি তাঁর সাথে অংশীদারদের তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেন না। বরং তিনি তাদেরকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের পথ সংশোধন করার জন্য সময় দেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬২:

"... আর নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মহান আল্লাহ মানুষকে যে অবকাশ দেন তা সীমিত সময়ের জন্য। অতএব, সময় শেষ হওয়ার আগেই আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে এবং তাদের আচরণ সংশোধন করে এটি ব্যবহার করা উচিত। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহ এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লজ্জিত যেকোনো অধিকারের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে

হবে। কিন্তু যদি কেউ তাদের প্রদত্ত অবকাশ ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের এই বিশ্বাসে প্রতারণা করা উচিত নয় যে তাদের পছন্দের জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না, কারণ এই জবাবদিহিতা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটেনি। বিলম্বিত শাস্তি মোটেও শাস্তির মতো নয়। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৬৩:

"কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ অবশ্যই দুর্নীতিবাজদের সম্পর্কে জানেন।"

আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, যারা নবী ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত বিশ্বাসে অটল থাকে, তারা কেবল সমাজের মধ্যে দুর্নীতির বিস্তারকে উৎসাহিত করে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, অনেক খ্রিস্টান বিশ্বাস করে যে, নবী ঈসা আলাইহিস সালাম তাদের পাপের জন্য অর্থ প্রদান করেছেন, তাই তাদের কর্ম নির্বিশেষে উভয় জগতেই তাদের মুক্তি নিশ্চিত। এই বিশ্বাস মানুষকে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে, যা তাদেরকে আল্লাহ তাআলা এবং মানুষের অধিকার পূরণে বাধা দেবে। এর ফলে সমাজের মধ্যে দুর্নীতির বিস্তার ঘটবে। তাদের আচরণের ফলে, এই লোকেরা কখনও মানসিক শান্তি পাবে না, কারণ তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা পাবে না এবং তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় স্থাপন করবে। এবং তারা পরকালে তাদের জবাবদিহিতা থেকে রেহাই পাবে না, কারণ মহান আল্লাহ তাদের সমস্ত উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্ম জানেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৩:

"... তাহলে নিশ্চয়ই- আল্লাহ দুর্নীতিবাজদের সম্পর্কে জানেন।"

এরপর আল্লাহ তাআলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং মুসলিম জাতিকে আদেশ করেন যে, তারা যেন আহলে কিতাবদের তাদের কর্ম ও কথার মাধ্যমে ইসলামের দিকে আহ্বান করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৪:

"বলুন, "হে কিতাবীগণ, এমন একটি কথার দিকে এসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান- আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না এবং আল্লাহ ছাড়া একে অপরকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না।" কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলো, "তোমরা সাক্ষী থাকো যে আমরা মুসলিম [তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী]।"

খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে দেবত্ব আরোপ করার পাশাপাশি, খ্রিস্টান এবং ইহুদি উভয়ই আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল, যখন তারা বিশ্বাস করত যে তাদের আলেমদের কথা আল্লাহর কথা সমান। অর্থাৎ, তারা তাদের আলেমদের রায় মেনে নিত, যারা পার্থিব লাভের জন্য তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে জিনিসপত্র হালাল ও অবৈধ করে, যেন এটি আল্লাহর আদেশ। দুঃখের বিষয়, এই মনোভাব অনেক মুসলিমকে প্রভাবিত করেছে যার ফলে তারা প্রায়শই এমন আচরণ করে যেন একজন আলেমের রায় আল্লাহর কথা, যদিও তা নয়। মুসলমানদের অবশ্যই আলেমদের সম্মান করতে হবে কিন্তু উপমা এবং স্বাধীন যুক্তির উপর ভিত্তি করে তাদের রায় তাদের মতামত, যা বিতর্কের জন্য উন্মুক্ত। কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে যেখানে তাদের রায় পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেমন মদ্যপান নিষিদ্ধ, প্রশ্ন ছাড়াই গ্রহণ করা উচিত।

এছাড়াও, আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো মহান আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে যেকোনো কিছু বা যে কারো আনুগত্য করা। ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং সে অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্য বজায় রাখবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসবে। কিন্তু যদি কেউ ইসলামী শিক্ষা উপেক্ষা করতে পছন্দ করে, তাহলে তারা অনিবার্যভাবে অন্যান্য জিনিসকে তাদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করবে, যেমন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি, এবং অন্ধভাবে তাদের আনুগত্য করবে, এমনকি যদি তারা তা উপলব্ধি না করে। এর ফলে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে, যা তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেবে। অতএব, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যদি কেউ কার্যত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর আনুগত্য করতে অস্বীকার করে, তাহলে তারা অনিবার্যভাবে অন্য কিছুর আনুগত্য করবে, তা সে তাদের নিজস্ব ইচ্ছা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন বা সংস্কৃতি যাই হোক না কেন। এটি একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

অতএব, যারা ইসলামকে তাদের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদের অবশ্যই তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে বাস্তবে সমর্থন করতে হবে, আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৪:

"...কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলো, "সাক্ষী থাকো যে আমরা মুসলিম [তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী]।"

অন্যরা কেবল তখনই একজন ব্যক্তির ঈমানের সঠিক সাক্ষ্য দিতে পারে যদি তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে তা প্রদর্শন করে। অতএব, ঈমানের মৌখিক ঘোষণা মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে যথেষ্ট নয়। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমান একটি গাছের মতো যাকে বৃদ্ধি পেতে হলে ভালো কর্মের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি না পেলে মারা যাবে, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও বৃদ্ধি পাবে না এবং ভালো কর্মের মাধ্যমে পুষ্ট না হলে মারা যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত, যেমনটি সঠিকভাবে প্রদত্ত হয়েছে।

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ৬৫-৬৮

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِىْ اِبْرٰهِيْمَ وَمَا اُنْزِلَتْ التَّوْرَةُ وَاِلَّا نَجِيْدُ اِلَّا مِنْ

بَعْدِهٖۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٥﴾

هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حٰجَجْتُمْ فِىْمَا لَكُمْ بِهِۦۙ عَلِمٌ فِلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِىْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِۦۙ عَلِمٌ وَاللّٰهُ

يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦٧﴾

اِنَّ اَوْلٰى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٨﴾

"হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা ইব্রাহিম সম্পর্কে কেন বিতর্ক করছো, অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তার পরেই অবতীর্ণ হয়েছে? তাহলে কি তোমরা চিন্তা করবে না?"

তোমরাই সেইসব লোক যারা তোমাদের জ্ঞানের বিষয়ে বিতর্ক করেছে, কিন্তু তোমরা কেন এমন বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছো যার বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই? আর আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জান না।

ইব্রাহিম ইহুদীও ছিলেন না, খ্রিস্টানও ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন সত্যের প্রতি আকৃষ্ট, একজন মুসলিম [আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল] এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

নিঃসন্দেহে, মানুষের মধ্যে ইব্রাহিমের সবচেয়ে যোগ্য হলেন তারা যারা তাঁর অনুসরণ করেছিলেন [আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে] এবং এই নবী [রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যারা ঈমান এনেছেন। আর আল্লাহ হলেন
মুমিনদের বন্ধু।"

নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়ে আহলে কিতাব, ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা উভয়ই দাবি করত যে তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছিলেন এবং তিনি তাদের ঐশী গ্রন্থ অনুসারে কাজ করেছিলেন। অর্থাৎ, ইহুদিরা দাবি করত যে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে একজন ইহুদি হিসেবে গণ্য করা হত যিনি তাওরাতের শিক্ষা অনুসারে কাজ করতেন, অন্যদিকে খ্রিস্টানরা দাবি করত যে তিনি একজন খ্রিস্টান হিসেবে বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে কাজ করতেন, যদিও উভয় ঐশী গ্রন্থই তাঁর অনেক পরে নাথিল হয়েছিল। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ৬৫:

"হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা ইব্রাহিম সম্পর্কে কেন বিতর্ক করছো, অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তার পরেই অবতীর্ণ হয়েছে? তাহলে কি তোমরা চিন্তা করবে না?"

তাদের দাবি স্পষ্টতই মিথ্যা ছিল এবং এটি একটি শিশুর কাছেও স্পষ্ট ছিল। তাদের মনোভাব ইঙ্গিত দেয় যে যখন একজন ব্যক্তির মতামত বা বিশ্বাস জ্ঞান এবং স্পষ্ট প্রমাণের উপর ভিত্তি করে না হয়, তখন তারা এমন বিষয় নিয়ে তর্ক করবে যা অর্থহীন। তারা তাদের মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য বিভ্রান্তিকর উপায়ে কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে। একজন মুসলিমকে এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে কারণ জ্ঞান, যুক্তি এবং স্পষ্ট প্রমাণ অনুসরণ করলেই কেবল পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই সঠিক নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। একজনকে অবশ্যই তাদের আকাঙ্ক্ষাকে একপাশে রেখে খোলা মনে প্রতিটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে যেখানে তারা জ্ঞান এবং প্রমাণ মূল্যায়ন করে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, এমনকি যদি এই সিদ্ধান্ত তাদের ব্যক্তিগত মতামতের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ৬৬:

"তোমরা তো সেইসব লোক যারা তোমাদের জ্ঞানের ব্যাপারে তর্ক করেছে, কিন্তু তোমরা কেন এমন বিষয়ে তর্ক করছো যার ব্যাপারে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই? আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জানো না।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৬৫:

"হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা ইব্রাহিম সম্পর্কে কেন বিতর্ক করছো, অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তার পরেই অবতীর্ণ হয়েছে? তাহলে কি তোমরা চিন্তা করবে না?"

দুঃখের বিষয় হল, কিছু মুসলিম একই রকম মনোভাব গ্রহণ করেছে যেখানে তারা কিছু কাজকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করে, যদিও এই কাজগুলি তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পরে উদ্ভাবিত হয়েছিল। অতএব, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করা এড়িয়ে চলা এবং পরিবর্তে নির্দেশনার দুটি উৎস: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য কঠোরভাবে মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হয়, এমনকি যদি তা সংকর্মের দিকে পরিচালিত করে, তবুও তারা নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর তত কম কাজ করবে, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে বিষয় দুটি নির্দেশনার উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন। উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হবে, তত বেশি তারা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতাকারী জিনিসগুলিতে কাজ করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা

ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পড়ে যাবে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষার সাথে চ্যালেঞ্জ করে। তারা এমনকি আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"... সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৬৬:

" তোমরা তো সেইসব লোক যারা তোমাদের জ্ঞানের ব্যাপারে তর্ক করেছে, কিন্তু তোমরা কেন এমন বিষয়ে তর্ক করছো যার ব্যাপারে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই? আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জানো না।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি অজ্ঞ থাকাকালীন পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে তর্ক করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে। এটি প্রায়শই ঘটে যখন কেউ অন্যদের বিশ্বাস এবং মতামতের ক্ষেত্রে অন্ধভাবে অনুসরণ করে, যেমন একজন পণ্ডিতের বিশ্বাস বা মতামত। সূরা ২২ আল হজ্জ, আয়াত ৮:

" আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে জ্ঞান, হেদায়েত অথবা আলোকিত কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে।"

অতএব, এই মনোভাব এড়িয়ে চলা উচিত এবং শুধুমাত্র তখনই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা উচিত যখন তাদের কাছে এই বিষয়ে জ্ঞান থাকে। এছাড়াও, একজন মুসলিম যিনি কোন নির্দিষ্ট আলেমকে অনুসরণ করেন যিনি একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের সমর্থক, তার একজন ধর্মাত্মকের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের আলেম সর্বদা সঠিক, যার ফলে তাদের আলেমের মতামতের

বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করা উচিত। এই আচরণটি আল্লাহর জন্য কিছু বা কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আলেমদের মধ্যে বৈধ মতপার্থক্য থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত একজন নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণকারী মুসলিমের উচিত এটিকে সম্মান করা এবং তাদের অনুসরণকারী আলেমের বিশ্বাসের সাথে ভিন্ন অন্যদের অপছন্দ করা নয়। তারা যে আলেমের অনুসরণ করে তারা অন্য আলেমের সাথে দ্বিমত পোষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের অনুসারীদের এই জ্ঞান থাকে না, তাই তাদের অন্য আলেমদের মতামত নিয়ে তর্ক করা বা অপছন্দ করা উচিত নয় কারণ এটি স্পষ্ট অজ্ঞতা।

এরপর মহান আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তাদের মিথ্যা দাবি সংশোধন করেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৭:

"ইব্রাহিম ইহুদিও ছিলেন না, খ্রিস্টানও ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন সত্যের প্রতি আকৃষ্ট, একজন মুসলিম [আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী]। এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"

হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, প্রতিটি পরিস্থিতিতেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে সত্যের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ঈমানের দৃঢ়তা অর্জন করলেই এটি অর্জন করা সম্ভব। দৃঢ় ঈমান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি নিশ্চিত করে যে, প্রতিটি পরিস্থিতিতে, স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময়, মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা নিশ্চিত করে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি শেখা এবং তার উপর কাজ করা হলে দৃঢ় ঈমান অর্জন করা সম্ভব হয়,

যা ব্যাখ্যা করে যে, আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তার ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। এই ব্যক্তি সহজেই আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হবে, যখন তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করা হয় কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে, তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে এবং মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত হয়। অতএব, ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমানের দৃঢ়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং তাদের জীবনের প্রতিটি জিনিসকে সঠিকভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৬৮:

" নিশ্চয়ই, মানুষের মধ্যে ইব্রাহিমের সবচেয়ে যোগ্য তারা যারা [আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে] তাকে অনুসরণ করেছে, এই নবী [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এবং যারা ঈমান এনেছে..."

মদিনায় বসবাসকারী আরব এবং আহলে কিতাবদের আল্লাহ তাআলা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, যদিও তারা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বংশধর, যা নিয়ে তারা অত্যন্ত গর্বিত ছিল, তবুও তারা কেবলমাত্র তখনই আল্লাহর আশীর্বাদ এবং করুণা লাভ করতে পারবে যখন তারা কার্যত তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, অর্থাৎ যখন তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করবে। এই আনুগত্যের একটি দিক ছিল ইসলাম, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কুরআনের

সত্যতা গ্রহণ করা, কারণ আহলে কিতাবরা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিল যে, এই সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য, যেমনটি তাদের ঐশী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তবুও তারা সত্য জানা সত্ত্বেও এ নিয়ে তর্ক করেছিল। আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে এটি নির্দেশিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

মক্কার অমুসলিমরা আরবি ভাষার উপর দক্ষ ছিল, তাই তারা জানত যে পবিত্র কুরআন কোন সৃষ্টির বাণী নয়। এবং যেহেতু তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ঘোষণার আগে চল্লিশ বছর তাঁর সাথে কাটিয়েছিল, তাই তারা জানত যে তিনি মিথ্যাবাদী নন। অধ্যায় ১০ ইউনুস, আয়াত ১৬:

"... কারণ আমি এর আগে তোমাদের মধ্যে এক জীবনকাল কাটিয়েছি। তাহলে কি তোমরা বুঝতে পারবে না?"

অবশেষে, আহলে কিতাব এবং মক্কার অমুসলিম উভয়ই জানত যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) পূর্ববর্তী ঐশী কিতাব অধ্যয়ন করেননি এবং তাই তাঁর পক্ষে পবিত্র কুরআন জাল করা অসম্ভব ছিল। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ৪৮:

"আর তুমি এর আগে কোন কিতাব পাঠ করেনি এবং তোমার ডান হাতে কোন কিতাব লিখে রাখেনি। তাহলে [অর্থাৎ, অন্যথায়] মিথ্যাবাদীদের সন্দেহের কারণ হত।"

অধিকন্তু, আল্লাহ, অমুসলিম আরব এবং আহলে কিতাবদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, যেহেতু তারা ইসলামের স্পষ্ট সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই তারা আর হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর উত্তরাধিকার বহন করার যোগ্য ছিল না, বরং এটি তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে যারা কার্যত তাঁর পথ অনুসরণ করেছিল, অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এবং তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। যদি অমুসলিম আরব এবং আহলে কিতাবরা তাদের অবাধ্যতার উপর অটল থাকে, তাহলে তারা হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর উত্তরাধিকার থেকে এই পৃথিবীতে বা পরকালে কোন উপকার পাবে না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৮:

“ নিশ্চয়ই, মানুষের মধ্যে ইব্রাহিমের সবচেয়ে যোগ্য তারা যারা [আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে] তার অনুসরণ করেছে, এই নবী [অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ, সা.] এবং যারা ঈমান এনেছে...”

মুসলমানদের অবশ্যই আহলে কিতাব এবং আরবের অমুসলিমদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে যারা পবিত্র নবী ইব্রাহিম (আঃ)-এর উত্তরাধিকার অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। বরং তাদের ইসলামী শিক্ষা শিখে এবং তার উপর আমল করে তাঁর উত্তরাধিকার অব্যাহত রাখতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে। এটি উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে এবং এই পরিণতি রোধ করতে পারে এমন যেকোনো কিছু থেকে সুরক্ষা পাবে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৬৪:

“... আর আল্লাহ হলেন মুমিনদের বন্ধু।”

অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী

শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান কখনই এই ফলাফল অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না, যতই গবেষণা করা হোক না কেন, যেহেতু তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের কারণে জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থাপন করতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান আছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণের সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি...'"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৬৮:

"... আর আল্লাহ হলেন মুমিনদের বন্ধু।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক সুরক্ষা অর্জনের শর্ত হলো সত্যিকারের বিশ্বাস গ্রহণ করা। একজন মুমিন হওয়া মুসলিম হওয়ার চেয়েও উচ্চতর, কারণ ইসলামিক জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করা একজন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ এবং প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহারের পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। একজন মুসলিম অন্যদের, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজনদের অন্ধ অনুকরণের উপর ভিত্তি করে ইসলাম গ্রহণ করে। অন্যদিকে, একজন মুমিন হওয়ার অর্থ হল ইসলামী

জ্ঞানের মধ্যে আলোচিত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণ শেখা এবং তার উপর আমল করা যাতে কেউ ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে ইসলামী শিক্ষার উপর কাজ করতে পারে। অতএব, একজনকে অবশ্যই ঈমানের দৃঢ়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে, এমনকি যখন তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করা হয় বা যখন তারা অন্যান্য জিনিস যেমন, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি দ্বারা আল্লাহকে অমান্য করতে উৎসাহিত হয়। এই মনোভাবই আল্লাহ, মহিমান্বিতের ঐশ্বরিক সুরক্ষা এবং উভয় জগতে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত 139:

"সুতরাং তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, যদি তোমরা [সত্যিকারের] বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।"

এবং অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৬৮:

"... আর আল্লাহ হলেন মুমিনদের বন্ধু।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই ঐশ্বরিক সুরক্ষা মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ঘটে না। এটি সর্বদা মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অনুসারে ঘটে। অতএব, এই ঐশ্বরিক সুরক্ষা তখনই ঘটে যখন এটি মানুষের জন্য সর্বোত্তম হয় এবং

এমনভাবে যা তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়।
সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য
কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের
জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, এই জেনে রাখা
উচিত যে, তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য দান করা হবে, কোন
না কোনভাবে, তা তাদের কাছে স্পষ্ট হোক বা না হোক। এই আনুগত্যের মধ্যে পবিত্র
কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে
ব্যবহার করা জড়িত। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে
পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান
দেব।"

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ৬৯-৭৪

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

৬৯

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِثَايَتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْنُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكُفُّوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

يَخْنُصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

“কিতাবধারীদের একদল তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে বিভ্রান্ত করে না এবং তারা তা উপলব্ধি করে না।

হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে কেন অস্বীকার করছো, অথচ তোমরাই তার সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছো?

হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে ফেলছো এবং সত্যকে গোপন করছো, অথচ তোমরা তা জানো?

আর আহলে কিতাবদের একদল[একে অপরকে] বলে, “মুমিনদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, দিনের শুরুতে তাতে বিশ্বাস করো এবং দিনের শেষে তা অস্বীকার করো, যাতে তারা[তাদের ধর্ম ত্যাগ করে] ফিরে আসে।”

আর যারা তোমাদের ধর্ম অনুসরণ করে তাদের ছাড়া আর কারো উপর বিশ্বাস করো না।” বলো, “নিশ্চয়ই[সত্য] পথই আল্লাহর পথ।[তোমরা কি ভয় করো] যে, তোমাদেরকে যেমন দেওয়া হয়েছে তেমন কাউকে দেওয়া হবে, অথবা তারা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তোমাদের সাথে বিতর্ক করবে?” বলো, “নিশ্চয়ই [সমস্ত] অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী ও প্রজ্ঞাময়।”

তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতের জন্য নির্বাচিত করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

মদীনায বসবাসকারী আহলে কিতাবদের কিছু নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য এবং আচরণ নিয়ে আলোচনা করার আগে, মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তাদের সকলেই এক রকম ছিল না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৯:

"কিতাবধারীদের একদল চায় যে তারা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারে..."

তাদের অনেকেই আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করেছিলেন, যার অর্থ হল, ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, সেই গোষ্ঠীর কিছু সদস্যের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীর বিচার না করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি প্রায়শই বৈষম্যের দিকে পরিচালিত করে, যেমন বর্ণবাদ।

আহলে কিতাবের পথভ্রষ্ট দল, যাদের বেশিরভাগই ছিল তাদের পণ্ডিতদের সমন্বয়ে গঠিত, তারা মুসলমানদের প্রতি ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে এই আচরণ করেছিল। আহলে কিতাবরা ঐশ্বরিক ওহীর প্রাপক ছিলেন এবং তাই তাদের কাছে ঐশ্বরিক জ্ঞান ছিল, তাই বৃহত্তর সমাজে, এমনকি মূর্তিপূজকদের মধ্যেও তাদের একটি বিশেষ স্থান ছিল। কিন্তু ইসলামের আগমনের মাধ্যমে এই বিশেষ মর্যাদা সরাসরি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। যদিও আহলে কিতাবের পণ্ডিতরা পবিত্র কুরআনকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, কারণ তারা এর লেখক, মহান আল্লাহ, মহিমাম্বিত, এবং তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-কে উভয়কেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তবুও তাদের ঈর্ষা তাদেরকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করেছিল। অধ্যায় ৬ আল আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

অধিকন্তু, আহলে কিতাব এবং মক্কার অমুসলিম উভয়ই জানত যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) পূর্ববর্তী ঐশী কিতাব অধ্যয়ন করেননি এবং তাই তাঁর পক্ষে পবিত্র কুরআন জাল করা অসম্ভব ছিল। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ৪৮:

"আর তুমি এর আগে কোন কিতাব পাঠ করেনি এবং তোমার ডান হাতে কোন কিতাব লিখে রাখেনি। তাহলে [অর্থাৎ, অন্যথায়] মিথ্যাবাদীদের সন্দেহের কারণ হত।"

আহলে কিতাবরা আরও ঈর্ষান্বিত ছিল যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ভাই হযরত ইসহাকের বংশধর না হয়ে বরং হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। যেহেতু

তাদের পুরো ধর্ম বংশের গুরুত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, যা তাদের মতে অন্যান্য মানবজাতির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিল, তাই তারা এমন একজন নবী (সাঃ)-কে গ্রহণ এবং অনুসরণ করতে পারত না, যিনি ভিন্ন বংশ থেকে এসেছিলেন। এটি কেবল তাদের তৈরি শ্রেষ্ঠত্বের জটিলতাকে ধ্বংস করবে।

অধিকন্তু, আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে পণ্ডিতরা জানতেন যে, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাদেরকে ঐশী শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে বাধ্য করা হবে। তারা আরও ভয় পেয়েছিলেন যে ইসলাম গ্রহণের ফলে তারা তাদের সমাজের মধ্যে অর্জিত নেতৃত্ব, সম্মান এবং সামাজিক প্রভাব হারাতে পারে। এটি তাদের ইসলাম প্রত্যাখ্যান করতে আরও উৎসাহিত করেছিল।

তাদের হিংসা এবং পার্থিব জিনিসের প্রতি ভালোবাসা তাদেরকে ইসলামকে ভুল প্রমাণ করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশী গ্রন্থের ভুল ব্যাখ্যা, সম্পাদনা এবং গোপন করতে উৎসাহিত করেছিল এবং এমনকি তারা পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছিল। এর ফলে তারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পরও অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিল এবং এর ফলে তারা উভয় জগতেই তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৯:

"কিতাবধারীদের একদল তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে বিভ্রান্ত করে না এবং তারা তা উপলব্ধি করে না।"

মহান আল্লাহর রহমত সম্পর্কে তাদের আকাঙ্ক্ষা তাদের বুঝতে বাধা দেয় যে তাদের কর্মকাণ্ড কীভাবে তাদেরকে উভয় জগতে কুফরী এবং শাস্তির দিকে নিয়ে যায়। তারা এই ভ্রান্ত বিশ্বাস গ্রহণ করে যে তারা মহান আল্লাহর প্রিয় এবং প্রিয়জন, কারণ তারা পবিত্র নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর। তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা মিথ্যাভাবে বর্ণবাদকে আল্লাহকে দায়ী করে। ৫ম সূরা আল মায়িদা, আয়াত ১৮:

"কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, "আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়জন।" বলুন, "তাহলে তিনি তোমাদের পাপের জন্য কেন শাস্তি দেন?" বরং তোমরা তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন..."

এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর অবিচার ও অবিচার আরোপ করেছিল, কারণ তারা দাবি করেছিল যে তিনি তাদের মধ্য থেকে মন্দ কর্মকারীর সাথে অন্যান্য জাতির সৎকর্মকারীর মতো আচরণ করবেন। অধ্যায় ৪৫ আল জাসিয়াহ, আয়াত ২১:

"যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমি তাদেরকে তাদের মতো করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান করে দেব? তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না মন্দ।"

অধিকন্তু, তাদের ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা তাদের এই মিথ্যা বিশ্বাসে প্ররোচিত করেছিল যে, তাদের অপরাধের জন্য যদি তাদের জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হয়, তবুও তা কেবল অল্প সময়ের জন্য হবে, কারণ তারা নিজেদেরকে বিশ্বাসী বলে মনে করত। সর্বজনীনভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, একজন বিশ্বাসী চিরকাল জাহান্নামে যাবে না। কিন্তু তারা নিজেদেরকে বোকা বানিয়েছিল, কারণ তারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, যদিও তারা এখনও অন্যান্য ঐশী গ্রন্থ এবং অন্যান্য পবিত্র নবীদের উপর বিশ্বাস করত। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ৮০:

"আর তারা বলে, "জাহান্নাম আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না, [কয়েক] দিন ছাড়া।" বলুন, "তোমরা কি আল্লাহর সাথে কোন অঙ্গীকার করেছ? কারণ আল্লাহ কখনও তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে এমন কিছু বল যা তোমরা জানো না?"

এবং ৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ১৫০-১৫১:

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, "আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে অবিশ্বাস করি" এবং এর মাঝামাঝি কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফের। আর আমরা কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।"

অতএব, মহান আল্লাহ সম্পর্কে তাদের আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে অজান্তেই অবিশ্বাসের পথে ধোঁকা দিয়েছিল। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৯:

"কিতাবধারীদের একদল তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে বিভ্রান্ত করে না এবং তারা তা উপলব্ধি করে না।"

তাই মুসলিমদের জন্য আহলে কিতাবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি উভয় জগতেই সমস্যা, চাপ এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে। মুসলিমদের অবশ্যই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর অবাধ্যতা চালিয়ে যাওয়া, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, অন্যদিকে উভয় জগতেই তাঁর রহমত এবং ক্ষমার আশা করা। অতএব, মহান আল্লাহর উপর আশা করার মধ্যে রয়েছে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে আল্লাহকে আনুগত্য করার চেষ্টা করা এবং তারপর উভয় জগতেই তাঁর রহমত এবং ক্ষমার আশা করা। যেহেতু মানুষের কাছ থেকে পরিপূর্ণতা আশা করা যায় না, তাই মহান আল্লাহর উপর আশা করার মধ্যে রয়েছে যখনই কেউ পাপ করে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ ও মানুষের প্রতি লজ্জিত যেকোনো অধিকার পূরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং আল্লাহর প্রতি আশার মধ্যে পার্থক্য এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অধিকন্তু, মুসলমানদের অবশ্যই আহলে কিতাবদের মনোভাব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ তারা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারী। এটা করা অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং কুফরের কাছাকাছি, যেমনটি কেউ দাবি করে যে, আল্লাহ, মহিমাম্বিত, মুসলমানদের মধ্যে থেকে দুষ্টদের সাথে সৎকর্মকারীদের সমান আচরণ করবেন। এটি সরাসরি আল্লাহর ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যতার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। মহান আল্লাহ, পবিত্র কুরআনে বারবার বলেছেন যে, তিনি মানুষের সাথে যে আচরণ করেন তা কখনও পরিবর্তন হয় না। যেমন তিনি পূর্ববর্তী জাতিগুলির অবাধ্য লোকদের শাস্তি দিয়েছিলেন যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন, ঠিক তেমনই তিনি তাঁর অবাধ্যতায় অবিচল থাকা মুসলিমদেরও শাস্তি দেবেন। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩:

"...কিন্তু তুমি কখনো আল্লাহর পদ্ধতিতে [অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে] কোন পরিবর্তন পাবে না, এবং তুমি কখনো আল্লাহর পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।"

অধিকন্তু, মুসলমানদের অবশ্যই আহলে কিতাবদের মনোভাব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে যারা ধরে নিয়েছিল যে তারা এখনও বিশ্বাসী, তাই তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত অনুগ্রহের অপব্যবহার করে তাঁর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, সে এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে তার ঈমান হারানোর বড় ঝুঁকিতে থাকে। কারণ ঈমান এমন একটি গাছের মতো যাকে বেড়ে ওঠার জন্য আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, তা বৃদ্ধি পেতে ব্যর্থ হয় এবং এমনকি মারাও যেতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে না এবং মৃত্যুর গুরুতর ঝুঁকিতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। অতএব, যে মুসলিম তাদের মৌখিক ঈমানের দাবি সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়,

সে হয়তো বিচারের দিন তাকে অমুসলিম হিসেবে গণ্য করবে, ঠিক যেমন আহলে কিতাবরা, যারা নিজেদেরকে আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাসী বলে দাবি করেছিল, কিন্তু ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে তাঁর অবাধ্যতা করার সময় তাকে অবিশ্বাস করেছিল।

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে পণ্ডিতদের যে দুটি জিনিস ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করতে এবং ইসলামের সত্যতা স্বীকার করার পরেও প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করেছিল, তা হল নেতৃত্ব এবং সম্পদের মতো পার্থিব জিনিসের প্রতি হিংসা এবং লোভ।

হিংসা একটি মহাপাপ যা যেকোনো মূল্যে এড়িয়ে চলতে হবে। এটি একটি মহাপাপ কারণ হিংসুক সরাসরি আল্লাহর পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করে। তারা এমন আচরণ করে যেন আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে একটি বিশেষ আশীর্বাদ প্রদান করে ভুল করেছেন। যে ব্যক্তি তাদের হিংসাকে তাদের ঈর্ষার বিরুদ্ধে মৌখিক ও শারীরিকভাবে লড়াই করতে দেয়, সে কেবল তাদের নিজস্ব সংকর্ম ধ্বংস করবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪২১০ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। বৈধ হিংসা হল যখন কেউ অন্য কারো অনুরূপ আশীর্বাদ পেতে চায়, যাতে অন্য কেউ তার প্রদত্ত জিনিসটি না হারায়। যদিও এই ধরনের হিংসা বৈধ, তবুও এটি কেবল ধর্মীয় বিষয়ে প্রশংসনীয় এবং পার্থিব বিষয়ে নিন্দনীয়। উদাহরণস্বরূপ, সহিহ মুসলিম, ১৮৯৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দুটি বৈধ ও প্রশংসনীয় ঈর্ষার পরামর্শ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাদের জ্ঞান সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যদের তা শেখায়, তাকে ঈর্ষা করা যেতে পারে। অন্য যে ব্যক্তিকে ঈর্ষা করা যেতে পারে সে হল সেই ব্যক্তি যে হালাল সম্পদ অর্জন করে এবং তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে।

হিংসা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি একটি মহাপাপ যা মহান আল্লাহর বণ্টনের পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করে। তাদের বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জন্য যা সর্বোত্তম তাই দান করেন। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, অন্যদের প্রতি ঈর্ষা করার পরিবর্তে, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এটি উভয় জগতে আরও আশীর্বাদ, মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব..."

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, অন্যদের হিংসা করলে কেবল মহান আল্লাহর আনুগত্য ভুলে যেতে হবে, যা উভয় জগতেই বিপদ ডেকে আনবে। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ্ বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"]

যে মুসলিমের উপর ঈর্ষা করা হয় তাকে অবশ্যই তার ঈর্ষাকারীর মৌখিক ও শারীরিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ধৈর্য ধরতে হবে এবং কেবল ইসলামের সীমানার মধ্যেই আত্মরক্ষা করতে হবে। ধৈর্যের অর্থ হলো নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা, যার অর্থ হলো পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত নিয়ামতগুলো ব্যবহার করা। এভাবেই একজন ব্যক্তি তার ঈর্ষাকারী থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সূরা ১১৩ আল ফালাক, আয়াত ১ এবং ৫:

"বলুন, "আমি প্রভাতের প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা করছি...এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"

তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের হিংসুকদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়, কারণ মহান আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে কাজ করেন, মানুষের সীমিত চিন্তাভাবনা অনুসারে নয়।

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে পণ্ডিতদের যে দুটি জিনিস ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করতে এবং ইসলামের সত্যতা স্বীকার করার পরেও প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করেছিল, তা হল নেতৃত্ব এবং সম্পদের মতো পার্থিব জিনিসের প্রতি হিংসা এবং লোভ।

অতএব, সম্পদ ও নেতৃত্বের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি ঈমানের ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক। কারণ যে ব্যক্তি এই জিনিসগুলি কামনা করে সে এগুলি অর্জনের জন্য তাদের ঈমানের সাথে আপস করবে। তারা এগুলি অর্জন করার সময় এবং এগুলি ধরে রাখার সময় মহান আল্লাহর অবাধ্য হবে, কারণ মহান আল্লাহকে অবাধ্য না করে নেতৃত্ব এবং অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করা সম্ভব নয়, বিশেষ করে এই দিন এবং যুগে। এই জিনিসগুলি যত বেশি কামনা করবে, তত বেশি তারা মহান আল্লাহকে অবাধ্য হবে

এবং অন্যদের প্রতি অন্যায় করবে। ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে এবং নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করার মতো নেতৃত্ব এবং সম্পদ অর্জনের জন্য মানুষ কতদূর এগিয়েছে তা দেখলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একজন মুসলিমের উচিত তাদের চাহিদা এবং দায়িত্ব অনুসারে বৈধ সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা করা এবং যদি তারা নেতৃত্বের পদে নিযুক্ত হন, তাহলে তা এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে তা তাদের এবং উভয় জগতের অন্যদের জন্য শান্তির উৎস হয়ে ওঠে। অন্যথায়, ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত, সম্পদ এবং নেতৃত্বের অপব্যবহার উভয় জগতের জন্য এর ধারকদের জন্য কেবল চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করবে, এমনকি যদি এটি তাদের বা অন্যদের কাছে স্পষ্ট না হয়।

অতএব, তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পদ ও নেতৃত্বের প্রতি ভালোবাসা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি তাদের হিংসা, আহলে কিতাবদের আলেমদের ইসলামের সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে এবং এমনকি এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাধ্য করেছিল , কারণ তারা ধরে নিয়েছিল যে তাদের ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার কারণে তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক ক্ষমাপ্রাপ্ত হবেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৯-৭১:

"কিতাবধারীদের একদল তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে বিভ্রান্ত করে না, আর তারা তা উপলব্ধি করে না। হে কিতাবধারীরা, তোমরা আল্লাহর আয়াত কেন অস্বীকার করছো, অথচ তোমরা তাদের সত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে? হে কিতাবধারীরা, তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে ফেলছো এবং সত্যকে গোপন করছো, যদিও তোমরা তা জানো?"

সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের পর ইহুদিদের একজন নেতা কিছু সাহাবীকে ইসলাম ত্যাগ করে ইহুদি ধর্ম গ্রহণের জন্য

আমন্ত্রণ জানানোর পর আয়াত ৬৯ নাজিল হয়। তানভীর আল মিকবাস মিন তাফসির ইবনে আব্বাস, ৩:৬৯, পৃষ্ঠা ৬১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অতএব, এটি আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার গুরুত্বকে নির্দেশ করে, কারণ শয়তান এবং তার সহযোগীরা সর্বদা মুসলমানদেরকে আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করতে উৎসাহিত করবে, বিশেষ করে যখন তারা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়। কঠিন সময়গুলি কেবল একটি পরীক্ষা যা দেখায় যে কারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং কারা বিশ্বাস করে না। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ২-৩:

"মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি, আর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা মিথ্যাবাদী।"

অতএব, আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমানের মৌখিক ঘোষণা প্রমাণ করতে হবে, তাঁর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকার মাধ্যমে, তারা কষ্টের সময় হোক বা স্বস্তির সময়। সুখের সময়, তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এবং কঠিন সময়ে, তাদের ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতেই পুরস্কার এবং মানসিক শান্তি পাবে। নিয়তে কৃতজ্ঞতা বলতে কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা জড়িত। কথায় কৃতজ্ঞতা বলতে ভাল কথা বলা বা নীরব থাকা জড়িত। এবং কাজের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা বলতে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা জড়িত। এছাড়াও, ধৈর্য বলতে নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে

চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা বোঝায়, বিশ্বাস করে যে তিনি কেবল তার জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক পথে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থন এবং করুণা লাভ করবে, যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৬৯-৭১:

"কিতাবধারীদের একদল তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে বিভ্রান্ত করে না, আর তারা তা উপলব্ধি করে না। হে কিতাবধারীরা, তোমরা আল্লাহর আয়াত কেন অস্বীকার করছো, অথচ তোমরা তাদের সত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে? হে কিতাবধারীরা, তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে ফেলছো এবং সত্যকে গোপন করছো, যদিও তোমরা তা জানো?"

আহলে কিতাবদের পণ্ডিতরা প্রকাশ্যে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশ্বরিক শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা, সম্পাদনা এবং গোপন করেছেন যেখানে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

তাই মুসলমানদের অবশ্যই এমন আচরণ এড়িয়ে চলতে হবে যেখানে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে নেতৃত্ব এবং সম্পদের মতো পার্থিব লাভের জন্য ইসলামী শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে কেবল তাদের আকাউফার পূজা করছে, যদিও তারা অন্যথা দাবি করে। অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

ফলস্বরূপ, পবিত্র কুরআন বিচারের দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। পবিত্র কুরআন যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তার কী হবে তা নির্ধারণ করার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না।

অধিকন্তু, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে পবিত্র কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা করে এবং ফলস্বরূপ অন্যরা তাদের পথভ্রষ্টতায় তাদের অনুসরণ করে, সে যতজনকে পথভ্রষ্ট করে তার উপর নির্ভর করে তার শাস্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ১৬ নং সূরা আন নাহল, আয়াত ২৫:

"যাতে তারা কিয়ামতের দিন তাদের পাপের বোঝা (অর্থাৎ পাপের) সম্পূর্ণরূপে বহন করে এবং যাদেরকে তারা অজ্ঞতাবশত পথভ্রষ্ট করে, তাদের বোঝারও কিছু অংশ বহন করে। নিঃসন্দেহে, তারা যা বহন করে তা খুবই মন্দ।"

এটাই হলো আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদের উপর এত রাগান্বিত হওয়ার একটি প্রধান কারণ, কারণ তারা কেবল নিজেরাই নয় বরং আরও অনেককে বিভ্রান্ত করেছিল। পরবর্তী আয়াতে এটি নির্দেশিত হয়েছে। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৭২:

“ আর আহলে কিতাবদের একদল[একে অপরকে] বলে, “দিনের শুরুতে মুমিনদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করো এবং দিনের শেষে তা অস্বীকার করো, যাতে তারা ফিরে আসে[অর্থাৎ, তাদের ধর্ম ত্যাগ করে]।”

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরতের পর দ্বিতীয় বছরে, নামাজের দিক, কিবলা, জেরুজালেমের মসজিদ আকসা থেকে মক্কার কাবাতে পরিবর্তন করা হয়েছিল। ইহুদিদের কাছে নামাজের দিক পরিবর্তন করা কঠিন মনে হয়েছিল কারণ পূর্ববর্তী নামাজের দিকটি তাদের নামাজের দিকের সাথে মিলে গিয়েছিল এবং তাই তারা এটিকে তাদের সঠিক পথের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছিল। ইহুদি নেতাদের একজন কা'ব বিন আশরাফ তার কিছু অনুসারীকে প্রথমে ইসলামে বিশ্বাস করার এবং সাহাবীদের সাথে মক্কার দিকে প্রার্থনা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, এবং তারপর দিনের শেষে ইসলাম এবং মুসলমানদের নামাজের দিক অস্বীকার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি সাহাবীদের বিভ্রান্ত করার লক্ষ্য রেখেছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, এবং আশা করেছিলেন যে তারা মদিনার শিক্ষিত এবং শিক্ষিত মানুষ হওয়ায় তাদের অনুসরণ করবে। অর্থ, যদি শিক্ষিত লোকেরা ইসলাম সম্পর্কে জানার পরে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তা অবশ্যই ভুল। এই বিষয়ে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আলে ইমরানের সূরা ৩, আয়াত ৭২-৭৩ নাযিল করেছেন:

"আর আহলে কিতাবদের একদল[একে অপরকে] বলে, "দিনের শুরুতে মুমিনদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করো এবং দিনের শেষে তা প্রত্যাখ্যান করো, হয়তো তারা ফিরে আসবে[অর্থাৎ, তাদের ধর্ম ত্যাগ করবে]। আর বিশ্বাস করো না তাদের ছাড়া যারা তোমাদের ধর্ম অনুসরণ করে..."

ইমাম ওয়াহিদীর " আসবাব আল নুযুল" , ৩:৭২, পৃষ্ঠা ৩৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি অন্যদের অন্ধভাবে অনুসরণ করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে। কোন কিছু গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জ্ঞান এবং প্রমাণ অনুসারে প্রতিটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা উচিত। এই কারণেই মহান আল্লাহ মানুষকে সাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন। এমনকি ইসলাম অন্ধভাবে ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করার সমালোচনা করেছে, কারণ মহান আল্লাহ চান মানুষ খোলা মনে ইসলামী শিক্ষা মূল্যায়ন করুক এবং তা বোধগম্যতা ও অন্তর্দৃষ্টির সাথে অনুসরণ করুক। ১২ সূরা ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

এবং ৩৪তম অধ্যায় সাবা, ৪৬তম আয়াত:

"বলুন, "আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি- তোমরা আল্লাহর জন্য জোড়ায় জোড়ায় এবং এককভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, তারপর চিন্তা করো।" তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন পাগলামি নেই। তিনি কেবল তোমাদেরকে কঠোর শাস্তির পূর্বে সতর্ককারী।"

অতএব, অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে, এমনকি যদি তা জনপ্রিয় মতামতও হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জ্ঞান এবং প্রমাণ অনুসারে প্রতিটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার জন্য তাদের সাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধি ব্যবহার করতে হবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে তার ধর্মীয় এবং পার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৭৩:

"আর যারা তোমাদের ধর্ম অনুসরণ করে তাদের ছাড়া অন্য কারো উপর বিশ্বাস করে না..."

আহলে কিতাবদের পণ্ডিতরা এই বক্তব্য দিয়েছিলেন কারণ তারা ভয় পেয়েছিলেন যে তাদের অজ্ঞ অনুসারীরা ইসলামের শিক্ষা শুনবে এবং ফলস্বরূপ তা গ্রহণ করবে। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম ধর্মপ্রচারক একই আচরণ করেন, কারণ তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের অজ্ঞ অনুসারীদের সতর্ক করেন যে তারা বিভিন্ন মতবাদের অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের দিকে মনোযোগ দেবেন না কারণ তারা ভয় পান যে তাদের অজ্ঞ অনুসারীরা তাদের অনুসরণ করা বন্ধ করে অন্যদের অনুসরণ করবে। এটি মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের একটি প্রধান কারণ। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, মুসলমানদের অন্ধ অনুকরণ এড়িয়ে অন্যদের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে হবে এবং পরিবর্তে তাদের পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য

শেখা, বোঝা এবং তার উপর আমল করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৭৩:

"... বলুন, "নিশ্চয়ই [সত্য] পথনির্দেশনা হলো আল্লাহর পথনির্দেশনা..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একমাত্র আল্লাহই মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জ্ঞান রাখেন যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে। একমাত্র তিনিই এই জ্ঞান রাখেন যে মানুষ তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেয়। অতএব এই মনোভাব উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। যদিও জ্ঞান, দূরদর্শিতা, অভিজ্ঞতা এবং পক্ষপাতের কারণে সমস্ত মানবসৃষ্ট আচরণবিধি এই ফলাফল অর্জন করতে পারে না। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের নিজের জন্য ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের একজন জ্ঞানী রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। যেভাবে এই জ্ঞানী রোগী ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, সেইভাবে যিনি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের প্রেসক্রাইব করা ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই অন্ধভাবে তাদের ডাক্তারের উপর বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষার উপর চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা অন্ধভাবে ইসলামের শিক্ষার উপর বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা

এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি...'"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৭৩:

"... বলুন, "নিশ্চয়ই [সত্য] পথনির্দেশনা হলো আল্লাহর পথনির্দেশনা..."

এই আয়াতটি নির্দেশ করে যে, দুটি পথনির্দেশনার উৎস: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীসের শিক্ষা কঠোরভাবে মেনে চলা এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর আমল করা এড়িয়ে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি আমল করা হবে, এমনকি যদি তা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে, তবুও তারা পথনির্দেশনার দুটি উৎসের উপর আমল করা তত কম করবে, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই মহানবী (সা.) সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বর হাদীসে সতর্ক করে বলেছেন যে, যে বিষয় দুটি পথনির্দেশনার উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করবেন। উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি আমল করা হবে, তত বেশি তারা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলিতে আমল করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পা দেবে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"... সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা

শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

এরপর আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা ভয় পেয়েছিলেন যে তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নেতৃত্ব এবং সামাজিক প্রভাব হারাবেন, তাদের সমালোচনা করেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৭৩:

"... [তুমি কি ভয় পাও] যেভাবে তোমাকে দেওয়া হয়েছে, তেমনভাবে কাউকে দেওয়া হবে..."

এই ভয়ই অন্যদের হিংসা এবং হিংসার ফলে সৃষ্ট নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের দিকে পরিচালিত করে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, একজনকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে এবং মেনে নিতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জন্য যা সর্বোত্তম তা দান করেন। অতএব, তাদের উচিত আল্লাহ যা দিয়েছেন তা সঠিকভাবে ব্যবহারের উপর মনোনিবেশ করা এবং অন্যদের যা দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন না হওয়া। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য পাবে।

আহলে কিতাবদের পণ্ডিতরা আরও আশঙ্কা করেছিলেন যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসের আকারে মুসলমানদের যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে আহলে কিতাবদের পণ্ডিতরা কীভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের প্রদত্ত ঐশ্বরিক জ্ঞান সম্পাদনা, ভুল ব্যাখ্যা এবং গোপন করেছিলেন, তা বিচারের দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৭৩:

"... [তুমি কি ভয় পাও যেভাবে তোমাকে দেওয়া হয়েছে, অন্য কাউকেও দেওয়া হবে, অথবা তারা [এর ফলে] তোমার প্রভুর সামনে তোমার সাথে তর্ক করবে?]"...

বাস্তবে, কেউ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিক বা না দিক, বিচারের দিনে তাদের নিজেরাই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। সূরা ২৪ আন নূর, আয়াত ২৪:

"যেদিন তাদের জিজ্ঞাসা, তাদের হাত এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।"

অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ প্রতিটি নিয়ত, কথা এবং কাজের জন্য জবাবদিহি করা থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই। বরং, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে।

মহান আল্লাহ তাআলা সেই সত্যটি ব্যাখ্যা করেছেন যা আহলে কিতাবদেরকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ঈর্ষান্বিত হতে বাধা দিত। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৭৩-৭৪:

“... বলো, “নিশ্চয়ই [সমস্ত] অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে - তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী ও প্রজ্ঞাময়।” তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর করুণার জন্য নির্বাচিত করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।”

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির আল্লাহর সাথে সমস্যা থাকে, কারণ তিনিই একমাত্র উভয় জগতের বরকতের বন্টন নির্ধারণ করেন। এবং যদি কেউ দাবি করে যে তারা মহান আল্লাহতে বিশ্বাস করে, তাহলে তাদের মেনে নেওয়া উচিত যে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যা সর্বোত্তম তা দান করেন কারণ তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বজ্ঞ। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৭৩:

"... আর আল্লাহ সর্বব্যাপী ও প্রজ্ঞাময়।"

অতএব, ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির উচিত ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহারের উপর মনোনিবেশ করা যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। এই আচরণ নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মহান আল্লাহর রহমত পাবে। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৭৪:

" তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতের জন্য নির্বাচিত করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।"

অন্যদিকে, যদি কোন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি তাদের ঈর্ষাকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়, তাহলে তারা উভয় জগতেই এই করুণা থেকে বঞ্চিত হবে কারণ তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে।

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ৭৫-৭৮

❦ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمُتَيْنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤْنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

“আর আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যাদের কাছে যদি তুমি প্রচুর পরিমাণে [ধন-সম্পদ] আমানত রাখো, তারা তোমাকে তা ফিরিয়ে দেবে। আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যাদের কাছে যদি তুমি একটি [একটি] মুদ্রাও আমানত রাখো, তবুও তারা তোমাকে তা ফেরত দেবে না যতক্ষণ না তুমি তার উপর সর্বদা দাঁড়িয়ে থাকো [তা দাবি করো]। এর কারণ হল তারা বলে, “অশিক্ষিতদের ব্যাপারে আমাদের কোন অভিযোগ নেই।” এবং তারা জেনেশুনে আল্লাহর উপর মিথ্যা কথা বলে।

কিন্তু হ্যাঁ, যে ব্যক্তি তার অঙ্গীকার পূরণ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে - তাহলে প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তাঁকে ভয় করে।

নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার এবং তাদের শপথ সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিনিময় করে, তাদের পরকালে কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আর অবশ্যই তাদের মধ্যে এমন একদল আছে যারা তাদের জিহ্বা দিয়ে কিতাব পরিবর্তন করে যাতে তোমরা মনে করো এটা কিতাব থেকে, অথচ এটা কিতাব থেকে নয়। আর তারা বলে, "এটা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে," অথচ এটা আল্লাহর কাছ থেকে নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে।"

মদীনায বসবাসকারী আহলে কিতাবদের কিছু নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য এবং আচরণ নিয়ে আলোচনা করার আগে, মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তাদের সকলেই এক রকম ছিল না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৭৫:

"আর আহলে কিতাবদের মধ্যে এমনও আছে, যদি তুমি তার কাছে প্রচুর পরিমাণে [ধন-সম্পদ] আমানত রাখো, তবে সে তোমাকে তা ফিরিয়ে দেবে..."

তাদের অনেকেই আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করেছিলেন, যার অর্থ হল, ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, সেই গোষ্ঠীর কিছু সদস্যের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীর বিচার না করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি প্রায়শই বৈষম্যের দিকে পরিচালিত করে, যেমন বর্ণবাদ।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৭৫:

"... আর তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে, যদি তুমি তার কাছে একটি [একক] মুদ্রাও অর্পণ করো, তবে সে তোমাকে তা ফেরত দেবে না যতক্ষণ না তুমি তার উপরে ক্রমাগত দাঁড়িয়ে থাকো [দাবি করো]..."

বর্ণিত হাদিস অনুসারে , আমানতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা মুনাফিকির একটি দিক এবং তাই এটি এড়িয়ে চলা উচিত। আমানতের সাথে আল্লাহ এবং অন্যান্য মানুষের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। প্রতিটি আমানতই আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আমানত, যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এই আমানত তখনই পূর্ণ হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে বর্ণিত আমানতগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে এবং নিশ্চিত করে যে তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেয় এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হয়। এই আমানত পূরণ করার ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। এছাড়াও, একজন ব্যক্তিকে তাদের এবং অন্যান্য মানুষের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি অন্যদের দ্বারা প্রতারণিত বা বিশ্বাসঘাতকতা করা পছন্দ করে না, তেমনি তাদের অন্যদের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রতারণা করা উচিত নয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস এড়িয়ে চলতে হবে যে, মহান আল্লাহ কেবল ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে আগ্রহী, যেমন নামায, এবং তাই তিনি মানুষকে তাদের পার্থিব বিষয়ের জন্য, যেমন অন্যদের কাছে তাদের আর্থিক আমানতের জন্য জবাবদিহি করবেন না। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ ইসলাম একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি যা একজন ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতির উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে, তা সে ধর্মীয় পরিস্থিতি হোক বা পার্থিব। অধ্যায় ১৭ আল ইসরা, আয়াত ৩৪:

"...এবং [প্রতিটি] অঙ্গীকার পূরণ করো। প্রকৃতপক্ষে, অঙ্গীকার সর্বদা [যার বিষয়ে] জিজ্ঞাসা করা হবে।"

প্রতিটি উদ্দেশ্য, কথা এবং কাজ, তা পার্থিব হোক বা ধর্মীয়, বিচারের দিনে জবাবদিহি করা হবে তা বুঝতে ব্যর্থ হওয়াই ছিল আহলে কিতাবদের বিপথগামী মনোভাব, যা

তাদেরকে অন্যদের প্রতি অন্যায় করতে উৎসাহিত করেছিল। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৭৫:

"... আর তাদের মধ্যে এমনও আছে, যদি তুমি তার কাছে একটি পয়সাও আমানত রাখো, তবুও সে তোমাকে তা ফেরত দেবে না যতক্ষণ না তুমি তার উপর সর্বদা দাঁড়িয়ে থাকো [দাবি করো]। এর কারণ হল তারা বলে, "অশিক্ষিতদের ব্যাপারে আমাদের কোন দোষ নেই।" এবং তারা জেনেও আল্লাহর উপর মিথ্যা কথা বলে।"

উপরন্তু, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আরও এক ধাপ এগিয়ে দাবি করেছেন যে অন্যান্য জাতির লোকদের, যেমন মূর্তিপূজকদের, তাদের ঐশী গ্রন্থ অনুসারে গ্রহণযোগ্য। এই দাবি করে তারা মহান আল্লাহর প্রতি অবিচার এবং অবিচার আরোপ করেছে, যা স্পষ্ট কুফরি। এটি বোঝার জন্য পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। অতএব, একজন ব্যক্তির এমন আচরণ করার কোনও অজুহাত ছিল না। দুঃখের বিষয় হল, কিছু অজ্ঞ মুসলিম একইভাবে আচরণ করে যার মাধ্যমে তারা ব্যবসায়িক লেনদেনের মতো পার্থিব বিষয়ে অন্যদের উপর অন্যায় করে, অন্যদিকে দাবি করে যে অমুসলিমদের প্রতি এমন আচরণ করা গ্রহণযোগ্য। মুসলমানদের এই অজ্ঞ আচরণ এড়িয়ে চলতে হবে এবং আহলে কিতাবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে, অন্যথায় তারা বিচারের দিনে তাদের সাথেই উশ্বিত হতে পারে। সুনানে আবু দাউদের ৪০৩১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে যে ব্যক্তি এইভাবে অন্যদের উপর অন্যায় করে তাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে, যা সবচেয়ে সম্ভাব্য ফলাফল, কারণ মানুষ এতটা করুণাময় নয়, তাহলে অত্যাচারীকে তাদের নেক আমল তাদের শিকারকে দিতে বাধ্য করা হবে এবং প্রয়োজনে, অত্যাচারী তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করবে, যতক্ষণ না ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে বিচারের দিন অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে, এমনকি যদি তারা

মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করে। সহীহ মুসলিম, ৬৫৭৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ইসলাম স্পষ্ট করে বলে যে, প্রত্যেকের সাথে, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে, শ্রদ্ধা ও সদয় আচরণ করা উচিত, ঠিক যেমন তারা চায় যে লোকেরা তাদের সাথে সম্মান ও সদয় আচরণ করুক। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম বা মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের এবং তাদের সম্পদ থেকে দূরে রাখে। সুনান আন নাসায়, ৪৯৯৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ৭৬:

"কিন্তু হ্যাঁ, যে ব্যক্তি তার অঙ্গীকার পূরণ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে - তাহলে প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তাঁকে ভয় করে।"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের সাথে করা প্রতিটি অঙ্গীকার পূরণ করার জন্য একজন ব্যক্তির অবশ্যই প্রচেষ্টা করতে হবে। এই আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, এই অঙ্গীকার পূরণ করা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে করতে হবে, নিজের সংজ্ঞা অনুসারে নয়। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ, মহান আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত আশীর্বাদগুলি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে পূরণ করতে হবে, নিজের চিন্তাভাবনা অনুসারে নয়। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে তার জীবনে স্থান দেবে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসবে। অতএব, একজন ব্যক্তির অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর কাজ করতে হবে, এমনকি যদি তা তার আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের এমন একজন জ্ঞানী রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা

নির্ধারিত হয়। ঠিক যেভাবে এই জ্ঞানী রোগী ভালো মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর কাজ করেন তিনিও ভালো হবেন। কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই আছে। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ তাকে সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে সাহায্য করতে পারে না এবং তার পরামর্শ তাকে তার জীবনের প্রতিটি জিনিস এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে সাহায্য করতে পারে না, কারণ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসের আকারে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্যটি তখনই স্পষ্ট হয় যখন কেউ দেখে যে কে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ইসলামী শিক্ষা অনুসারে ব্যবহার করে এবং কে করে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের প্রেসক্রাইব করা ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই অন্ধভাবে তাদের ডাক্তারের উপর বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষার উপর চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা অন্ধভাবে ইসলামের শিক্ষার উপর বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

অধিকন্তু, যে ব্যক্তি সঠিক আচরণ করবে তাকে ঐশ্বরিক ভালোবাসা দেওয়া হবে। এটি উভয় জগতে তাদের মানসিক শান্তি বৃদ্ধি করবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৭৬:

"... তাহলে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তাঁকে ভয় করে।"

এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে আনুগত্যের মাধ্যমে সমর্থন না করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে ঐশ্বরিক শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা, যা একজন ব্যক্তিকে

আল্লাহর অধিকার এবং মানুষের অধিকার পূরণ করতে সাহায্য করবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৭৭:

"নিশ্চয়ই, যারা আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার এবং তাদের শপথ সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিনিময় করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই, এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না; এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

বিশেষ করে, এটি আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে সেইসব আলেমদের বোঝাতে পারে যারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রহণ করে আল্লাহর সাথে তাদের অঙ্গীকার পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, যা তারা তাদের ঐশী কিতাবগুলির মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

তারা এইভাবে আচরণ করেছিল কারণ তারা জানত যে ইসলাম গ্রহণের ফলে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকবে এবং তারা ভয় পেয়েছিল যে ইসলাম গ্রহণের ফলে তারা তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্জিত সামাজিক মর্যাদা এবং নেতৃত্ব হারাবে। অতএব, নেতৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি তাদের ঈমানের সাথে আপোষ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করে বলেছেন যে নেতৃত্ব এবং সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা একজন ব্যক্তির ঈমানের জন্য দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক, যাদেরকে ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। কারণ এই দুটি জিনিসের জন্য অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা সহজেই কাউকে আল্লাহ, মহান আল্লাহকে অমান্য করতে বাধ্য করতে পারে, যখন সেগুলি অর্জন করে, সেগুলিকে ধরে রাখে এবং বৃদ্ধি করে। নিজের চাহিদা এবং দায়িত্ব অনুসারে বৈধ জিনিসগুলি অনুসরণ করা সর্বদা অনেক বেশি নিরাপদ। এইভাবে আচরণ করা একজন ব্যক্তিকে উভয় জগতের চাপ এবং সম্ভাব্য শাস্তি থেকে রক্ষা করে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৭৭:

"নিশ্চয়ই, যারা আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার এবং তাদের শপথ সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিনিময় করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না; এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন ব্যক্তি কেবল সম্পদ এবং নেতৃত্ব অর্জনের মতো পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই আল্লাহর প্রতি তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণা সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্য বজায় রাখতে বাধা দেবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলা তৈরি হবে। যত বেশি এইভাবে আচরণ করবে, তত বেশি তারা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ডুবে যাবে, যেমন হতাশা, মাদকদ্রব্যের সংমিশ্রণ এবং আত্মহত্যার প্রবণতা, এমনকি যদি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। সূরা তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ্ বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"]"

যেহেতু এই ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর বাণী উপেক্ষা করেছে, তাই পরকালে তারা তাঁর সাথে প্রেমময়ভাবে কথা বলা থেকে বঞ্চিত হবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৭৭:

" নিশ্চয়ই, যারা আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার এবং তাদের শপথকে সামান্য মূল্যে বিনিময় করে, তাদের পরকালে কোন অংশ নেই এবং আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না..."

যেহেতু তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপর তাদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করেনি, বরং তারা তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে পার্থিব লাভের উপর, যেমন সম্পদ অর্জনের উপর কেন্দ্রীভূত করেছিল, তাই তারা মহান আল্লাহ, যিনি তাদের প্রতি ভালোবাসা এবং যত্নশীল, তাঁর সান্নিধ্য লাভের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে। সূরা ৫১ আয ধরিয়াত, আয়াত ৫৬:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত[আনুগত্য] করার জন্যই সৃষ্টি করিনি।"

এবং অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৭৭:

"... আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না..."

যেহেতু তারা ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত ভালো গুণাবলী, যেমন উদারতা, ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে পবিত্র করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত নেতিবাচক গুণাবলী, যেমন হিংসা, অহংকার এবং লোভ এড়িয়ে চলেছিল, তাই তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর দ্বারা পবিত্র হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৭৭:

"... আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, এবং তাদের পবিত্রও করবেন না..."

এইসবের পরিণতি কেবল কঠোর এবং অকল্পনীয় শাস্তি। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৭৭:

"...এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমান হলো এমন একটি গাছের মতো যাকে বেড়ে ওঠার জন্য আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি না পেলেও বেড়ে উঠতে পারে না এবং এমনকি মারাও যেতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমানও বেড়ে উঠতে পারে না এবং মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৭৭:

"নিশ্চয়ই, যারা আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার এবং তাদের শপথ সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিনিময় করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না; এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

জামে আত তিরমিযী, ২৯৯৬ নম্বর হাদিস অনুসারে, এই আয়াতটি তখন নাযিল হয় যখন একজন সাহাবী, আশ'আত বিন কায়েস, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, একজন ইহুদীর সাথে তার জমির একটি অংশ নিয়ে বিরোধে লিপ্ত হন। যেহেতু সাহাবী, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তার কাছে মালিকানার প্রমাণ না থাকায়, মহানবী মুহাম্মদ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীকে শপথ করতে আদেশ দেন যে জমিটি তার। সাহাবী, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, অভিযোগ করেন যে, ইহুদী সম্পত্তি দখল করার জন্য মিথ্যা শপথ করে মিথ্যা শপথ করে। এই ঘটনার পর এই আয়াতটি নাযিল হয়।

এই প্রসঙ্গে, এই আয়াতটি মিথ্যা শপথ করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে। সতর্কীকরণ হিসেবে এটা জানা যথেষ্ট যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অন্যায়ভাবে কারো সম্পত্তি দখল করার জন্য আদালতের মামলায় মিথ্যা শপথ করে, সে জাহান্নামে যাবে, এমনকি যদি সে গাছের একটি ডালও ধরে। দুঃখের বিষয়, মুসলিম দেশগুলিতে এইভাবে মিথ্যা শপথ প্রায়শই ঘটে কারণ তারা অজ্ঞতার সাথে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদের ধর্মীয় অনুশীলনের যত্ন নেন, যেমন নামাজ। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, ইসলাম একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি যা একজন ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রভাবিত করে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে পার্থিব বা ধর্মীয় পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি উদ্দেশ্য, কথা এবং কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। অতএব, একজন মুসলিমকে অন্যদের প্রতি অন্যায় করা থেকে বিরত থাকতে হবে কারণ বিচারের দিন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ন্যায়বিচার অন্যায়কারীকে জাহান্নামে যেতে পারে। সহিহ মুসলিমের 6579 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেন যে, আহলে কিতাবদের কিছু পণ্ডিত কীভাবে পার্থিব লাভ, যেমন সম্পদ এবং নেতৃত্ব, লোভের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশী কিতাবের ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৭৮:

"আর অবশ্যই, তাদের মধ্যে এমন একটি দল আছে যারা তাদের জিহ্বা দিয়ে কিতাব পরিবর্তন করে যাতে তোমরা মনে করো এটি কিতাব থেকে, অথচ এটি কিতাব থেকে নয়। আর তারা বলে, "এটা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে," অথচ এটি আল্লাহর কাছ থেকে নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহর উপর মিথ্যা কথা বলে।"

তাই মুসলমানদের অবশ্যই পার্থিব লাভের জন্য পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সাঃ) এর হাদীসের ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা করার এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি উভয় জগতেই সমস্যা সৃষ্টি করে। এইভাবে আচরণ করে যে পার্থিব জিনিসগুলি পাওয়া যায় তা উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি যদি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে এবং পরকালে তাদের জন্য অপেক্ষা করা শাস্তি আরও খারাপ হয়। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

এছাড়াও, মনে রাখতে হবে যে, তাদের পাপ তাদের মৃত্যুর পরেও বৃদ্ধি পেতে থাকবে, যতক্ষণ না অন্যরা তাদের ভুল পরামর্শ অনুসারে কাজ করে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৭৮:

"আর অবশ্যই, তাদের মধ্যে এমন একটি দল আছে যারা তাদের জিহ্বা দিয়ে কিতাব পরিবর্তন করে যাতে তোমরা মনে করো এটি কিতাব থেকে, অথচ এটি কিতাব থেকে নয়। আর তারা বলে, "এটা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে," অথচ এটি আল্লাহর কাছ থেকে নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহর উপর মিথ্যা কথা বলে।"

দুঃখের বিষয় হল, এই মানসিকতার একটি ক্ষুদ্রতর রূপ প্রায়শই মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে দেখা যায় যারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সাঃ) এর হাদীসগুলিকে তাদের চিন্তাধারার আলোকে ব্যাখ্যা করেন। এর মাধ্যমে, তারা অজ্ঞ মুসলমানদের এই বিশ্বাসে বিভ্রান্ত করে যে তাদের চিন্তাধারা এবং তাদের চিন্তাধারা দ্বারা নির্ধারিত কর্মকাণ্ড অনুসরণ করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তিনি তাদের কাছ থেকে এটাই চান, যদিও এই কর্মকাণ্ডগুলি আসলে পবিত্র কুরআন বা মহানবী (সাঃ) এর হাদীসে পাওয়া যায় না। তারা এইভাবে আচরণ করে কারণ তারা চায় না যে তাদের অনুসারীরা তাদের চিন্তাধারা ত্যাগ করুক এবং পরিবর্তে সত্যের কাছাকাছি অন্য কোন চিন্তাধারাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করুক। এই পণ্ডিতদের উচিত ছিল তাদের চিন্তাধারার পরিবর্তে, মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করা, মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করা।

একজন মুসলিম পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সাঃ)-এর হাদীস শেখা, বোঝা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে এই ধরনের বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের অনুসরণ করা এড়াতে পারে। যত বেশি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং আমল করা হবে, অন্যরা তত কম তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারবে। কিন্তু যদি কেউ অজ্ঞতাকে তাদের পথ হিসেবে বেছে নেয়, তাহলে তারা অনিবার্যভাবে অন্যদের অন্ধভাবে অনুসরণ করবে এবং ফলস্বরূপ, তারা এমন কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে পারে যে ইচ্ছাকৃতভাবে ঐশী শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করে। সুনানে ইবনে মাজাহ, ২২৪ নম্বরে পাওয়া হাদিস অনুসারে, ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং আমল করা প্রতিটি মুসলিমের উপর একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য, যে ব্যক্তি অন্ধভাবে ভুল ব্যক্তির অনুসরণ করবে তাকে তার

পছন্দের জন্য দায়ী করা হবে। যাদের ইসলামী জ্ঞানের অ্যাক্সেস ছিল তাদের মধ্যে থেকে মহান আল্লাহ তায়ালা অজ্ঞতাকে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করবেন না।

অধ্যায় ৩ - আলী ইমরান, আয়াত ৭৯-৮৫

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾

فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

“কোন মানুষের[অর্থাৎ নবীর] জন্য এটা সম্ভব নয় যে আল্লাহ তাকে কিতাব, জ্ঞান ও নবুওত দান করবেন এবং তারপর সে মানুষকে বলবে, “আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার দাস হও”, বরং [তিনি বলতেন], “তোমরা কিতাব শিক্ষা দিয়েছ এবং যা অধ্যয়ন করেছ তার জন্য তোমরা আল্লাহর ধার্মিক জ্ঞানী হও।”

আর সে কি তোমাদেরকে ফেরেশতা ও নবীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিতে পারে না? তোমরা মুসলিম হওয়ার পর কি সে তোমাদেরকে কুফরী করতে বলবে?

আর যখন আল্লাহ নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, “আমি তোমাদেরকে যা কিছু কিতাব ও জ্ঞান দান করি, অতঃপর তোমাদের কাছে এমন একজন রসূল আসেন যিনি তোমাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়ন করেন, তখন তোমরা অবশ্যই তার উপর ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।” [আল্লাহ] বললেন, “তোমরা কি স্বীকার করেছ এবং আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছ?” তারা বলল, “আমরা স্বীকার করেছি।” তিনি বললেন, “তাহলে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে আছি।”

এরপর যারা মুখ ফিরিয়ে নিল, তারাই ছিল অবাধ্য।

তাহলে কি তারা আল্লাহর ধর্ম ছাড়া অন্য কিছু চায়? অথচ আসমান ও যমীনের সকলেই স্বেচ্ছায় অথবা জোর করে তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, আর তাঁরই দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন করা হবে?

বলুন, আমরা আল্লাহর উপর এবং আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের বংশধরদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, এবং মূসা, ঈসা এবং নবীদের তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তার উপর ঈমান এনেছি। আমরা তাদের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই আজ্ঞাবহ।

আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবনব্যবস্থা কামনা করে, তার কাছ থেকে তা কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”

মহান আল্লাহ নবুওয়তের উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন যাতে নবীগণ, যেমন হযরত ঈসা (আঃ) ঐশ্বরিক, এই মিথ্যা বিশ্বাস দূর করা যায়। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৭৯:

"কোন মানুষের [অর্থাৎ নবীর] জন্য এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, জ্ঞান ও নবুওত দান করবেন এবং তারপর সে মানুষকে বলবে, "তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও!"..."

একজন নবী (সাঃ) এর লক্ষ্য হলো আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত আচরণবিধি তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং এই আচরণবিধির বাস্তব আদর্শ হয়ে ওঠা। আল্লাহ তাআলা সর্বদা মানবজাতিকে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করেছেন। এই আচরণবিধির মধ্যে রয়েছে তিনি মানুষকে যে আশীর্বাদ দিয়েছেন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন, তাই তিনিই একমাত্র এই নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন। অন্যদিকে, সমস্ত মানব-রচিত আচরণবিধি কখনই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে না কারণ তাদের জ্ঞান, দূরদর্শিতা এবং অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে এবং পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের অবশ্যই একজন বিচক্ষণ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিচক্ষণ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তিও ভালো থাকবেন। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের প্রেসক্রাইব করা ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষা নিয়ে

চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণের সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি...'"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৭৯:

“কোন মানুষের [অর্থাৎ নবীর] জন্য এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, জ্ঞান ও নবুওত দান করবেন এবং তারপর সে মানুষকে বলবে, “আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার দাস হও”, বরং [তিনি বলতেন], “তোমরা আল্লাহর ধার্মিক জ্ঞানী লোক হও ”...”

বইটি আইনের কথা বলতে পারে, যা এমন একটি আচরণবিধি যা মানুষকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে যাতে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মানসিক শান্তি অর্জন করবে এবং আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে। অতএব, এই আইন সমাজের মধ্যে শান্তি ও ন্যায়বিচারের বিস্তার নিশ্চিত করবে। জ্ঞানের প্রয়োজন কারণ এটি মানুষকে তাদের জ্ঞান, যেমন আইন, সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে শেখায়, যাতে এটি তাদের এবং উভয় জগতের অন্যান্য মানুষের উপকার করে। একটি ন্যায়সঙ্গত এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য আইন এবং প্রজ্ঞা উভয়েরই প্রয়োজন। প্রজ্ঞা ছাড়া আইনের সহজেই ভুল ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কারণ মানুষ অন্যদের ভুল করার জন্য আইনের মধ্যে ফাঁক খুঁজে পেতে পারে। আইন ছাড়া জ্ঞান মানুষকে এমন একটি আচরণবিধি গ্রহণ করতে বাধ্য করবে যা সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত তার সংজ্ঞা অনুসারে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত পক্ষপাতের কারণে, সমস্ত মানবসৃষ্ট আচরণবিধি কখনই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে না। অতএব, আইন ছাড়া জ্ঞান মনের শান্তি অর্জনে বাধা সৃষ্টি করবে এবং সমাজের মধ্যে শান্তি ও ন্যায়বিচারের প্রসারকেও বাধাগ্রস্ত করবে, কারণ মানুষ অন্য মানুষের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হবে। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ৭৯:

“কোন মানুষের [অর্থাৎ নবীর] জন্য এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, জ্ঞান ও নবুওত দান করবেন এবং তারপর সে মানুষকে বলবে, “আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার দাস হও”, বরং [তিনি বলতেন], “তোমরা আল্লাহর ধার্মিক জ্ঞানী লোক হও ...”

একজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিশন নিজেই তাদের প্রতি ঐশ্বরিকতা আরোপ করাকে অস্বীকার করে কারণ তারা মানুষ যারা ঐশ্বরিক আচরণবিধি প্রদানের জন্য এবং তাদের সম্প্রদায়ের জন্য শারীরিক আদর্শ হওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে কোন ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য থাকা তাদের সম্প্রদায়ের জন্য আদর্শ হওয়ার উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করবে, কারণ মানুষ কোন ঐশ্বরিক সত্তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে না। এই কারণেই আল্লাহ, মহান, ফেরেশতাদের মতো অন্য কোন সৃষ্টিকে পবিত্র নবী হিসেবে মনোনীত করেননি, কারণ মানুষ কার্যত তাদের অনুসরণ করতে সক্ষম হবে না, কারণ তারা মানুষের অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতার মতো অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না। একজন ভালো আদর্শকে অবশ্যই তাদের অনুসারীদের সাথে মিলিত হতে হবে যাতে তাদের অনুসারীরা তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। মানুষ কোন ঐশ্বরিক সত্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হবে না, কারণ তারা মানুষের অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতার মতো অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে না। অতএব, পবিত্র নবীগণ, সকলেই অন্যান্য মানবজাতির মতোই মানুষ ছিলেন কিন্তু তাদেরকে ঐশ্বরিক আচরণবিধি প্রদান এবং তাদের সম্প্রদায়কে সরল পথে পরিচালিত করার জন্য প্রতিভাবান এবং নির্বাচিত করা হয়েছিল যা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। সূরা আল কাহফ, আয়াত ১১০:

"বলুন, "আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী এসেছে যে তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য..."

দুঃখের বিষয় হল, মুসলমানদের মধ্যে দুটি চরমপন্থী মনোভাব দেখা দিয়েছে যা পবিত্র নবীগণের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। প্রথমটি হল, পবিত্র নবীগণের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আচরণ করা এবং তাদেরকে মানবজাতির নেতা হিসেবে না দেখা, যাদের প্রতিটি পরিস্থিতিতে আনুগত্য ও অনুসরণ করা আবশ্যিক, যদিও ইসলাম এই নির্দেশ দেয়। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এবং ৫৯তম অধ্যায় আল হাশর, ৭ম আয়াত:

"... আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৮০:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

এবং ৩৩তম সূরা আল আহযাব, আয়াত ২১:

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে একটি চমৎকার আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"

অন্য চরম মনোভাব হলো যখন নবীগণ, সাঃ, তাদের অনুসারীরা তাদের অনুসারীদের দ্বারা এতটাই উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন যে তাদেরকে আর মানুষ হিসেবে দেখা হয় না। এটি মানুষকে কার্যত তাদের অনুসরণ করতে বাধা দেয় কারণ তারা আর তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। উপরন্তু, এই মনোভাব ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার জন্ম দেয় যেখানে একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তাদের নবী, সাঃ, এতটাই উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন যে তাদের পরকালে তাদের সম্প্রদায়ের ভাগ্য নির্ধারণ করার ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তারা তাদের সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন এবং ফলস্বরূপ তাদের সম্প্রদায়ের সকলেই জান্নাতে যাবে, এমনকি যদি তাদের সম্প্রদায়ের সদস্যরা আল্লাহর অবাধ্যতা চালিয়ে যায়। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস গ্রহণ করলে কেবল আল্লাহ, সাঃ এর অবাধ্যতা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত হবে, একই সাথে ধরে নেওয়া হবে যে তাদের জন্য মুক্তি নিশ্চিত। এটি এমন ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বকে অন্যদের উপর আরোপ করে যা আল্লাহ, সাঃ দ্বারা

প্রদত্ত হয়নি। এবং এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মাধ্যমে কেউ আল্লাহ, সাঃ এর প্রতি অবিচারকে দায়ী করে, কারণ তারা দাবি করে যে তিনি সৎকর্মকারীর সাথে মন্দকর্মকারীর সমান আচরণ করবেন। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 21:

"যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমি তাদেরকে তাদের মতো করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান করে দেব? তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না মন্দ।"

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সাঃ) এর ঐতিহ্য, নবীদের প্রতি উভয় চরমপন্থী মনোভাবকে দূর করেছে। ইসলাম স্পষ্ট করে বলে যে, নবীগণ হলেন এমন মানুষ যাদের কোন ঐশ্বরিক গুণাবলী নেই, যাদেরকে ঐশ্বরিক আচরণবিধি প্রদান এবং তাদের সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবহারিক আদর্শ হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। পবিত্র নবীগণের, বিশেষ করে শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর, আনুগত্য ও অনুসরণ করা আবশ্যিক, যেমনটি আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন, কিন্তু তাদের এমন কিছু তাঁর বা অন্যান্য পবিত্র নবীগণের, যা পবিত্র কুরআন বা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস তাদের প্রতি আরোপ করে না।

অতএব, যে ব্যক্তি সঠিক আচরণ করবে, সে ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে এবং সঠিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। এটি উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 79:

"...কিন্তু [পরিবর্তে, তিনি বলতেন], " তোমরা ধর্মগ্রন্থ থেকে যা শিখেছ এবং যা অধ্যয়ন করেছ তার জন্য প্রভুর ধার্মিক জ্ঞানী লোক হও ।"

কিন্তু এই আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, ইসলামী জ্ঞান অর্জন না করে উভয় জগতেই মানসিক শান্তির ফলাফল অর্জন করা সম্ভব নয়। কেউ কেবল আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা, যখন তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য শিখে এবং সেগুলি অনুসরণ করে। অতএব, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, সে মৌলিক বাধ্যতামূলক কর্তব্যগুলি পালন করলেও মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারবে না, কারণ তারা অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলির অপব্যবহার করবে। এটি তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন থেকে বিরত রাখবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় স্থাপন করবে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৭৯:

"...কিন্তু [পরিবর্তে, তিনি বলতেন], " তোমরা ধর্মগ্রন্থ থেকে যা শিখেছ এবং যা অধ্যয়ন করেছ তার জন্য প্রভুর ধার্মিক জ্ঞানী লোক হও ।"

যদিও শিক্ষাদানের আগে শিক্ষা আসে, তবুও এই আয়াতে এগুলোর বিপরীত দিকটি উল্লেখ করা হয়েছে। একটি সম্ভাব্য কারণ হল এই আয়াতে প্রথমে আরও গুরুতর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যা হল অন্যদের শিক্ষা দেওয়া। সর্বদা মনে রাখা উচিত যে অন্যদের শিক্ষা দেওয়া আরও গুরুতর বিষয় কারণ একজন শিক্ষক বা উপদেষ্টার পাপ বা সৎকর্ম তাদের মৃত্যুর পরেও বৃদ্ধি পাবে, যা নির্ভর করে তারা তাদের ছাত্রদের সঠিক বা ভুল শিক্ষা দিয়েছেন কিনা তার উপর। জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। যদিও ইসলামী শিক্ষা শেখা কেবল নিজের উপর প্রভাব ফেলে, তাই সঠিক নির্দেশনা বা পথদ্রষ্টতার গুরুতরতা আরও সীমিত কারণ এটি অন্যদের উপর প্রভাব ফেলে না।

এরপর আল্লাহ তাআলা পুনরায় জোর দিয়ে বলেন যে, একজন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনোই মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করার নির্দেশ দেবেন না, যেমন ফেরেশতাদের। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮০:

"আর তিনি কি তোমাদেরকে ফেরেশতা ও নবীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিতে পারেন না..."

এই আয়াতে সেইসব মূর্তিপূজকদের সমালোচনা করা হয়েছে যারা ফেরেশতাদের উপাসনা করতো এবং নিজেদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে দাবি করতো। তারা মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করতো যে ফেরেশতারা তাদের পক্ষে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, যখন কেউ কোন সৃষ্টিকে দেবত্ব বলে অভিহিত করে, তখন এটি এই মনোভাবের দিকে পরিচালিত করে এবং তাই এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি কেবল ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয় যার ইসলামে কোন মূল্য নেই। উপরন্তু, যেহেতু সমস্ত পবিত্র নবী, তাদের উপর শান্তি

বর্ষিত হোক, তাদের একই লক্ষ্য ছিল এবং তারা একটি শৃঙ্খলের অংশ ছিলেন, যার মাধ্যমে তারা পর পর প্রজন্ম ধরে একে অপরের অনুসরণ করতেন, তাই তাদের কেউ তার সম্প্রদায়কে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করার নির্দেশ দিতেন না, কারণ এটি মুসলমানদের, যারা সঠিকভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করতো, কুফরের দিকে আমন্ত্রণ জানাত। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ৮০:

"...তোমরা মুসলিম হওয়ার পর কি সে তোমাদের কুফরী করতে নির্দেশ দেবে?"

যদি হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর ঐশ্বরিকতা প্রচার করতেন, তাহলে তিনি নিজেকে অন্যান্য নবীদের, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, এর সাথে যুক্ত করতেন না, কারণ তারা কেবল আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার করতেন। যদি তিনি অন্যান্য নবীদের, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, অস্বীকার করতেন এবং তার পরিবর্তে নিজের ঐশ্বরিকতা প্রচার করতেন, তাহলে এটি আরও যুক্তিসঙ্গত হত। কিন্তু সমস্ত ঐশ্বরিক কিতাব থেকে স্পষ্ট যে, হযরত ঈসা (আঃ) নিজেকে অন্যান্য নবীদের, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, এর সাথে যুক্ত করেছিলেন এবং তাদের নবুওত এবং আল্লাহর একত্ববাদ প্রচারের একক লক্ষ্যকে সমর্থন করেছিলেন। এটি আরেকটি স্পষ্ট প্রমাণ যে, তিনি অন্যান্য নবীদের মতো কেবল আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার করেছিলেন। ৫ম অধ্যায় আল মায়িদা, আয়াত ১১৬-১১৭:

“আর[সেদিনের কথা মনে রেখো] যখন আল্লাহ বলবেন, “হে মরিয়ম পুত্র ঈসা, তুমি কি মানুষকে বলেছিলে, ‘আল্লাহ ব্যতীত আমাকে এবং আমার মাকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করো?’” তিনি বলবেন, “তুমি কি পবিত্রা আমার এমন কথা বলা উচিত ছিল না যার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি তা বলতাম, তাহলে তুমি তা জানতো।

তুমি আমার ভেতরে যা আছে তা জানো, আর তোমার ভেতরে যা আছে তা আমি জানি না। নিশ্চয়ই তুমিই অদৃশ্যের জ্ঞানী। আমি তাদেরকে যা আদেশ করেছিলাম তা ছাড়া আর কিছুই বলিনি - আমার প্রতিপালক এবং তোমার প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত করো। আর আমি তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম যতক্ষণ আমি তাদের মধ্যে ছিলাম; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই ছিলে তাদের উপর পর্যবেক্ষক, এবং তুমিই সবকিছুর উপর সাক্ষী।”

সাধারণভাবে বলতে গেলে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রসারের কারণগুলির মধ্যে ছিল তাঁর অলৌকিক জন্ম, তাঁর জীবদ্দশায় সম্পাদিত অলৌকিক ঘটনা এবং তাঁর আসমানে আরোহণ। পবিত্র কুরআন হযরত ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক জন্মের সত্যতা নিশ্চিত করে এবং তাঁর পিতৃহীন জন্মকে মহান আল্লাহর অসীম শক্তির নিদর্শন হিসেবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৭:

“তিনি [মারিয়াম, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট] বললেন, “হে আমার প্রতিপালক, আমার সন্তান কীভাবে হবে যখন কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি?” [ফেরেশতা] বললেন, “আল্লাহ এমনই, তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেন, তখন কেবল বলেন, 'হু', আর তা হয়ে যায়।”

মহান আল্লাহ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, ঠিক যেমন তিনি হযরত আদম আলাইহিস সালামকে পিতা বা মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। এই বাস্তবতার অর্থ এই নয় যে তারা ঐশ্বরিক। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৯:

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ঈসার উদাহরণ আদমের মতো। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে বলেছেন, "হও", আর সে হয়ে গেল।"

এটা অদ্ভুত যে খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে হযরত ঈসা (আঃ) হলেন মহান আল্লাহর পুত্র, কারণ তিনি পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তারা হযরত আদম (আঃ)-কে মহান আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে না, যদিও তিনি পিতা বা মাতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মানসিকতা অনুসারে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর চেয়ে হযরত আদম (আঃ)-এর মহান আল্লাহর পুত্র বলে অভিহিত হওয়ার অধিকার বেশি, কিন্তু তারা তা দাবি করে না। হযরত আদম (আঃ)-এর ক্ষেত্রে তারা যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে, কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে যুক্তি বা সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে না। এটা অদ্ভুত।

পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক ঘটনাগুলি যাচাই করা হয়েছে। তবে এটি স্পষ্ট করে যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি এবং আদেশে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এই অলৌকিক ঘটনাগুলি সম্পাদন করেছিলেন। যদি মহান আল্লাহর ইচ্ছা বা অনুমতির প্রয়োজন হত, তাহলে তাঁর জন্য মহান আল্লাহর ইচ্ছা বা অনুমতির প্রয়োজন হত না। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৪৯:

“আর [ঈসা আলাইহিস সালামকে] বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল বানাও, [যিনি বলবেন], 'আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করি, অতঃপর

আমি তাতে ফুঁ দেই, আল্লাহর নির্দেশে তা পাখি হয়ে যায়। আর আমি অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করি এবং আল্লাহর নির্দেশে মৃতকে জীবিত করি। আর আমি তোমাদেরকে তোমাদের খাবার এবং তোমাদের ঘরে যা জমা করে রাখি তা জানিয়ে দেই..."

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম জীবিত অবস্থায় আসমানে আরোহণ করা আল্লাহর শক্তির আরও ইঙ্গিত দেয়, যখন তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে এই যাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন। যদি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ঐশ্বরিক হতেন, তাহলে তিনি তাঁর নিজস্ব সহজাত শক্তি দিয়ে এই যাত্রা করতে পারতেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৫:

"[স্মরণ করো] যখন আল্লাহ বললেন, "হে ঈসা, আমি অবশ্যই তোমাকে গ্রহণ করব এবং আমার দিকে উঠিয়ে নেব এবং তোমাকে পবিত্র করব [অর্থাৎ, কাফেরদের থেকে মুক্ত করব..."

পবিত্র কুরআন খ্রিস্টানদের বলে যে, তাদের বিশ্বাসের বিপরীতে, নবী ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি। ক্রুশে যার ছবি দেখা গিয়েছিল তিনি নবী ঈসা (আঃ)-এর মতো দেখতে ছিলেন না, বরং তিনি এমন একজন ছিলেন যাকে তাঁর মতো করে তৈরি করা হয়েছিল। আল্লাহ, মহিমান্বিত, ইতিমধ্যেই নবী ঈসা (আঃ)-কে আকাশের দিকে তুলে নিয়েছিলেন। সূরা ৪ আন-নিসা, আয়াত ১৫৬-১৫৮:

"আর তাদের অবিশ্বাস এবং মরিয়মের বিরুদ্ধে তাদের বিরাট অপবাদ বলার জন্য। এবং তাদের এই কথার জন্য যে, "আমরা আল্লাহর রসূল মরিয়মের পুত্র মসীহ ঈসাকে হত্যা করেছি।" তারা তাকে হত্যা করেনি, কবুলশেও চড়ায়নি; বরং তাদের কাছে তার অনুরূপ করা হয়েছিল.. বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে তুলে নিয়েছেন।"

হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া মানে হত্যা করা, এই ভুল খ্রিস্টান বিশ্বাস নিজেই অদ্ভুত কারণ একজন প্রকৃত ঐশ্বরিক সত্তা মৃত্যু অনুভব করার চেয়ে অনেক বেশি দূরে। যদি কোন সত্তা মারা যেতে পারে, তবে তা ঐশ্বরিক হতে পারে না। তাই বাস্তবে, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে তাদের ভুল বিশ্বাস তাঁর ঐশ্বরিকতা সম্পর্কে তাদের ভুল বিশ্বাসকে অস্বীকার করে।

স্বভাবতই একটি ঐশ্বরিক সত্তা এমন একটি জিনিস যা স্বয়ংসম্পূর্ণ, অর্থাৎ তাদের অন্য কারো দ্বারা তাদের প্রতিপালনের প্রয়োজন হয় না। যদি একটি সত্তা অন্য কারো দ্বারা প্রতিপালিত হয় তবে তারা ঐশ্বরিক হতে পারে না। নবী ইসা (আঃ) এবং তাঁর মা মরিয়ম (আঃ) উভয়েই ঐশ্বরিক সত্তা ছিলেন না কারণ তাদের মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুষ্টির প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা ছিলেন না।

৫ম অধ্যায়
আল মায়িদা, আয়াত ৭৫:

"মরিয়মপুত্র মসীহ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না; তাঁর পূর্বে আরও রসূল গত হয়ে গেছেন। আর তাঁর মা ছিলেন সত্যবাদী। তাঁরা দুজনেই খাবার খেতেন। দেখো, আমি কীভাবে তাদের কাছে নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করি; তারপর দেখো, কীভাবে তারা বিভ্রান্ত হয়।"

তাছাড়া, কেউ দাবি করতে পারে না যে, যেহেতু ফেরেশতারা খায় না, তাই তাদেরকে ঈশ্বর হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বাস্তবে, তাদেরকেও আল্লাহ তাআলা ভিন্নভাবে রিযিক দান করেন, তাই তারাও স্বয়ংসম্পূর্ণ নন। অন্যান্য সৃষ্টির মতোই তাদেরও সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তারা মৃত্যু ভোগ করবে, এই সত্যই দেবত্বকে অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট।

একজন জৈবিক শিশু তার পিতামাতার সাথে সর্বদা কিছু বৈশিষ্ট্য ভাগ করে নেবে। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে, তিনি মহান আল্লাহর সাথে কোন গুণাবলী ভাগ করে নিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে, তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য অন্যান্য মানুষের সাথে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে খাদ্য ও জল দ্বারা লালন-পালন করা হয়েছে, সে মারা যাবে এবং পুনরুত্থিত হবে, ঠিক অন্যান্য সমস্ত মানুষের মতো। তার বৈশিষ্ট্যগুলি ঐশ্বরিকতাকে অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট।

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী রোমানরা তাদের ধর্মে নবী ঈসা (আঃ)-এর ঐশ্বরিক অস্তিত্বের ধারণা প্রবর্তন করে, যা তারা তাদের পূর্বের ধর্ম, পৌত্তলিকতা থেকে ধারণ করেছিল। তারা একজন মহান ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত নবী (সাঃ)-কে গ্রহণ করে জিউস, হারকিউলিস এবং ওডেনের মতো উপকথা এবং পৌরাণিক কাহিনীর সাথে যুক্ত করে। কেবলমাত্র সামান্য সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় এটি বোঝার জন্য যে, যে সত্তা অন্য কারো দ্বারা সৃষ্ট, প্রতিপালিত এবং মারা যেতে পারে, সে কখনও ঐশ্বরিক হতে পারে না, কারণ এই বিষয়গুলি ঐশ্বরিক সত্তার গুণাবলীর বিরোধিতা করে।

এরপর আল্লাহ তাআলা এমন একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন যা নবীগণের একক লক্ষ্য এবং তারা কীভাবে আল্লাহর একত্ববাদ প্রচারকারী ধারাবাহিক শৃঙ্খলের অংশ ছিলেন তা নির্দেশ করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮১:

“আর যখন আল্লাহ নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, “আমি তোমাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান থেকে যা কিছু দান করি, অতঃপর তোমাদের কাছে এমন একজন রসূল আসেন যিনি তোমাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়ন করেন, তখন তোমরা অবশ্যই তার উপর ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।” [আল্লাহ] বললেন, “তোমরা কি স্বীকার করেছ এবং আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছ?” তারা বলল, “আমরা স্বীকার করেছি।” তিনি বললেন, “তাহলে সাক্ষী থাকো, আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকবো।”

এটি ধারাবাহিক নবীদের, সালাম, ধারাবাহিকতার কথা উল্লেখ করে, যারা একে অপরকে যাচাই ও সমর্থন করেছিলেন, কারণ তারা সকলেই একই মিশনে ছিলেন। উপরন্তু, পরবর্তী আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, নবীগণ, সালাম, তাদের সম্প্রদায় থেকে এই একই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যাতে তারা পরবর্তী নবী, সালাম, সঠিকভাবে অনুসরণ করে। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৮২:

“আর যারা এরপর মুখ ফিরিয়ে নিল, তারাই ছিল অবাধ্য।”

আহলে কিতাবরা অনেক নবী-রাসূলকে, বিশেষ করে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে, গ্রহণ ও অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, যদিও তাদেরকে আল্লাহ, তাদের আসমানী কিতাব এবং নবী-রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে তা মেনে নিতে হয়েছিল। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

এবং ৫ম অধ্যায় আল মায়িদাহ, আয়াত ১৫৫-১৫৭:

“আর মূসা তাঁর সম্প্রদায় থেকে সত্তর জনকে আমাদের নির্ধারিত সময়ের জন্য মনোনীত করলেন। অতঃপর যখন ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল, তখন তিনি বললেন, “হে আমার পালনকর্তা, যদি তুমি ইচ্ছা করতে, তবে তাদেরকে আগেই ধ্বংস করতে পারতে এবং আমাকেও। আমাদের মধ্যে মূর্খরা যা করেছে তার জন্য

কি তুমি আমাদের ধ্বংস করতে? এটা তোমার পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়, যার মাধ্যমে তুমি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করো এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করো। তুমি আমাদের অভিভাবক, অতএব আমাদের ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়া করো; আর তুমিই সর্বোত্তম ক্ষমাশীল। আর আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে [যা ভালো] এবং আখেরাতেও কল্যাণ নির্ধারণ করো; নিশ্চয়ই আমরা তোমার দিকে ফিরে এসেছি।" [আল্লাহ] বললেন, "আমার শাস্তি - আমি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে থাকি, কিন্তু আমার রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।" তাই আমি এটি তাদের জন্য লিখে দেব যারা আমাকে ভয় করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াতগুলিতে বিশ্বাস করে। যারা সেই নিরক্ষর নবীর রাসূলকে অনুসরণ করে, যাকে তারা তাদের কাছে তওরাত ও ইঞ্জিলের কিতাবে লিখিত [অর্থাৎ বর্ণিত] পায়, যিনি তাদের সংকাজের আদেশ দেন এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য সংকাজ হালাল করেন এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের বোঝা এবং তাদের উপর থেকে শৃঙ্খল দূর করেন। সুতরাং যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁকে সম্মান করেছে, তাঁকে সমর্থন করেছে এবং তাঁর সাথে অবতীর্ণ আলোর অনুসরণ করেছে - তারাই সফলকাম হবে।"

মুসলমানদের অবশ্যই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, যাতে তারা কার্যত নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে অনুসরণ এবং সমর্থন করা থেকে বিরত থাকে। কেবল মৌখিকভাবে তাঁর প্রতি বিশ্বাস ঘোষণা করা যথেষ্ট নয়। তাঁর ঐতিহ্য অনুসরণ করে কার্যত কর্মের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি সর্বদা আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলবে, যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করবে এবং নিশ্চিত করবে যে তারা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে। এই মনোভাব উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। উপরন্তু, কার্যত নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে অনুসরণ করে, একজন ব্যক্তি তাঁর পবিত্র চরিত্র গ্রহণ করবে এবং তাই তাকে বাইরের জগতে সঠিকভাবে উপস্থাপন করবে।

আলোচ্য মূল আয়াতগুলি দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, এভাবেই একজন ব্যক্তি তার মিশনকে সমর্থন করবে। কিন্তু যদি একজন মুসলিম তার ঐতিহ্য শিখতে এবং তার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা তাদের প্রদত্ত অনুগ্রহের অপব্যবহার করবে, যা তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে। উপরন্তু, তারা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে যার ফলে তাকে বাইরের জগতে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে। এটি অমুসলিম এবং অন্যান্য মুসলিম উভয়কেই ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে উৎসাহিত করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে ভুলভাবে উপস্থাপন করা এমন একটি বিষয় যার জন্য প্রতিটি মুসলিমকে জবাবদিহি করতে হবে, কারণ তাঁর এবং ইসলামের সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করা সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য।

প্রত্যেক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একই ধর্ম প্রচার করেছিলেন এই সত্যটি ব্যাখ্যা করার পর, মহান আল্লাহ, তারপর মানবজাতিকে তাদের ইতিহাস জুড়ে যে আচরণবিধি প্রদান করেছেন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অযৌক্তিকতার সমালোচনা করেন যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৮৩:

"তারা কি আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম কামনা করে..."

যেমনটি আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, একমাত্র মহান আল্লাহই হলেন যিনি উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে এমন নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের অভাবের কারণে সমস্ত মানবসৃষ্ট আচরণবিধি কখনও মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে না। একমাত্র মহান আল্লাহই মানবজাতিকে তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শেখাতে পারেন যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক

অবস্থা অর্জন করতে পারে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে। এছাড়াও, কেউ কেউ বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য কীভাবে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৪৩:

"তারা কি আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম কামনা করে, অথচ আসমান ও যমীনের সকলেই তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে..."

যখন কেউ মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করবে, তখন তারা প্রশান্তি ও প্রশান্তি দেখতে পাবে। এই প্রশান্তি ও প্রশান্তি আসমান ও পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টির, যেমন নক্ষত্র এবং গ্রহ, আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আদেশ পালনের প্রত্যক্ষ ফলাফল। অধ্যায় ৪১ ফুসসিলাত, আয়াত ১১:

"অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন, যখন তা ছিল ধোঁয়াশাচ্ছন্ন, এবং তাকে এবং পৃথিবীকে বললেন, "তোমরা স্বচ্ছায় আসো অথবা বাধ্য হয়ে।" তারা বলল, "আমরা স্বচ্ছায় আসছি।"

যদি তারা মানুষের মতো মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করে, তাহলে এর ফলে মহাবিশ্ব বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, কারণ প্রতিটি সৃষ্টিই যা ইচ্ছা তাই করবে, যেমন একটি গ্রহ তার কক্ষপথ পরিবর্তন করে এবং ফলস্বরূপ অন্য গ্রহ বা নক্ষত্রের সাথে ধাক্কা

খায় অথবা সূর্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে উদয় এবং অস্ত যেতে ব্যর্থ হয়। যখন কেউ মহাবিশ্বের মধ্যে শান্ত, প্রশান্তি এবং নিখুঁত ভারসাম্য পর্যবেক্ষণ করে, তখন এটি তাদের মহাবিশ্বের মধ্যে সৃষ্টির মতো একইভাবে আচরণ করতে অনুপ্রাণিত করবে যাতে তারাও শান্তি ও প্রশান্তি লাভ করে। অধ্যায় ২১ আল আশ্বিয়া, আয়াত ৩৩:

"আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র; সকল [আকাশমণ্ডলী] একটি কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।"

মহান আল্লাহ তাআলার আন্তরিক আনুগত্য করা, কারণ মানুষের জন্য ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করা জড়িত। কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলা ৮৩ নং আয়াতে সতর্ক করে বলেছেন, যদি কেউ আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হতে চায়, তাহলে তারা কখনও তাঁর ইচ্ছা এবং তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ এড়াতে পারবে না। ফলস্বরূপ, তারা এই পৃথিবীতে কখনও মানসিক শান্তি পাবে না, এমনকি যদি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে, কারণ তিনিই কেবল তাদের বিষয়াবলী এবং তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করেন, যা মনের শান্তির আবাস। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, ৮৩ নং আয়াত:

"তারা কি আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম কামনা করে, অথচ আসমান ও যমীনের সকলেই স্বেচ্ছায় অথবা জোর করে তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে..."

এবং ৫৩ নং অধ্যায় আন নাজম, ৪৩ নং আয়াত:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

যদি তারা তাঁর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তাহলে পরকালেও তাদের আচরণের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। তাদের আচরণের ফলে, তারা এই পৃথিবীতে বা পরকালে মানসিক শান্তি পাবে না। এই হল প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত, এমনকি যদি তারা পার্থিব সাফল্য লাভ করে এবং পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৮৩:

"...এবং তাঁরই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন করা হবে"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ[অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৮৩:

"তারা কি আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম কামনা করে, অথচ আসমান ও যমীনের সকলেই স্বেচ্ছায় অথবা জোর করে তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, এবং তাঁরই কাছে তাদের ফিরিয়ে আনা হবে?"

আসবাব আল নুযুল" , ৩:৮৩, পৃষ্ঠা ৩৬ অনুসারে , এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল যখন দুটি দল, একটি খ্রিস্টান এবং অন্যটি ইহুদি, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে এসেছিল, যাতে তিনি বিচার করতে পারেন যে কোন ধর্ম, খ্রিস্টান বা ইহুদি ধর্ম, মহানবী ইব্রাহিম (সাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। যখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রায় ছিল যে উভয় ধর্মেরই মহানবী ইব্রাহিম (সাঃ)-এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তখন তারা ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে এবং ৮৩ নং আয়াত নাযিল হয়।

মদিনায় বসবাসকারী আরব এবং আহলে কিতাবদের আল্লাহ তাআলা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, যদিও তারা তাঁর বংশধর, যা নিয়ে তারা অত্যন্ত গর্বিত, তবুও তারা কেবল তখনই মহান আল্লাহর আশীর্বাদ এবং করুণা লাভ করতে পারবে যখন তারা কার্যত তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, অর্থাৎ যখন তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করবে। এই আনুগত্যের একটি দিক ছিল ইসলাম, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতা এবং পবিত্র কুরআনকে গ্রহণ করা, কারণ আহলে কিতাবরা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিল যে, এই সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে

সত্য, যেমনটি তাদের ঐশী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

অধিকন্তু, অমুসলিম আরব এবং আহলে কিতাবরা ইসলামের স্পষ্ট সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে তারা আর হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর উত্তরাধিকার বহন করার যোগ্য ছিল না, বরং এটি তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে যারা কার্যত তাঁর পথ অনুসরণ করেছিলেন, অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এবং তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। যদি অমুসলিম আরব এবং আহলে কিতাবরা তাদের অবাধ্যতার উপর অটল থাকে, তাহলে তারা হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর উত্তরাধিকার থেকে এই পৃথিবীতে বা পরকালে কোন উপকার পাবে না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৪:

“ বলুন, আমরা আল্লাহর উপর এবং আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের বংশধরদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, এবং মুসা, ঈসা এবং নবীদের তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তার উপর ঈমান এনেছি। আমরা তাদের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই আজ্ঞাবহ।”

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিম হওয়ার অর্থ হলো আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক অনুগ্রহগুলো ব্যবহার করে। মহান আল্লাহর কাছে এই ব্যবহারিক আত্মসমর্পণই হলো তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মূল কথা। মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈমান হলো একটি গাছের মতো যাকে বেড়ে ওঠার জন্য আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি গ্রহণে ব্যর্থ হয়, তা বেড়ে উঠতে ব্যর্থ হয় এবং এমনকি মারাও যেতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমানও বৃদ্ধি পায় না এবং মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

যেহেতু সকল নবী-রাসূল (সাঃ) ইসলামের বাণী প্রচার করেছেন, যা কার্যত আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের ধর্ম, তাই এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ মানুষের কাছ থেকে অন্য কোন জীবনধারা গ্রহণ করবেন না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৫:

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবনব্যবস্থা কামনা করে, তার কাছ থেকে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

এটি অনেকের দ্বারা গৃহীত ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনাকে দূর করে দেয় যারা বিশ্বাস করে যে তারা তাদের নিজস্ব জীবনযাত্রা বেছে নিতে পারে এবং এই পৃথিবীতে এবং বিচারের দিনে কোনও না কোনওভাবে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। যেমনটি আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের কারণে সমস্ত মানব-নির্মিত আচরণবিধি কখনই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে না। যদি কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনও জীবনধারা অনুসরণ করে, তবে তারা অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এটি তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে। উপরন্তু, তারা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। অতএব, তাদের মনোভাব তাদের এই পৃথিবীতে বা পরকালে মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে। বিচারের দিনের কথা বলতে গেলে, কেউ যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনও জীবনধারা বেছে নেয় তবে আন্তরিক অনুতাপ, সুপারিশ বা অন্য কোনও কিছুর মাধ্যমে সংশোধন করার অনুমতি পাবে না। অধ্যায় 30 আর রুম, আয়াত 57:

"অতএব, সেদিন তাদের ওজর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না যারা অন্যায় করেছে এবং তাদেরকে [আল্লাহকে] সন্তুষ্ট করতে বলা হবে না।"

এবং অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৮৫:

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবনব্যবস্থা কামনা করে, তার কাছ থেকে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

যেহেতু এই আয়াতে ইসলামের কথা বলা হয়েছে, কেবল ঈমানের কথা নয়, তাই যে মুসলিম মৌখিকভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তাকে অবশ্যই কার্যত তাঁর আনুগত্য করতে হবে, কারণ ইসলাম একটি বাস্তব জীবন ব্যবস্থা। সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর হাদিসে ইসলাম এবং ঈমানের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হয়েছে। ঈমান অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত, যখন ইসলাম মহান আল্লাহর ব্যবহারিক আনুগত্যের সাথে সম্পর্কিত। যখন উভয়ের কথা বলা হয়, তখন তারা ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে কিন্তু যখন পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়, তখন উভয় অর্থই প্রযোজ্য। এই আয়াতে, উভয় অর্থই প্রযোজ্য, তবুও ইসলামকে বেছে নেওয়া হয়েছে, ঈমান শব্দটি নয়, যাতে কেউ আয়াতটির ভুল ব্যাখ্যা করতে না পারে এই দাবি করে যে এটি কেবল অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসকে বোঝায়, বাহ্যিক কর্মকে নয়। অতএব, যে ব্যক্তি কার্যত আল্লাহকে আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয় এবং তার পরিবর্তে তিনি যে নিয়ামত দান করেছেন তার অপব্যবহার করে, সে বিচারের দিনে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে উশ্বিত হতে পারে। উপরন্তু, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, যে মুসলিম কার্যত আল্লাহকে আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়, তার এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে তার ঈমান হারানোর ভয় করা উচিত, কারণ ঈমান একটি উদ্ভিদের মতো যা আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট হতে হবে। যেভাবে একটি উদ্ভিদ সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, সে মারা যায়, ঠিক তেমনিভাবে যে ব্যক্তি আনুগত্যের মাধ্যমে তাকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমানও মারা যায়। এই ক্ষেত্রে, নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তি চিরকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে থাকবে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৮৫:

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবনব্যবস্থা কামনা করে, তার কাছ থেকে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

এছাড়াও, যেহেতু ইসলাম পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সাঃ)-এর হাদীস কঠোরভাবে শেখা এবং তার উপর আমল করার সাথে সম্পর্কিত, তাই ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎস থেকে দূরে থাকা উচিত, এমনকি যদি তা সংকর্মের দিকে পরিচালিত করে। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি আমল করা হবে, এমনকি যদি তা সংকর্মের দিকে পরিচালিত করে, ততই তারা হেদায়েতের দুটি উৎসের উপর আমল করবে না, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে মহানবী (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, হেদায়েতের দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত যে কোনও বিষয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করবেন। উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি আমল করা হবে, ততই তারা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক এমন কিছু কাজে লিপ্ত হবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পা দেবে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"... সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ৮৬-৯২

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾

أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٨﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ

﴿٩٠﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى

بِهِ ۖ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

"আল্লাহ কিভাবে সেই জাতিকে পথ দেখাবেন যারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে এবং সাক্ষ্য দিয়েছে যে রাসূল সত্য এবং তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন এসে গেছে? আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

তাদের প্রতিফল এই যে, তাদের উপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং মানুষের
সকলের অভিশাপ।

তাদের উপর থেকে শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া
হবে না।

তবে যারা এরপর তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তারা ব্যতীত।
নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনার পর কুফরী করে এবং কুফরীতে বৃদ্ধি পায়, তাদের
তওবা কখনও কবুল করা হবে না এবং তারাই পথভ্রষ্ট।

নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায় মারা যায়, তাদের কারো কাছ
থেকে পৃথিবীর সমান সোনাও কবুল করা হবে না, যদি সে আত্মত্যাগের বিনিময়ে
তা দিয়ে থাকে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং তাদের কোন
সাহায্যকারী থাকবে না।

তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা
কখনও পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, আল্লাহ তা
জানেন।"

মহান আল্লাহ, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর যুগে মদীনায বসবাসকারী আহলে কিতাবদের ইসলামে অবিশ্বাসের জন্য সমালোচনা করেছেন , যদিও তাদের কুফরীর পূর্বে তারা মহান আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৬:

"ঈমান আনার পর যারা কুফরী করেছে, আল্লাহ তাদেরকে কিভাবে হেদায়েত দেবেন..."

তারা পবিত্র কুরআনের সত্যতা চিনতে পেরেছিল কারণ তারা এর লেখক, মহান আল্লাহ, এর সাথে পরিচিত ছিল এবং তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে চিনতে পেরেছিল, কারণ তাদের ঐশী গ্রন্থগুলিতে উভয়ের আলোচনা করা হয়েছে, তবুও তারা ইসলামকে অস্বীকার করেছিল। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৮৬:

"আল্লাহ কিভাবে সেই জাতিকে পথ দেখাবেন যারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে এবং সাক্ষ্য দিয়েছে যে রাসূল সত্য এবং তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন এসে গেছে?"

এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

আহলে কিতাবরা ইচ্ছাকৃত ধারণা গ্রহণ করেছিল যা তাদেরকে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করার পরেও বিভ্রান্তিতে থাকতে উৎসাহিত করেছিল। তারা বিশ্বাস করত যে যেহেতু তারা মহান আল্লাহর প্রিয়জন, তাই তিনি তাদের শাস্তি দেবেন না, এমনকি যদি তারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে তাঁর অবাধ্য হয়। ৫ম সূরা আল মায়িদা, আয়াত ১৮:

"কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, "আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়জন।" বলুন, "তাহলে তিনি তোমাদের পাপের জন্য কেন শাস্তি দেন?" বরং তোমরা তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন..."

এই ধরনের বোকামিপূর্ণ বিশ্বাস গ্রহণ করে, তারা মহান আল্লাহর উপর অবিচার ও অবিচার আরোপ করেছিল, কারণ তারা দাবি করেছিল যে তিনি তাদের মধ্যে একজন মন্দ কর্মচারীর সাথে সৎকর্মকারীর মতোই আচরণ করবেন। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২১:

"যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমি তাদেরকে তাদের মতো করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান করে দেব? তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না মন্দ।"

অধিকন্তু, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস বর্ণবাদকে আল্লাহ তাআলার উপর আরোপ করেছিল, কারণ তারা দাবি করেছিল যে তারা তাদের বংশের কারণে বাকি মানবজাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে, কারণ তারা পবিত্র নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর।

অধিকন্তু, তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, তাদের অবাধ্যতার জন্য যদি তাদের শাস্তি দেওয়া হয়, তবুও তা সীমিত সময়ের জন্য হবে কারণ তারা নিজেদেরকে বিশ্বাসী বলে মনে করত, যদিও তারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে কাফের হয়ে গিয়েছিল। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ৮০:

"আর তারা বলে, "জাহান্নাম আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না, [কয়েক] দিন ছাড়া।" বলুন, "তোমরা কি আল্লাহর সাথে কোন অঙ্গীকার করেছ? কারণ আল্লাহ

কখনও তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে এমন কিছু বল যা তোমরা জানো না?"

এবং ৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ১৫০-১৫১:

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, “আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে অবিশ্বাস করি” এবং এর মাঝামাঝি কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফের। আর আমরা কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।”

এই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনাই তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় অটল থাকতে এবং ইসলামের সত্যতা স্বীকার করার পরেও প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করেছিল। মুসলিমদের অবশ্যই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে। তাদের এই মিথ্যা বিশ্বাস গ্রহণ করা এড়িয়ে চলতে হবে যে তারা মহান আল্লাহর প্রিয়, কারণ তারা মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মত। এই মিথ্যা বিশ্বাস কেবল আল্লাহকে অবাধ্য হতে উৎসাহিত করে এবং তাঁর প্রতি অন্যায়, অবিচার এবং বর্ণবাদের মতো মিথ্যা জিনিস আরোপ করে। উপরন্তু, তাদের অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে এবং ধরে নিতে হবে না যে তারা তাদের ঈমান নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে, কারণ আল্লাহকে প্রদত্ত নিয়ামতগুলির অপব্যবহার করে অবাধ্যতা চালিয়ে যাওয়া কুফরের দিকে পরিচালিত করতে পারে। কারণ ঈমান একটি গাছের মতো যাকে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। যে গাছ সূর্যালোকের মতো পুষ্টি পায় না, সে মারা যাবে, ঠিক তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও মারা যেতে পারে যে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৮৬:

"... আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।"

আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে আলেমরা কেবল মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপরই অটল ছিলেন না, বরং তাদের সম্প্রদায়ের নেতা হওয়ার কারণে তারা পরবর্তী প্রজন্ম সহ অন্যদেরও বিভ্রান্ত করেছিলেন। এটিই তাদের উপর আল্লাহ তায়ালার এত রাগান্বিত হওয়ার একটি কারণ। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৭-৮৮:

"তাদের শাস্তি এই যে, তাদের উপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং মানুষের সকলের অভিশাপ। তারা তাতে চিরকাল থাকবে। তাদের শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তাদের অবকাশও দেওয়া হবে না।"

এই আয়াতগুলি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাদেরকে তারা তাদের জীবদশায় পথভ্রষ্ট করেছিল এবং যাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করেছিল, তারা পরকালে তাদের অভিশাপ দেবে। ৭ম সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ৩৮:

"[আল্লাহ] বলবেন, "তোমাদের পূর্বে জিন ও মানবজাতির মধ্যে যেসব জাতি গত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ করো।" যখনই কোন জাতি প্রবেশ করবে, তখনই তারা তার ভগ্নিপতিকে অভিশাপ দেবে, এমনকি যখন তারা সবাই

সেখানে একে অপরের উপর আছড়ে পড়বে, তখন তাদের শেষেরটি তাদের প্রথমটির সম্পর্কে বলবে, “হে আমাদের পালনকর্তা, এরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, অতএব তাদেরকে জাহান্নামের দ্বিগুণ শাস্তি দাও।” তিনি বলবেন, “প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা জানো না।”

অতএব, ইচ্ছাকৃতভাবে ঐশ্বরিক শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করা থেকে সর্বদা বিরত থাকা উচিত কারণ এটি উভয় জগতেই সমস্যা সৃষ্টি করে। এইভাবে আচরণ করার মাধ্যমে তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করে, যেমন সম্পদ এবং নেতৃত্ব, তা তাদের জন্য মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এবং পরকালের শাস্তি আরও ভয়াবহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনান ইবনে মাজাহ, ২৫৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই ব্যক্তিকে জাহান্নামের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। মনে রাখা উচিত যে, মৃত্যুর পরেও যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাদের খারাপ পরামর্শ অনুসারে কাজ করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের পাপ বাড়তে থাকবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের দ্বারা বিপথগামী হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করা এড়িয়ে চলা। এমনকি ইসলামের মধ্যেও অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করা সমালোচনা করা হয়েছে, কারণ একজন ব্যক্তির গরুর মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বরং অন্যদের পরামর্শ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাদের প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধি ব্যবহার করা উচিত। পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই, একজন ব্যক্তির জ্ঞান অর্জন করা উচিত এবং জ্ঞান এবং প্রমাণের ভিত্তিতে রায় দেওয়া উচিত, অন্যদের অন্ধভাবে অনুসরণ না করে যাতে তাদের জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া কম হয়। ইসলামের ক্ষেত্রে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য শেখা এবং সে অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করা উচিত,

যাতে তারা অন্যদের সঠিক এবং ভুল নির্দেশনার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

কিন্তু সর্বদা যেমন, মহান আল্লাহ মানুষের আন্তরিক তওবা কবুল করেন, তারা যতই বিভ্রান্তিতে পতিত হোক না কেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৯:

" তাদের ছাড়া যারা এরপর তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে। কারণ, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদের অসংখ্য সুযোগ দিয়েছেন, যারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করার পরেও একগুঁয়েভাবে ইসলামের বিরোধিতা করেছিল। মুসলমানদের তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে, তাদের দেওয়া সুযোগগুলো গ্রহণ করে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া এবং তাদের আচরণ সংশোধন করা উচিত যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ, মহান আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার

এবং আল্লাহ তাআলা এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার পূরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

কিন্তু আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, কাউকে কখনোই এই বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে এই দ্বিতীয় সুযোগগুলি তাদের চিরকালের জন্য দেওয়া হবে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত অবকাশ সীমিত সময়ের জন্য। কেউ কখনোই ধরে নেবেন না যে যেহেতু তাদের উপর এখনও শাস্তি আসেনি, এর অর্থ হল এটি আদৌ আসবে না। বিলম্বিত শাস্তি এবং কোন শাস্তি না পাওয়ার সমান নয়। অতএব, তাদের সময় শেষ হওয়ার আগেই মহান আল্লাহ প্রদত্ত অবকাশ সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯০:

" নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনার পর কুফরী করে [অর্থাৎ বার্তা প্রত্যাখ্যান করে] এবং অতঃপর কুফরীতে বৃদ্ধি পায়, তাদের তওবা কখনও কবুল করা হবে না এবং তারাই পথভ্রষ্ট।"

অধিকন্তু, এই আয়াতে অকৃতজ্ঞ তওবার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে যেখানে কেউ তাদের অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এবং দাবি করে যে তারা মহান আল্লাহর কাছে তওবা করেছে। অধিকন্তু, এই আয়াতটি এই বাস্তবতাকেও নির্দেশ করে যে একবার মৃত্যু এসে গেলে, তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এই বিন্দুর পরে তাদের তওবা কবুল করা হবে না। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ১৭-১৮:

“ আল্লাহর কাছে কেবল তাদের জন্যই তওবা কবুল হয় যারা অজ্ঞতাবশত পাপ করে এবং অচিরেই তওবা করে। আল্লাহ তাদেরই ক্ষমা করেন, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। কিন্তু তাদের জন্য তওবা কবুল হয় না যারা মন্দ কাজ করতে থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, "আমি এখন তওবা করেছি", অথবা তাদের জন্যও নয় যারা কাফের অবস্থায় মারা যায়। তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।”

বিচারের দিন কাউকে তওবা করার সুযোগও দেওয়া হবে না। ৩০ নম্বর সূরা আর রুম, ৫৭ নম্বর আয়াত:

"অতএব, সেদিন তাদের ওজর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না যারা অন্যায় করেছে এবং তাদেরকে [আল্লাহকে] সন্তুষ্ট করতে বলা হবে না।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৯০:

" নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনার পর কুফরী করে এবং কুফরীতে বৃদ্ধি পায়, তাদের তওবা কখনও কবুল করা হবে না এবং তারাই পথভ্রষ্ট।"

এই আয়াত এবং পরবর্তী আয়াত এই ভয়াবহ বাস্তবতা সম্পর্কে সতর্ক করে যে, যদি কেউ তাদের ঈমানকে মরতে দেয় এবং আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার উপর অটল থাকে, তাহলে ঈমানের দাবিদাররাও আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, কারণ ঈমান হলো একটি উদ্ভিদের মতো যাকে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। যে উদ্ভিদ সূর্যের আলোর মতো পুষ্টিতে ব্যর্থ হয়, সে যেমন মারা যায়, তেমনি যে ব্যক্তি আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমানও মারা যেতে পারে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। উপরন্তু, বিচারের দিন একজন ব্যক্তিকে যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হবে তার অবস্থা অনুসারেই তাকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সহীহ মুসলিমের ৭২৩২ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হল, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থেকে মৃত্যুবরণ করবে, তাকে পুনরুত্থিত করা হবে এবং আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, আনুগত্যের অবস্থায়। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করে, তার প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করে, তাকে পুনরুত্থিত করা হবে এবং অবাধ্যতার অবস্থায় আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এই আলোচনার উপর ভিত্তি করে একজন ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯১:

"নিশ্চয়ই, যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায় মারা যায়, তাদের কারো কাছ থেকে পৃথিবীর সমান সোনাও কখনও গ্রহণ করা হবে না, যদি সে আত্মত্যাগের জন্য তা দিয়ে থাকে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।"

পৃথিবীতে পার্থিব আশীর্বাদ উপভোগ করাই মানুষের প্রধান কারণ, কেন তারা আল্লাহকে অমান্য করে। আল্লাহ সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাঁর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তারা বিচারের দিন স্বর্ণে ভরা পৃথিবীকে এমনভাবে ব্যবহার করতে প্রস্তুত থাকবে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে,

কিন্তু তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না, কারণ প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহারের সময়কাল তাদের পৃথিবীতে থাকাকালীন। পরবর্তী আয়াতে এটি নির্দেশ করা হয়েছে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯২:

" তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও নেকীর অধিকারী হতে পারবে না..."

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই ব্যয় বলতে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করাকে বোঝায়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব, এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের নিজের জন্য ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয়। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকে। একইভাবে এই বিজ্ঞ রোগী ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, একইভাবে যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন তিনিও ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন। কারণ একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন এবং তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও এত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ

সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ তাদের জীবনের প্রতিটি জিনিস এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে না, কারণ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে। একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসের আকারে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তায়লা মানুষকে ইসলামের শিক্ষাগুলি নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। কিন্তু এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..'"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯২:

"... আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, আল্লাহ তা অবশ্যই জানেন।"

মহান আল্লাহ তাআলা দুটি পথ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার পথ যা মনের শান্তির দিকে পরিচালিত করে এবং তাঁর অবাধ্যতার পথ যা উভয় জগতেই চাপের দিকে পরিচালিত করে। যে পথই বেছে নাও না কেন, মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত এবং উভয় জগতেই তাদের জবাবদিহি করবেন। এই পৃথিবীতে, হয় তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে মানুষ মানসিক শান্তি পাবে, নয়তো তাঁর অবাধ্যতার মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা হবে এবং পরকালে যা আসবে তা আরও গুরুতর। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সংকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

এবং ৯ম অধ্যায়, তাওবাহ, ৮২ নং আয়াতে:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিসহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ্ বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"]"

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ৯৩-৯৭

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ۚ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ ৯৩

﴿فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ৯৪

﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ৯৫

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾ ৯৬

﴿فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ ۚ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ ৯৭

“বনী ইসরাঈলের জন্য সকল খাদ্যই হালাল ছিল, তা ছাড়া যা ইসরাঈল [অর্থাৎ নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালাম] তাওরাত নাযিল হওয়ার আগে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন, “তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।”

আর যারা এরপর আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, তারাই আসলে জালিম।”

বলো, “আল্লাহ সত্য বলেছেন। অতএব, তোমরা ইব্রাহিমের ধর্ম অনুসরণ করো, যিনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।”

নিঃসন্দেহে, মানুষের জন্য প্রথম যে ঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা হলো বাক্কায়
(মক্কায়) অবস্থিত, যা বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক।

এতে স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে[যেমন] ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর স্থান। আর যে কেউ এতে
[হারামে] প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে। আর মানুষের উপর আল্লাহর জন্য
গৃহের হজ্জ করা[পাওয়া] - যে কেউ সেখানে যাওয়ার পথ খুঁজে পেতে সক্ষম।
কিন্তু যে কেউ কুফরী করে[অর্থাৎ, অস্বীকার করে] - তাহলে আল্লাহ বিশ্বজগতের
থেকে মুক্ত।"

মহান আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট ঘটনার মাধ্যমে ধর্মীয় বিদআত এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৩:

" বনী ইসরাঈলের জন্য সকল খাদ্যই হালাল ছিল, তা ছাড়া যা ইসরাঈল [নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালাম] তাওরাত নাথিল হওয়ার আগে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন, "তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

মদিনায় বসবাসকারী আহলে কিতাবরা পার্থিব লাভের জন্য খাদ্যসহ কিছু জিনিসকে তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে হালাল বা অবৈধ বলে দাবি করত এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর আরোপ করত, যেমন তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, যদিও আল্লাহ তায়ালা তাদের ধর্মের বিভিন্ন দিক তাওরাতের মধ্যে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তারা তখনও নেতৃত্ব এবং সম্পদের মতো পার্থিব লাভের জন্য তাওরাতের শিক্ষা সম্পাদনা, ভুল ব্যাখ্যা এবং গোপন করার উপর অটল ছিল।

মুসলিমদের অবশ্যই পার্থিব লাভের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামী শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করে আহলে কিতাবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এইভাবে তারা যে কোনও পার্থিব জিনিস পাবে তা উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এবং পরকালে তাদের জন্য যে শাস্তি অপেক্ষা করছে তা আরও ভয়াবহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই ব্যক্তিকে জাহান্নামের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। সুনান ইবনে মাজাহ, ২৫৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। ৩য় অধ্যায়, আলে ইমরান, আয়াত ৯৪:

"আর যারা এরপর আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, তারাই আসলে জালিম।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মূল আয়াতগুলি ধর্মীয় উদ্ভাবনের বিরুদ্ধে সতর্ক করে। সর্বদা নির্দেশনার দুটি উৎস কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎস এড়িয়ে চলতে হবে। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হবে, এমনকি যদি তা সংকর্মের দিকে পরিচালিত করে, তবুও তারা নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর তত কম কাজ করবে, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে সতর্ক করে বলেছেন যে, যে বিষয় দুটি নির্দেশনার উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন। উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হবে, তত বেশি তারা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে এমন জিনিসগুলিতে কাজ করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পা দেবে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

এরপর মহান আল্লাহ ধর্মীয় বিদআত পরিহার করার এবং মানবজাতিকে প্রদত্ত ধর্মীয় জ্ঞানের উপর আঁকড়ে থাকার গুরুত্বের উপর জোর দেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৫:

"বল, "আল্লাহ সত্য বলেছেন...""

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যেহেতু একমাত্র মহান আল্লাহই সবকিছু জানেন, তাই তিনিই মানুষকে নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। তিনিই মানুষকে শেখাতে পারেন কিভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয় যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে। সমস্ত মানবসৃষ্ট আচরণবিধি কখনই এই পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে না কারণ তাদের জ্ঞান, দূরদর্শিতা, অভিজ্ঞতার অভাব এবং পক্ষপাতের কারণে। ফলস্বরূপ, এই আচরণবিধিগুলি সত্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি নয়। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, এমনকি যদি তা তার আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের একজন জ্ঞানী রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। ঠিক যেমন এই জ্ঞানী রোগী ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার উপর কাজ করেন তিনিও ভালো হবেন। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের প্রেসক্রাইব করা ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই অন্ধভাবে তাদের ডাক্তারের উপর বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষার উপর চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা অন্ধভাবে ইসলামের শিক্ষার উপর বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৫:

"বলুন, "আল্লাহ সত্য বলেছেন। অতএব, তোমরা সত্যের দিকে ঝুঁকে ইব্রাহিমের ধর্ম অনুসরণ করো; এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"

মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ঐশ্বরিক আচরণবিধি ছিল হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জীবনধারার প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং তাঁর পথ হিসেবে গ্রহণ করা এবং এটি তাঁকে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন থেকে বিরত রাখে, তা সে শারীরিক অংশীদার

হোক, যেমন মূর্তি, অথবা অমূর্ত অংশীদার হোক, যেমন সামাজিক প্রবণতা, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি। তিনি ঐশ্বরিক আচরণবিধি এত কঠোরভাবে মেনে চলেন যে, মহান আল্লাহ তাকে এক বিরাট আগুনের ভেতরে থাকা অবস্থায়ও মানসিক প্রশান্তি দান করেন। সূরা ২১ আল আশ্বিয়া, আয়াত ৬৮-৬৯:

"তারা বলল, "তাকে পুড়িয়ে ফেলো এবং তোমাদের দেবতাদের সাহায্য করো - যদি তোমরা কাজ করতে চাও।" আমরা[অর্থাৎ, আল্লাহ] বললাম, "হে আগুন, ইব্রাহিমের উপর শীতলতা এবং নিরাপত্তা হও।"

একইভাবে, যে ব্যক্তি ইসলামী আচরণবিধি গ্রহণ করে, সে এই পৃথিবীতে কষ্টের আগুনের মুখোমুখি হলেও মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে, যাতে সে প্রতিটি কষ্ট শান্তি এবং অগণিত আশীর্বাদের সাথে অতিক্রম করতে পারে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৯৫:

"বলুন, "আল্লাহ সত্য বলেছেন। অতএব, তোমরা সত্যের দিকে ঝুঁকে ইব্রাহিমের ধর্ম অনুসরণ করো; এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"

এটি মক্কার মূর্তিপূজকদের এবং মদিনায় বসবাসকারী আহলে কিতাবদের সরাসরি সমালোচনা ছিল, যারা নিজেদেরকে মহানবী ইব্রাহিম (আঃ)-এর বংশধর হিসেবে অত্যন্ত গর্বিত করেছিল, যদিও তারা তাঁর মতো আচরণ করত না এবং বরং মহান আল্লাহ্র অবাধ্যতায় অটল ছিল। প্রকৃতপক্ষে, উভয় দলই পবিত্র নবী ইব্রাহিম (আঃ)-এর উত্তরাধিকারকে সমুন্নত রাখার দাবি করেছিল, যদিও তারা উভয়েই স্পষ্টতই ইসলামকে অসম্মান করছিল। তাদের অবাধ্যতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যখন তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেও প্রত্যাখ্যান করেছিল। মক্কার মূর্তিপূজকরা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ঘোষণার আগে ৪০ বছর তাঁর সাথে কাটিয়েছিলেন এবং তাই জানতেন যে তিনি মিথ্যাবাদী নন। এবং যেহেতু তারা আরবি ভাষার উপর দক্ষ ছিলেন, তাই তারা জানতেন যে পবিত্র কুরআন কোনও সৃষ্টির বাণী নয়। আহলে কিতাবের পণ্ডিতরা পবিত্র কুরআনকে চিনতে পেরেছিলেন কারণ তারা এর লেখক, আল্লাহ্, মহিমাবিশিষ্টের সাথে পরিচিত ছিলেন এবং তারা পবিত্র কুরআন হিসেবে ইসলামের সত্যতা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কথা তাদের ঐশী গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

মুসলমানদের অবশ্যই এই দুটি দলের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে, যারা মহানবী (সা.)-এর অনুসারী বলে গর্ব করে, কিন্তু বাস্তবে তাঁকে এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর অবিচল ও আন্তরিক আনুগত্যকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়। এই আনুগত্যের অর্থ হল, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টির কারণ হয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা আরবের মূর্তিপূজক এবং মদিনায় বসবাসকারী আহলে কিতাবদেরকে তাঁর নির্মিত পবিত্র আল্লাহর ঘরকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর উত্তরাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৬:

"নিশ্চয়ই, মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রথম ঘরটি হল বাক্কায় [অর্থাৎ মক্কায়] অবস্থিত, যা বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক।"

আল্লাহর ঘর, মহিমাম্বিত কাবা, মানবজাতির জন্য একটি পথপ্রদর্শক কারণ এটি প্রতিনিধিত্ব করে যে কীভাবে তারা এই পৃথিবীতে তাদের সৃষ্টি এবং জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ করবে। সূরা ৫১ আয ধরিয়াত, আয়াত ৫৬:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত[আনুগত্য] করার জন্যই সৃষ্টি করিনি।"

এবং অধ্যায় ৬৭ আল মুলক, আয়াত ২:

"যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম..."

মুসলমানরা যেমন দিনে পাঁচবার মক্কায় অবস্থিত আল্লাহর ঘরের দিকে মুখ করে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করে, তেমনি একজন মুসলমানকে সারাদিন সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যের মুখোমুখি হতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে, এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করবে এবং এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। এই পদ্ধতিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এমন বাস্তব আদর্শ ছিলেন আরবদের পূর্বপুরুষ, হযরত ইব্রাহিম, আলাইহিস সালাম। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ৯৭:

"এতে স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে[যেমন] ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর স্থান..."

মহান আল্লাহ তাআলার আন্তরিক আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছিল হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর উত্তরাধিকার, যা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছেছিল। যে কেউ এই আনুগত্যের দাবি করে, তাকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আনুগত্য ব্যবহার করে মহান আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যে ব্যক্তি এটি করতে ব্যর্থ হয় সে কেবল আরবের মূর্তিপূজক এবং আহলে কিতাবের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, যারা মৌখিকভাবে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর অনুসরণের দাবি করেছিল, কিন্তু কার্যত তা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ঠিক যেমন এই লোকেরা পরকালে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর সাথে একত্রিত হবে না, যেমন তারা কার্যত তাঁর পথ অনুসরণ করেনি, তেমনি যারা তাঁকে এবং তাঁর উত্তরাধিকারী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কার্যত অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারাও পারবে না।

এরপর মহান আল্লাহ মক্কার অমুসলিমদের মক্কায তাঁর ঘরের কারণে তিনি যে নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন তা স্বরণ করিয়ে দিলেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭:

"... আর যে কেউ এতে[অর্থাৎ, মক্কায] প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে..."

সেই সময়, মক্কার আশেপাশের গোত্রগুলি ক্রমাগত একে অপরের উপর আক্রমণ করত এবং তাদের ভূমির পাশ দিয়ে যাওয়া বাণিজ্য কাফেলাগুলিকে লুট করত, কিন্তু মহান আল্লাহর ঘরের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে, যা ছিল পবিত্র নবী ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) এর প্রার্থনার প্রকাশ, তারা মক্কার অমুসলিমদের কোনও ক্ষতি করত না।
অধ্যায় ১০৬ কুরাইশ, আয়াত ১-৪:

"কুরাইশদের অভ্যস্ত নিরাপত্তার জন্য। শীত ও গ্রীষ্মের কাফেলায় তাদের অভ্যস্ত নিরাপত্তার জন্য। তারা যেন এই ঘরের প্রভুর উপাসনা করে। যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে আহার দিয়েছেন এবং ভয় থেকে নিরাপদ করেছেন।"

মক্কার অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের জন্য এই বিন্দুটিই যথেষ্ট ছিল, বিশেষ করে যখন তারা স্পষ্টভাবে এর সত্যতা স্বীকার করেছিল। নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ঘোষণার আগে তারা তাঁর সাথে ৪০ বছর কাটিয়েছিলেন এবং তাই জানতেন যে তিনি মিথ্যাবাদী নন এবং যেহেতু তারা আরবি ভাষার উপর দক্ষ ছিলেন, তাই তারা জানতেন যে পবিত্র কুরআন কোনও সৃষ্ট সত্তার কথা নয়। এত কিছু পরেও, মক্কার অমুসলিমদের নেতারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ তারা জানতেন যে এটি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিজেদের সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে। এটি এমন একটি বিষয় যা তারা গ্রহণ করতে পারেনি।

যেহেতু মক্কায় অবস্থিত আল্লাহর ঘর কাবা অমুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, তাই মহান আল্লাহ বারবার নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীদের (তাঁদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন) প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, তাদের লক্ষ্যের একটি অংশ ছিল তাঁর ঘরকে মুক্ত করা যাতে এটি শেষ যুগ পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য এই পৃথিবীতে জীবনের উদ্দেশ্য পূরণের নিদর্শন হয়ে ওঠে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭:

"... আর মানুষের উপর আল্লাহর জন্যই ঘরের হজ্জ করা আবশ্যক - যে কেউ সেখানে পৌঁছানোর পথ খুঁজে পেতে সক্ষম তার জন্য..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে ধর্মীয় সাফল্যের জন্য ত্যাগ এবং প্রচেষ্টা প্রয়োজন। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি ত্যাগ এবং প্রচেষ্টা ছাড়া পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে পারে না, যেমন একজন ডাক্তার হওয়া, তেমনি একজন ব্যক্তি ত্যাগ এবং প্রচেষ্টা ছাড়া উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে এমন ধর্মীয় সাফল্য অর্জন করতে পারে না। অতএব, যে ব্যক্তি অলসতা অবলম্বন করে প্রতিটি পরিস্থিতিতে, যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত, আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, সে দেখতে পাবে যে সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে না, এমনকি যদি সে মৌখিকভাবে ইসলামে বিশ্বাসী বলে দাবি করে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৯৭:

"... আর মানুষের উপর আল্লাহর জন্যই ঘরের হজ্জ করা আবশ্যক - যে কেউ সেখানে পৌঁছানোর পথ খুঁজে পেতে সক্ষম তার জন্য..."

পবিত্র হজ্জের আসল উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের পরকালের শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা। যেভাবে একজন মুসলমান পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য তাদের ঘর, ব্যবসা, সম্পদ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সামাজিক মর্যাদা ত্যাগ করে, ঠিক

একইভাবে তারা তাদের মৃত্যুর সময়, পরকালের শেষ যাত্রায়, স্থায়ীভাবে এই জিনিসগুলি পিছনে ফেলে আসবে। যখন একজন মুসলিম তাদের পবিত্র হজ্জের সময় এটি স্মরণ করবে, তখন তারা এই কর্তব্যের সমস্ত দিক সঠিকভাবে পালন করবে। এছাড়াও, তারা পরিবর্তিত ব্যক্তি হয়ে বাড়ি ফিরে যাবে, কারণ তারা পরকালের শেষ যাত্রার প্রস্তুতি এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতাকে অন্যান্য সমস্ত কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দেবে। ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তারা এটি অর্জন করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে। অতএব, এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে।

অতএব, মুসলমানদের পবিত্র হজ্জকে ছুটির দিন হিসেবে দেখা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এই মনোভাব তাদের এটি সঠিকভাবে পালন করতে এবং এর উদ্দেশ্য পূরণ করতে বাধা দেবে। এটি অবশ্যই মুসলমানদের তাদের পরকালের শেষ যাত্রার কথা মনে করিয়ে দেবে, এমন একটি যাত্রা যার কোন প্রত্যাবর্তন নেই এবং দ্বিতীয় কোন সুযোগ নেই। কেবলমাত্র এটিই পবিত্র হজ্জ সঠিকভাবে পালন করতে এবং পরকালের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুতি নিতে অনুপ্রাণিত করবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে তাকে তাদের পবিত্র হজ্জের মাধ্যমে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। সহীহ বুখারী, ১৭৭৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। অধ্যায় ৩, আলে ইমরান, আয়াত ৯৭:

"... আর মানুষের উপর আল্লাহর জন্যই ঘরের হজ্জ করা আবশ্যিক - যে কেউ সেখানে পৌঁছানোর পথ খুঁজে পেতে সক্ষম তার জন্য..."

অধিকন্তু, এই আয়াতটি ইসলামের সহজ-সরল প্রকৃতির ইঙ্গিত দেয় কারণ মহান আল্লাহ কেবল মানুষের সামর্থ্য অনুসারে কর্তব্য নির্ধারণ করেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮৬:

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপান না..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এমন অলস মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে যেখানে তারা দাবি করে যে তারা তাদের বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, যদিও তারা তা করে না। যদি কেউ যথাসাধ্য চেষ্টা করে, তবে নিঃসন্দেহে তারা তাদের উপর অর্পিত সমস্ত কর্তব্য পালন করবে কারণ প্রতিটি কর্তব্য পালন করা তাদের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। কেউ নিজেকে এবং অন্যদের বোকা বানাতে পারে কিন্তু তারা মহান আল্লাহকে বোকা বানাতে পারবে না, এবং তাই কেউ যদি তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয় তবে তিনি কোনও অজুহাত গ্রহণ করবেন না।

এরপর আল্লাহ তাআলা কারোর ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন না করার বিষয়ে সতর্ক করে বলেন, কারণ এটি কুফরীতে পরিণত হতে পারে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭:

"...কিন্তু যে কেউ কুফরী করে (অর্থাৎ, অস্বীকার করে) - তাহলে আল্লাহ অবশ্যই বিশ্বজগতের অভাবমুক্ত।"

শারীরিক আনুগত্যের মাধ্যমে কারো মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন না করা কুফরীতে পরিণত হতে পারে কারণ ঈমান হলো এমন একটি উদ্ভিদের মতো যা বেঁচে থাকার জন্য আনুগত্যের মাধ্যমে পুষ্ট হতে হয়। যে উদ্ভিদ সূর্যালোকের মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, সে যেমন মারা যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও মারা যেতে পারে যে আনুগত্যের মাধ্যমে তা পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। অতএব, একজন ব্যক্তির নিজের স্বার্থে, তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করা উচিত কারণ মহান আল্লাহ, না ইসলামের তাদের ঈমান বা কর্মের প্রয়োজন। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৯৭:

"... নিশ্চয়ই, আল্লাহ বিশ্বজগতের অভাবমুক্ত।"

এই সত্যটি মনে রাখলে কেউ অহংকার থেকে বিরত থাকে, যার মাধ্যমে তারা বিশ্বাস করে যে তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাঁর আনুগত্য করে আল্লাহ তায়ালার প্রতি অনুগ্রহ করছে। এটি একটি অত্যন্ত অজ্ঞতাপূর্ণ মনোভাব কারণ আল্লাহর অসীম মর্যাদা মানুষের আচরণ অনুসারে পরিবর্তিত হয় না। মানুষের মর্যাদা পরিবর্তিত হয় তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে কিনা তার উপর নির্ভর করে।

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ৯৮-১০১

قُلْ يَٰأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَٰتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾
قُلْ يَٰأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَن ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا
ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بِعَدَآئِمِكُمْ كَٰفِرِينَ ﴿١٠٠﴾
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رُسُلُهُٗ، وَمَن يَعْصِمْ بِٱللَّهِ فَقَدْ
هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

"বলুন, হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে কেন অস্বীকার
করছো, অথচ আল্লাহ তোমাদের কর্মের সাক্ষী?"

বলুন, হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা কেন ঈমানদারদের আল্লাহর পথ থেকে
বিচ্যুত করছো, তোমরা তা বক্র করার চেষ্টা করছো, অথচ তোমরাই সাক্ষী? আর
আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বেখবর নন।

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আহলে কিতাবদের কোন দলের কথা মেনে চলো,
তাহলে তারা তোমাদের ঈমানের পর কাফের করে ফেলবে।

আর তোমরা কীভাবে কুফরী করতে পারো, যখন তোমাদের সামনে আল্লাহর
আয়াত পাঠ করা হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল আছেন? আর যে ব্যক্তি
আল্লাহর পথ দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, সে অবশ্যই সরল পথের দিকে পরিচালিত
হবে।"

আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদের কিছু পণ্ডিতকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করার এবং তাদের অজ্ঞ অনুসারীদের বিভ্রান্ত করার জন্য সমালোচনা করেছেন, যদিও তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেছিল। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৯৮:

"বলুন, হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে কেন অস্বীকার করছো, অথচ আল্লাহ তোমাদের কর্মের সাক্ষী?"

এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায় আল-আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

তারা পবিত্র কুরআনকে চিনতে পেরেছিল কারণ তারা এর লেখক, মহিমাম্বিত আল্লাহকে চিনত, এবং তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উভয়কেই চিনত, যেমনটি তাদের ঐশী গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। উপরন্তু, আহলে কিতাব এবং মক্কার অমুসলিম উভয়ই জানত যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করেননি এবং তাই তাঁর পক্ষে পবিত্র কুরআন জাল করা অসম্ভব ছিল। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ৪৮:

"আর তুমি এর আগে কোন কিতাব পাঠ করেনি এবং তোমার ডান হাতে কোন কিতাব লিখে রাখোনি। তাহলে [অর্থাৎ, অন্যথায়] মিথ্যাবাদীদের সন্দেহের কারণ হত।"

যেহেতু তারা পার্থিব লাভ, যেমন সম্পদ এবং নেতৃত্বের জন্য তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার চালিয়ে যেতে চেয়েছিল, তাই তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশী ধর্মগ্রন্থ থেকে জ্ঞান সম্পাদনা, ভুল ব্যাখ্যা এবং গোপন করেছিল। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৭৪:

"বলুন, হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে কেন অস্বীকার করছো, অথচ আল্লাহ তোমাদের কর্মের সাক্ষী?"

আহলে কিতাবরা ইচ্ছাকৃত ধারণা গ্রহণ করেছিল যা তাদেরকে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করার পরেও বিভ্রান্তিতে থাকতে উৎসাহিত করেছিল। তারা বিশ্বাস করত যে

যেহেতু তারা মহান আল্লাহর প্রিয়জন, তাই তিনি তাদের শাস্তি দেবেন না, এমনকি যদি তারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে তাঁর অবাধ্য হয়। ৫ম সূরা আল মায়িদা, আয়াত ১৮:

"কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, "আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়জন।" বলুন, "তাহলে তিনি তোমাদের পাপের জন্য কেন শাস্তি দেন?" বরং তোমরা তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন..."

এই ধরনের বোকামিপূর্ণ বিশ্বাস গ্রহণ করে, তারা মহান আল্লাহর উপর অবিচার ও অবিচার আরোপ করেছিল, কারণ তারা দাবি করেছিল যে তিনি তাদের মধ্যে একজন মন্দ কর্মচারীর সাথে সৎকর্মকারীর মতোই আচরণ করবেন। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২১:

"যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমি তাদেরকে তাদের মতো করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান করে দেব? তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না মন্দ।"

অধিকন্তু, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস বর্ণবাদকে আল্লাহ তাআলার উপর আরোপ করেছিল, কারণ তারা দাবি করেছিল যে তারা তাদের বংশের কারণে বাকি মানবজাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে, কারণ তারা পবিত্র নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর।

অধিকন্তু, তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, তাদের অবাধ্যতার জন্য যদি তাদের শাস্তি দেওয়া হয়, তবুও তা সীমিত সময়ের জন্য হবে কারণ তারা নিজেদেরকে বিশ্বাসী বলে মনে করত, যদিও তারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে কাফের হয়ে গিয়েছিল। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ৮০:

"আর তারা বলে, "জাহান্নাম আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না, [কয়েক] দিন ছাড়া।" বলুন, "তোমরা কি আল্লাহর সাথে কোন অঙ্গীকার করেছ? কারণ আল্লাহ কখনও তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে এমন কিছু বল যা তোমরা জানো না?"

এবং ৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ১৫০-১৫১:

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, “আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে অবিশ্বাস করি” এবং এর মাঝামাঝি কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফের। আর আমরা কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।”

এই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনাই তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় অটল থাকতে এবং ইসলামের সত্যতা স্বীকার করার পরেও প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করেছিল। মুসলিমদের অবশ্যই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা

এড়িয়ে চলতে হবে। তাদের এই মিথ্যা বিশ্বাস গ্রহণ করা এড়িয়ে চলতে হবে যে তারা মহান আল্লাহর প্রিয়, কারণ তারা মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মত। এই মিথ্যা বিশ্বাস কেবল আল্লাহকে অবাধ্য হতে উৎসাহিত করে এবং তাঁর প্রতি অন্যায়, অবিচার এবং বর্ণবাদের মতো মিথ্যা জিনিস আরোপ করে। উপরন্তু, তাদের অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে এবং ধরে নিতে হবে না যে তারা তাদের ঈমান নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে, কারণ আল্লাহকে প্রদত্ত নিয়ামতগুলির অপব্যবহার করে অবাধ্যতা চালিয়ে যাওয়া কুফরের দিকে পরিচালিত করতে পারে। কারণ ঈমান একটি গাছের মতো যাকে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। যে গাছ সূর্যালোকের মতো পুষ্টি পায় না, সে মারা যাবে, ঠিক তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও মারা যেতে পারে যে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

তাছাড়া, মদিনায় ইসলাম আসার আগে, আহলে কিতাবরা শক্তিশালী অবস্থানে ছিল কারণ তারা মদিনায় বসবাসকারী মূর্তিপূজকদের কাছ থেকে আর্থিকভাবে উপকৃত হতো। কিন্তু ইসলাম যখন মদিনায় প্রবেশ করে, তখন এই মূর্তিপূজকরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং ফলস্বরূপ, আহলে কিতাবরা তাদের কাছ থেকে আর তেমন সুবিধা পায়নি। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী (সা.) মদিনায় হিজরতের প্রথম বছরে, তিনি তাঁর মসজিদের কাছে একটি বাজার স্থাপন করেন কারণ একমাত্র বাজারটি আহলে কিতাবদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, যারা আর্থিক সুদের মতো অবৈধ এবং অন্যায় আর্থিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করত, যদিও এটি তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, নবীর (সা.) নোবেল লাইফ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯২৩-৯২৫- এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের আগমনের ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে, আহলে কিতাবরা সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, বিভ্রান্ত করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা

চালিয়েছিল, যার ফলে তাদের ইসলাম ত্যাগ করতে উৎসাহিত করেছিল। অধ্যায় ৩, আলে ইমরান, আয়াত ৯৯:

"বলুন, "হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা কেন ঈমানদারদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করছো, তোমরা তা বন্ধ করার চেষ্টা করছো, অথচ তোমরাই [সত্যের] সাক্ষী? আর আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বেখবর নন।"

ইসলামের ভয়ের কারণে মানুষ সম্পদ অর্জনে ব্যর্থ হয়, যার ফলে বিনোদন শিল্প এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মতো কোম্পানিগুলি মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালায়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এবং ইসলামিক শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য করার উপর তাদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে যাতে অন্যদের প্রচেষ্টার দ্বারা বিভ্রান্ত না হন। এই আনুগত্যের একটি দিক হল বিনোদন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মতো অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে লিপ্ত হওয়া এড়ানো, এমনকি যদি সেগুলি বৈধ বলে বিবেচিত হয়।

অধিকন্তু, আহলে কিতাবরা ঐশী ওহীর অধিকারী ছিলেন এবং তাই ঐশী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, বৃহত্তর সমাজে, এমনকি মূর্তিপূজকদের মধ্যেও তাদের একটি বিশেষ স্থান ছিল। কিন্তু ইসলামের আগমনের মাধ্যমে এই বিশেষ মর্যাদা সরাসরি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। আহলে কিতাবরা আরও ঈর্ষান্বিত হয়েছিল যে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ভাই হযরত ইসহাকের বংশধর না হয়ে বরং হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। যেহেতু তাদের পুরো ধর্ম বংশের গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, যা তাদের মতে অন্যান্য মানবজাতির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিল, তাই তারা একজন পবিত্র নবী (সাঃ)-কে গ্রহণ এবং অনুসরণ করতে

পারেনি, যিনি ভিন্ন বংশ থেকে এসেছিলেন। এটি কেবল তাদের তৈরি শ্রেষ্ঠত্বের জটিলতাকে ধ্বংস করবে। এই ঈর্ষা ছিল আহলে কিতাবের আলেমদের সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, বিভ্রান্ত করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালানোর আরেকটি কারণ।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, হিংসা একটি ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্য যা এড়িয়ে চলা উচিত। এটি একটি কবীরা পাপ কারণ এটি ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট আশীর্বাদ প্রদানের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর পছন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের কথা ও কর্মকে তাদের হিংসা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, যার সাথে তারা ঈর্ষা করে তার অধিকার পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মহান আল্লাহ সকলকে তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তাই দান করেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, তাদের অবশ্যই ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহারের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে কারণ এটিই তাদের উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। এই মনোভাব তাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্য বজায় রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করার সাথে সাথে তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব, এটি উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে।

অন্যদিকে, হিংসাকে তাদের কথা এবং কর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে দিলে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলির অপব্যবহার করবে এবং ফলস্বরূপ তারা মানসিক শান্তি পাবে না।

যে মুসলিমের উপর ঈর্ষা করা হয় তাকে অবশ্যই তার ঈর্ষাকারীর মৌখিক ও শারীরিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ধৈর্য ধরতে হবে এবং কেবল ইসলামের সীমানার মধ্যেই আত্মরক্ষা করতে হবে। ধৈর্যের অর্থ হলো নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা, যার অর্থ হলো পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত নিয়ামতগুলো ব্যবহার করা। এভাবেই একজন ব্যক্তি তার ঈর্ষাকারী থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সূরা ১১৩ আল ফালাক, আয়াত ১ এবং ৫:

"বলুন, "আমি প্রভাতের প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা করছি...এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"

তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের হিংসুকদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়, কারণ মহান আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে কাজ করেন, মানুষের সীমিত চিন্তাভাবনা অনুসারে নয়।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৯৯:

"বলুন, "হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা কেন ঈমানদারদের আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখো, তোমরা তা বক্র করার চেষ্টা করো, অথচ তোমরাই [সত্যের] সাক্ষী?"..."

যারা তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায় তাদের কৌশল এড়িয়ে চলতে হবে। তাদের পরিকল্পনার একটি দিক হলো ইসলামকে বিপথগামী করে তোলা এবং মুসলিমদের ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ না করার জন্য উৎসাহিত করা। একজন মুসলিম কেবল ইসলামী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই এই আক্রমণকে কাটিয়ে উঠতে পারে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য শিখতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, যাতে তারা ইসলামের সত্যতা এবং ন্যায়নিষ্ঠতার ইঙ্গিত দেয় এমন স্পষ্ট প্রমাণগুলি উপলব্ধি করতে পারে। ইসলামের মধ্যে যেসব বিধানকে বিভ্রান্ত ব্যক্তির বিপথগামী হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, সেগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং যে ব্যক্তি খোলা মনে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে, সে নিঃসন্দেহে এই বিধানগুলি গ্রহণ করবে জেনে যে এটি তাদের এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য সর্বোত্তম। অন্যদিকে, যে মুসলিম ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তাকে সহজেই অন্যরা ইসলামকে একটি বিপথগামী এবং বর্বর ধর্ম বলে বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করবে।

আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, সকল মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছেন, যারা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে অথবা যারা অজ্ঞতার সাথে ইসলামের উপর নিক্ষিপ্ত মিথ্যা সমালোচনা গ্রহণ করে, তারাই হোক না কেন, তিনি উভয় জগতেই তাদের জবাবদিহি করবেন। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৯:

"... আর তোমরা যা করো আল্লাহ তা সম্পর্কে বেখবর নন।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১০০:

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আহলে কিতাবদের কোন দলের কথা মেনে চলো, তাহলে তারা তোমাদের ঈমানের পর কাফের করে ফেলবে।"

পবিত্র কুরআনে যখন মহান আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের মৌখিক ঈমানের দাবি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া মৌখিক ঈমানের দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হলো সেই প্রমাণ এবং প্রমাণ যা অর্জন করা প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতেই পুরস্কার এবং রহমত লাভ করতে পারে। যেমন একটি ফলবান বৃক্ষ কেবল তখনই কার্যকর যখন তা ফল দেয়, তেমনি ঈমান কেবল তখনই কার্যকর যখন তা সংকর্ম করে। এই কর্মের আহ্বানে, মহান আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যদি তারা অজ্ঞতার সাথে অন্যদের আনুগত্য করে যারা তাদেরকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্য রাখে, তাহলে তারা ঈমান আনার পর আবার কাফের হয়ে যেতে পারে।

প্রথমত, লক্ষণীয় বিষয় হল, এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে, সকল আহলে কিতাব এই ধরনের আচরণ করতেন না। তাদের অনেকেই আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলেন, যার অর্থ হল, আল্লাহকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এটি সেই গোষ্ঠীর কিছু সদস্যের

কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীর বিচার না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ এটি প্রায়শই বর্ণবাদের মতো বৈষম্যের দিকে পরিচালিত করে।

এছাড়াও, একজন মুসলিম যদি ইসলামের শিক্ষা পরিত্যাগ করে তাদের পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করে, তাহলে সে আবার কুফরীতে ফিরে যেতে পারে, এমনকি যদি তারা মৌখিকভাবে নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে। কারণ ঈমান হলো এমন একটি গাছের মতো যা বেঁচে থাকার জন্য আনুগত্যের মাধ্যমে পুষ্ট হতে হবে। যেভাবে একটি উদ্ভিদ সূর্যালোকের মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, সে মারা যাবে, ঠিক তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও মারা যেতে পারে যে তাকে আনুগত্যের মাধ্যমে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এটি সবচেয়ে বড় ক্ষতি। এভাবেই একজন মুসলিম তাদের ঈমান হারাতে পারে এবং প্রায়শই তাদের অনুসরণ করার ফলে যারা পার্থিব কারণে, যেমন সম্পদ এবং সামাজিক প্রভাব অর্জনের জন্য তাদের পথভ্রষ্ট করতে চায়। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এই পরিণতি কেবল ইসলামী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই এড়ানো যেতে পারে। এটি ঈমানের নিশ্চিততার দিকে পরিচালিত করে। দৃঢ় ঈমান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময়, প্রতিটি পরিস্থিতিতেই, সর্বশক্তিমান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ ও প্রমাণাদি শেখা এবং তার উপর আমল করা হলে দৃঢ় ঈমান অর্জন করা সম্ভব হয়, যেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ হয়। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ব্যক্তি যখনই তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে, তখন সহজেই আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হবে কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে, তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে বরং মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ হয়। অতএব, ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও

শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং প্রত্যেককে এবং সবকিছুকে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থাপন করে। ঈমানের নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১০১:

" আর তোমরা কীভাবে কুফরী করতে পারো, যখন তোমাদের সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল আছেন? আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কথা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে, সে সরল পথে পরিচালিত হয়।"

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য আজও মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সাথে থাকবে। যতক্ষণ তারা এগুলো শেখার এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করবে, ততক্ষণ তারা মহান আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং এটি ঈমানের নিশ্চয়তার দিকে পরিচালিত করবে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, দৃঢ় ঈমান তাদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করবে এবং উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১০০:

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আহলে কিতাবদের কোন দলের কথা মেনে চলো, তাহলে তারা তোমাদের ঈমানের পর কাফের করে ফেলবে।"

এই আয়াতটি একটি নির্দিষ্ট ঘটনার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। মদিনায় বসবাসকারী একজন ঈর্ষান্বিত বয়স্ক অমুসলিম শাস বিন কায়স একবার মদিনার সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, এক সমাবেশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মদিনার সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, মূলত দুটি প্রধান গোত্র, আউস এবং খাজরাজ থেকে এসেছিলেন। এই দুটি গোত্র প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একে অপরের সাথে যুদ্ধ করে আসছিল এবং ইসলাম গ্রহণের পরই তারা একত্রিত হয়েছিল। যখন শাস মদিনার সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, একে অপরের প্রতি যে মহান ভালোবাসা এবং স্নেহ লক্ষ্য করেছিলেন, যদিও কয়েক বছর আগে তারা শত্রু ছিল, তখন ইসলামের প্রতি তার ঘৃণা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। তিনি একজন তরুণ কবিকে আউস এবং খাজরাজ দুটি গোত্রের মধ্যে সংঘটিত একটি পুরানো যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু কথা বলতে উৎসাহিত করেছিলেন, যেখানে তাদের অনেক বিশিষ্ট নেতা নিহত হয়েছিল। এই কবিতাটি প্রাচীন পুরানো নেতিবাচক অনুভূতিগুলিকে উষ্ণে দিয়েছিল যা ইসলাম দ্বারা সমাহিত করা হয়েছিল, যার ফলে কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, একে অপরের সাথে তর্ক করতে বাধ্য হয়েছিল। যেকোনো যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আগে, মহানবী (সা.)-কে কী ঘটেছিল তা জানানো হয়েছিল এবং তিনি তাদের কাছে গিয়ে তাদের নতুন যুগের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। উপজাতি আনুগত্যের নামে অজ্ঞতাপূর্ণ অনুশীলন এবং অর্থহীন সহিংসতা থেকে দূরে একটি নতুন যুগ। এই নেতিবাচক অনুভূতিগুলি এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যগুলির দ্বারা দ্রুত নিভে গিয়েছিল যতক্ষণ না সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, একে অপরের প্রতি তাদের মনোভাব এবং আচরণ সংশোধন করে একে অপরের প্রতি তাদের ভ্রাতৃত্বপ্রেমে ফিরে আসেন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা 236-237-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা আলে ইমরানের ১০০ নম্বর আয়াত নাযিল করেছেন:

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আহলে কিতাবদের কোন দলের কথা মেনে চলো, তাহলে তারা তোমাদের ঈমানের পর কাফের করে ফেলবে।"

ইমাম ওয়াহিদীর " আসবাব আল নুযুল" , ৩:১০০, পৃষ্ঠা ৩৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলা এড়িয়ে চলা কারণ এটি মানুষের হৃদয়ে নেতিবাচক অনুভূতি তৈরি করে। এটি প্রায়শই পরিবারের মধ্যে ঘটে যেখানে একজন ব্যক্তি তাদের আত্মীয়স্বজনদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলে, বিশেষ করে তাদের সন্তানদের সামনে। এটি মানুষের হৃদয়ে নেতিবাচক অনুভূতি তৈরি করে, যার ফলে সম্পর্ক ভেঙে যায় এবং অন্যদের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হয়। যেহেতু মানুষ ফেরেশতা নয়, তাই তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় অন্যদের সম্পর্কে যা শোনে তা দ্বারা প্রভাবিত হয়, তারা তা উপলব্ধি করুক বা না করুক এবং তারা এই পরিণতি কামনা করুক বা না করুক। অতএব, মুসলমানদের কর্তব্য হল অন্যদের সম্পর্কে কেবল ভালো কথা বলা যাতে মানুষের হৃদয়ে ইতিবাচক অনুভূতি তৈরি হয়। শুধুমাত্র বিরল ক্ষেত্রে যেখানে অন্যদের সতর্ক করার প্রয়োজন হয়, সেখানেই মানুষের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলা যেতে পারে। এমনকি যেখানে কেউ বাস্তব জীবনের উদাহরণের মাধ্যমে কাউকে শিক্ষা দিতে চায়, তাদের নাম উল্লেখ করা এড়িয়ে চলা উচিত, ঠিক যেমনটি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) করতেন। যে ব্যক্তি অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা শোনে তার উচিত বক্তাকে গীবত করা থেকে বিরত থাকতে এবং তাদের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে শিক্ষিত করতে সতর্ক করা। তাদের অবশ্যই অন্যদের সম্পর্কে শোনা নেতিবাচক কথার উপর মনোযোগ দেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে তারা তাদের সম্পর্কে যা শুনেছে তা তাদের সম্পূর্ণ চরিত্রকে সংজ্ঞায়িত করে না। তাদের অবশ্যই যার

সম্পর্কে নেতিবাচক কথা শুনেছে তার প্রতি ভালো আচরণ প্রদর্শন করতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার পূরণ করতে হবে। সহজ কথায়, একজনের উচিত অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা সে চায় অন্যরা তার সাথে আচরণ করুক। এইভাবে আচরণ করলে অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলার কারণে তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তা কমবে।

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১০২-১০ ৯

يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۚ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ أُسْوِدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾

تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ﴿١٠٩﴾

“হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত, তেমনভাবে ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরণ করো, যখন তোমরা শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের হৃদয়কে একত্রিত করেছিলেন এবং তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গিয়েছিলে। আর তোমরা জাহান্নামের গর্তের কিনারায় ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছিলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা হিদায়াত পাও।

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি জাতি [উঠুক] যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে, আর তারা ই সফলকাম হবে।

আর তাদের মতো হয়ো না, যারা স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

যেদিন কিছু মুখ সাদা হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে। যাদের মুখ কালো হবে, তাদের বলা হবে, "তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিলে? তাহলে তোমরা যা অস্বীকার করতে তার জন্য শাস্তি আশ্বাদন করো।"

আর যাদের মুখমন্ডল সাদা হবে, তারা আল্লাহর রহমতের মধ্যে থাকবে এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

এগুলো আল্লাহর আয়াত, আমরা এগুলো তোমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে পাঠ করছি; আর আল্লাহ বিশ্বজগতের উপর কোন জুলুম চান না।

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর এবং আল্লাহর কাছেই সকল বিষয়
প্রত্যাবর্তিত হবে।"

যখন মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুমিনদের প্রতি আহ্বান জানান, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের মৌখিক ঈমানের দাবি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হলো প্রমাণ এবং প্রমাণ যা অর্জন করা প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার এবং রহমত লাভ করতে পারে। যেমন একটি ফলবান বৃক্ষ কেবল তখনই কার্যকর যখন তা ফল দেয়, তেমনি ঈমান কেবল তখনই কার্যকর যখন তা সংকর্ম করে। এই ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের ঈমান বাস্তবায়নের জন্য উৎসাহিত করেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০২:

" হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত তেমন ভয় করো..."

তাকওয়া হলো পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। অতএব, তাকওয়া একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্য নিশ্চিত করে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তার জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেয়। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে তার সামর্থ্য অনুসারে তাকওয়া গ্রহণ করবে, কারণ এটিই হলো মহান আল্লাহকে ভয় করার অর্থ, যেভাবে তিনি ভয় পাওয়ার যোগ্য। এর বাইরে যা কিছু তা মানুষের সামর্থ্যের বাইরে, যা তাদের কাছ থেকে কখনও আশা করা যায় না। তাগাবুনের ৬৪ নম্বর আয়াতে, ১৬ নম্বর আয়াতে:

"অতএব, যতটা সম্ভব আল্লাহকে ভয় করো..."

অতএব, এই আয়াত মুসলমানদেরকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে উৎসাহিত করে এবং এমন অলস মনোভাব এড়িয়ে চলে যেখানে তারা কেবল বাধ্যতামূলক কর্তব্যগুলিই পালন করে এবং তাদের প্রদত্ত সমস্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদাসীন থাকে। এই ধরনের আচরণ করা হল মৌলিক এবং ন্যূনতম বাধ্যতামূলক কর্তব্যগুলি পালনকারী মুসলমানদের মানসিক শান্তি অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার একটি প্রধান কারণ, কারণ তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার অব্যাহত রাখে। এটি তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেয় এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় ফেলে দেয়। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০২:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত তেমন ভয় করো..."

কিছু পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে এই আয়াতটি রহিত করা হয়েছিল কারণ কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, যথাযথভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে কেউই এতটা শক্তিশালী ছিল না যে তিনি যেভাবে ভয় পাওয়ার যোগ্য ছিলেন, ঠিক তেমনভাবে আল্লাহকে ভয় করার জন্য। এরপর ৬৪তম সূরা তাগাবুনের ১৬তম আয়াত নাজিল হয়:

"অতএব, যতটা সম্ভব আল্লাহকে ভয় করো..."

কিন্তু দুটি আয়াত বাতিল না করেই মিলিত হতে পারে। দ্বিতীয় আয়াতটি কেবল আলোচ্য মূল আয়াতটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে, এটি বাতিল করেনি। অর্থাৎ, উভয় আয়াতের অর্থ একই, সর্বোচ্চ ক্ষমতা অনুসারে আল্লাহকে ভয় করো। এটি তাফসির আল কুরতুবী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৩-এ আলোচনা করা হয়েছে। এটি আরও সমর্থন করে যে, মহান আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে এমন দায়িত্ব দেন না যা তারা পালন করতে পারে না, এবং তাঁকে যেভাবে ভয় করা উচিত সেভাবে ভয় করা কারো দ্বারা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারা, আয়াত ২৮৬:

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধের বাইরে কোন বোঝা চাপান না..."

উপরন্তু, তাকওয়ার একটি দিক হল কিছু হালাল জিনিস এড়িয়ে চলা, কারণ এটি তাকে হারাম জিনিসের দিকে নিয়ে যাবে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ১৮৭:

"...এগুলো আল্লাহর[নির্ধারিত] সীমা, তাই এর কাছে যেও না..."

মহান আল্লাহ কখনও তাঁর সীমা লঙ্ঘন না করার কথা বলেননি, বরং তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে মানুষ যেন তাঁর সীমার কাছেও না যায়। পবিত্র কুরআন জুড়ে এই উপদেশ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ হযরত আদম (আঃ)-কে জান্নাতের একটি গাছের ফল না খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু গাছের কাছেও না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যদিও এর কাছে যাওয়া বৈধ ছিল। ৭ম সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ১৯:

"আর"হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখান থেকে ইচ্ছা থাকে, কিন্তু এই গাছের কাছে যেও না, অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"

অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যা ইঙ্গিত দেয় যে কেবল কিছু বৈধ বলেই তা করা উচিত নয়, কারণ মহান আল্লাহর সীমা অতিক্রম করা অবৈধ নয়, কেবল তা অতিক্রম করা অবৈধ। কিছু বৈধ জিনিস, যেমন অনর্থক জিনিস, এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি প্রায়শই অবৈধের দিকে পরিচালিত করে। উদাহরণস্বরূপ, অনর্থক কথাবার্তা, যা পাপ হিসাবে বিবেচিত হয় না, প্রায়শই পাপের দিকে পরিচালিত করে যেমন গীবত এবং মিথ্যা বলা। সম্পদের অনর্থক ব্যয় প্রায়শই অপব্যয় ব্যয়ের দিকে পরিচালিত করে, যা পাপ। অধ্যায় ১৭ আল ইসরা, আয়াত ২৭:

"নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই, আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।"

যারা বিপথগামী হয়ে পড়েছে তাদের অধিকাংশই ধাপে ধাপে এই পথে চলে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, তারা অবৈধ জিনিসগুলিতে অংশ না নিয়ে সেগুলিতে অংশ নিতে উৎসাহিত এবং প্রলুব্ধ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি মদ্যপানকারীদের সাথে থাকে, তার মদ্যপান করার সম্ভাবনা সেই ব্যক্তির তুলনায় বেশি থাকে যারা মদ্যপানকারীদের সাথে থাকে না। কিছু হালাল জিনিস, বিশেষ করে অসার জিনিস, এড়িয়ে চলার এই মনোভাব এমনই, যা মহানবী (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৪৫১

নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি ধার্মিক হতে পারে না, অর্থাৎ, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করার উপর তারা অটল থাকতে পারে না, যতক্ষণ না তারা কিছু হালাল জিনিস ত্যাগ করে ভয়ে যে এটি তাদেরকে হারাম জিনিসের দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, কেবল হারাম জিনিস এড়িয়ে চলার দিকেই অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হবে না, বরং কিছু হালাল জিনিস, বিশেষ করে অসার জিনিস এড়িয়ে চলার দিকেও অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হবে, কারণ ভয়ে এটি তাদেরকে অবশেষে হারাম জিনিসের দিকে নিয়ে যাবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকবে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত, যা ন্যায়ের সারাংশ এবং উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৭:

"... এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ [অর্থাৎ, বিধান] মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।"

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সীমারেখার কাছে না যাওয়ার গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়, সে হালাল জিনিসগুলিতে, বিশেষ করে অসার জিনিসগুলিতে অতিরিক্ত লিপ্ত হবে, যা তাদের অবৈধ জিনিসগুলিতে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে, যার ফলে উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলার সৃষ্টি হবে, এমনকি তারা বিনোদনের মুহূর্তগুলিও উপভোগ করবে, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতা থেকে বাঁচতে পারবে না। যারা এইভাবে আচরণ করে, যেমন ধনীদেব, তাদের জীবন পর্যবেক্ষণ করলে এটি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সূরা তওবার ৯, আয়াত ৮২:

"তাহলে তারা যেন অল্প হেসে ফেলে এবং [তারপর] অনেক কাঁদে, কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ।" তারা আগে আয় করত।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় কেন উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

আলোচ্য মূল আয়াতগুলি থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে তাকওয়া অবলম্বন করবে, সে নিশ্চিত করবে যে সে মুসলিম হিসেবেই মৃত্যুবরণ করবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০২:

"... আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত তেমনভাবে ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে, আজ মুসলিম হওয়া মানেই আগামীকাল মুসলিম হিসেবে মারা যাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। কারণ ঈমান হলো একটি গাছের মতো যাকে আনুগত্যের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে। যেমন একটি উদ্ভিদ যদি জলের মতো পুষ্টি না পায়, তাহলে মারা যাবে, ঠিক তেমনি একজন মুসলিমের ঈমান যদি আনুগত্যের মাধ্যমে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে মারা যেতে পারে। অতএব, একজনকে অবশ্যই তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা মুসলিম হিসেবে বেঁচে থাকে এবং মারা যায়। সহীহ মুসলিমের ৭২৩২ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস এটিকে আরও সমর্থন করে। মহানবী (সা.) পরামর্শ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তিকে সেই অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে যেখানে সে মারা গেছে। তাই যদি সে একজন ধার্মিক মুসলিম হিসেবে মারা যায়, তাহলে তাকে ধার্মিক মুসলিম হিসেবে পুনরুত্থিত করা হবে। এবং তার মৃত্যুর অবস্থা নির্ধারিত হয় তার জীবনযাত্রার মাধ্যমে। যদি কেউ ধার্মিক মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করে, যারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের ঈমানকে বাস্তবায়িত করে, তাহলে সে একজন ধার্মিক মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে এবং বিচারের দিনে তাকে ধার্মিক মুসলিম হিসেবে পুনরুত্থিত করা হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের ঈমান বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয় এবং কেবল মৌখিকভাবে ইসলামে বিশ্বাসের দাবি করে, সে অমুসলিম হিসেবে মারা যেতে পারে এবং তাই বিচারের দিনে তাকে অমুসলিম হিসেবেই পুনরুত্থিত করা হবে। বিচারের দিনে এই ব্যক্তির কী হবে তা নির্ধারণ করার

জন্য কোনও পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না। আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে এই পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১০৬:

"সেদিন [কিছু] মুখ সাদা হবে এবং [কিছু] মুখ কালো হবে। যাদের মুখ কালো হবে, [তাদের বলা হবে], "তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিলে? তাহলে তোমরা যা অস্বীকার করতে তার জন্য শাস্তি আত্মদান করো।"

এরপর আল্লাহ তাআলা ব্যাখ্যা করেন যে, একজন ধার্মিক মুসলিম হিসেবে বেঁচে থাকতে এবং মরতে হলে, তাকে অবশ্যই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসের শিক্ষা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য, তাঁর উপর বরকত ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩:

"আর আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরে রাখো..."

অতএব, অন্য সকল ধরণের ধর্মীয় জ্ঞান এড়িয়ে চলা উচিত, এমনকি যদি তা সংকর্মের দিকে পরিচালিত করে, কারণ এগুলো মহান আল্লাহর রজ্জুর অংশ নয়। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি আমল করা হবে, এমনকি যদি তা সংকর্মের দিকে পরিচালিত করে, ততই তারা হেদায়াতের দুটি উৎসের উপর আমল করবে না, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বর হাদিসে সতর্ক করে বলেছেন যে, যে বিষয় দুটি হেদায়াতের উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করবেন।

উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি আমল করা হবে, ততই তারা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলিতে আমল করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পা দেবে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"... সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [জাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কাজ করা মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের একটি প্রধান কারণ কারণ এটি মুসলমানদের পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্যের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধা দেয়। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১০৩:

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না..."

ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে, মুসলিমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে যেখানে প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিশ্বাস, রীতিনীতি এবং আচরণ রয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায় একে অপরের সাথে তর্ক করে বিশ্বাস করে যে তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত, অন্যদিকে অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায় বিভ্রান্ত। অধ্যায় ৩০ আর রুম, আয়াত ৩২:

"[অথবা] যারা তাদের ধর্মকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, প্রতিটি দল তাদের যা আছে তা নিয়েই আনন্দিত।"

এই মনোভাব মুসলমানদেরকে এক পরিবারের মতো আচরণ করতে এবং একে অপরের অধিকার পূরণ করতে বাধা দেয়। অন্যদিকে, যখন মুসলমানরা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে একটি একক আচরণবিধি মেনে চলে, তখন এটি তাদের ঐক্যবদ্ধতা নিশ্চিত করবে।

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা অব্যাহত থাকবে, তত বেশি তারা বিভ্রান্ত হবে। আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১০৩:

"তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরণ করো, যখন তোমরা শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের হৃদয়কে একত্রিত করেছিলেন এবং তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গিয়েছিলে। আর তোমরা জাহান্নামের গর্তের কিনারায় ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছিলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা হিদায়াত পাও।"

মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ঐক্য, সঠিক পথনির্দেশনা, মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য কেবল দুটি দিকনির্দেশনার উৎস: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য শেখা এবং তার উপর আমল করার মধ্যেই নিহিত। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি তার প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে

পরিচালিত করে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেয়। অতএব, এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, এমনকি যদি তা তার আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের এমন একজন জ্ঞানী রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকে। ঠিক যেমন এই জ্ঞানী রোগী ভালো মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো হবেন। এর কারণ হলো, একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখার এবং তার জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই। সমাজের দ্বারা আবিষ্ট মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ মানুষকে সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ তাকে তার জীবনের প্রতিটি জিনিস এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে না, কারণ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসের আকারে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্যটি তখন স্পষ্ট হয় যখন কেউ দেখে যে কে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ইসলামী শিক্ষা অনুসারে ব্যবহার করে এবং কে করে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের প্রেসক্রাইব করা ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই অন্ধভাবে তাদের ডাক্তারের উপর বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষার উপর চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা অন্ধভাবে ইসলামের শিক্ষার উপর বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির

ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..'"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১০৩:

"তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরণ করো, যখন তোমরা শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের হৃদয়কে একত্রিত করেছিলেন এবং তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গিয়েছিলে। আর তোমরা জাহান্নামের গর্তের কিনারায় ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছিলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা হিদায়াত পাও।"

এই আয়াতটি রক্তের বন্ধনের মতো অন্যান্য সকল বন্ধনের উপর ঈমানের বন্ধনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। যদিও একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের সাথে, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্কের অধিকার পূরণ করতে হবে, তবুও ঈমানের বন্ধনকে অন্যান্য সকল বন্ধনের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। যখন মুসলমানরা এইভাবে আচরণ করে, তখন এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একে অপরকে ভালো কাজে সহায়তা করবে এবং খারাপ কাজের বিরুদ্ধে একে অপরকে সতর্ক করবে। অধ্যায় ৫ আল মায়িদা, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

অন্যদিকে, যখন কেউ বিশ্বাসের বন্ধনের চেয়ে পার্থিব সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়, তখন তারা অনিবার্যভাবে অন্যদের, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজনদের, খারাপ জিনিসের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কারণে সমর্থন করবে। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে দুর্নীতি ও অনৈক্য ছড়িয়ে পড়বে।

উপরন্তু, ১০৩ নং আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, যখন একজন মুসলিম পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য ধরে রাখে, তখন এটি অনৈক্যের আরেকটি প্রধান উৎসকে দূর করবে: জাগতিক বাধা যা মানুষকে পৃথক করে, যেমন জাতি, উপজাতি এবং ভ্রাতৃত্ব। যখন একটি সমাজ এই জাগতিক বাধাগুলিতে ডুবে থাকে, তখন এটি সর্বদা মানুষের মধ্যে অনৈক্যের দিকে পরিচালিত করবে। অন্যদিকে, ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করলে ঐক্য এবং সাম্য তৈরি হয়, কারণ একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের উপর নির্ভর করে অন্য ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। ৪৯ নং অধ্যায় আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

অতএব, মানুষের মর্যাদা বিচারের অন্যান্য সকল মানদণ্ডের কোন মূল্য নেই, যেমন লিঙ্গ, জাতিগততা এবং সামাজিক শ্রেণী, এবং মুসলমানদের অবশ্যই এগুলি উপেক্ষা করতে হবে, অন্যথায় এটি মুসলিম জাতির মধ্যে বর্ণবাদ এবং অনৈক্যের জন্ম দেয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে যেহেতু একজনের উদ্দেশ্য অন্যদের থেকে গোপন থাকে, তাই তারা বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে অন্যদেরকে অন্যদের চেয়ে ভালো বলে বিচার করতে পারে না এবং তাই অন্যদের বা নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে দাবি করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ একমাত্র আল্লাহই সকল মানুষের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মকাণ্ড জানেন। সূরা ৫৩ আন নাজম, আয়াত ৩২:

"...তাই তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করো না; তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁকে ভয় করে।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মুসলমানদের মধ্যে সকল মতপার্থক্য নিন্দনীয় নয়। নিন্দনীয় মতপার্থক্য হলো এমন এক মতপার্থক্য যেখানে পৃথক মুসলিম বা মুসলিমদের দলগুলিকে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসের আলোকে পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট ও মৌলিক আদেশ-নিষেধের উপর আন্তরিকভাবে কাজ করা থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করা হয়। সঠিক পথপ্রাপ্ত আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য সর্বদা গৌণ বিষয় নিয়ে থাকে, ইসলামের মৌলিক আদেশ-নিষেধ নয়। তাই এগুলো নিন্দনীয় নয় কারণ সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, মাঝে মাঝে একে অপরের সাথে এইভাবে মতবিরোধ করতেন। এই গৌণ বিষয়গুলি সঠিকভাবে আলোচনা করলে কখনও মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের কারণ হয় না কারণ এগুলি মুসলমানদের মধ্যে শত্রুতার কারণ হয়ে ওঠে না। বাস্তবে, এই ধরনের মতপার্থক্য জাতির জন্য রহমতের উৎস কারণ এটি বৃহত্তর সম্প্রদায়ের জন্য ইসলামের বিধান সহজ করে তোলে। যদি সকল সঠিক পথপ্রাপ্ত আলেম ইসলামের অভ্যন্তরে প্রতিটি গৌণ বিষয়ে একমত হতেন, তাহলে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের জন্য ইসলাম পালন করা আরও কঠিন হয়ে পড়ত কারণ ইসলামের নির্দেশিকা অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে যেত।

যখন মুসলমানরা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সাঃ) এর ঐতিহ্য মেনে চলবে, তখন তারা মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১০৪:

" আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি জাতি [উদীয়মান] হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে..."

উল্লেখিত ভালো দিকগুলো পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা যেতে পারে, যা অনুসরণ করলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। একজন ব্যক্তির জীবনের পাশাপাশি বৃহত্তর সমাজের উপর ইসলামী আচরণবিধির ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করার জন্য, একজনকে খোলা মনে ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করতে হবে, কারণ এই শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, এগুলিকে সহজেই বর্বর এবং বিচ্যুত বলে মনে করার জন্য ভুল ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সূরা সাবা, আয়াত ৪৬:

" বলুন, "আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি- তোমরা আল্লাহর জন্য জোড়ায় জোড়ায় এবং এককভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, তারপর চিন্তা করো।" তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন পাগলামি নেই। তিনি কেবল তোমাদেরকে কঠোর শান্তির পূর্বে সতর্ককারী।"

এবং ১২ নম্বর অধ্যায় ইউসুফ, ১০৮ নম্বর আয়াত:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অন্যদিকে, আলোচিত মূল আয়াতগুলিতে উল্লেখিত সঠিক এবং ভুল হল সেই বিষয়গুলি যা সাধারণ জ্ঞান এবং মৌলিক শালীনতার অধিকারী যে কেউ সহজেই সঠিক বা ভুল হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে, যেমন মিথ্যা বলা এড়ানো এবং অন্যদের সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করার গুরুত্ব। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 104:

" আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি জাতি [উদীয়মান] হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সংকাজের আদেশ দেবে এবং অসংকাজে নিষেধ করবে..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামী জ্ঞান এবং সঠিক আচরণের মাধ্যমে এই ভূমিকা পালন করতে হবে, কারণ ভুল জ্ঞান এবং খারাপ আচরণ মানুষকে কেবল ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দেয়। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে, যাতে বাইরের বিশ্ব তাদের ইসলামী চরিত্র এবং আচরণ পর্যবেক্ষণ করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা উপলব্ধি করতে পারে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৪:

"...এবং তারাই সফল হবে।"

কিন্তু যদি মুসলমানরা ইসলামী চরিত্র গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা বহির্বিশ্বের কাছে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে এবং ফলস্বরূপ তারা অমুসলিম এবং

অন্যান্য মুসলমানদের ইসলাম এবং এর ব্যাপক সুবিধা থেকে নিরুৎসাহিত করবে। যেহেতু বহির্বিশ্বের কাছে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করা সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য, তাই উভয় জগতেই এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১০৪:

" আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি জাতি [উদীয়মান] হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে..."

মুসলিমদের জন্য ইসলামী জ্ঞান অনুসারে সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ করার উপর দৃঢ় থাকা গুরুত্বপূর্ণ, কোমলভাবে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস এড়িয়ে চলা উচিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা পথভ্রষ্ট লোকদের আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হবে না। একটি ভালো আপেল যখন পচা আপেল দ্বারা বেষ্টিত থাকবে তখন তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একইভাবে, যে মুসলিম সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ করার দায়িত্বে ব্যর্থ হয়, সে অন্যদের খারাপ আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হবে, তা তাদের কাছে স্পষ্ট হোক বা না হোক। সমাজের বেশিরভাগ মানুষ যদি মন্দকাজেই লেগে থাকে, তবুও তাদের উপর নির্ভরশীলদের, যেমন তাদের সন্তানদের, উপদেশ দিতেই থাকবে, কারণ এটি সকল মুসলমানের উপর একটি পৃথক কর্তব্য। সুনানে আবু দাউদের ২৯২৮ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। এমনকি যদি কারো উপদেশ অকার্যকর হয়, তবুও তাদের অবশ্যই কোমলভাবে এবং ইসলামী জ্ঞান অনুসারে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ বহির্বিশ্বকে সঠিক নির্দেশনা থেকে

নিরুৎসাহিত করবে, যা ফলস্বরূপ সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে, তখনই তারা উভয় জগতের সমাজের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে। ৭ম সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ১৬৪:

"আর যখন তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় বলল, "কেন তোমরা এমন জাতিকে উপদেশ দাও, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করতে অথবা কঠোর শাস্তি দিতে যাচ্ছেন?" তারা বলল, "তোমাদের প্রতিপালকের সামনে ক্ষমা চাও এবং সম্ভবত তারা তাঁকে ভয় করবে।"

এবং ৫ম সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত ১০৫:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিজেদের উপরই (দায়িত্ব)। যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না যখন তোমরা হেদায়েত পাবে। তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর কাছেই; তারপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।"

কিন্তু যে ব্যক্তি এই কর্তব্য অবহেলা করবে তাকে তার ব্যর্থতার পরিণতি ভোগ করতে হবে এবং অন্যদের খারাপ আচরণের কারণে সে বিপথগামী হতে পারে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১০৪:

" আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি জাতি [উদীয়মান] হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ন্যায়-অন্যায়ের জন্য ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলি আসলে সেই অর্থ বোঝায় যা সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায় কোনও ব্যাখ্যার পার্থক্য ছাড়াই সঠিক এবং ভুল হিসাবে গ্রহণ করে। পবিত্র কুরআনে ভালোর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বাধ্যবাধকতা বা অন্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পাপ ব্যবহার করা হয়নি। যেহেতু সঠিক পথপ্রদর্শক পণ্ডিতদের দ্বারা প্রদত্ত স্বাধীন যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত নিয়মগুলি বিভিন্ন ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত, তাই তাদের সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায়ের নিষেধের কেন্দ্রবিন্দু করা উচিত নয়। যখন এই নীতিকে অবহেলা করা হয় তখন মুসলমানরা একে অপরের সাথে এমন গৌণ বিষয় নিয়ে লড়াই করে যা বিভিন্ন ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত এবং এত বড় বিষয় নয়, যখন সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায় যে ভুলকে মন্দ বলে মনে করে তা উপেক্ষা করা হয় এবং নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলতে দেওয়া হয়।

এরপর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে তাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের মতো দলে দলে বিভক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করেন, যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস ব্যতীত অন্য কিছু উপর আমল করার প্রত্যক্ষ ফলাফল। সূরা ৩, আলে ইমরান, আয়াত ১০৫:

"আর তাদের মতো হয়ো না, যারা স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে..."

এই অনৈক্য তখনই ঘটে যখন মানুষ পার্থিব জিনিসপত্র, যেমন নেতৃত্ব, কামনা করে। যখন একটি দল ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন কেবল একজনই নেতা থাকতে পারে। কিন্তু যখন মানুষ ধর্মের মধ্যে নেতৃত্ব চায়, তখন তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঐশ্বরিক শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করে এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎস ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব দল তৈরি করতে উৎসাহিত করে, যা তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। এই ধরনের আচরণ এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি উভয় জগতেই কেবল সমস্যা সৃষ্টি করে। এই আচরণের মাধ্যমে যে পার্থিব জিনিসগুলি পাওয়া যায়, যেমন নেতৃত্ব, তা কেবল তাদের জন্য চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং পরকালে তাদের জন্য যা অপেক্ষা করছে তা আরও খারাপ হবে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনান ইবনে মাজাহ, ২৫৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এই ব্যক্তিকে জাহান্নামের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। এই শাস্তি উভয় জগতেই বৃদ্ধি পাবে, যা নির্ভর করে ঐশ্বরিক শিক্ষার ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা করে কতজনকে বিভ্রান্ত করে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ১০৫:

"...এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"

এছাড়াও, একজন মুসলিমকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীস শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে অন্যদের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে হবে। তাদের অবশ্যই অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি পথভ্রষ্টতা এবং অনৈক্যের দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, যার ইসলামী জ্ঞান আছে সে অন্যদের দ্বারা বিভ্রান্ত হবে না এবং ফলস্বরূপ তারা অন্যান্য মুসলমানদের সাথে ভালো কাজে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলি এড়িয়ে চলবে।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের পরিণতি বর্ণনা করেন যারা হেদায়েতের দুটি উৎস: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীস মেনে চলে এবং যারা তা মেনে চলে না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৬:

"সেদিন [কিছু] মুখ সাদা হবে এবং [কিছু] মুখ কালো হবে। যাদের মুখ কালো হবে, [তাদের বলা হবে], "তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিলে? তাহলে তোমরা যা অস্বীকার করতে তার জন্য শাস্তি আত্মদান করো।"

সাদা এবং কালো মুখমণ্ডল মনের এবং শরীরের শান্তি অথবা এর অভাবকে প্রতিনিধিত্ব করে যা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করার বা তা না করার সরাসরি ফলাফল। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, যারা মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে কার্যত ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয়, তারা তাদের ঈমান হারানোর বড় ঝুঁকিতে থাকে। কারণ

ঈমান এমন একটি গাছের মতো যা বেঁচে থাকার জন্য আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট হতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা সূর্যালোকের মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, তা বৃদ্ধি পেতে ব্যর্থ হয় এবং এমনকি মারাও যেতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট হতে ব্যর্থ হয় তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে না এবং মৃত্যুর গুরুতর ঝুঁকিতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 106:

"... যাদের মুখ কালো হবে, [তাদের বলা হবে], "তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিলে? তাহলে তোমরা যা কুফরী করতে তার জন্য শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো।"

ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করে এই পরিণতি এড়াতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। যেমনটি আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এটি উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 107:

"যাদের মুখ সাদা হবে, তারা আল্লাহর রহমতের মধ্যে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

ঐশ্বরিক ওহীর মাধ্যমে, মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে দুটি পথ স্পষ্ট করে দেন। প্রথমটি হল সঠিক পথ যার মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা, যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। দ্বিতীয় পথ হল প্রদত্ত অনুগ্রহের অপব্যবহার, যা একজন ব্যক্তিকে একটি

ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেয়, এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল স্থানে ফেলে দেয় এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে বাধা দেয়। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত 108:

"এগুলো আল্লাহর আয়াত। আমরা এগুলো তোমাকে উদ্দেশ্য করে শুনছি..."

যেহেতু একমাত্র মহান আল্লাহই সবকিছু জানেন, তাই তিনিই মানবজাতিকে সঠিক আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। তিনিই তাদেরকে শেখাতে পারেন কিভাবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে হয় এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেওয়ার সাথে সাথে তাদের জীবনের সবকিছু সঠিকভাবে স্থাপন করতে হয়। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১০৮:

"... আর আল্লাহ বিশ্বজগতের উপর কোন অবিচার চান না।"

জ্ঞান, দূরদর্শিতা এবং অভিজ্ঞতার অভাব এবং পক্ষপাতের কারণে মানবসৃষ্ট সকল আচরণবিধি কখনই এই পরিণতির দিকে পরিচালিত করবে না। অতএব, তাদের নিজেদের স্বার্থে ইসলামী আচরণবিধি গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের এমন একজন বিচক্ষণ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ

গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিচক্ষণ রোগী যেমন ভালো মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন। কিন্তু ঠিক যেমন একজন অজ্ঞ রোগী তার ডাক্তারের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেন তার শারীরিক স্বাস্থ্য খারাপ থাকবে, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী আচরণবিধি প্রত্যাখ্যান করেন তার মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ থাকবে, এমনকি যদি তাদের পার্থিব বিলাসিতা থাকে, কারণ তারা মহান আল্লাহর ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচতে পারে না। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১০৯:

"আকাশমন্ডলে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর..."

এই পৃথিবীতে এবং পরকালেও কেউ জবাবদিহি থেকে রেহাই পাবে না। এই পৃথিবীতে, নিজের খারাপ সিদ্ধান্তের পরিণতির মুখোমুখি হওয়া প্রায়শই সূক্ষ্ম, যেমন দুর্বল মানসিক স্বাস্থ্য অর্জন, এমনকি যদি কেউ পার্থিব বিলাসিতাও ধারণ করে। কিন্তু পরকালে তার যে পরিণতি হবে তা স্পষ্ট এবং স্পষ্ট হবে। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১০৯:

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। এবং [সকল] বিষয় আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।"

পরিশেষে, সমগ্র সৃষ্টি মহান আল্লাহর আওতাধীন এবং তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারাধীন, একজন ব্যক্তির তাঁর নিয়ম মেনে চলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট দেশের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তেমনি মহাবিশ্বের মালিকের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতেই তার সমস্যা হবে। একজন ব্যক্তি যদি তার নিয়ম মেনে চলতে না পারে তবে একটি দেশ ছেড়ে যেতে পারে কিন্তু এমন জায়গায় পালিয়ে যেতে পারবে না যেখানে মহান আল্লাহর নিয়ম ও এখতিয়ার প্রযোজ্য হয় না। একজন ব্যক্তি তার সমাজের নিয়ম পরিবর্তন করতে সক্ষম হতে পারে কিন্তু তারা কখনও মহান আল্লাহর নিয়ম পরিবর্তন করতে পারবে না। উপরন্তু, ঠিক যেমন একজন বাড়ির মালিক ঘরের নিয়ম নির্ধারণ করে, এমনকি অন্যরা এই নিয়মের প্রতি আপত্তি জানালেও, একইভাবে, মহাবিশ্ব মহান আল্লাহর, এবং তাই, তিনিই একমাত্র এই মহাবিশ্বের নিয়ম নির্ধারণ করেন, মানুষ এই নিয়ম পছন্দ করুক বা না করুক। অতএব, এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে, নিজের স্বার্থে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে সে মহান আল্লাহর নিয়ম মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। একজন ব্যক্তি হয় আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পিছনের হিকমতগুলি শেখার চেষ্টা করতে পারে, যাতে সে বুঝতে পারে যে কীভাবে সেগুলি তাদের এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য উপকারী এবং কীভাবে তারা উভয় জগতে মানসিক ও শারীরিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, অথবা সে তার আকাঙ্ক্ষার উপাসনা করতে পারে এবং ইসলামের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলামী নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তার উচিত উভয় জগতেই তার পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং কোনও আপত্তি, প্রতিবাদ বা অভিযোগ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ২৯:

"আর বলো, "সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, অতএব যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক; আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।" নিশ্চয়ই আমরা জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে ঘিরে থাকবে। আর যদি তারা

সাহায্যের জন্য ডাকে, তবে তাদের সাহায্যের জন্য ঘোলা তেলের মতো পানি ব্যবহার করা হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দেবে। পানীয় কত নিকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট।"

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১১০-১১ ৭

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ

الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

لَن يَضُرَّوْكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُؤْلَوْكُمْ أَلَا ذَبَارُكُمْ لَا يُنصُرُونَ ﴿١١١﴾

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُ وَبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ

بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

﴿١١٣﴾ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

﴿١١٣﴾

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

﴿١١٥﴾ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا

أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

“তোমরা তো সর্বোত্তম জাতি, যাদেরকে মানবজাতির জন্য (উদাহরণস্বরূপ) সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহর উপর ঈমান আন। যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনত, তবে তাদের জন্য তা মঙ্গলজনক হত। তাদের মধ্যে ঈমানদারও আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অবাধ্য।”

তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কেবল [কিছু] বিরক্তি ছাড়া। আর যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাহলে তারা তোমাদের পিঠ ফিরিয়ে ফেলবে [অর্থাৎ পিছু হটবে]; তারপর তাদের সাহায্য করা হবে না।

আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রশি [অর্থাৎ, চুক্তি] এবং মানুষের পক্ষ থেকে একটি রশি [অর্থাৎ, চুক্তি] ব্যতীত, যেখানেই তাদের ধরা হয়েছে, সেখানেই তাদের লাঞ্ছিত করা হয়েছে। আর তারা আল্লাহর ত্রোদের শিকার হয়েছে এবং তাদের উপর দারিদ্র্য নেমে এসেছে। এর কারণ তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। এর কারণ তারা অবাধ্যতা করেছে এবং [অভ্যন্তরীণভাবে] সীমালঙ্ঘন করেছে।

তারা [সকল] এক নয়; আহলে কিতাবদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় আছে যারা [আনুগত্যে] দাঁড়িয়ে আছে, রাতের কিছু সময় আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করে এবং [নামাজে] সিজদা করে।

তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, সৎকাজের আদেশ দেয়,
অসৎকাজে নিষেধ করে এবং সৎকাজে দ্রুত অগ্রসর হয়। আর তারাই
সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

আর তারা যা কিছু সৎকর্ম করবে, তা কখনো অস্বীকার করা হবে না। আর আল্লাহ
সৎকর্মশীলদের সম্পর্কে জানেন।

নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে
কখনোই তাদের কোন কাজে আসবে না, আর তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা
সেখানে চিরকাল থাকবে।

তারা পার্থিব জীবনে যা ব্যয় করে তার উদাহরণ হলো হিমবাহী বাতাসের মতো, যা
এমন এক জাতির ফসলের উপর আঘাত করে যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে
এবং তা ধ্বংস করে দেয়। আর আল্লাহ তাদের উপর জুলুম করেননি, বরং তারা
নিজেদের উপর জুলুম করে।”

মহান আল্লাহ, এই মিথ্যা ধারণাটি মুছে ফেলেন যে, তাঁর আনুগত্য ব্যতীত অন্য যেকোনো কিছুতেই শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত সঠিক উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১১০:

"তোমরা তো সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির জন্য [উদাহরণস্বরূপ] আবির্ভূত হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখো..."

এবং ৪৯তম অধ্যায় আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে একজন ব্যক্তির মর্যাদা কেবল তার আন্তরিকতার উপর নির্ভর করে। এটি কোনও পার্থিব বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন তার লিঙ্গ, জাতি, বংশ বা সম্পদ। সূরা ৪৯, আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

অতএব, মানুষের মর্যাদা বিচারের অন্যান্য সকল মানদণ্ডের কোন মূল্য নেই এবং মুসলমানদের অবশ্যই এগুলো উপেক্ষা করতে হবে, অন্যথায় এটি মুসলিম জাতির মধ্যে বর্ণবাদ এবং অনৈক্যের জন্ম দেয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যেহেতু একজনের উদ্দেশ্য অন্যদের থেকে গোপন থাকে, তাই তারা বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে অন্যদেরকে অন্যদের চেয়ে ভালো বলে বিচার করতে পারে না এবং তাই অন্যদের বা নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে দাবি করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ একমাত্র আল্লাহই সকল মানুষের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মকাণ্ড জানেন। ৫৩ সূরা আন নাজম, আয়াত ৩২:

"...তাই তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করো না; তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁকে ভয় করো।"

অন্য কিছুতে শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত আছে এই বিশ্বাস একজনকে কেবল আহলে কিতাবদের মতই একই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে। তারা বিশ্বাস করত যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব তাদের বংশধরদের মধ্যেই নিহিত, কারণ তারা পবিত্র নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর। এই মিথ্যা বিশ্বাস গ্রহণ করে তারা মহান আল্লাহর প্রতি অবিচার আরোপ করে, কারণ তারা দাবি করে যে তিনি তাদের মধ্য থেকে একজন দুষ্ট কর্মচারীকে সংকর্মশীলের মতো আচরণ করবেন। সূরা ৪৫ আল জাসিয়াহ, আয়াত ২১:

"যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমি তাদেরকে তাদের মতো করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে- তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান করে দেব? তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না মন্দ।"

অধিকন্তু, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস বর্ণবাদকে আল্লাহ তাআলার উপর আরোপ করেছিল, কারণ তারা দাবি করেছিল যে তারা তাদের বংশের কারণে বাকি মানবজাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে, কারণ তারা পবিত্র নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর।

অধিকন্তু, তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, তাদের অবাধ্যতার জন্য যদি তাদের শাস্তি দেওয়া হয়, তবুও তা সীমিত সময়ের জন্য হবে কারণ তারা নিজেদেরকে বিশ্বাসী বলে মনে করত, যদিও তারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে কাফের হয়ে গিয়েছিল। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ৮০:

"আর তারা বলে, "জাহান্নাম আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না, [কয়েক] দিন ছাড়া।" বলুন, "তোমরা কি আল্লাহর সাথে কোন অঙ্গীকার করেছ? কারণ আল্লাহ কখনও তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে এমন কিছু বল যা তোমরা জানো না?"

এবং ৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ১৫০-১৫১:

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, “আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে অবিশ্বাস করি” এবং এর মাঝামাঝি কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফের। আর আমরা কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।”

এই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনাই তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় অটল থাকতে এবং ইসলামের সত্যতা স্বীকার করার পরেও প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করেছিল। মুসলিমদের অবশ্যই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে। তাদের এই মিথ্যা বিশ্বাস গ্রহণ করা এড়িয়ে চলতে হবে যে তারা মহান আল্লাহর প্রিয়, কারণ তারা মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মত। এই মিথ্যা বিশ্বাস কেবল আল্লাহকে অবাধ্য হতে উৎসাহিত করে এবং তাঁর প্রতি অন্যায়, অবিচার এবং বর্ণবাদের মতো মিথ্যা জিনিস আরোপ করে। উপরন্তু, তাদের অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে এবং ধরে নিতে হবে না যে তারা তাদের ঈমান নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে, কারণ আল্লাহকে প্রদত্ত নিয়ামতগুলির অপব্যবহার করে অবাধ্যতা চালিয়ে যাওয়া কুফরের দিকে পরিচালিত করতে পারে। কারণ ঈমান একটি গাছের মতো যাকে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। যে গাছ সূর্যালোকের মতো পুষ্টি পায় না, সে মারা যাবে, ঠিক তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও মারা যেতে পারে যে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১১০:

"তোমরা তো সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির জন্য [উদাহরণস্বরূপ] আবির্ভূত হয়েছো। তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখো..."

উল্লেখিত সঠিক এবং ভুল হলো সেইসব জিনিস যা সাধারণ জ্ঞান এবং মৌলিক শালীনতার অধিকারী যে কেউ সহজেই সঠিক বা ভুল হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে, যেমন মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা এবং অন্যদের সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করার গুরুত্ব। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১১০:

"তোমরা তো সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির জন্য [উদাহরণস্বরূপ] আবির্ভূত হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখো..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামী জ্ঞান এবং সঠিক আচরণের মাধ্যমে এই ভূমিকা পালন করতে হবে, কারণ ভুল জ্ঞান এবং খারাপ আচরণ মানুষকে কেবল ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দেয়। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে, যাতে বহির্বিশ্ব তাদের ইসলামী চরিত্র এবং আচরণ পর্যবেক্ষণ করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা উপলব্ধি করতে পারে। এটিই মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের বাস্তব প্রমাণ। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০:

"...তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখো..."

কিন্তু যদি মুসলমানরা ইসলামী চরিত্র গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা বহির্বিশ্বের কাছে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে এবং ফলস্বরূপ তারা অমুসলিম এবং অন্যান্য মুসলমানদের ইসলাম এবং এর ব্যাপক সুবিধা থেকে নিরুৎসাহিত করবে। যেহেতু বহির্বিশ্বের কাছে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করা সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য, তাই উভয় জগতেই এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১১০:

"তোমরা তো সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির জন্য [উদাহরণস্বরূপ] আবির্ভূত হয়েছো। তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখো..."

মুসলিমদের জন্য ইসলামী জ্ঞান অনুসারে সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ করার উপর দৃঢ় থাকা গুরুত্বপূর্ণ, কোমলভাবে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস এড়িয়ে চলা উচিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা পথভ্রষ্ট লোকদের আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হবে না। একটি ভালো আপেল যখন পচা আপেল দ্বারা বেষ্টিত থাকবে তখন তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একইভাবে, যে মুসলিম সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ করার দায়িত্বে ব্যর্থ হয়, সে অন্যদের খারাপ আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হবে, তা তাদের কাছে স্পষ্ট হোক বা না হোক। সমাজের বেশিরভাগ মানুষ যদি মন্দকাজেই লেগে থাকে, তবুও তাদের উপর নির্ভরশীলদের, যেমন তাদের সন্তানদের, উপদেশ দিতেই থাকবে, কারণ এটি সকল

মুসলমানের উপর একটি পৃথক কর্তব্য। সুনানে আবু দাউদের ২৯২৮ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। এমনকি যদি কারো উপদেশ অকার্যকর হয়, তবুও তাদের অবশ্যই কোমলভাবে এবং ইসলামী জ্ঞান অনুসারে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ বহির্বিশ্বকে সঠিক নির্দেশনা থেকে নিরুৎসাহিত করবে, যা ফলস্বরূপ সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

যখন কেউ সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে, তখনই তারা উভয় জগতের সমাজের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে। ৭ম সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ১৬৪:

"আর যখন তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় বলল, "কেন তোমরা এমন জাতিকে উপদেশ দাও, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করতে অথবা কঠোর শাস্তি দিতে যাচ্ছেন?" তারা বলল, "তোমাদের প্রতিপালকের সামনে ক্ষমা চাও এবং সম্ভবত তারা তাঁকে ভয় করবে।"

এবং ৫ম সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত ১০৫:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিজেদের উপরই (দায়িত্ব)। যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না যখন তোমরা হেদায়েত পাবে। তোমাদের

সকলের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর কাছেই; তারপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।"

কিন্তু যে ব্যক্তি এই কর্তব্য অবহেলা করবে তাকে তার ব্যর্থতার পরিণতি ভোগ করতে হবে এবং অন্যদের খারাপ আচরণের কারণে সে বিপথগামী হতে পারে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১১০:

"তোমরা তো সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির জন্য [উদাহরণস্বরূপ] আবির্ভূত হয়েছো। তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখো..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ন্যায়-অন্যায়ের জন্য ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলি আসলে সেই অর্থ বোঝায় যা সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায় কোনও ব্যাখ্যার পার্থক্য ছাড়াই সঠিক এবং ভুল হিসাবে গ্রহণ করে। পবিত্র কুরআনে ভালোর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বাধ্যবাধকতা বা অন্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পাপ ব্যবহার করা হয়নি। যেহেতু সঠিক পথপ্রদর্শক পণ্ডিতদের দ্বারা প্রদত্ত স্বাধীন যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত নিয়মগুলি বিভিন্ন ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত, তাই তাদের সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায়ের নিষেধের কেন্দ্রবিন্দু করা উচিত নয়। যখন এই নীতিকে অবহেলা করা হয় তখন মুসলমানরা একে অপরের সাথে এমন গৌণ বিষয় নিয়ে লড়াই করে যা বিভিন্ন ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত এবং এত বড় বিষয় নয়, যখন সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায় যে

ভুলকে মন্দ বলে মনে করে তা উপেক্ষা করা হয় এবং নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলতে দেওয়া হয়।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১১০:

"তোমরা তো সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির জন্য [উদাহরণস্বরূপ] আবির্ভূত হয়েছো। তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখো..."

যেহেতু মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের কথা বলা হয়েছে, সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজ থেকে নিষেধ করে কার্যত তাঁর আনুগত্য করার পর, তাই এটি আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করার গুরুত্বকে আরও নির্দেশ করে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ব্যবহারিক আনুগত্যের মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। ১১০ নং আয়াতের পরবর্তী অংশে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, এটি ছিল মহান আল্লাহর প্রতি এই ব্যবহারিক আনুগত্য, যা আহলে কিতাবরা করতে ব্যর্থ হয়েছিল, যদিও তারা মৌখিকভাবে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি করেছিল। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০:

"...যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনত, তবে তাদের জন্য তা মঙ্গলজনক হত। তাদের মধ্যে ঈমানদারও আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অবাধ্য।"

তারা চরম অবাধ্য ছিল কারণ তারা আল্লাহর প্রতি তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে কাজে সমর্থন করেনি। বরং, তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করেই চলেছিল। অতএব, মুসলমানদের তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে, অন্যথায় উভয় জগতেই তাদের একই পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। সুনানে আবু দাউদের ৪০৩১ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অধিকন্তু, এই আয়াতটি আরও স্পষ্ট করে যে, সকল আহলে কিতাব এই ধরনের আচরণ করতেন না। তাদের অনেকেই আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলেন, যার অর্থ হল, আল্লাহকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টিজনক, যেমন ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এটি সেই গোষ্ঠীর কিছু সদস্যের কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীর বিচার না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ এটি প্রায়শই বৈষম্যের দিকে পরিচালিত করে, যেমন বর্ণবাদ।

এরপর আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর প্রতি তাদের ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের শত্রুরা তাদের কোনও উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করতে পারবে না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১১:

"তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কেবল [কিছু] বিরক্তি ছাড়া। আর যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাহলে তারা তোমাদের পিঠ ঠেলে দেবে [অর্থাৎ পিছু হটবে]; তারপর তাদের সাহায্য করা হবে না।"

মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাদের শত্রুরা তাদের মারাত্মক ক্ষতি করেছে। এর কারণ হলো, মুসলিমরা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার চুক্তির অংশটি পূরণ করেনি। শ্রেষ্ঠত্ব এবং ঐশ্বরিক সুরক্ষা তখনই লাভ করা যায় যখন মুসলমানরা কার্যত আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৯:

"সুতরাং তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, যদি তোমরা [সত্যিকারের] বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।"

অতএব, যদি মুসলিমরা তাদের বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য করে চুক্তির তাদের দিকগুলো পূরণ করতে হবে। অন্যথায়, তারা বর্তমানে সারা বিশ্বে যে নির্যাতিত অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে, সেই অবস্থাতেই থাকবে। অধ্যায় ১৩ আর রা'দ, আয়াত ১১:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে..."

এরপর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে আহলে কিতাবদের মনোভাব ও আচরণ গ্রহণ থেকে সতর্ক করেন, যারা তাঁর অবাধ্যতা অব্যাহত রেখেছিল। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১২:

" আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের যেখানেই ধরা পড়েছে, সেখানেই তাদের অপমান করা হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দড়ি [অর্থাৎ, অঙ্গীকার] এবং মানুষের পক্ষ থেকে দড়ি [অর্থাৎ, চুক্তি] ছাড়া..."

মহান আল্লাহর রজ্জু বলতে বোঝায় আহলে কিতাবদের যারা ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করে, যাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের সুরক্ষা লাভের জন্য কর দিতে হয় যাতে তারা শান্তিতে তাদের ধর্ম পালন করতে পারে। জনগণের রজ্জু বলতে বোঝায় আহলে কিতাবরা রাজনৈতিক ও আর্থিক সহায়তা লাভের জন্য অন্যান্য অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১২:

"...এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের উপর আচ্ছন্ন হয়ে গেছে..."

আহলে কিতাবদের দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করার একটি প্রধান কারণ হল, তাদের নেতারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের অজ্ঞ অনুসারীদের ইসলামের সত্যতা স্বীকার করার পরেও প্রত্যাখ্যান করতে বিভ্রান্ত করেছিলেন। আহলে কিতাবদের পণ্ডিতরা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, যেমনটি তাদের ঐশী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও, তাদের পণ্ডিতরা পবিত্র কুরআনকে স্বীকৃতি

দিয়েছিলেন কারণ তারা এর লেখক, মহান আল্লাহ তাআলার সাথে পরিচিত ছিলেন।
সূরা ৬ আল-আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

অধিকন্তু, আহলে কিতাব এবং মক্কার অমুসলিম উভয়ই জানত যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) পূর্ববর্তী ঐশী কিতাব অধ্যয়ন করেননি এবং তাই তাঁর পক্ষে পবিত্র কুরআন জাল করা অসম্ভব ছিল। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ৪৮:

"আর তুমি এর আগে কোন কিতাব পাঠ করেনি এবং তোমার ডান হাতে কোন কিতাব লিখে রাখেনি। তাহলে [অর্থাৎ, অন্যথায়] মিথ্যাবাদীদের সন্দেহের কারণ হত।"

যেহেতু তারা পার্থিব লাভ, যেমন সম্পদ এবং নেতৃত্বের জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার অব্যাহত রাখতে চেয়েছিল, তাই তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশী গ্রন্থ থেকে জ্ঞান সম্পাদনা, ভুল ব্যাখ্যা এবং গোপন করেছিল। এই আচরণের মাধ্যমে তারা তাদের অজ্ঞ অনুসারীদের বিভ্রান্ত করেছিল, যার ফলে মহান আল্লাহ আরও ক্রোধান্বিত করেছিলেন। সর্বদা মনে রাখা উচিত যে তাদের পাপ তাদের মৃত্যুর পরেও বৃদ্ধি পাবে, যতক্ষণ কেউ তাদের ভুল পরামর্শ অনুসারে কাজ করবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অধ্যায় ৩, আলে ইমরান, আয়াত ১১২:

"... এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়েছে এবং তাদের উপর দারিদ্র্য নেমে এসেছে। এর কারণ হল তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীতে অবিশ্বাস করেছিল..."

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, আহলে কিতাবরা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করেছিল যা তাদেরকে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করার পরেও বিভ্রান্তিতে থাকতে উৎসাহিত করেছিল। তারা বিশ্বাস করত যে যেহেতু তারা মহান আল্লাহর প্রিয়জন, তাই তিনি তাদের শাস্তি দেবেন না, এমনকি যদি তারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে তাঁর অবাধ্য হয়। ৫ম অধ্যায় আল মায়িদা, আয়াত ১৮:

"কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, "আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়জন।" বলুন, "তাহলে তিনি তোমাদের পাপের জন্য কেন শাস্তি দেন?" বরং তোমরা তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন..."

অধিকন্তু, তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, তাদের অবাধ্যতার জন্য যদি তাদের শাস্তি দেওয়া হয়, তবুও তা সীমিত সময়ের জন্য হবে কারণ তারা নিজেদেরকে বিশ্বাসী বলে মনে করত, যদিও তারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে কাফের হয়ে গিয়েছিল। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ৮০:

"আর তারা বলে, "জাহান্নাম আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না, [কয়েক] দিন ছাড়া।" বলুন, "তোমরা কি আল্লাহর সাথে কোন অঙ্গীকার করেছ? কারণ আল্লাহ কখনও তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে এমন কিছু বল যা তোমরা জানো না?"

এবং ৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ১৫০-১৫১:

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, “আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে অবিশ্বাস করি” এবং এর মাঝামাঝি কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফের। আর আমরা কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।”

এই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনাই তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় অবিচল থাকতে এবং ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেও প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করেছিল। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১২:

"... এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়েছে এবং তাদের উপর দারিদ্র্য নেমে এসেছে। এর কারণ হল তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীতে অবিশ্বাস করেছিল..."

মুসলমানদের অবশ্যই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে। তাদের এই মিথ্যা বিশ্বাস গ্রহণ করা এড়িয়ে চলতে হবে যে তারা মহান আল্লাহর প্রিয়, কারণ তারা মহান নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। এই মিথ্যা বিশ্বাস কেবল আল্লাহকে অমান্য করতে উৎসাহিত করে এবং তাঁর প্রতি অন্যায়, অবিচার এবং বর্ণবাদের মতো মিথ্যা জিনিস আরোপ করে। উপরন্তু, তাদের অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে এবং ধরে নিতে হবে না যে তারা তাদের ঈমান নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে, কারণ আল্লাহকে প্রদত্ত নিয়ামতগুলির অপব্যবহার করে তার অবাধ্যতা অব্যাহত রাখা কুফরের দিকে পরিচালিত করতে পারে। কারণ ঈমান একটি গাছের মতো যাকে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। যে গাছ সূর্যালোকের মতো পুষ্টি পায় না, সে মারা যাবে, ঠিক তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও মারা যেতে পারে যে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১১২:

"... আর তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়েছে এবং তাদের উপর দারিদ্র্য নেমে এসেছে। এর কারণ হলো তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে..."

মদিনায় বসবাসকারী আহলে কিতাবদের পূর্বপুরুষ, অর্থাৎ বনী ইসরাঈল, তারাই তাদের কাছে প্রেরিত কিছু নবীকে হত্যা করেছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ মদিনায় বসবাসকারী আহলে কিতাবদের সমালোচনা করেছেন কারণ তারা তাদের পূর্বপুরুষদের আচরণের নিন্দা করেননি বরং তাদের আচরণ ও কর্মের প্রশংসা করেছেন। এছাড়াও, আহলে কিতাবরাও একাধিকবার নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন, তাই তাদের এই সমালোচনা প্রাপ্য ছিল। ১১২ নং আয়াতের শেষে এটি নির্দেশ করা হয়েছে। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, ১১২ নং আয়াত:

"... এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়েছে এবং তাদের উপর দারিদ্র্য নেমে এসেছে। এর কারণ হল তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। এর কারণ হল তারা অবাধ্যতা করেছে এবং [অভ্যাসগতভাবে] সীমালঙ্ঘন করেছে।"

তারা আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রেখেছিল, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করেছিল এবং ফলস্বরূপ তারা দারিদ্র্যের কবলে পড়েছিল এবং মহান আল্লাহকে রাগান্বিত করেছিল। এই পরিণতি হল প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহারের প্রত্যক্ষ ফলাফল, কারণ এই আচরণ একজনকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেবে, এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল স্থানে ফেলবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে বাধা দেবে। এটি একজনকে মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেবে এবং পরিবর্তে উভয় জগতে মানসিক দারিদ্র্য, চাপ এবং ঝামেলার দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, ইসলামিক শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে মহান

আল্লাহর আনুগত্য করে এই পরিণতি এড়াতে হবে, এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের একজন জ্ঞানী রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। যেভাবে এই জ্ঞানী রোগী ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবে, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং কাজ করে সেও ভালো হবে। এর কারণ হলো, একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখার এবং তার জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই। সমাজের দ্বারা আবিষ্ট মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ মানুষকে সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ তাকে তার জীবনের প্রতিটি জিনিস এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে না, কারণ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসের আকারে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্যটি তখন স্পষ্ট হয় যখন কেউ দেখে যে কে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ইসলামী শিক্ষা অনুসারে ব্যবহার করে এবং কে করে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের প্রেসক্রাইব করা ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই অন্ধভাবে তাদের ডাক্তারের উপর বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষার উপর চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা অন্ধভাবে ইসলামের শিক্ষার উপর বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১১২:

" আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের যেখানেই ধরা পড়েছে, সেখানেই তাদের অপমান করা হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দড়ি এবং মানুষের পক্ষ থেকে দড়ি ব্যতীত। তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়েছে এবং দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত হয়েছে। এর কারণ হলো তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। এর কারণ হলো তারা অবাধ্যতা করেছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে।"

এই আয়াতটি বিশেষভাবে মদীনায় বসবাসকারী আহলে কিতাবদের কথা উল্লেখ করতে পারে যারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা, যেমন মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা, অবিচল থেকেছেন, যদিও তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু আয়াতটি আহলে কিতাবের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথাও উল্লেখ করতে পারে যারা তাদের মনোভাব এবং আচরণ গ্রহণ করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, আহলে কিতাবরা বিশ্বাস করে যে তারা তাদের বংশের কারণে অন্যান্য মানবজাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তারা অহংকার গ্রহণ করে। এই অহংকার তাদেরকে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হতে এবং অন্যদের প্রতি অন্যায় করতে উৎসাহিত করে এই বিশ্বাসে যে তাদের অধিকার আছে, কারণ তারা আল্লাহর প্রিয় এবং তারা মানবজাতির প্রভু। তাদের অহংকারের ফলে, যেখানে তারা পৃথিবীতে তাদের মর্যাদা উন্নত করার চেষ্টা করেছিল, আল্লাহ তাআলা তাদের অপমান এবং দারিদ্র্যের শিকার করেছেন। যতক্ষণ আহলে কিতাবরা তাদের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করতে থাকবে, ততক্ষণ তারা আল্লাহ তাআলা এবং অন্যান্য মানুষের প্রতি অহংকার গ্রহণ করবে। ফলস্বরূপ, মহান আল্লাহ, যুগে যুগে তাদের অপমান করতে থাকবেন, যদিও এটি তাদের বা অন্যদের কাছে স্পষ্ট নয়। অধ্যায় ১৭ আল ইসরা, আয়াত ৪:

"আর আমরা কিতাবে বনী ইসরাঈলদের জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, "তোমরা অবশ্যই পৃথিবীতে দুবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং অবশ্যই তোমরা চরম অহংকারে পৌঁছে যাবে।"

এবং ৭ম সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ১৬৭:

"আর[স্মরণ করো] যখন তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি অবশ্যই তাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত এমন লোক পাঠাবেন যারা তাদেরকে নিকৃষ্টতম শাস্তি দেবে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে দ্রুত; কিন্তু তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

তাই মুসলমানদের অবশ্যই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে, এই মিথ্যা বিশ্বাসের মাধ্যমে যে তারা অন্যান্য মানবজাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, অহংকার অবলম্বন করে, অন্যথায় তারা যেখানেই যাক না কেন, অপমান ও দারিদ্র্যের শিকার হবে।

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহ সর্বদা স্পষ্ট করে বলেন যে, সমস্ত আহলে কিতাব অথবা তাদের পূর্বপুরুষ, বনী ইসরাঈল, তাঁর অবাধ্যতার উপর অটল ছিলেন না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৩:

"তারা[সকল] এক রকম নয়..."

এই আয়াতটি আরও স্পষ্ট করে যে, সকল আহলে কিতাবই ভুল আচরণ করেনি। তাদের অনেকেই আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলেছিল, যার অর্থ হল, আল্লাহকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টিজনক, যেমন

ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এটি সেই গোষ্ঠীর কিছু সদস্যের কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীর বিচার না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ এটি প্রায়শই বৈষম্যের দিকে পরিচালিত করে, যেমন বর্ণবাদ।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১১৩:

" তারা [সকল] এক নয়; আহলে কিতাবদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় আছে যারা [আনুগত্যে] দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে..."

ইসলামের আগমনের পূর্বে, তারা তাদের ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য প্রমাণ করেছিল। তাই তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের মৌখিক বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করেছিল, যেমন তাদের প্রার্থনার ধরণ। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৩:

"... আহলে কিতাবদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় আছে যারা [আনুগত্যে] দণ্ডায়মান, রাতের কিছু সময় আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করে এবং [নামাজে] সিজদা করে।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ফরজ নামাজ কায়েম করার মধ্যে রয়েছে সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ শর্তাবলী এবং আদব-কায়দা পূরণ করা, যেমন সময়মতো আদায় করা।

পবিত্র কুরআনে ফরজ নামাজ কায়েম করার কথা প্রায়শই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে কারণ এটি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক প্রমাণ। উপরন্তু, যেহেতু প্রতিদিনের নামাজগুলি বিস্তৃত, তাই এগুলি বিচার দিনের ধ্রুবক স্মারক এবং এর জন্য কার্যত প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে, কারণ ফরজ নামাজের প্রতিটি স্তর বিচার দিনের সাথে সম্পর্কিত। যখন কেউ সঠিক অবস্থানে দাঁড়াবে, তখন বিচারের দিন সে এভাবেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। সূরা ৮৩ আল মুতাফিফিন, আয়াত ৪-৬:

"তারা কি ভাবে না যে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে? এক মহাদিনের জন্য, যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে?"

যখন তারা রুকু করে, তখন এটি তাদের সেই অনেক লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা পৃথিবীতে তাদের জীবদ্দশায় মহান আল্লাহর কাছে রুকু না করার জন্য বিচারের দিনে সমালোচিত হবে। সূরা ৭৭ আল মুরসালাত, আয়াত ৪৮:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'নামাজে রুকু করো', তখন তারা রুকু করে না।"

এই সমালোচনার মধ্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ না করাও অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ নামাজে সিজদা করে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিচারের দিনে মানুষকে মহান আল্লাহর কাছে সিজদা করার জন্য কীভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের

জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করার জন্য সঠিকভাবে সিজদা করেনি, তারা বিচারের দিনে এটি করতে সক্ষম হবে না। সূরা ৬৮ আল-কালাম, আয়াত ৪২-৪৩:

"যেদিন পরিস্থিতি কঠিন হবে, সেদিন তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের চোখ অবনত হবে, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। আর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় সিজদা করার জন্য ডাকা হত।"

যখন কেউ নামাযে হাঁটু গেড়ে বসে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে কিয়ামতের দিন তারা কীভাবে তাদের চূড়ান্ত বিচারের ভয়ে আল্লাহর সামনে এই অবস্থানে বসে থাকবে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২৮:

"আর তুমি প্রত্যেক জাতিকে [ভয়ে] নতজানু দেখবে। প্রত্যেক জাতিকে তার আমলনামার দিকে ডাকা হবে [এবং বলা হবে], "আজ তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।"

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নামাজ পড়বে, সে তার নামাজ সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে। এর ফলে তারা নামাজের মাঝখানে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। সূরা ২৯, আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫:

"...প্রকৃতপক্ষে, নামাজ অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১১৩:

"... আহলে কিতাবদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় আছে যারা [আনুগত্যে] দণ্ডায়মান, রাতের কিছু সময় আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করে এবং [নামাজে] সিজদা করে।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি রাতের নফল নামাজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব নির্দেশ করে। সহীহ বুখারী, ১১৪৫ নম্বরে পাওয়া একটি ঐশ্বরিক হাদীসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ, তাঁর অসীম মহিমা অনুসারে, প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং মানুষকে তাদের চাহিদা পূরণের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করার জন্য আহ্বান জানান যাতে তিনি তা পূরণ করতে পারেন। রাতের নফল নামাজ আল্লাহর প্রতি মানুষের আন্তরিকতা প্রমাণ করে, যেমন অন্য কোন চোখ তাদের দেখছে না। এর অসংখ্য ফজিলত রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, সুনান আন নাসায়ী, ১৬১৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীস পরামর্শ দেয় যে এটি সর্বোত্তম নফল নামাজ। উভয় জগতের সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির রাতের নফল নামাজ প্রতিষ্ঠা করেন, কারণ সর্বোচ্চ অবস্থান যা মহানবী মুহাম্মদ

(সাঃ) এর জন্য সংরক্ষিত, তা সরাসরি রাতের নফল নামাজের সাথে সম্পর্কিত।
অধ্যায় ১৭ আল ইসরা, আয়াত ৭৯:

"আর রাতের [একাংশ] অংশে, এর সাথে সালাত (অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াত) পাঠ
করো, এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত [ইবাদত]; আশা করা যায় যে তোমার প্রতিপালক
তোমাকে প্রশংসিত স্থানে উত্তীর্ণ করবেন।"

রাতের বেলায় নেক দুআও সহজেই কবুল করা হয়। জামে আত তিরমিযী, ৩৪৯৯
নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নফল রাতের নামাজ প্রতিষ্ঠা
করা পাপ থেকে বিরত রাখে, অনর্থক ও পাপপূর্ণ সামাজিক সমাবেশ এড়াতে সাহায্য
করে এবং অনেক শারীরিক অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী,
৩৫৪৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়া পরিহার করে নফল রাতের
নামাজের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত, কারণ এটি অলসতা এবং ঘুমের কারণ হয়। দিনের
বেলায় অপ্রয়োজনীয় শারীরিক পরিশ্রম এড়িয়ে চলা উচিত। দিনের বেলায় একটি
ছোট ঘুম এতে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে, পাপ এড়িয়ে চলা উচিত এবং
ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহ তায়ালার
আনুগত্য করার চেষ্টা করা উচিত, কারণ আনুগত্যকারীরা নফল রাতের নামাজ
আদায় করা সহজ করে তোলে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১১৩:

"তারা [সকল] এক নয়; আহলে কিতাবদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় আছে যারা [আনুগত্যে] দাঁড়িয়ে আছে, রাতের কিছু সময় আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করে এবং [নামাজে] সিজদা করে।"

এই আয়াতটি তখন নাযিল হয়েছিল যখন আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে বিভ্রান্ত পণ্ডিতরা তাদের মধ্যে যারা আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যেমন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, সা'লাবাহ ইবনে সা'য়া , উসাইদ ইবনে সা'য়া এবং আসাদ ইবনে উবাইদ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের সমালোচনা করেছিলেন। বিভ্রান্ত পণ্ডিতরা দাবি করেছিলেন যে এই লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করার জন্য খারাপ ছিল। এটি ইমাম আল ওয়াহিদীর, আসবাব আল নুযুল , 3:113, পৃষ্ঠা 39- এ আলোচনা করা হয়েছে।

এই আন্তরিক বিশ্বাসীদের তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধভাবে অনুসরণ না করার জন্য সমালোচনা করা হয়েছিল। অতএব, এই ঘটনাটি অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে কারণ এটি প্রায়শই বিপথগামীতার দিকে পরিচালিত করে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইসলামে অন্যদের অনুকরণ প্রায়শই বিপথগামীতার দিকে পরিচালিত করে কারণ এই ব্যক্তি যখন অন্ধভাবে অনুসরণ করছে তখন তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য থেকে সরে যায় তখন তারা বুঝতে ব্যর্থ হবে। যখন এটি ঘটে, তখন এই ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে তারা ইসলামী শিক্ষার উপর কাজ করছে যখন তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামী শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত নয় এমন প্রথাগত অনুশীলনগুলিতে কাজ করছে। যে ব্যক্তি এই মনোভাব

ধরে রাখবে সে অজান্তেই বিপথগামী হয়ে যাবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি অন্ধভাবে অন্যদের অনুকরণ করার পরিবর্তে ইসলামী জ্ঞানের উপর কাজ করবে সে সহজেই এমন অনুশীলনগুলিকে চিনতে পারবে যা ইসলামে মূলগত নয় এবং তাই সেগুলি এড়িয়ে চলবে। ফলস্বরূপ, তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যগুলিকে মেনে চলবে, যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। এটি একটি প্রধান কারণ যে মহান আল্লাহ, ইসলামের মধ্যেও অন্যদের অন্ধ অনুকরণের সমালোচনা করেন। আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, চান মানুষ ইসলামের শিক্ষা অধ্যয়ন করুক এবং অন্যদের অন্ধ অনুকরণ নয়, বরং বোধগম্যতার ভিত্তিতে তা গ্রহণ করুক। সূরা ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..'"

অন্ধ অনুকরণও দুর্বল ঈমানের দিকে পরিচালিত করে। যার ঈমান দুর্বল সে সহজেই আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হবে যখন তার আকাউক্ষার বিরোধিতা করা হবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং বোধগম্যতার সাথে তার উপর কাজ করে, সে দৃঢ় ঈমান গ্রহণ করবে। ঈমানের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করবে যে তারা আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা, কারণ তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে উভয় জগতের মানসিক শান্তি এই আচরণের মধ্যেই নিহিত। অতএব, পশুর মতো আচরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং তাদের দ্বারা প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধি ব্যবহার করে খোলা মনে ইসলামী জ্ঞান অধ্যয়ন করতে হবে যাতে তারা বুঝতে পেরে তা গ্রহণ করে এবং তার উপর কাজ করে।

এরপর আল্লাহ তাআলা ইসলামের আগমনের পূর্বে আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে আন্তরিক বিশ্বাসীদের নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যান। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৪:

"তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে..."

আল্লাহর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস বলতে বোঝায়, মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ঘোষণাকে কাজে সমর্থন করা। যে ব্যক্তি আল্লাহকে তার প্রভু বলে বিশ্বাস করে, সে অবশ্যই তার দাসত্ব গ্রহণ করবে। একজন প্রকৃত বান্দা নিজের সন্তুষ্টি খোঁজে না, এবং অন্যরাও তাকে খুশি করবে বলে আশা করে না। তারা অন্য সকল বিষয়ের উপর তার প্রভুর সন্তুষ্টি এবং আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেবে, যেমন মানুষের আনুগত্য ও অনুসরণ, নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি। একজন বান্দা যা চায় তা হল তার প্রভুকে খুশি করা। উপরন্তু, একজন বান্দা স্বীকার করে যে তার নিজের জীবন সহ তার যা কিছু আছে তা তার স্রষ্টা ও প্রভু, মহান আল্লাহর। অতএব, তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা দ্রুত ব্যবহার করবে। একজন প্রকৃত বান্দা বুঝতে পারবে যে, যেহেতু মহান আল্লাহ তাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক এবং সকল কিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক, তাই তাঁর অবাধ্যতা করে তারা মনের শান্তি লাভ করতে পারে না, কারণ তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল সহ সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্যে কঠোর পরিশ্রম করবে, কারণ এটিই উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

একজন ব্যক্তি যত বেশি এইভাবে কাজ করবে, মহান আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস তত বেশি দৃঢ় হবে। অধিকন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে নিশ্চিত হবে যে বিচারের দিন তাকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এটি তাকে বাস্তবে এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করতে আরও উৎসাহিত করবে, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১১৪:

"তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে..."

অতএব, যে ব্যক্তি মৌখিকভাবে আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং বিচার দিবসের উপর বিশ্বাসের দাবি করে কিন্তু কার্যত আল্লাহ, মহিমাম্বিতকে আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়, যার ফলে কার্যত বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়, তাকে অবশ্যই তাদের ঈমানের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে, কারণ তাদের সৎকর্মের অভাব আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং শেষ দিবসের উপর তাদের বিশ্বাসের অভাবের প্রমাণ।

পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস দ্বারা নির্দেশিত মহাবিশ্বের মধ্যে নিদর্শনাবলী

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ এবং বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ মহাবিশ্বের মধ্যে অসংখ্য সুষম ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, যেমন পৃথিবী থেকে সূর্যের নিখুঁত দূরত্ব, জলচক্র, সমুদ্রের ঘনত্ব, যা জাহাজগুলিকে তাদের উপর দিয়ে চলতে দেয় এবং তাদের মধ্যে সমুদ্রের জীবনকে বিকশিত হতে দেয়, এবং আরও অনেক ব্যবস্থা, তখন তারা একজন স্রষ্টার হাত পর্যবেক্ষণ করবে। এত নিখুঁত সুষম ব্যবস্থা এলোমেলো ঘটনার পরিণতি হতে পারে না। উপরন্তু, যদি একাধিক ঈশ্বর থাকত তবে এটি বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করত কারণ প্রতিটি ঈশ্বর মহাবিশ্বের মধ্যে ভিন্ন কিছু চাইতেন। এটি স্পষ্টতই ঘটনা নয় এবং তাই একক ঈশ্বর, মহান আল্লাহকে নির্দেশ করে।
অধ্যায় 21 আল আশ্বিয়া, আয়াত 22:

"যদি তাদের মধ্যে [অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের] আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত..."

মহাবিশ্বের মধ্যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে যা বিচার দিবসের আগমনের ইঙ্গিত দেয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, তখন সে একটি প্রধান জিনিস লক্ষ্য করবে যা ভারসাম্যহীন, তা হল মানুষের কর্ম। সৎকর্মকারী এই পৃথিবীতে তাদের পূর্ণ প্রতিদান পায় না এবং মন্দকর্মকারী তাদের পূর্ণ শাস্তি পায় না, এমনকি যদি তাদের কোন সরকার দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়। এটা বোঝা যুক্তিসঙ্গত যে একক স্রষ্টা, মহান আল্লাহ, যিনি এই মহাবিশ্বের অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থার ভারসাম্য বজায় রেখেছেন, তিনি একদিন মানুষের কর্মেরও ভারসাম্য বজায় রাখবেন, যা এই পৃথিবীর প্রধান ভারসাম্যহীন জিনিস। কর্মের এই ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য, মানুষের কর্মের প্রথমেই অবসান হতে হবে। এটিই বিচারের দিন যখন মানুষের কর্মের বিচার এবং চিরতরে ভারসাম্য বজায় রাখা হবে।

অধিকন্তু, আল্লাহ, মহিমান্বিত, বৃষ্টি ব্যবহার করে একটি মৃত পতিত ভূমিকে জীবন দান করেন এবং সৃষ্টির জন্য একটি মৃত বীজকে জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তোলেন। একইভাবে, মহিমান্বিত আল্লাহ, মানুষ নামক মৃত বীজকে, যাকে মাটিতে সমাহিত করা হয়, জীবন দান করতে পারেন এবং করবেন, যেমন মৃত বীজ থেকে অঙ্কুরিত হয়ে প্রাণ ফিরে আসে। ঋতু পরিবর্তন স্পষ্টভাবে পুনরুত্থানকে দেখায়। উদাহরণস্বরূপ, শীতকালে, গাছের পাতা মারা যায় এবং ঋতু পড়ে এবং গাছটি প্রাণহীন দেখায়। কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে, পাতাগুলি আবার গজায় এবং গাছটি প্রাণে পূর্ণ দেখায়। সমস্ত প্রাণীর ঘুম জাগরণ চক্র পুনরুত্থানের আরেকটি উদাহরণ। ঘুম মৃত্যুর বোন, কারণ ঘুমন্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলি কেটে ফেলা হয়। মহান আল্লাহ, তারপর একজন ব্যক্তির আত্মা তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন যদি তারা বেঁচে থাকার জন্য নির্ধারিত হয় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিকে আবার জীবন দান করে। অধ্যায় 39 আয-যুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ মানুষের আত্মা তাদের মৃত্যুর সময় কবজ করেন এবং যারা মারা যায় না তাদের নিদ্রাকালে কবজ করেন। অতঃপর যাদের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদের তিনি ধরে রাখেন এবং অন্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

এই এবং আরও অনেক উদাহরণের উপর চিন্তা করলে মানুষের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা এবং বিচারের দিনে এর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১১৪:

"...এবং তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে..."

সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধের গুরুত্ব সম্পর্কে আয়াতের এই অংশে আগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সংক্ষেপে বলতে গেলে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমাজের মধ্যে মন্দের বিস্তার ঘটতে পারে কেবল মানুষ সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ এড়িয়ে চলার মাধ্যমে। যেহেতু আজকের যুগে সমাজের সদস্যরা আগের চেয়েও বেশি একে অপরের সাথে সংযুক্ত, তাই মানুষ আগের চেয়েও বেশি অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হবে। অতএব, এই দায়িত্ব পালন করা উচিত, এমনকি যদি তা কেবল তাদের উপর নির্ভরশীলদের, যেমন তাদের সন্তানদের ক্ষেত্রেও হয়। এই দায়িত্ব সঠিক চরিত্র এবং সঠিক জ্ঞানের সাথে পালন করা উচিত, অন্যথায় মানুষ কেবল তাদের আচরণ সংশোধন করতে নিরুৎসাহিত হবে। যে ভালো জিনিসের আদেশ দিতে হবে এবং যে খারাপ জিনিসের নিষেধ করতে হবে, সেগুলি অবশ্যই বৃহত্তর সমাজ দ্বারা সহজেই ভাল বা খারাপ হিসাবে স্বীকৃত হবে। অতএব, তাদের এমন গৌণ ইসলামী বিষয়গুলির আদেশ ও নিষেধ করা এড়িয়ে চলতে হবে যা বোঝার জন্য গভীর জ্ঞান প্রয়োজন। পরিশেষে, এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজনকে সর্বদা উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দিতে হবে এবং অন্যদের যে ভালো জিনিসের আদেশ দিচ্ছে তা বাস্তবে বাস্তবায়ন করার এবং যে খারাপ জিনিস থেকে তারা অন্যদের নিষেধ করছে তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করতে হবে। ৬১তম সূরা আস সাফ, আয়াত ২-৩:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য বিষয় হলো, তোমরা যা বলো না, তা বলো।"

উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দিলে একজন ব্যক্তি সৎকর্মে ত্বরান্বিত হবে এবং অন্যদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করবে। এটিই ধার্মিকতার ভিত্তি এবং এর মধ্যে ঐশ্বরিক শিক্ষার রূপরেখা হিসেবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৪:

"...এবং সৎকর্মে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাও। আর তারাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।"

ইসলামের আগমনের পূর্বে আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে আন্তরিক বিশ্বাসীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তারা আল্লাহর আনুগত্যের জন্য তাদের প্রচেষ্টার প্রতিদান পাবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৫:

"এবং তারা যা-ই ভালো কাজ করুক না কেন, তা কখনোই তাদের থেকে বঞ্চিত করা হবে না..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেহেতু এই আয়াতে কোনওভাবেই একজন ব্যক্তিকে ছোট বা বড় সকল ধরনের সৎকর্ম করার জন্য প্রচেষ্টা করতে বাধা দেওয়া হয়নি। এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ ঐশ্বরিক শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। এই পৃথিবীতে, এই ব্যক্তি মানসিক শান্তি অর্জন করবে, কারণ তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং

শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। এবং এই আচরণ নিশ্চিত করবে যে তারা পরকালে পুরস্কার পাবে, কারণ এভাবেই একজন ব্যক্তি বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত হবে। এটি মানুষের জন্য ভালো কাজ এড়াতে কোনও অজুহাত রাখে না, কারণ এটি কত পার্থিব আশীর্বাদ আছে তার দ্বারা নির্ধারিত হয় না বরং এটি নির্ধারিত হয় যে কেউ কীভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে। অতএব, প্রত্যেকেই উভয় জগতেই সৎ আচরণ করতে এবং মানসিক শান্তি অর্জন করতে সক্ষম। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 115:

"... আর আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের সম্পর্কে জানেন।"

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সতর্ক করেন যারা তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহের অপব্যবহার করে তাঁর অবাধ্য হয়। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৬:

"নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে তাদের কোন কাজে আসবে না..."

মানুষ কেন মহান আল্লাহকে অমান্য করে তার প্রধান কারণ হলো পার্থিব আকাঙ্ক্ষা, যেমন সম্পদ অর্জন এবং অন্যদের, যেমন আত্মীয়স্বজনদের খুশি করার জন্য। মদিনায় বসবাসকারী অনেক আহলে কিতাবও একই আচরণ করেছিল, যদিও তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেছিল, তাদের সামাজিক মর্যাদা হারানোর ভয়ে, যা

তাদের জন্য সম্পদের উৎস ছিল, এবং তাদের সম্প্রদায়কে অসন্তুষ্ট করার ভয়ে। সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহকে অমান্য করে তারা যা অর্জন করে তা সর্বদা তাদের জন্য চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, মহান আল্লাহকে অমান্য করে, প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল পথে পরিচালিত করে। এটি তাদের উভয় জগতেই কেবল চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করবে, এমনকি যদি তাদের পার্থিব বিলাসিতা থাকে। সূরা তওবার ৯, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৬:

" নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কখনোই তাদের কোন কাজে আসবে না..."

যদি কেউ আল্লাহর অবাধ্যতার মনোভাব ধরে রাখে, তাহলে তারা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারবে না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৬:

"... আর তারাই জাহান্নামের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

একজন মুসলিমের জন্য আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান বাস্তবে বাস্তবায়িত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বাস্তবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তিনি যে আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে প্রদান করেছেন সেগুলো ব্যবহার করা। যে ব্যক্তি তাঁর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তার ঈমান ছাড়া এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার গুরুতর ঝুঁকি থাকে। কারণ ঈমান হলো এমন একটি উদ্ভিদের মতো যাকে বেঁচে থাকার জন্য আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, তা বৃদ্ধি পেতে ব্যর্থ হয় এবং এমনকি মারাও যেতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে না এবং মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

এরপর মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেন যে, যারা তাঁর অবাধ্য হয়, তাদের প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করে, তারা উভয় জগতেই ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই পাবে না, যদিও তা তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৭:

"এই পার্থিব জীবনে তারা যা ব্যয় করে তার উদাহরণ হলো তুষারপাতযুক্ত বাতাসের মতো, যা এমন এক জাতির ফসলের উপর আঘাত করে যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে এবং তা ধ্বংস করে দেয়..."

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, সে ভারসাম্যহীন মানসিক ও শারীরিক অবস্থা লাভ করবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে হারিয়ে ফেলবে। ফলস্বরূপ, তাদের প্রচেষ্টা

উভয় জগতেই কেবল চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করবে, এমনকি যদি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। এটি একটি অনস্বীকার্য সত্য যে পার্থিব বিলাসিতা অর্জন এবং উপভোগ করার মানসিক শান্তি ছাড়া কোনও মূল্য নেই। এই কারণেই ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তির হতাশা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতার মতো মানসিক ব্যাধিতে ভোগেন, কারণ তাদের অনেক পার্থিব বিলাসিতা থাকা সত্ত্বেও তাদের মানসিক শান্তি থাকে না। এছাড়াও, যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, সে বিচার দিবসের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতেও ব্যর্থ হবে। পরকালে তাদের প্রচেষ্টার ক্ষতি সকলের জন্য আরও স্পষ্ট হবে। অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ২৩:

" আর আমি তাদের কৃতকর্মের কাছে যাব এবং সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মতো করে দেব।"

এবং ১৮তম সূরা আল কাহফ, আয়াত ১০৩-১০৪:

"বলুন, "আমরা কি তোমাদেরকে কর্মের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে অবহিত করব? [তারা] তারা যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে ব্যর্থ হয়েছে, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।"

যে ব্যক্তি প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে নিজের প্রচেষ্টা নষ্ট করে, তার জন্য নিজেকে ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়, কারণ উভয় জগতের মানসিক শান্তির পথ মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৭:

"... আর আল্লাহ তাদের উপর জুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করে।"

অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা যেন উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১১৭:

" এই পার্থিব জীবনে তারা যা ব্যয় করে তার উদাহরণ হলো হিমবাহী বাতাসের মতো, যা এমন এক জাতির ফসলের উপর আঘাত করে যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে এবং তা ধ্বংস করে দেয়। আর আল্লাহ তাদের উপর জুলুম করেননি, বরং তারা নিজেদের উপর জুলুম করে।"

এই আয়াতটি ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার ভ্রান্ত ধারণাকেও দূর করে। ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার অর্থ হলো আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকা, আর মনে করা যে, আল্লাহ তাদেরকে উভয় জগতেই রহমত ও ক্ষমা প্রদান করবেন। এই মনোভাব এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি স্পষ্টতই উভয় জগতেই ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং, তাদেরকে আল্লাহর উপর প্রকৃত আশা গ্রহণ করতে হবে। এর অর্থ হলো আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকা, যখনই তারা কোন পাপ করে ফেলে তখন নিজের আচরণ সংশোধন করা এবং তারপর উভয় জগতেই আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করা। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং আশার মধ্যে পার্থক্য এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১১৮-১২০

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ
بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ

تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

هَآأَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لِقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا
خَلَوْا عَصَوْا عَلَيْكُمْ أَلَا نَمْلِكُ مِنَ الْغَيْظِ قُلٌ مُّوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

إِن تَمَسَّكُمُ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصَبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا
يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের [অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের] ব্যতীত অন্যদের
অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, কারণ তারা তোমাদের [কোনও] ক্ষতি থেকে
রেহাই দেবে না। তারা চায় যে তোমাদের কষ্ট হোক। তাদের মুখ থেকে ইতিমধ্যেই
ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে এবং তাদের বুক যা গোপন করে তা আরও বেশি। যদি তোমরা
বুদ্ধি ব্যবহার করো, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের জন্য নিদর্শনগুলি স্পষ্ট
করে দিয়েছি।"

তোমরা তাদের ভালোবাসো কিন্তু তারা তোমাদের ভালোবাসে না, অথচ তোমরা
কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখো - পুরোটাই। আর যখন তারা তোমাদের সাথে দেখা
করে, তখন বলে, "আমরা বিশ্বাস করি।" কিন্তু যখন তারা একা থাকে, তখন তারা
তোমাদের উপর রাগে আঙুল কামড়ায়। বলো, "তোমরা তোমাদের রাগে মরে যাও।
নিশ্চয়ই আল্লাহ বুকের ভেতরে যা আছে তা জানেন।"

যদি তোমাদের কল্যাণ হয়, তবে তা তাদের কষ্ট দেয়; আর যদি তোমাদের উপর কোন অকল্যাণ আসে, তবে তারা তাতে আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ড পরিবেষ্টনকারী।

পবিত্র কুরআনে যখন মহান আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের মৌখিক ঈমানের দাবি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হলো প্রমাণ এবং প্রমাণ যা অর্জন করা প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার এবং রহমত লাভ করতে পারে। যেমন একটি ফলবান বৃক্ষ কেবল তখনই কার্যকর যখন তা ফল দেয়, তেমনি ঈমান কেবল তখনই কার্যকর যখন তা সৎকর্ম করে। এই ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে ইসলামের ধ্বংস কামনাকারীদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে তোলার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৮-১২০:

“ হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্যদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, কারণ তারা তোমাদের [কোনও] ক্ষতি থেকে রেহাই দেবে না। তারা চায় তোমাদের কষ্ট হোক। তাদের মুখ থেকে ইতিমধ্যেই ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে এবং তাদের বুক যা গোপন করে তা আরও বড়। যদি তোমরা বুদ্ধি ব্যবহার করো, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে নিদর্শনগুলি স্পষ্ট করে দিয়েছি। দেখো, তোমরা তাদেরকে ভালোবাসো কিন্তু তারা তোমাদের ভালোবাসে না, অথচ তোমরা কিতাব - সবকিছুর উপর বিশ্বাস রাখো। আর যখন তারা তোমাদের সাথে দেখা করে, তখন বলে, "আমরা ঈমান এনেছি।" কিন্তু যখন তারা একা থাকে, তখন তারা তোমাদের উপর রাগে আঙুল কামড়ায়। বলো, "তোমাদের রাগে মরে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ বুকের ভেতরে যা আছে তা জানেন।" যদি তোমাদের ভালো লাগে, তবে তা তাদের কষ্ট দেয়; আর যদি তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে, তবে তারা এতে আনন্দিত হয়..."

এই আয়াতগুলোর অর্থ এই নয় যে, একজন মুসলিম একজন অমুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে না কারণ এই আয়াতগুলো এবং অনুরূপ আয়াতগুলো মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়কার অমুসলিমদের কথা উল্লেখ করে। ইসলামের

ধ্বংস কামনাকারী অমুসলিমদের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা সেই সময়ে বিশেষভাবে বিপজ্জনক ছিল, কারণ অমুসলিমরা ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করত।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে উপদেশ দেয় যে, মহান আল্লাহ অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন না। ৬০ তম সূরা আল মুমতাহানা, আয়াত ৮:

"যারা ধর্মের কারণে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিস্কার করেনি, তাদের সাথে সদাচরণ করতে এবং তাদের সাথে ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন।"

বাস্তবে, মূল আয়াতটি মুসলমানদের সতর্ক করে যে, যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করতে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। বাস্তবে এটি মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৩৩ নম্বর হাদিসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, একজন মুসলিম তার বন্ধুর জীবনের পথে। এর অর্থ হল, একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীদের মধ্যে থাকা ভালো বা খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করবে, তা তার কাছে স্পষ্ট হোক বা না হোক। অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের সাহচর্য গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে উৎসাহিত করে।

তাছাড়া, মুসলিম ও অমুসলিম সকলের সাথে সদয় আচরণ করা একজন প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। একজন প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি এবং তার সম্পদ থেকে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি দূরে রাখে। সুনানে আন নাসায়ীর ৪৯৯৮ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, অন্যদের সাথে সুস্থ সামাজিক আচরণ এবং অন্যদের সাথে গভীর বন্ধুত্বের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গভীর বন্ধুত্ব সর্বদা একজন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করবে, সে তা বুঝতে পারুক বা না পারুক এবং এটি তার সঙ্গীর প্রতি ভালোবাসার কারণে তার বিশ্বাসের সাথে আপোষ করতে পারে, অন্যদিকে, অন্যদের সাথে ভালো সামাজিক আচরণ কখনই তাকে এই পর্যায়ে নিয়ে যাবে না। অতএব, মুসলমানদের সকলের সাথে ভালো চরিত্র এবং আচরণ গ্রহণ করা উচিত, তবে তাদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব সংরক্ষণ করা উচিত যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের দিকে উৎসাহিত করবে। কেবলমাত্র একজন মুসলিমই অন্য মুসলিমের জন্য এটি করতে পারে। অন্যদিকে, একজন অমুসলিম, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর অবাধ্য হতে উৎসাহিত করবে, যদিও তারা এটির ইচ্ছা নাও করে। এর কারণ হল একজন অমুসলিম একজন মুসলিমের চেয়ে আলাদা আচরণবিধি অনুসরণ করে। এবং একজন অমুসলিমের কাছে যে আচরণ গ্রহণযোগ্য তা ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১১৮:

"... তাদের মুখ থেকে ইতিমধ্যেই ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে, এবং তাদের বুক যা গোপন করে তা আরও বড়..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমের উচিত এমন সরল মনোভাব গ্রহণ করা এড়িয়ে চলা যার মাধ্যমে সে অন্যদের সুবিধা নিতে দেয়। ইসলাম মুসলমানদেরকে সর্বদা অন্যদের কথা এবং কাজকে ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করতে শেখায়। উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আবু দাউদের ৪৯৯৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে, মানুষের সম্পর্কে ভালো চিন্তা করা আল্লাহর ইবাদতের একটি দিক। তবুও, এর অর্থ এই নয় যে, এমন মনোভাব গ্রহণ করা উচিত যেখানে তারা অন্যদের নেতিবাচক কথা এবং কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ থাকে। ১১৮ নম্বর আয়াতের শেষে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, একজন মুসলিমকে সর্বদা নিশ্চিত করতে হবে যে তারা যেখানে সম্ভব অন্যদের সন্দেহের সুবিধা দেবে এবং ইসলামের সীমার মধ্যে অন্যদের নেতিবাচক আচরণ থেকেও নিজেদের রক্ষা করবে, বিশেষ করে যেখানে অতীতে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। সহীহ বুখারী, ৬১৩৩ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। ৩ নম্বর অধ্যায় আলী ইমরান, ১১৮ নম্বর আয়াত:

"...যদি তোমরা বুদ্ধি ব্যবহার করো, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্ট করে দিয়েছি।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেহেতু মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন, তাই তিনিই মানুষের জন্য নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। একমাত্র মহান আল্লাহই মানুষকে তাঁর প্রদত্ত

আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শেখাতে পারেন যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে। অন্যদিকে, সমস্ত মানবসৃষ্ট আচরণবিধি কখনও মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে না কারণ তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে এবং পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং সেগুলি অনুসরণ করতে হবে, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের এমন একজন জ্ঞানী রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেগুলি অনুসরণ করেন এবং তা জেনে কাজ করেন যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। ঠিক যেমন এই জ্ঞানী রোগী ভাল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সেগুলি অনুসরণ করে সেও ভাল হবে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের প্রেসক্রাইব করা ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই অন্ধভাবে তাদের ডাক্তারের উপর বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষার উপর চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা অন্ধভাবে ইসলামের শিক্ষার উপর বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি...'"

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১১৮:

"... যদি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করো, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্ট করে দিয়েছি।"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১১৯:

"এই যে তুমি তাদের ভালোবাসছো কিন্তু তারা তোমাকে ভালোবাসছে না..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মানুষের মধ্যে ভালোবাসার নিদর্শন নির্ধারণ করা হয় তারা একে অপরকে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কতটা উৎসাহিত করে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। কারণ যে ব্যক্তি অন্য কাউকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে সে উভয় জগতেই তাদের মনের শান্তি পেতে চায়। যেহেতু মনের শান্তি কেবল আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমেই পাওয়া যায়, তাই তারা তাদের প্রিয়জনকে এর প্রতি উৎসাহিত করবে। কিন্তু যদি কেউ অন্য কাউকে আল্লাহর অবাধ্যতার জন্য উৎসাহিত করে, তাহলে এটি তাদের প্রতি তাদের ভালোবাসার অভাব প্রমাণ করে, কারণ তারা চায় না যে অন্য ব্যক্তি উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাক। অতএব, প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে হবে যে তারা তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য উৎসাহিত করে কিনা। এটিই তাদের দেখাবে যে তারা সত্যিই তাদেরকে ভালোবাসে কিনা।

৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১১৯:

"এই যে, তুমি তাদের ভালোবাসছো কিন্তু তারা তোমাকে ভালোবাসছে না, অথচ তুমি ধর্মগ্রন্থের উপর বিশ্বাস রাখো - সবকিছুতেই.."

এই আয়াতটি এই বাস্তবতার দিকেও ইঙ্গিত করতে পারে যে, যখন কেউ তাদের জীবনে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে, তখন তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যদের দ্বারা, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা, তাদের সমালোচনা করা হবে।

এটি একটি অনিবার্য বাস্তবতা যার মুখোমুখি বেশিরভাগ মুসলিম যখনই ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য আরও বেশি প্রচেষ্টা করে তখন হয়। এটি ঘটে কারণ ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন প্রায়শই মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয় এবং তাই তারা তাদের উপেক্ষা করে। কিন্তু যখন তারা অন্যদের এই শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করতে দেখে, তখন তাদের খারাপ মুসলিম মনে হয় এবং ফলস্বরূপ তারা ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টাকারী ব্যক্তির সমালোচনা করে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, একজনকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর কাজ করা চালিয়ে যেতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। এটি ঘটে কারণ ইসলামী শিক্ষাগুলি দেখায় যে কীভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়। এটি তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে। মনে রাখতে হবে যে যারা ইসলামী শিক্ষা উপেক্ষা করে তাদের সমালোচনা করে তাদের খুশি করার ফলে তারা কেবল তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা পাবে না এবং তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় রাখবে। এটি তাদের মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেবে, এমনকি যদি অন্যরা ইসলামী শিক্ষা উপেক্ষা করার জন্য তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়।

৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১১৯:

"এই যে, তুমি তাদের ভালোবাসছো কিন্তু তারা তোমাকে ভালোবাসছে না, অথচ তুমি ধর্মগ্রন্থের উপর বিশ্বাস রাখো - সবকিছুতেই.."

এই আয়াতটি আরও ইঙ্গিত করে যে, যখন কেউ ইসলামী শিক্ষা শেখে এবং তার উপর আমল করে, তখন সে অন্যদের প্রতি আন্তরিকতা গ্রহণ করতে উৎসাহিত হবে। সহীহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিস অনুসারে, অন্যদের প্রতি আন্তরিকতা গ্রহণ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অন্যদের প্রতি আন্তরিকতা একজনকে তার সামর্থ্য অনুসারে, যেমন আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক সাহায্য, মৌখিক এবং ব্যবহারিকভাবে অন্যদের ভালো কাজে সহায়তা করতে উৎসাহিত করবে। এটি সমাজকে ইতিবাচক দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং উন্নত করবে। আন্তরিকতা একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে উৎসাহিত করবে যেভাবে সে নিজেও অন্যদের দ্বারা আচরণ পেতে চায়। এটি মানুষের অধিকার পূরণ নিশ্চিত করবে এবং সমাজের মধ্যে শান্তি ও ন্যায়বিচারের বিস্তার ঘটাবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা শিখতে এবং তার উপর আমল করতে ব্যর্থ হয়, সে অন্যদের প্রতি এই আন্তরিকতা গ্রহণ করবে না। অন্যদের প্রতি তাদের অকৃতজ্ঞতা সমাজের মধ্যে অনৈক্য, বিচ্যুতি, অবিচার এবং শান্তির অভাব ছড়িয়ে দেবে।

৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১১৯:

"... আর যখন তারা তোমাদের সাথে দেখা করে, তখন বলে, "আমরা ঈমান এনেছি।" কিন্তু যখন তারা একা থাকে, তখন তারা তোমাদের উপর রাগে আঙুল কামড়ায়। বলো, "তোমরা তোমাদের রাগে মরে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ বুকের ভেতরে যা আছে তা জানেন।"

এই আয়াতে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, দ্বিমুখী মনোভাব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত, যার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকে খুশি করার জন্য তাদের

আচরণ পরিবর্তন করে। এটি একটি জঘন্য মনোভাব যা উভয় জগতেই কেবল অপমানের দিকে পরিচালিত করে। এই পৃথিবীতে, মহান আল্লাহ, দ্বিমুখী ব্যক্তিকে সকলের সামনে প্রকাশ করে দেবেন এবং ফলস্বরূপ, যাদেরকে তারা তাদের মনোভাব দিয়ে খুশি করার চেষ্টা করেছিল তারা তাদের অপছন্দ করবে। এবং আখেরাতে তাদের শাস্তি আরও কঠোর হবে। উদাহরণস্বরূপ, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদের ৪৮৭৩ নম্বর হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কেউ দ্বিমুখী মনোভাব গ্রহণ করবে তার জন্য কিয়ামতের দিন আগুনের দুটি জিহ্বা থাকবে।

৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১২০:

" যদি তোমাদের কল্যাণ স্পর্শ করে, তাহলে তাদের কষ্ট হয়; আর যদি তোমাদের কোন অকল্যাণ ঘটে, তাহলে তারা আনন্দিত হয়..."

এই মনোভাব হিংসার প্রত্যক্ষ ফলাফল। হিংসা একটি মহাপাপ যা যেকোনো মূল্যে এড়িয়ে চলতে হবে। এটি একটি মহাপাপ কারণ হিংসুক সরাসরি আল্লাহর পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করে। তারা এমন আচরণ করে যেন আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে একটি বিশেষ আশীর্বাদ প্রদান করে ভুল করেছেন। যে ব্যক্তি তাদের হিংসাকে তাদের হিংসাকারীর বিরুদ্ধে মৌখিক ও শারীরিকভাবে লড়াই করতে দেয়, সে কেবল তাদের নিজস্ব সংকর্ম ধ্বংস করবে। সুনান ইবনে মাজাহ, ৪২১০ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। বৈধ হিংসা হল যখন কেউ অন্য কারো অনুরূপ আশীর্বাদ পেতে চায়, যাতে অন্য কেউ তার প্রদত্ত জিনিসটি না হারায়। যদিও এই ধরনের আচরণ বৈধ, তবুও এটি কেবল ধর্মীয় বিষয়ে প্রশংসনীয় এবং পার্থিব বিষয়ে নিন্দনীয়। উদাহরণস্বরূপ, সহিহ মুসলিম, ১৮৯৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দুটি বৈধ ও প্রশংসনীয় হিংসার পরামর্শ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাদের জ্ঞান সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যদের তা শেখায়, তাকে হিংসা করা যেতে পারে। অন্য যে ব্যক্তিকে ঈর্ষা করা যেতে পারে সে হল সেই ব্যক্তি যে হালাল সম্পদ অর্জন করে এবং তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে।

হিংসা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি একটি মহাপাপ যা মহান আল্লাহর বণ্টনের পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করে। তাদের বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জন্য যা সর্বোত্তম তাই দান করেন। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, অন্যদের প্রতি ঈর্ষা করার পরিবর্তে, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এটি উভয় জগতে আরও আশীর্বাদ, মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব..."

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, অন্যদের হিংসা করলে কেবল মহান আল্লাহর আনুগত্য ভুলে যেতে হবে, যা উভয় জগতেই বিপদ ডেকে আনবে। অধ্যায় ২০ দ্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

১২০ নং আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, ঈর্ষান্বিত মুসলিমকে অবশ্যই তাদের ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির মৌখিক ও শারীরিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ধৈর্য ধরতে হবে এবং কেবল ইসলামের সীমানার মধ্যেই আত্মরক্ষা করতে হবে। ধৈর্যের অর্থ হলো নিজের কথা ও কর্মের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি

আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা, যার অর্থ হলো পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত নিয়ামতগুলো ব্যবহার করা। এভাবেই একজন ব্যক্তি তাদের ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সূরা ১১৩ আল ফালাক, আয়াত ১ এবং ৫:

"বলুন, "আমি প্রভাতের প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা করছি...এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"

তখন আল্লাহ, মহান, তাদের ঈর্ষান্বিতদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়, কারণ আল্লাহ, মহান, তাঁর অসীম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অনুসারে কাজ করেন, মানুষের সীমিত চিন্তাভাবনা অনুসারে নয়। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১২০:

"... আর যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ড পরিবেষ্টনকারী।"

আল্লাহ, মহান, মুসলমানদের উপদেশ দিচ্ছেন যে, অন্যদের ক্ষতি থেকে, যেমন যারা তাদের ঈর্ষা করে বা ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করার জন্য তাদের সমালোচনা করে, তাদের থেকে ঐশ্বরিক সুরক্ষার মূল চাবিকাঠি হলো আল্লাহর আনুগত্যের

উপর ধৈর্য ধারণ করা। ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে আল্লাহ, মহানের আনুগত্য অব্যাহত রাখতে হবে, কারণ এটিই তাদের মনের শান্তির দিকে পরিচালিত করবে, অন্যদের আচরণ নির্বিশেষে, কারণ আল্লাহ, মহান, সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয় সহ, মনের শান্তির আবাসস্থল। অধ্যায় 65 তালুক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই ঐশ্বরিক সুরক্ষা আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে ঘটে, মানুষের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারে নয়। অতএব, এটি সর্বোত্তম সময়ে এবং সর্বোত্তম উপায়ে ঘটে, যদিও এটি মানুষের কাছে স্পষ্ট নয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অধ্যায় ৩ - আলী ইমরান, আয়াত ১২১-১২ ৯

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿١٢٤﴾

بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ

الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنُظْمِنَ قُلُوبَكُمْ بِهِ ۚ وَمَا لِنَنْصُرَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

﴿١٢٦﴾

لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

﴿١٢٩﴾

“আর[স্মরণ করো] যখন তুমি, [নবী মুহাম্মদ, সা.] সকালে তোমার পরিবার থেকে
বেরিয়ে[ওহদের] যুদ্ধের জন্য মুমিনদের তাদের অবস্থানে স্থাপন করেছিলে -
এবং আল্লাহ শ্রবণকারী এবং জ্ঞানী।

যখন তোমাদের মধ্যে দুটি দল সাহস হারাতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাদের
বন্ধু ছিলেন; এবং মুমিনদের আল্লাহর উপর নির্ভর করা উচিত।

আর আল্লাহ তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধে বিজয় দান করেছিলেন, অথচ তোমরা
দুর্বল ছিলে[সংখ্যায় অল্প]। অতএব, আল্লাহকে ভয় করো, সম্ভবতঃ তোমরা কৃতজ্ঞ
হবে।

[স্মরণ করো] যখন তুমি মুমিনদের বলছিলে, "তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে
তোমাদের পালনকর্তা তিন হাজার ফেরেশতা অবতীর্ণ করে তোমাদের সাহায্য
করবেন?"

হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহর প্রতি সতর্ক থাকো এবং তারা[অর্থাৎ,
শত্রুরা] ক্রোধে তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা
তোমাদেরকে পাঁচ হাজার চিহ্ন বিশিষ্ট ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন।

আর আল্লাহ এটা তোমাদের জন্য সুসংবাদ এবং তোমাদের হৃদয়কে প্রশান্ত করার
জন্যই করেছেন। আর বিজয় কেবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে।
যাতে তিনি কাফেরদের একদলকে কেটে ফেলেন অথবা তাদের দমন করেন যাতে
তারা হতাশ হয়ে ফিরে যায়।

তিনি তাদের ক্ষমা করবেন নাকি শাস্তি দেবেন, সে সিদ্ধান্ত তোমার নয়, কারণ তারা
আসলেই জালেম।

আর আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা
করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এই আয়াতের অংশে, মহান আল্লাহ উহদের যুদ্ধের ঘটনাবলী আলোচনা করেছেন, যা নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় হিজরতের তৃতীয় বছরে সংঘটিত হয়েছিল। সূরা ৩, আলে ইমরান, আয়াত ১২১:

" আর [স্মরণ করো] যখন তুমি, [নবী মুহাম্মদ, সা.] সকালে তোমার পরিবার থেকে বেরিয়ে [ওহদের] যুদ্ধের জন্য মুমিনদের তাদের অবস্থানে স্থাপন করেছিলে..."

এটি উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমনটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়া হল অন্যদের, যেমন নিজের সন্তানদের, পথ দেখানোর ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি। উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার মধ্যে রয়েছে ইসলামের শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করা যাতে অন্যরা তাদের কাজ এবং কথার মাধ্যমে এর সত্যতা বুঝতে পারে। তবেই মুসলিমরা পরবর্তী প্রজন্মকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য শিক্ষা দিতে পারে যাতে তারা অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা বুঝতে পারে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের জীবনব্যাপী ইসলামের শিক্ষার উপর অটল থাকবে। দুঃখের বিষয় হল, বেশিরভাগ মুসলিম পিতামাতা পরবর্তী প্রজন্মকে পার্থিব জ্ঞান শেখানোর জন্য অত্যন্ত আগ্রহী, যা পার্থিব সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে, কিন্তু তারা তাদের ধর্মীয় শিক্ষাকে অবহেলা করে এবং তাদের ধর্মীয় শিক্ষা অন্যদের হাতে তুলে দেয়, যদিও তাদের সন্তানদের সরাসরি ইসলামের ভিত্তি শেখানো তাদের কর্তব্য। যদিও পরবর্তী প্রজন্মকে পার্থিব জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করা প্রশংসনীয়, তবুও বাবা-মায়ের ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষাকে অবহেলা করা উচিত নয়। শিশুদের না বুঝে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শেখার জন্য মসজিদে পাঠানো যথেষ্ট নয়। একজন কিশোর-কিশোরীর অন্ধ অনুকরণ নয়, বরং প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলাম গ্রহণ করা উচিত, অন্যথায় তারা সময়ের সাথে সাথে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে কারণ তারা

ইসলামকে সংস্কৃতির একটি অংশ হিসেবে দেখবে যা সময়ের সাথে সাথে পরিত্যাগ করা যেতে পারে। যখন কেউ প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলাম গ্রহণ করে তখন তারা বুঝতে পারবে যে ইসলাম একটি জীবনধারা, যা প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হবে এবং যখন তারা তাদের প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করে প্রয়োগ করতে হবে। এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন তাদের পরিবারের প্রবীণরা তাদের ইসলামের সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণ শেখান। এবং এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন এই প্রবীণরা, যেমন বাবা-মা, ইসলামিক শিক্ষা নিজেরাই শিখে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেন।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১২১:

" আর[স্মরণ করো] যখন তুমি, [নবী মুহাম্মদ, সা.] সকালে তোমার পরিবার থেকে বেরিয়ে[ওহদের] যুদ্ধের জন্য মুমিনদের তাদের অবস্থানে স্থাপন করেছিলে..."

এছাড়াও, এই আয়াতটি ইসলামের ত্যাগের দাবি বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে। ইসলাম এমন একটি ধর্ম নয় যার লক্ষ্য কেবল মানুষকে নিজেদের সম্পর্কে ভালো বোধ করা, এমনকি যখন তারা অলসতা অবলম্বন করে। ইসলাম অনুভূতি ও আবেগের ধর্ম নয় বরং কর্ম ও সংগ্রামের ধর্ম যা তাদের অভিজ্ঞতার প্রতিটি পরিস্থিতি এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করা প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদকে প্রভাবিত করে। যেমন একজন ব্যক্তি ত্যাগ ও প্রচেষ্টা ছাড়া পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে পারে না, যেমন ডাক্তার হওয়া, তেমনি একজন মুসলিমও ত্যাগ ও প্রচেষ্টা ছাড়া উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পেতে পারে না। এই প্রচেষ্টার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসে বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত, তাঁর উপর শান্তি ও শান্তি বর্ষিত

হোক। যেহেতু এই প্রচেষ্টা প্রায়শই একজন ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে, তাই তাদের অবশ্যই ইসলামী শিক্ষার মধ্যে স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি শিখতে হবে যা নির্দেশ করে যে কতটা আন্তরিকভাবে আল্লাহকে আনুগত্য করলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি দৃঢ় ঈমান গ্রহণ করবে। দৃঢ় ঈমান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে, স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময়, সর্বোপরি আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ব্যক্তি যখনই তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে, তখন সহজেই আল্লাহকে অমান্য করবে কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে বরং মহান আল্লাহর আনুগত্য করলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। অতএব, ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং তাদের জীবনের প্রতিটি জিনিসকে সঠিকভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে।

একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। যদি তাদের প্রচেষ্টা ন্যূনতম হয়, তবে তাদের প্রতিদানে খুব বেশি আশা করা উচিত নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন, তাই তিনি প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্ম অনুসারে প্রতিদান দেবেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১২১:

"... আর আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।"

এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমান এমন একটি গাছের মতো যার বৃদ্ধি এবং বেঁচে থাকার জন্য আনুগত্যের মাধ্যমে পুষ্টি প্রয়োজন। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি না পেলেও বৃদ্ধি পাবে না এবং এমনকি মারাও যেতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি আনুগত্যের মাধ্যমে এটিকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমানও বৃদ্ধি পাবে না এবং মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১২১:

" আর [স্বরণ করে] যখন তুমি, [নবী মুহাম্মদ, সা.] সকালে তোমার পরিবার থেকে বেরিয়ে [ওহদের] যুদ্ধের জন্য মুমিনদের তাদের অবস্থানে স্থাপন করেছিলে - এবং আল্লাহ শ্রবণকারী এবং জ্ঞানী।"

যখন অমুসলিম সেনাবাহিনী উহদের কাছাকাছি পৌঁছেছিল, তখন মহানবী (সাঃ) একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে মুসলিম সেনাবাহিনীর মদিনায় অবস্থান করা উচিত এবং শহরের ভেতরে শত্রুদের মোকাবেলা করা উচিত বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তরুণ সাহাবীরা, যারা বদরের যুদ্ধে দেখেননি, তারা তাঁকে এগিয়ে যাওয়ার এবং উহদে অমুসলিম সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন, যা তিনি অবশেষে মেনে নেন। মহানবী (সাঃ) তাঁর যুদ্ধের বর্ম পরিধান করার পর, তরুণ সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং মদিনার ভেতরে অমুসলিম সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাঁর প্রাথমিক পরামর্শে ফিরে যেতে নবী (সাঃ) কে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহর শত্রুদের মোকাবেলা না করে একজন মহানবী (সাঃ)

তাঁর যুদ্ধের বর্ম খুলে ফেলা ঠিক নয়। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর স্বপ্নে মদিনায় থাকাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, যদিও তিনি শেষ যুগ পর্যন্ত সকল নেতার জন্য একটি ভালো উদাহরণ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। একজন ভালো নেতা শত্রু সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়ার মতো বৈধ কারণ ছাড়া তাদের আদেশ পরিবর্তন করে অনিশ্চিত আচরণ করেন না। এই ধরনের আচরণের ফলে সৈন্যরা কেবল তাদের নেতার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে, যা যুদ্ধের সময় অত্যন্ত বিপজ্জনক। অতএব, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উহুদের দিকে যাত্রা করার নির্দেশে অটল ছিলেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন ব্যক্তির জীবনে একটি দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করা উচিত যার মাধ্যমে তারা তাদের বৈধ পার্থিব এবং ধর্মীয় সিদ্ধান্তে অটল থাকে এবং কেবল প্রমাণ এবং জ্ঞানের কারণে পথ পরিবর্তন করে। যে ব্যক্তি অনিশ্চিত মনোভাব গ্রহণ করে সে কখনই তাদের নেওয়া কোনও সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে না, যার ফলে তাদের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং নিবেদিতপ্রাণ থাকার মাধ্যমে তারা যে সুবিধাগুলি অর্জন করতে পারত তা হারাবে। উপরন্তু, এই ব্যক্তি ক্রমাগত পিছনের দিকে তাকাবে, যদিও তারা ইতিহাস পরিবর্তন করতে পারে না, যা তাদের সামনের দিকে তাকাতে এবং তাদের সুযোগ এবং বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উপকৃত হতে বাধা দেবে।

যখন মহানবী (সাঃ) উহুদের যুদ্ধে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য মদীনা ত্যাগ করেন, তখন মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই তার ৩০০ সৈন্য নিয়ে মুসলিমদের সংকল্পকে দুর্বল করার লক্ষ্যে পিছু হটে যান। তার পরিকল্পনা প্রায় কার্যকর হয়ে ওঠে কারণ কয়েকজন সাহাবীর সংকল্প দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু আল্লাহর প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস শয়তানের কুমন্ত্রণাকে জয় করে এবং তারা অটল থাকে। এই সংকটময় মুহূর্তের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা ৩য় সূরা আলে ইমরানের ১২২ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"যখন তোমাদের মধ্যে দুটি দল সাহস হারাতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাদের বন্ধু ছিলেন; এবং মুমিনদের আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত।"

ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেস্টার" বইয়ের ২৫০-২৫১ পৃষ্ঠায় এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা এবং তারপর পরিস্থিতির ফলাফল গ্রহণ করা, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর আনুগত্যের উপর দৃঢ়ভাবে স্থির রেখে সিদ্ধান্ত নেন, জেনে রাখা যে, তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন যে, সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য কী সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

উদাহরণস্বরূপ, একজন অসুস্থ ব্যক্তির উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুসারে বৈধ ঔষধ গ্রহণ করা এবং তারপর আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যে তিনি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করবেন কিনা, কারণ তিনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন তা তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১২২:

"যখন তোমাদের মধ্যে দুটি দল সাহস হারাতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাদের বন্ধু ছিলেন; এবং মুমিনদের আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত।"

এই আয়াতটি প্রতিটি পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে কঠিন সময়ে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। ঈমানের মৌখিক ঘোষণার আসল পরীক্ষা হল যখন তারা কঠিন পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে যেখানে তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করা হয়। এই আনুগত্যের মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। মুনাফিকদের মতো, ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা এত বিশেষ নয়। মহান আল্লাহর আনুগত্য নিশ্চিত করবে যে উভয় জগতেই একজন ব্যক্তি মানসিক শান্তি এবং মহান আল্লাহর সুরক্ষা এবং সাহায্য পাবে। অধ্যায় 65 তলাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই ঐশ্বরিক সাহায্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে নয়। এটি সর্বদা মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অনুসারে। অতএব, এই ঐশ্বরিক সাহায্য সেই সময় ঘটে যখন এটি মানুষের জন্য সর্বোত্তম এবং এমনভাবে যা তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, এই জেনে যে, তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য দান করা হবে, কোন না কোনভাবে, তা তাদের কাছে স্পষ্ট হোক বা না হোক। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সংকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

উহদের যুদ্ধে তাদের পরাজয়ের পর, মহান আল্লাহ সাহাবাদের (আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন) স্বরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি তাদের পূর্ববর্তী একটি যুদ্ধ, বদরের যুদ্ধে বিজয় দান করেছিলেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১২৩:

" আর আল্লাহ তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধে বিজয় দান করেছিলেন, অথচ তোমরা দুর্বল ছিলে[অর্থাৎ সংখ্যায় কম]..."

এটি বিপদের সময় মহান আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরণ করার গুরুত্ব নির্দেশ করে কারণ এটি ধৈর্যশীল থাকার এবং এমনকি মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার একটি চমৎকার উপায়। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১২৩:

"... তাহলে আল্লাহকে ভয় করো; হয়তো তোমরা কৃতজ্ঞ হবো।"

নিয়াতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হলো শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করা। কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হলো ভালো কথা বলা অথবা নীরব থাকা। আর কাজের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হলো পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে, তা ব্যবহার করা। অধিকন্তু, ধৈর্য ধারণের অর্থ হলো নিজের কথা বা কর্মের ব্যাপারে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, এই বিশ্বাস রাখা যে তিনি কেবল তার জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। ২য় সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক পথে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থন এবং করুণা লাভ করবে, যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১২৪-১২৫:

“[স্মরণ করো] যখন তুমি মুমিনদের বলছিলে, “তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে তোমাদের রব তিন হাজার ফেরেশতা অবতীর্ণ করে তোমাদের সাহায্য করবেন? হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহর প্রতি সতর্ক থাকো এবং তারা [অর্থাৎ, শত্রুরা] তোমাদের উপর ক্রোধে আক্রমণ করবে, তাহলে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্ন বিশিষ্ট ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।”

এই আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ তাআলা ঐশী সাহায্য লাভের শর্ত হিসেবে ধৈর্যশীল থাকা এবং তাকওয়া অবলম্বন করাকে নির্ধারণ করেছেন। যেমনটি আগে

আলোচনা করা হয়েছে, ধৈর্য হলো নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, এই বিশ্বাসে যে তিনি কেবল তার জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। তাকওয়ার অর্থ হলো পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। অতএব, তাকওয়া একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক অবস্থাকে সুষম করে তোলে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তার জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেয়।

উপরন্তু, তাকওয়ার একটি দিক হল কিছু হালাল জিনিস এড়িয়ে চলা, কারণ এটি তাকে হারাম জিনিসের দিকে নিয়ে যাবে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ১৮৭:

"...এগুলো আল্লাহর [নির্ধারিত] সীমা, তাই এর কাছে যেও না..."

মহান আল্লাহ কখনও তাঁর সীমা লঙ্ঘন না করার কথা বলেননি, বরং তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে মানুষ যেন তাঁর সীমার কাছেও না যায়। পবিত্র কুরআন জুড়ে এই উপদেশ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ হযরত আদম (আঃ)-কে জান্নাতের একটি গাছের ফল না খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু গাছের কাছেও না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যদিও এর কাছে যাওয়া বৈধ ছিল। ৭ম সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ১৯:

"আর"হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখান থেকে ইচ্ছা থাকে, কিন্তু এই গাছের কাছে যেও না, অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"

অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যা ইঙ্গিত দেয় যে কেবল কিছু বৈধ বলেই তা করা উচিত নয়, কারণ মহান আল্লাহর সীমা অতিক্রম করা অবৈধ নয়, কেবল তা অতিক্রম করা অবৈধ। কিছু বৈধ জিনিস, যেমন অনর্থক জিনিস, এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি প্রায়শই অবৈধের দিকে পরিচালিত করে। উদাহরণস্বরূপ, অনর্থক কথাবার্তা, যা পাপ হিসাবে বিবেচিত হয় না, প্রায়শই পাপের দিকে পরিচালিত করে যেমন গীবত এবং মিথ্যা বলা। সম্পদের অনর্থক ব্যয় প্রায়শই অপব্যয় ব্যয়ের দিকে পরিচালিত করে, যা পাপ। অধ্যায় ১৭ আল ইসরা, আয়াত ২৭:

"নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই, আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।"

যারা বিপথগামী হয়ে পড়েছে তাদের অধিকাংশই ধাপে ধাপে এই পথে চলে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, তারা অবৈধ জিনিসগুলিতে অংশ না নিয়ে সেগুলিতে অংশ নিতে উৎসাহিত এবং প্রলুব্ধ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি মদ্যপানকারীদের সাথে থাকে, তার মদ্যপান করার সম্ভাবনা সেই ব্যক্তির তুলনায় বেশি থাকে যারা মদ্যপানকারীদের সাথে থাকে না। কিছু হালাল জিনিস, বিশেষ করে অসার জিনিস, এড়িয়ে চলার এই মনোভাব এমনই, যা মহানবী (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৪৫১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি ধার্মিক হতে পারে না, অর্থাৎ, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করার উপর তারা অটল থাকতে পারে না, যতক্ষণ

না তারা কিছু হালাল জিনিস ত্যাগ করে ভয়ে যে এটি তাদেরকে হারাম জিনিসের দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, কেবল হারাম জিনিস এড়িয়ে চলার দিকেই অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হবে না, বরং কিছু হালাল জিনিস, বিশেষ করে অসার জিনিস এড়িয়ে চলার দিকেও অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হবে, কারণ ভয়ে এটি তাদেরকে অবশেষে হারাম জিনিসের দিকে নিয়ে যাবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকবে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত, যা ন্যায়ের সারাংশ এবং উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৭:

"... এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ [অর্থাৎ, বিধান] মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।"

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সীমারেখার কাছে না যাওয়ার গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়, সে হালাল জিনিসগুলিতে, বিশেষ করে অসার জিনিসগুলিতে অতিরিক্ত লিপ্ত

হবে, যা তাদের অবৈধ জিনিসগুলিতে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে, যার ফলে উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলার সৃষ্টি হবে, এমনকি তারা বিনোদনের মুহূর্তগুলিও উপভোগ করবে, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতা থেকে বাঁচতে পারবে না। যারা এইভাবে আচরণ করে, যেমন ধনীদেব, তাদের জীবন পর্যবেক্ষণ করলে এটি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সূরা তওবার ৯, আয়াত ৮২:

"তাহলে তারা যেন অল্প হেসে ফেলে এবং [তারপর] অনেক কাঁদে, কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ।" তারা আগে আয় করত।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় কেন উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১২৪-১২৫:

“[স্মরণ করো] যখন তুমি মুমিনদের বলছিলে, “তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে তোমাদের রব তিন হাজার ফেরেশতা অবতীর্ণ করে তোমাদের সাহায্য করবেন? হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহর প্রতি সতর্ক থাকো এবং তারা [অর্থাৎ, শত্রুরা] তোমাদের উপর ক্রোধে আক্রমণ করবে, তাহলে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্ন বিশিষ্ট ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।”

কিন্তু কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, উহুদের যুদ্ধের সময়, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদেশ মেনে চলার মাধ্যমে অনিচ্ছাকৃতভাবে ধৈর্য ও তাকওয়া প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হওয়ায়, তারা ফেরেশতাদের সাহায্য পায়নি। উহুদের যুদ্ধ শুরু হলে, সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, দ্রুত অমুসলিম সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন যার ফলে তারা পিছু হটে। কিন্তু কিছু তীরন্দাজ, মহানবী (সাঃ) যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, উহুদ পাহাড়ের সামনে অবস্থিত জাবাল আল রুমাহ নামে একটি ছোট পাহাড়ে অবস্থান করার নির্দেশ দেন, তারা বিশ্বাস করেন যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং আদেশ আর প্রযোজ্য নয়। যখন তারা যুদ্ধের মাল সংগ্রহের জন্য জাবাল আল রুমাহতে নেমে আসেন, তখন মুসলিম সেনাবাহিনীর পশ্চাদভাগ উন্মোচিত হয়ে যায়। অমুসলিম সেনাবাহিনী তখন একত্রিত হয় এবং উভয় পক্ষের মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে। এর ফলে অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, শহীদ হন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯-৩০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, কোন পাপ করেননি কারণ তারা বিশ্বাস করতেন যে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আদেশ আর প্রযোজ্য হবে না, তবুও যুদ্ধের গণীমত সংগ্রহের, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করার তাদের সৎ ও ধার্মিক ইচ্ছা সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সাঃ)-এর ঐতিহ্যের প্রতি সর্বদা কঠোরভাবে আনুগত্য প্রদর্শনের গুরুত্ব নির্দেশ করে এবং অন্যান্য সকল কাজ থেকে বিরত থাকে, এমনকি যদি তা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি আমল করা হয়, এমনকি যদি তা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে, ততই তারা এই দুটি পথনির্দেশের উপর কম আমল করবে, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বর হাদিসে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে বিষয় দুটি পথনির্দেশের মূলে নেই তা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন। উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি আমল করা হবে, ততই তারা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলিতে কাজ করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পা দেবে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা

শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১২৩-১২৭:

“ আর বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদেরকে ইতিমধ্যেই বিজয় দান করেছিলেন, যখন তোমরা দুর্বল ছিলে [অর্থাৎ সংখ্যায় কম]। তাহলে আল্লাহকে ভয় করো, হয়তো তোমরা কৃতজ্ঞ হবে। [স্মরণ করো] যখন তুমি মুমিনদেরকে বলেছিলে, "তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে তোমাদের পালনকর্তা তিন হাজার ফেরেশতা নাযিল করে তোমাদের সাহায্য করবেন? হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহর প্রতি সতর্ক থাকো এবং তারা [অর্থাৎ শত্রু] তোমাদের উপর [আক্রমণ করে] আক্রমণ করবে, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত [স্পষ্টতার] ফেরেশতা দ্বারা

তোমাদের সাহায্য করবেন। আর আল্লাহ এটা করেছেন তোমাদের জন্য সুসংবাদ এবং তোমাদের হৃদয়কে আশ্বস্ত করার জন্য। আর বিজয় কেবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে, যাতে তিনি কাফেরদের একটি অংশকে কেটে ফেলেন অথবা তাদেরকে দমন করেন যাতে তারা হতাশ হয়ে ফিরে যায়।"

এই আয়াতগুলো বদরের যুদ্ধের কথাও উল্লেখ করতে পারে যেখানে সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, ধৈর্য ও তাকওয়ার শর্ত পূরণ করেছিলেন যার ফলে মহান আল্লাহ তাদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতাদের পাঠিয়েছিলেন। অধ্যায় ৮ আল আনফাল, আয়াত ১২:

"[স্মরণ করো] যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের কাছে ওহী পাঠালেন যে, "আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং যারা বিশ্বাস করেছে তাদের শক্তিশালী করো। আমি অবিশ্বাসীদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করব। অতএব, তোমরা তাদের ঘাড়ে আঘাত করো এবং তাদের প্রতিটি আঙুলের ডগায় আঘাত করো।"

একবার বদরের যুদ্ধের সময়, একজন সাহাবী, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন, একজন অমুসলিম সৈনিকের পিছনে ছুটছিলেন এবং চাবুকের শব্দ শুনতে পান এবং কেউ কথা বলতে না পেরেও কথা বলতে থাকেন। তিনি অমুসলিমকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। যখন তিনি মহানবী (সাঃ) কে ঘটনাটি জানান, তখন তিনি নিশ্চিত হন যে এটি তৃতীয় আসমান থেকে একজন ফেরেশতা ছিলেন। সহীহ মুসলিমের ৪৫৮৮ নম্বর হাদিসে এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

আরেকবার, একজন ফেরেশতা একজন সাহাবীকে, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন, মহানবী (সা.)-এর চাচা, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবকে বন্দী করতে সাহায্য করেছিলেন, যাকে মক্কার অমুসলিমরা এই যুদ্ধে তাদের সাথে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল। মুসনাদে আহমাদের ৯৪৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বদর ও উহুদের যুদ্ধ থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, ধৈর্যশীল ও পরহেজগার থাকা কীভাবে ঐশ্বরিক সাহায্যের দিকে পরিচালিত করে এবং এই দুটি বৈশিষ্ট্য ছাড়া কীভাবে ঐশ্বরিক সাহায্য হারাতে পারে।

৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১২৬:

"আর আল্লাহ এটা তোমাদের জন্য সুসংবাদ এবং তোমাদের হৃদয়কে আশ্বস্ত করার জন্যই করেছেন। আর বিজয় কেবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।"

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তাঁর সাহায্য লাভের জন্য একজন ব্যক্তির সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই। প্রতিটি পরিস্থিতিতে ঐশ্বরিক সাহায্য লাভের জন্য কেবল ধৈর্য ও তাকওয়ার শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। অতএব, নিজের স্বার্থে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত

আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, তিনি সবচেয়ে অসম্ভব পরিস্থিতিতেও এই সহায়তা প্রদান করতে পারেন। এবং যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ, তাই তিনি জানেন কিভাবে সর্বোত্তম সময়ে এবং সর্বোত্তম উপায়ে সাহায্য প্রদান করতে হয়। অতএব, তাঁর আনুগত্যের উপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে, কারণ তারা বুঝতে পারে না যে ঐশ্বরিক সাহায্য নিকটবর্তী। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১২৬:

"... আর বিজয় কেবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মহান আল্লাহ তখন তাদের সকলকে সতর্ক করেন যারা তাঁর অবাধ্য হয়, তিনি তাদের প্রদত্ত অনুগ্রহের অপব্যবহার করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১২৭:

"যাতে তিনি কাফেরদের একটি অংশকে কেটে ফেলতে পারেন অথবা তাদের দমন করতে পারেন যাতে তারা হতাশ হয়ে ফিরে যায়।"

যারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তারা সর্বদা হতাশা এবং এর সাথে জড়িত মানসিক সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয়, যেমন বিষণ্ণতা। কারণ প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে, এটি একজন ব্যক্তির জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় নিয়ে যায় এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে বাধা দেয়। অতএব,

মহান আল্লাহর অবাধ্যতা উভয় জগতেই কেবল হতাশা, চাপ এবং ঝামেলার দিকে পরিচালিত করে, এমনকি যদি কেউ পার্থিব বিলাসিতাও ধারণ করে। সূরা তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ্ বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"]"

উহূদের যুদ্ধের সময়, মহানবী (সাঃ) গুরুতর আহত হন। তাঁর দাঁত ভেঙে যায় এবং মুখমণ্ডল ও ঠোঁট কেটে ফেলা হয়। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩০-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) তাঁর উম্মতের জন্য এতটাই চিন্তিত ও দুঃখিত ছিলেন যে, তাঁর মুখ থেকে রক্ত মুছে ফেলার সময় তিনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, মহান আল্লাহ কীভাবে সেইসব লোকদের ক্ষমা

করতে পারেন যারা তাদের নবী (সাঃ) কে এভাবে কষ্ট দিয়েছে। এরপর আল্লাহ তাআলা নিম্নলিখিত আয়াতটি নাযিল করেন এবং মহানবী (সাঃ) কে আশ্বস্ত করেন যে, ক্ষমার দরজা তাদের জন্য এখনও খোলা রয়েছে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১২৮:

"তিনি তাদের ক্ষমা করবেন নাকি শাস্তি দেবেন, সে সিদ্ধান্ত তোমার নয়, কারণ তারা আসলেই জালেম।"

সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪০২৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে। অমুসলিমদের কাছ থেকে এই ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সময়, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর কাছে তাদের ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করছিলেন কারণ তারা তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞান এবং পূর্ণ বোধগম্যতা রাখেনি। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২৬৮-২৬৯ এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এমন চরম পরিস্থিতিতেও, মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে হত্যা করার চেষ্টাকারী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার কথা উল্লেখ করার আগে তাদের ক্ষমা করার কথা উল্লেখ করেছেন। এটি তাঁর করুণা ও ক্ষমার বিশালতা নির্দেশ করে। অতএব, মহান আল্লাহ তাআলা যে অবকাশ দান করেন তা গ্রহণ করা উচিত, কারণ তিনি মানুষকে তাদের পাপের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেন না। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৬১:

"আর যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের অন্যায়ের জন্য দোষারোপ করতেন, তাহলে তিনি পৃথিবীতে (অর্থাৎ, পৃথিবীতে) কোন প্রাণীকেই ছেড়ে দিতেন না, কিন্তু তিনি তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিলম্বিত করেন। যখন তাদের সময় এসে যাবে, তখন তারা এক মুহূর্তও পিছিয়ে থাকবে না এবং এগিয়েও যাবে না।"

আন্তরিক তওবার মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার উপর অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা থেকে বিরত থাকার এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লজ্জিত যেকোনো অধিকারের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া উচিত। কাউকে এই বিশ্বাসে বিভ্রান্ত করা উচিত নয় যে মহান আল্লাহ, মহান আল্লাহ, যে অবকাশ দেন তা চিরকাল স্থায়ী হবে, কারণ সবকিছুরই একটি সময়সীমা থাকে। শাস্তি বিলম্বিত হওয়া এবং কোনও শাস্তি না দেওয়ার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। অতএব, আল্লাহ, মহান আল্লাহ, যে অবকাশ দেন তা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য একজনকে বিলম্ব না করে আন্তরিক তওবার জন্য তাড়াহুড়ো করতে হবে, অন্যথায় তারা যখন তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে তখন তারা খালি হাতে থাকবে এবং অনুশোচনায় পূর্ণ থাকবে, কারণ তারা এই পৃথিবীতে বা পরকালে মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতা থেকে পালাতে পারবে না। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১২৯:

" আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর..."

এই পৃথিবীতে, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি যে পার্থিব জিনিসপত্র অর্জন করে, তা তার জন্য চাপ, ঝামেলা এবং দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এটি আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত পার্থিব জিনিসপত্রের অপব্যবহারের প্রত্যক্ষ

ফলাফল, কারণ এটি একজনকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেয় এবং তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় নিয়ে যায়। এবং যেহেতু এই আচরণ একজনকে বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিতে বাধা দেয়, তাই পরকালে তারা যে শাস্তির মুখোমুখি হবে তা আরও স্পষ্ট এবং আরও খারাপ হবে। কিন্তু যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ বেঁচে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের পথ সংশোধন করার সুযোগ থাকে, কারণ মহান আল্লাহ মানুষকে শাস্তি দেওয়ার চেয়ে ক্ষমা করা পছন্দ করেন। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১২৯:

"...তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এই আয়াতটি ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার ধারণাকেও দূর করে দেয় যেখানে কেউ আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকে এবং উভয় জগতেই তাঁর রহমত ও ক্ষমা লাভের আশা করে। এই আচরণ এড়িয়ে চলা উচিত কারণ ইসলামে এর কোন মূল্য নেই। এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে, যদিও মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল মানুষকে পছন্দ করেন, তবুও এর অর্থ এই নয় যে তিনি তাঁর অবাধ্যদের শাস্তি দেবেন না। অতএব, ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলতে হবে এবং মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার উপর প্রকৃত আশা গ্রহণ করতে হবে। আশার অর্থ হলো ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা, যখনই কেউ পাপ করে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া এবং তারপর তাঁর রহমত ও ক্ষমার উপর নির্ভর করা। ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং আশার মধ্যে পার্থক্য জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১২৯:

" আর আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

পরিশেষে, সমগ্র সৃষ্টি মহান আল্লাহর আওতাধীন এবং তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারাধীন, একজন ব্যক্তির তাঁর নিয়ম মেনে চলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট দেশের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তেমনি মহাবিশ্বের মালিকের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতেই তার সমস্যা হবে। একজন ব্যক্তি যদি তার নিয়ম মেনে চলতে না পারে তবে একটি দেশ ছেড়ে যেতে পারে কিন্তু এমন জায়গায় পালিয়ে যেতে পারবে না যেখানে মহান আল্লাহর নিয়ম ও এখতিয়ার প্রযোজ্য হয় না। একজন ব্যক্তি তার সমাজের নিয়ম পরিবর্তন করতে সক্ষম হতে পারে কিন্তু তারা কখনও মহান আল্লাহর নিয়ম পরিবর্তন করতে পারবে না। উপরন্তু, ঠিক যেমন একজন বাড়ির মালিক ঘরের নিয়ম নির্ধারণ করে, এমনকি অন্যরা এই নিয়মের প্রতি আপত্তি জানালেও, একইভাবে, মহাবিশ্ব মহান আল্লাহর, এবং তাই, তিনিই একমাত্র এই মহাবিশ্বের নিয়ম নির্ধারণ করেন, মানুষ এই নিয়ম পছন্দ করুক বা না করুক। অতএব, এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে, নিজের স্বার্থে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে সে মহান আল্লাহর নিয়ম মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। একজন ব্যক্তি হয় আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পিছনের হিকমতগুলি শেখার চেষ্টা করতে পারে, যাতে সে বুঝতে পারে যে কীভাবে সেগুলি তাদের এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য উপকারী এবং কীভাবে তারা উভয় জগতে মানসিক ও শারীরিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, অথবা সে তার

আকাউক্ষার উপাসনা করতে পারে এবং ইসলামের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলামী নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তার উচিত উভয় জগতেই তার পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং কোনও আপত্তি, প্রতিবাদ বা অভিযোগ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ২৯:

"আর বলো, "সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, অতএব যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক; আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।" নিশ্চয়ই, আমরা জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে ঘিরে থাকবে। আর যদি তারা সাহায্যের জন্য ডাকে, তবে তাদের সাহায্যের জন্য ঘোলা তেলের মতো পানি ব্যবহার করা হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দেবে। পানীয় কত নিকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট।"

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৩০-১৩৬

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَعْضٌ مِمَّا كَسَبْتُمْ تَغْلِبُونَ

১৩০

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۖ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ

لِلْمُتَّقِينَ ۖ

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ بِهِمْ وَمَن

يَعْفِرْ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

أُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

وَنِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা দ্বিগুণ-বর্ধিত হারে সুদ খাও না, বরং আল্লাহকে ভয়
করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

আর সেই আগুনকে ভয় করে, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।
আর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়।

আর তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং আসমান ও যমীনের সমান বিস্তৃত
জান্নাতের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

যারা স্বাচ্ছন্দ্যে ও কষ্টে [আল্লাহর পথে] ব্যয় করে, যারা রাগ সংবরণ করে এবং
মানুষকে ক্ষমা করে - এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।

আর যারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে অথবা নিজেদের উপর জুলুম করে,
তখন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে - আর
আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? - এবং জেনে শুনে তাদের
কৃতকর্মে অটল থাকে না।

তাদের প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাত, যার তলদেশে
নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে; আর [সৎকর্মশীল] কর্মীদের
প্রতিদান কতই না উত্তম।”

উহুদের যুদ্ধের ঘটনাবলী, যার ফলে মুসলমানদের জনবল হ্রাস এবং আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল, সে সম্পর্কে মন্তব্য করার পর, মহান আল্লাহ মুসলিম সম্প্রদায়কে সুদের সাথে লেনদেন এড়াতে সতর্ক করেছেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩০:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা দ্বিগুণ-বর্ধিত হারে সুদ খাও না, বরং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

পবিত্র কুরআনে যখন মহান আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রতি আহ্বান জানান, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের মৌখিক ঈমানের দাবি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া মৌখিক ঈমানের দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হলো সেই প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজন ব্যক্তির অর্জন করা প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতেই পুরস্কার এবং রহমত লাভ করতে পারে। যেমন একটি ফলবান বৃক্ষ কেবল তখনই কার্যকর যখন তা ফল দেয়, তেমনি ঈমান কেবল তখনই কার্যকর যখন তা সংকর্ম করে। এই ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ মুসলিমদের সুদের সাথে লেনদেন থেকে সতর্ক করেছেন কারণ এটি কেবল সমাজের জন্য আর্থিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

আর্থিক সুদ বলতে ঋণগ্রহীতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বোঝায়। পবিত্র কুরআন নাজিলের সময় অনেক ধরনের সুদের লেনদেন প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল বিক্রেতা একটি জিনিস বিক্রি করে মূল্য পরিশোধের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছিলেন, শর্ত ছিল যে ক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তারা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবেন কিন্তু পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেবেন। আরেকটি ছিল একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কিছু টাকা ধার দিয়েছিলেন এবং শর্ত দিয়েছিলেন যে ঋণগ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঋণের পরিমাণের চেয়ে বেশি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফেরত দিতে

হবে। সুদের লেনদেনের তৃতীয় রূপ ছিল যে ঋণগ্রহীতা এবং বিক্রেতা সম্মত হন যে ঋণগ্রহীতা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট হারে ঋণ পরিশোধ করবে এবং যদি তারা সীমার মধ্যে তা করতে ব্যর্থ হয় তবে ঋণদাতা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু একই সাথে সুদের হারও বাড়িয়ে দেবে। এখানে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞাগুলি এই ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

যারা এই বিশ্বাস করেন তারা বৈধ বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা এবং আর্থিক সুদের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হন। এই বিভ্রান্তির ফলে কেউ কেউ যুক্তি দেন যে, যদি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা অর্থের উপর লাভ বৈধ হয়, তাহলে ঋণ থেকে অর্জিত মুনাফা কেন অবৈধ বলে গণ্য করা হবে? তারা যুক্তি দেন যে, একজন ব্যক্তি তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করার পরিবর্তে, তারা এমন কাউকে ঋণ দেয় যে পালানক্রমে তা থেকে লাভ করে। এই পরিস্থিতিতে ঋণগ্রহীতা কেন ঋণদাতাকে লাভের একটি অংশ প্রদান করবেন না? তারা স্বীকার করতে ব্যর্থ হন যে কোনও ব্যবসায়িক উদ্যোগ ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়। কোনও উদ্যোগই লাভের সম্পূর্ণ গ্যারান্টি বহন করে না। অতএব, এটি ন্যায্যসঙ্গত নয় যে কেবলমাত্র অর্থদাতাকেই সকল পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফার অধিকারী বলে বিবেচনা করা উচিত এবং ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা উচিত। এটি ন্যায্যবিচারের অংশ নয় যে যারা তাদের সম্পদ উৎসর্গ করে তাদের কোনও নির্দিষ্ট হারে মুনাফার নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, অন্যদিকে যারা তাদের সম্পদ ঋণ দেয় তারা ক্ষতির সমস্ত ঝুঁকি থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফার নিশ্চয়তা পায়।

একটি স্বাভাবিক বৈধ লেনদেনে, একজন ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয় করা জিনিস থেকে লাভবান হন। বিক্রেতা জিনিসটি তৈরিতে ব্যয় করা প্রচেষ্টা এবং সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণ পান। অন্যদিকে, সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনে, সুবিধার বিনিময় ন্যায্যভাবে হয় না। সুদ গ্রহণকারী পক্ষ তাদের প্রদত্ত ঋণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে এবং এইভাবে তাদের লাভ সুরক্ষিত হয়। অন্য পক্ষ

ঋণ নেওয়া তহবিল ব্যবহার করতে পারে তবে এটি সর্বদা লাভ নাও দিতে পারে। যদি এই ধরনের ব্যক্তি ঋণ নেওয়া তহবিল কোনও প্রয়োজনে ব্যয় করে তবে কোনও লাভ হবে না। তহবিল বিনিয়োগ করা হলেও, একজনের লাভ বা ক্ষতি উভয়ই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতএব, সুদ-সম্পর্কিত লেনদেন একদিকে ক্ষতি এবং অন্যদিকে লাভ বা একদিকে নিশ্চিত এবং স্থির মুনাফা এবং অন্যদিকে অনিশ্চিত লাভের কারণ হয়। অতএব, বৈধ বাণিজ্য আর্থিক সুদের সমান নয়।

এছাড়াও, সুদের বোঝা ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলে। এমনকি মূল ঋণ এবং সুদ পরিশোধের জন্য তাদের অন্য উৎস থেকে ঋণ নিতে হতে পারে। সুদের পদ্ধতির কারণে ঋণ পরিশোধের পরেও তাদের বকেয়া অর্থ প্রায়শই থেকে যায়। এই আর্থিক চাপ মানুষকে নিজের এবং তাদের পরিবারের জন্য জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেতে বাধা দিতে পারে। এই চাপ অনেক শারীরিক এবং মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

পরিশেষে, এই ধরনের ব্যবস্থায় কেবল ধনীরাই ধনী হয় এবং দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়।

যদিও আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন করা বাহ্যিকভাবে একজন ব্যক্তিকে সম্পদ অর্জনের মতো মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এটি তাদের সামগ্রিক ক্ষতির কারণ হয়। এই ক্ষতি বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এটি তাদের ভালো এবং বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন হারাতে পারে যা তারা আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন থেকে বিরত থাকলে অর্জন করতে পারত। মহান আল্লাহ তাদের সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করতে বাধ্য করতে পারেন যা তাদের সন্তুষ্ট করে না। উদাহরণস্বরূপ, তারা শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখীন হতে পারে যার ফলে তারা তাদের মূল্যবান অবৈধ সম্পদ ব্যয়

করে এবং তাদের পছন্দসই উপায়ে তা ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। সামগ্রিক ক্ষতির একটি আধ্যাত্মিক দিকও রয়েছে। তারা যত বেশি আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন করে তত বেশি তাদের লোভ অর্থবহ হয়ে ওঠে, পার্থিব জিনিসের প্রতি তাদের লোভ কখনই সন্তুষ্ট হয় না যা সংজ্ঞা অনুসারে তাদের প্রচুর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাদের দরিদ্র করে তোলে। এই লোকেরা দিনভর এক পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য সমস্যায় পতিত হবে এবং সন্তুষ্টি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে কারণ তারা বৈধ ব্যবসা এবং সম্পদের সাথে যে অনুগ্রহ রয়েছে তা হারিয়ে ফেলবে। এটি তাদের আর্থিক স্বার্থ এবং অন্যান্য উপায়ে আরও অবৈধ সম্পদ অর্জনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। পরকালে ক্ষতি আরও স্পষ্ট। কিয়ামতের দিন তারা খালি হাতে থাকবে কারণ হারাম কাজের সাথে জড়িত কোন সৎকর্ম, যেমন হারাম সম্পদ দিয়ে দান, মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কিয়ামতের দিন এই ব্যক্তির শেষ পরিণতি কোথায় হবে তা নির্ধারণ করার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না।

বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন এবং সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি সমাজে একটি উপকারী ভূমিকা পালন করে যেখানে দ্বিতীয়টি সমাজকে অধঃপতনের দিকে পরিচালিত করে। স্বভাবতই সুদ লোভ, স্বার্থপরতা, উদাসীনতা এবং অন্যদের প্রতি নিষ্ঠুরতা জন্মায়। এটি সম্পদের উপাসনার দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদের সাথে করুণা এবং ঐক্য নষ্ট করে। এভাবে এটি অর্থনৈতিক এবং নৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই সমাজকে ধ্বংস করতে পারে।

অন্যদিকে, দানশীলতা হলো উদারতা এবং করুণার ফল। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সদিচ্ছার কারণে সমাজ ইতিবাচকভাবে বিকশিত হবে যা সকলের জন্য উপকারী হবে। এটা স্পষ্ট যে যদি এমন একটি সমাজ থাকে যেখানে ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে স্বার্থপর আচরণ করে, যেখানে ধনীদের স্বার্থ সরাসরি সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিপরীত হয়, তাহলে সেই সমাজ স্থিতিশীল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না।

এই ধরনের সমাজে, প্রেম এবং করুণার পরিবর্তে, পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং তিক্ততা বৃদ্ধি পাবে।

পরিশেষে, যখন মানুষ তাদের নিজস্ব চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করে এবং তারপর তাদের উদ্ভূত সম্পদ দাতব্য উপায়ে ব্যয় করে অথবা পারস্পরিক বৈধ ব্যবসায়িক উদ্যোগে অংশ নেয়, তখন সেই সমাজের ব্যবসা, শিল্প এবং কৃষির উন্নতি হবে। সমাজের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন সেই সমাজের তুলনায় অনেক বেশি হবে যেখানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আর্থিক স্বার্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৩০:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা দ্বিগুণ-বর্ধিত সুদ খাও না..."

আরবি শব্দ "ভোগ" এর আক্ষরিক অর্থ "খাওয়া"। এটি সতর্ক করে যে, আর্থিক স্বার্থের মতো অবৈধ সম্পদ অর্জনের মাধ্যমে লেনদেন করা কেবল লোভী এবং স্বার্থপর মানসিকতা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে, যেখানে তারা কেবল আরও সম্পদ অর্জনের চিন্তা করে, তা তাদের এবং অন্যদের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব যাই হোক না কেন। এই লোকেরা আর্থিক স্বার্থ গ্রহণ করে, ঠিক যেমন একজন লোভী ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার গ্রহণ করে। তারা যেকোনো উপায়ে আরও

সম্পদ অর্জনের জন্য এতটাই মগ্ন হয়ে পড়ে যে স্বাভাবিক মানদণ্ডে তারা পাগল বলে মনে হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৭৫:

" যারা সুদ খায় তারা দাঁড়াতে পারে না, কেবল সেই ব্যক্তির মতো দাঁড়ানো ছাড়া যাকে শয়তান পাগল করে দিচ্ছে.."

এই মানসিকতা গ্রহণকারী মুসলমানরা নিঃসন্দেহে তাদের ঈমান ধ্বংস করবে কারণ তারা এর বিপরীত কাজ করবে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সম্পদ ও নেতৃত্বের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা এবং আকাঙ্ক্ষা একজন মুসলিমের ঈমানের জন্য ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই উন্মাদ মনোভাব একজন ব্যক্তিকে মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে, এমনকি যদি তারা প্রচুর সম্পদ অর্জন করে। কারণ তাদের মনোভাব তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে, ফলস্বরূপ তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা পাবে না এবং তারা নিঃসন্দেহে তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় স্থাপন করবে। আরও সম্পদ অর্জনের ক্রমাগত চিন্তা এবং তারা যা কিছু অর্জন করেছে তা হারানোর ক্রমাগত ভয় উভয় জগতেই তাদের চাপ, উদ্বেগ এবং ঝামেলা বাড়িয়ে তুলবে। অতিরিক্ত দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করা এবং ঘুম ও বিশ্রামের অভাব পরিস্থিতিতে আরও খারাপ করে তুলবে। তাই তারা যতই সম্পদ এবং অন্যান্য পার্থিব জিনিসপত্র অর্জন করুক না কেন, তারা কখনও মানসিক শান্তি পাবে না। সম্পদ অর্জনের জন্য তীব্র লোভ পোষণকারী লোকদের দেখলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতএব, একজন মুসলিমকে তাদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য আর্থিক সুদের মতো সকল ধরনের অবৈধ সম্পদ এড়িয়ে চলতে হবে।

এছাড়াও, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যেমন একজন ব্যক্তির নিয়ত ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি, তেমনি হালাল জিনিস উপার্জন এবং ব্যবহার ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি। যদি কারো ভিত্তি কলুষিত হয়, তাহলে তারা যা কিছু করে তা কলুষিত হবে এবং মহান আল্লাহ তাআলার কাছে প্রত্যাখ্যাত হবে, যেমন দান করা। কারো ঈমানের ভিত্তিকে কলুষিত করা পাপ করার চেয়েও অনেক খারাপ যা তার ঈমানের অন্যান্য অংশকে প্রভাবিত করে এবং তাই যেকোনো মূল্যে তা এড়িয়ে চলতে হবে।

এরপর আল্লাহ তাআলা একজন মুসলিমের পাপের উপর অটল থাকা এবং আখেরাতে তার শাস্তির মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করেন। এছাড়াও, তিনি সুদ গ্রহণ এবং কাফের হিসেবে মৃত্যুবরণ করার মতো বড় পাপের উপর অটল থাকাকেও সংযুক্ত করেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩০-১৩১:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা দ্বিগুণ-বর্ধিত হারে সুদ খাও না, বরং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। এবং কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা আগুনকে ভয় করো।"

এই আয়াতটি এমন ইচ্ছাপূরণমূলক চিন্তাভাবনাকে দূর করে যা উভয় জগতে মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকা এবং তাঁর রহমত ও ক্ষমার প্রত্যাশা করাকে বোঝায়। অন্যদিকে, প্রকৃত আশা হলো মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা, যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং নিজের আচরণ সংশোধন করা এবং তারপর উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করা জড়িত। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি

হাদিসে এই পার্থক্যটি আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, এই পার্থক্যটি উপলব্ধি করা উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার প্রতি প্রকৃত আশা গ্রহণ করে এবং ইচ্ছাপূরণমূলক চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ ইসলামে এর কোন মূল্য নেই।

অধিকন্তু, এই আয়াতে মুসলমানদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তাহলে তাদের ঈমান ছাড়াই এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, ঈমানের মৌখিক ঘোষণা তখনই মূল্যহীন যখন কেউ কার্যত আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈমান হলো একটি উদ্ভিদের মতো যাকে বেড়ে ওঠা এবং বেঁচে থাকার জন্য আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। যেভাবে একটি উদ্ভিদ সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, সে মারা যাবে, ঠিক তেমনিভাবে যে ব্যক্তি আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমানও মারা যেতে পারে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। অতএব, পাপের পরিণতির ভয়ে এই পরিণতি এড়াতে হবে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৩১:

"আর তোমরা সেই আগুনকে ভয় করো, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সমগ্র সৃষ্টি মহান আল্লাহর আওতাধীন এবং তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারাধীন, একজন ব্যক্তির তাঁর নিয়ম মেনে চলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যেমন একজন ব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট দেশের দায়িত্বে নিযুক্ত সরকারের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তেমনি মহাবিশ্বের মালিকের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতেই তার সমস্যা হবে। একজন ব্যক্তি যদি তার নিয়ম মেনে চলতে না পারে তবে সে একটি দেশ ছেড়ে যেতে পারে কিন্তু এমন

জায়গায় পালিয়ে যেতে পারবে না যেখানে মহান আল্লাহর নিয়ম ও এখতিয়ার প্রযোজ্য হয় না। একজন ব্যক্তি তার সমাজের নিয়ম পরিবর্তন করতে সক্ষম হতে পারে কিন্তু তারা কখনও মহান আল্লাহর নিয়ম পরিবর্তন করতে পারবে না। উপরন্তু, ঠিক যেমন একজন বাড়ির মালিক ঘরের নিয়ম নির্ধারণ করে, এমনকি অন্যরা এই নিয়মের প্রতি আপত্তি জানালেও, একইভাবে, মহাবিশ্ব মহান আল্লাহর, এবং তাই, তিনিই একমাত্র এই মহাবিশ্বের নিয়ম নির্ধারণ করেন, মানুষ এই নিয়ম পছন্দ করুক বা না করুক। অতএব, এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে, নিজের স্বার্থে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে সে মহান আল্লাহর নিয়ম মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। একজন ব্যক্তি হয় আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পিছনের হিকমতগুলি শেখার চেষ্টা করতে পারে, যাতে সে বুঝতে পারে যে কীভাবে সেগুলি তাদের এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য উপকারী এবং কীভাবে তারা উভয় জগতে মানসিক ও শারীরিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, অথবা সে তার আকাঙ্ক্ষার উপাসনা করতে পারে এবং ইসলামের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলামী নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তার উচিত উভয় জগতেই তার পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং কোনও আপত্তি, প্রতিবাদ বা অভিযোগ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ২৯:

"আর বলো, "সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, অতএব যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক; আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।" নিশ্চয়ই, আমরা জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে ঘিরে থাকবে। আর যদি তারা সাহায্যের জন্য ডাকে, তবে তাদের সাহায্যের জন্য ঘোলা তেলের মতো পানি ব্যবহার করা হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দেবে। পানীয় কত নিকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট।"

অতএব, প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি উভয় জগতেই শাস্তির দিকে পরিচালিত করে। এই পৃথিবীতে, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে যে পার্থিব জিনিসগুলি পাওয়া যায় তা তাদের জন্য চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি যদি তারা পার্থিব বিলাসিতাও ধারণ করে, কারণ তারা মহান আল্লাহর ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচতে পারে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

অধিকন্তু, যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে এবং তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে হারিয়ে ফেলে। এটি উভয় জগতেই তাদের চাপ এবং ঝামেলা বাড়িয়ে তুলবে। উপরন্তু, যেহেতু এই আচরণ তাদেরকে বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে বাধা দেয়, তাই পরকালে তাদের যে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে তা আরও স্পষ্ট এবং এই পৃথিবীর শাস্তির চেয়েও অনেক খারাপ হবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩১:

"আর তোমরা সেই আগুনকে ভয় করো, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"

অতএব, এই মনোভাব পরিহার করে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত

অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার বিপরীত হয়। তাদের এমন একজন বিচক্ষণ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকে। ঠিক যেমন এই বিচক্ষণ রোগী ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন এবং তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও এত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ তাদের জীবনের প্রতিটি জিনিস এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে না, কারণ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসের আকারে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইসলামের শিক্ষাগুলি নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। কিন্তু এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করেন যারা তাঁর প্রদত্ত নেয়ামত সঠিকভাবে ব্যবহার করেন। এটি আল্লাহ, মহানবী (সা.) এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়। সূরা ৩, আলে ইমরান, আয়াত ১৩২:

" আর তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়।"

মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎকর্ম করা। যে ব্যক্তি অন্য কারণে কাজ করে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করাও অন্তর্ভুক্ত। প্রথম দিকটি হল এটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিতভাবে তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা এবং শেষ দিকটি হল আন্তরিকভাবে এর উপর আমল করা।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনুগত্যের মধ্যে তাঁর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং সে অনুযায়ী কাজ করা জড়িত। অতএব, তাঁর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং সে অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা করার মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করা উচিত। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এবং ৫৯তম অধ্যায় আল হাশর, ৭ম আয়াত:

"... আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ৮০:

"আর তারা বলে, "জাহান্নাম আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না, [কয়েক] দিন ছাড়া।" বলুন, "তোমরা কি আল্লাহর সাথে কোন অঙ্গীকার করেছ? কারণ আল্লাহ কখনও তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে এমন কিছু বল যা তোমরা জানো না?"

এবং ৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ১৫০-১৫১:

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, "আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে অবিশ্বাস করি" এবং এর মাঝামাঝি কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফের। আর আমরা কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।"

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৮০:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

এবং ৩৩তম সূরা আল আহযাব, আয়াত ২১:

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে একটি চমৎকার আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"

তাঁর পবিত্র চরিত্রের অনুকরণে তাদের চরিত্রকে গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং উদারতার মতো ভালো গুণাবলী গ্রহণ করে এবং হিংসা, অহংকার এবং লোভের মতো নেতিবাচক গুণাবলী ত্যাগ করে। এটি তাদের মানসিক শান্তি নিশ্চিত করবে, কারণ ইতিবাচক গুণাবলী গ্রহণের ফলে ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে শেখা এবং তার উপর আমল করা, বহির্বিশ্বের কাছে তাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা নিশ্চিত করবে। যে ব্যক্তি এটি করতে ব্যর্থ হয় সে অনিবার্যভাবে তাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে এবং অমুসলিম এবং অন্যান্য মুসলিমদের ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করা থেকে বিরত রাখবে। তাঁর ভুলভাবে উপস্থাপন করার ফলে বহির্বিশ্ব মুসলমানদের খারাপ আচরণ পর্যবেক্ষণ করলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমালোচনা করবে। এটি এমন একটি বিষয় যা প্রতিটি মুসলিমকে জবাবদিহি করতে হবে কারণ তাদের উপর কর্তব্য হলো আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে বহির্বিশ্বের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা।

উপরন্তু, পূর্ববর্তী জাতিগুলি যারা তাদের পবিত্র নবীদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালোবাসার দাবি করে, তারা যেমন আখেরাতে তাদের সাথে মিলিত হবে না কারণ তারা কার্যত তাদের অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তেমনি যে মুসলিমরা কার্যত নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তারাও আখেরাতে তাঁর সাথে মিলিত হবে না। বরং, একজন ব্যক্তি তাদের সাথে মিলিত হবে যাদের তারা এই পৃথিবীতে কার্যত অনুকরণ করেছিল। সুনান আবু দাউদের ৪০৩১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনুগত্য করে, সে নিশ্চিত করবে যে সে তার প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করছে। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে এবং নিশ্চিত করে যে সে তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেয় এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হয়। এটি উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৩২:

" আর তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়।"

এটি নির্দেশের দুটি উৎস: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীস আন্তরিকভাবে মেনে চলার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য

উৎস এড়িয়ে চলার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি আমল করা হবে, এমনকি যদি তা সংকর্মের দিকে পরিচালিত করে, তবুও তারা নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর তত কম আমল করবে, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে বিষয় দুটি নির্দেশনার উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করবেন। উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি আমল করা হবে, তত বেশি তারা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলিতে কাজ করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পা দেবে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [জাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

পরবর্তী আয়াতগুলিতে, মহান আল্লাহ তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্যের কিছু দিক ব্যাখ্যা করেছেন। সূরা ৩, আলে ইমরান, আয়াত ১৩৩:

"আর তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও..."

যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষের কাছ থেকে পরিপূর্ণতা দাবি করেন না, তাই তিনি নিশ্চিত করেন যে অনুতাপ এবং সংস্কারের দরজা সর্বদা তাদের জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু একজন ব্যক্তির অবশ্যই তাকে যে সময় দেওয়া হয়েছে তা কাজে লাগাতে হবে এবং তার উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্ম সংশোধন করতে বিলম্ব করা উচিত নয়, কারণ তার জীবনের শেষ অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে। উপরন্তু, মৃত্যুর সময় পাপ থেকে তওবা কবুল হয় না। চতুর্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ১৭-১৮:

“আল্লাহর কাছে তওবা কেবল তাদের জন্যই কবুল হয় যারা অজ্ঞতাবশত পাপ করে [অর্থাৎ আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে] এবং অচিরেই তওবা করে। আল্লাহ যাদের প্রতি ক্ষমাশীল হন, এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। কিন্তু তওবা তাদের জন্য [কবুল হয় না] যারা মন্দ কাজ করতে থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, "আমি এখন তওবা করেছি", অথবা তাদের জন্যও নয় যারা কাফের অবস্থায় মারা যায়। তাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।”

আন্তরিক তওবার মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার উপর অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার পূরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

আন্তরিক তওবা একই বা অনুরূপ পাপের উপর টিকে থাকা থেকে বিরত রাখে এবং ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। অতএব, এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করার মাধ্যমে তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন নিশ্চিত করবে। এই মনোভাব আলোচিত মূল আয়াতগুলিতে উল্লিখিত ধার্মিকতার ভিত্তি। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত 133:

" আর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং আসমান ও জমিনের সমান বিস্তৃত জান্নাতের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"

এরপর আল্লাহ তাআলা ধার্মিকতার কিছু বৈশিষ্ট্য আরও তুলে ধরেন। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি আরও ইঙ্গিত দেয় যে, ইসলামে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণা ততক্ষণ পর্যন্ত যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না তারা আনুগত্য ও ধার্মিকতার ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা সমর্থন করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৪:

" যারা স্বাচ্ছন্দ্য এবং কষ্টে [আল্লাহর পথে] ব্যয় করে..."

এর মধ্যে রয়েছে একজন ব্যক্তির প্রদত্ত আশীর্বাদ, যেমন তার শক্তি, সময় এবং সম্পদ, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। স্বাচ্ছন্দ্য এবং কষ্ট উভয় সময়েই এই আচরণে অটল থাকার সঠিক মনোভাব গ্রহণ করার জন্য, তাদের অবশ্যই কৃতজ্ঞতা এবং ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে। কৃতজ্ঞতা মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে মহান আল্লাহকে মেনে চলতে উৎসাহিত করবে এবং ধৈর্য তাদেরকে কঠিন সময়ে মহান আল্লাহকে মেনে চলতে উৎসাহিত করবে। নিয়তে কৃতজ্ঞতা বলতে কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা বোঝায়। একজনের কথার কৃতজ্ঞতা বলতে ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা বোঝায়। এবং একজনের কর্মে কৃতজ্ঞতা বলতে বোঝায় যে তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে খুশি করে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অধিকন্তু, ধৈর্যের অর্থ হলো নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের

উপর দৃঢ় থাকা, এই বিশ্বাসে যে তিনি কেবল তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক পথে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থন এবং করুণা লাভ করবে, যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৩৪:

"যারা স্বাচ্ছন্দ্য এবং কষ্টে [আল্লাহর পথে] ব্যয় করে..."

যখন একজন মুসলিম সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তার যা কিছু আছে তা মহান আল্লাহর, তখন তার কাছে থাকা আশীর্বাদগুলো, যেমন দান, আল্লাহর অনুগ্রহে সঠিকভাবে ব্যবহার করা সহজ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব গ্রহণ করে সে

বুঝতে পারে যে তারা কেবল আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ফেরত দিচ্ছে। সূরা ২ আল বাকারাহ, আয়াত ২৫৪:

"হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদের যা রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করো..."

এই আচরণ অহংকারের মাধ্যমে তাদের দানশীলতার সৎকর্ম নষ্ট করা থেকেও রক্ষা করে। অহংকার একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করায় যে তারা দান করে আল্লাহ এবং অভাবীদের প্রতি অনুগ্রহ করছে। কিন্তু একইভাবে একজন ব্যক্তি গর্ব ছাড়াই ব্যাংক ঋণ ফেরত দেয়, মুসলমানদের বুঝতে হবে যে তাদের দান হল আল্লাহ প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের একটি উপায়। উপরন্তু, অভাবীরা তাদের দান গ্রহণ করে দাতার প্রতি অনুগ্রহ করছে। অভাবীরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়ার একটি উপায়, এবং তাদের ছাড়া এটি অসম্ভব। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে তাদের সম্পদ তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং শক্তির মাধ্যমে জমা হয়েছে, তাহলে তাদের বুঝতে হবে যে এই জিনিসগুলিও আল্লাহ প্রদত্ত। অতএব, সম্পদের মতো আশীর্বাদের আকারে এই ঋণ অবশ্যই আল্লাহর কাছে ফেরত দিতে হবে, অন্যথায় তাদের এমন শক্তির সম্মুখীন হতে হতে পারে যা এই পৃথিবীতে শুরু হবে এবং পরকালেও অব্যাহত থাকবে।

যখন কেউ দান করে, তখন তার লেনদেন কোন অভাবী ব্যক্তির সাথে হয় না, বরং তা হয় মহান আল্লাহর সাথে। যখন কোন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর সাথে ব্যবসা করে, তখন তারা এমন এক অকল্পনীয় লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে যা তাদের এই দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত করবে। আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে এটি নির্দেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২৪৫:

"কে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, যাতে তিনি তার জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন?"

আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে আলোচিত ধার্মিকতার পরবর্তী দিকের জন্যও ধৈর্য প্রয়োজন। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৩৪:

"... এবং যারা রাগ দমন করে..."

এই আয়াতের অর্থ এই নয় যে, একজন ধার্মিক ব্যক্তি রাগ অনুভব করেন না, কারণ রাগ অনুভব করা একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য যা এমনকি পবিত্র নবীগণও অনুভব করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, রাগ একটি কার্যকর বৈশিষ্ট্য যখন এটি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহার করা হয়, যেমন আত্মরক্ষার সময়। ইসলাম মানুষকে তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায় যাতে তারা তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অবাধ্য হয়ে পাপ না করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন রাগান্বিত ব্যক্তির চুপ থাকা উচিত এবং রাগ চলে যাওয়ার পরেই কেবল কথা বলা উচিত। একজন ব্যক্তির যখন সে রাগ করে তখন যে পরিস্থিতির সাথে জড়িত তা ছেড়ে দেওয়া উচিত এবং যখন সে শান্ত হয়ে যায় তখনই কেবল ফিরে আসা উচিত। শব্দ প্রায়শই কর্মের চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক হতে পারে তাই, কারও কথা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যখন সে রাগান্বিত হয়। তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, একজন রাগান্বিত ব্যক্তিকে একটি নিষ্ক্রিয় শারীরিক অবস্থান নিতে হবে। অর্থাৎ, যদি তারা দাঁড়িয়ে থাকে তবে তাদের বসতে হবে এবং যদি তারা বসে থাকে তবে তাদের শান্ত না হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকা উচিত। সুনানে আবু দাউদের ৪৭৮২ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

একজন ব্যক্তির উচিত রাগের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় ধৈর্য, সহনশীলতা এবং ক্ষমার মতো প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা, যা ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত এবং ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন অশ্লীল কথাবার্তা পরিত্যাগ করা।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৩৪:

"... যারা রাগ দমন করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে..."

যখন কেউ তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে যাতে তারা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে কথা বলতে এবং কাজ করতে পারে, তখন অন্যদের ক্ষমা করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ক্ষমা করা একটি মহান কাজ কারণ এটি তাদের নিজেদের ক্ষমার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"...এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

সর্বদা মনে রাখা উচিত যে মানুষ যেহেতু ফেরেশতা নয়, তাই তারা ভুল করতে বাধ্য, ঠিক যেমন তারা নিজেরাই ভুল করে। এবং যেমন তারা চায় যে মহান আল্লাহ এবং মানুষ তাদের ভুল ক্ষমা করুক, তেমনি তাদের অন্যদের ভুলও ক্ষমা করতে শেখা উচিত। এটা বোধগম্য যে একজন ব্যক্তি অন্যকে ক্ষমা করার জন্য সংগ্রাম করতে পারে যা চলমান, যেমন ট্র্যাফিক দুর্ঘটনার পরে অক্ষম হয়ে যাওয়া। যদি তারা এই ক্ষেত্রেও ক্ষমা করার চেষ্টা করতে পারে তবে তাদের জন্য পুরস্কার আরও বেশি হবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কারও সাথে করা অন্যায় চলমান নয়, একজন ব্যক্তির উচিত অন্যদের ক্ষমা করা এবং ক্ষোভ পুষে রাখা নয়। যে ব্যক্তি এই ধরনের ক্ষোভ পুষে রাখে তার ভয় করা উচিত যে, আল্লাহ, মহামহিম, কিয়ামতের দিন তাদের কর্ম পরীক্ষা করবেন, ঠিক যেমন তারা এই পৃথিবীতে মানুষের ভুল পরীক্ষা করে ধরে রেখেছে। যার কর্ম বিচারের দিন যাচাই করা হবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত ১০৩ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যদের ক্ষমা করার অর্থ হল নিজেকে অন্যদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়। ধৈর্য এবং অন্যদের ক্ষমা করার অর্থ এমন নিষ্ক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করা নয় যার মাধ্যমে কেউ অন্যদের তাদের উপর অন্যায় করতে দেয় এবং তারা আবার ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। এই নিষ্ক্রিয় মনোভাবের সাথে ইসলামের শিক্ষার কোনও সম্পর্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ, একজন মহিলা যিনি তার স্বামীর দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন, তাকে নিজেকে এবং তার সন্তানদের রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে, এমনকি যদি এর জন্য পুলিশকে ডেকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। নিজেকে এবং তার সন্তানদের তার ক্ষতি থেকে রক্ষা করার এবং তার জীবন চালিয়ে যাওয়ার পরে, সে এই পৃথিবীতে, সরকারের মাধ্যমে ন্যায়বিচার চাইতে পারে এবং বিচারের দিনে আল্লাহর কাছে ন্যায়বিচার চাইতে পারে। কিন্তু যদি সে তার বিরুদ্ধে করা অতীতের ভুলের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাকে ক্ষমা করতে পারে, তাহলে তার ক্ষমা হবে। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ১৩৪:

"... আর আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

এটি স্পষ্ট করে যে ঐশ্বরিক ভালোবাসা কেবল ঈমানের মৌখিক ঘোষণার মাধ্যমে নয়, আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়। যত বেশি ভালো কাজ করার জন্য অধ্যবসায় করা হয়, যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত, তত বেশি ঐশ্বরিক যত্ন, ভালোবাসা এবং সুরক্ষা উভয় জগতেই তারা পাবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ঐশ্বরিক ভালোবাসা এবং যত্নের অর্থ এই নয় যে, কেউ এই পৃথিবীতে তার সমস্ত প্রার্থনা এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে অথবা তারা অসুবিধার সম্মুখীন হবে না। এর অর্থ হল, মহান আল্লাহ, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাঁর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতিতে, স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা অসুবিধার সময়, তাদের মানসিক প্রশান্তি দান করবেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৪:

"... আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

অধিকন্তু, যেহেতু সৎকর্মের কোন সীমা নির্ধারণ করা হয়নি, তাই এটি মানুষের কোন অজুহাত রাখে না। সৎকর্ম করার অর্থ হল ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং তাই সকলেই তা অর্জন করতে পারে, তা আল্লাহ তাআলা যতই পার্থিব জিনিস দান করুন না কেন, তা নির্বিশেষে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৩৫:

"এবং যারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে অথবা নিজেদের উপর জুলুম করে..."

এটি বড় এবং ছোট পাপের কথা বলতে পারে। পাপগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে ছোট এবং বড় হিসেবে। বড় এবং ছোট পাপের শ্রেণীবিভাগ করার জন্য অনেকগুলি ভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী সরকার যে পাপের শাস্তি দেবে তাকে বড় পাপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এবং যে কোনও পাপ যা জাহান্নামের সাথে সম্পর্কিত, মহান আল্লাহর ক্রোধ বা অভিশাপ, তাকে বড় পাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও, ছোট পাপের উপর আস্তা রাখাও সেগুলিকে বড় পাপে পরিণত করতে পারে। বড় পাপ কেবল আন্তরিক তওবার মাধ্যমেই ক্ষমা করা হয়, অন্যদিকে ছোট পাপগুলি বড় পাপ এড়িয়ে চলা এবং সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে মুছে ফেলা যায়। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৩১:

"যদি তোমরা সেইসব কবীরা পাপ থেকে বিরত থাকো যেগুলো তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দেব..."

ইসলামি শিক্ষা ইচ্ছাকৃতভাবে বড় এবং ছোট পাপের তালিকা তৈরি করা এড়িয়ে গেছে, যাতে মুসলমানরা সতর্ক থাকে এবং ধরে নেয় যে তাদের যেকোনো পাপকে বড় পাপ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যদি মানুষের কাছে একটি তালিকা দেওয়া হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে অনেকেই ছোট পাপকে তুচ্ছ মনে করেই তা করে যাবে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৩৫:

"এবং যারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে অথবা নিজেদের উপর জুলুম করে..."

এটি আরও ইঙ্গিত করে যে, যখন কেউ পাপ করে, তখন বাস্তবে সে কেবল নিজের উপরই অন্যায় করছে, যদিও এটি তার কাছে স্পষ্ট নয়। আল্লাহর অসীম মর্যাদা, কেউ তাঁর আনুগত্য করুক বা না করুক, তার কোনও পরিবর্তন হয় না। উপরন্তু, যে ব্যক্তি তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার যত বেশি করবে, তার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা তত বেশি ভারসাম্যহীন হবে এবং তার জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে তত বেশি ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচারের দিনে তার জবাবদিহিতার জন্য কার্যত প্রস্তুতি তত কম হবে। এটি তাদের উভয় জগতেই কেবল চাপ, ঝামেলা এবং

অসুবিধার কারণ হবে, এমনকি যদি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। সূরা তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ্ বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"]"

এছাড়াও, যখন কেউ অন্য কারো উপর অন্যায় করে, তখন যদি তার শিকার তাকে ক্ষমা না করে, তাহলে তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। পরকালে, তাকে তার নেক আমলগুলো তার শিকারকে দিতে বাধ্য করা হবে এবং প্রয়োজনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তার পাপগুলো তারা বহন করবে। এর ফলে অন্যায়কারী জাহান্নামে নিষ্কিপ্ত হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, নিজের জন্য পাপ করা থেকে বিরত থাকা উচিত, তা

সে আল্লাহ, মহান আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘন করে হোক বা মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করে হোক।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৩৫:

"আর যারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে অথবা নিজেদের উপর জুলুম করে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে - আর আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? - এবং জেনে শুনে তাদের কৃতকর্মে অটল থাকে না।"

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহ মানুষের কাছ থেকে পরিপূর্ণতা দাবি করেন না। বরং তিনি আশা করেন যে মানুষ তাঁর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করবে এবং যখনই তারা কোনও পাপ করে, তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে এবং তাদের আচরণ সংশোধন করবে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহ এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার পূরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

অধিকন্তু, এই আয়াতটি ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার মিথ্যা ধারণাকে দূর করে দেয় যেখানে কেউ আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকে, অথচ ধরে নেয় যে সে তার রহমত ও ক্ষমা

পাবে। অন্যদিকে, প্রকৃত আশা হলো আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা, যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং নিজের আচরণ সংশোধন করা এবং তারপর উভয় জগতে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করা অন্তর্ভুক্ত। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পার্থক্যটি আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, একজন ব্যক্তির উচিত এই পার্থক্যটি উপলব্ধি করা এবং নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার প্রকৃত আশা গ্রহণ করে এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলা, কারণ ইসলামে এর কোন মূল্য নেই।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা এবং উভয় জগতের সাফল্যের নিশ্চয়তা দেন যারা ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত ধার্মিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৩৬:

"তাদের প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে; আর [সৎ কর্মশীল] কর্মীদের প্রতিদান কতই না উত্তম।"

হয়েছে, মহান আল্লাহ এই আয়াতে স্পষ্ট করে বলেছেন যে এই পুরস্কার তাদের জন্য যারা তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে সৎকর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমান একটি গাছের মতো যাকে বেড়ে ওঠা এবং বেঁচে থাকার জন্য আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। যেভাবে একটি উদ্ভিদ সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, সে মারা যাবে, ঠিক তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও মারা যাবে যে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

অধ্যায় ৩ - আলী ইমরান, আয়াত ১৩৭-১৪৮

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

إِنْ يَمَسُّكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِّثْلُهُ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ نَظُرُونَ ﴿١٤٣﴾

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ
وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنِ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ

مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

وَكَايِن مِّن نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا

أَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾

فَعَانَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسُنَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

“তোমাদের পূর্বেও অনুরূপ পরিস্থিতি অতীত হয়েছে, সুতরাং পৃথিবীতে ভ্রমণ করো
এবং দেখো মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।

এই [কুরআন] সকল মানুষের জন্য স্পষ্ট বক্তব্য এবং আল্লাহভীরুদের জন্য
পথনির্দেশনা ও উপদেশ।

অতএব তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, যদি তোমরা [সত্যিকারের]
মুমিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।

যদি তোমাদের কোন আঘাত লাগে, তবে [বিরোধী] সম্প্রদায়ও ইতিমধ্যেই অনুরূপ
আঘাত পেয়েছে। আর এই দিনগুলো [বিভিন্ন অবস্থার] আমরা মানুষের মধ্যে
পালাক্রমে আবর্তন করি যাতে আল্লাহ ঈমানদারদের প্রকাশ করেন এবং
তোমাদের মধ্যে থেকে কিছুকে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করেন - আর আল্লাহ
জালেমদের পছন্দ করেন না।

আর যাতে আল্লাহ [পরীক্ষার মাধ্যমে] মুমিনদের পবিত্র করেন এবং কাফেরদের ধ্বংস করেন।

নাকি তোমরা মনে করো যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনও তোমাদের মধ্যে কারা তাঁর পথে লড়াই করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল তা প্রকাশ করেননি?

আর তোমরা মৃত্যু [শাহাদাত] আসার আগেই তা কামনা করতে, আর তোমরা [এখন] তা [তোমার সামনে] দেখতে পেয়েছ, অথচ তোমরা তা দেখছিলে।

মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? আর যে পশ্চাদপসরণ করবে সে কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না; তবে আল্লাহ কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।

আর আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কারো মৃত্যু সম্ভব নয়, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। যে কেউ দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে, আমরা তাকে তা দিব; আর যে কেউ আখেরাতের প্রতিদান কামনা করে, আমরা তাকে তা দিব। আর কৃতজ্ঞদেরকে আমরা অবশ্যই পুরস্কৃত করব।

আর কত নবী [যুদ্ধে] অংশ নিয়েছেন এবং তাঁর সাথে অনেক আলেমের সাথে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু আল্লাহর পথে তাদের উপর যা এসেছিল তার কারণে তারা কখনও আত্মবিশ্বাস হারাননি, দুর্বল হননি বা আত্মসমর্পণ করেননি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।

আর তাদের কথা ছিল কেবল এই যে, তারা বলছিল, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের পাপ এবং আমাদের কাজে অতিরিক্ত কাজ ক্ষমা করুন এবং আমাদের পাপ দূর করুন এবং কাফের সম্প্রদায়ের উপর আমাদের বিজয়ী করুন।"

অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার প্রতিদান এবং আখেরাতের উত্তম প্রতিদান দান করলেন। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

মানুষ তাদের জীবনে যেসব বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, যেমন স্বাচ্ছন্দ্য এবং অসুবিধা, তা নতুন কিছু নয় এবং যুগের সূচনা থেকেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষ তা অনুভব করে আসছে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৭:

"[তোমার মতো] একই রকম পরিস্থিতি তোমার আগেও ঘটেছে..."

অতএব, কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সম্মুখীন ব্যক্তি কখনই এমনটা ভাববেন না যে তিনি অস্বাভাবিক এবং অন্যায় কিছুর সম্মুখীন হচ্ছেন কারণ অনেক মানুষ তাদের আগে একই বা অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এই সত্যটি মনে রাখলে তা কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণ করতে উৎসাহিত করবে। ধৈর্যের অর্থ হলো নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, এই বিশ্বাস রাখা যে তিনি কেবল তার জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৩৭:

"[তোমার মতো] একই রকম পরিস্থিতি তোমার আগেও ঘটেছে..."

এটি আরও ইঙ্গিত করে যে, এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষা সর্বদাই সময়ের সাথে একই রকম ছিল। এই পরীক্ষায় বোঝা যায় যে, কেউ যদি তাকে দেওয়া আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তাহলে সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারবে কিনা। ৬৭ সূরা আল-মুলক, আয়াত ২:

" যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম..."

এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ করে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে তাদের জীবনের মধ্যে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে মানসিক শান্তি অর্জন করবে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, এমনকি যদি তা তার আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের এমন একজন বিচক্ষণ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকে। এই বিচক্ষণ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার উপর কাজ করেন তিনিও ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন।
অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

এর কারণ হলো, একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সুখম করার জন্য এবং তার জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার। সমাজের দ্বারা আবিষ্ট মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ মানুষকে সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ তাকে তার জীবনের প্রতিটি জিনিস এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে না, কারণ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসের আকারে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্যটি তখন স্পষ্ট হয় যখন কেউ দেখে যে কে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ইসলামী শিক্ষা অনুসারে ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৭:

"... অতএব, পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো কেমন হয়েছে মিথ্যাবাদীদের পরিণাম।"

যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের প্রেসক্রাইব করা ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই অন্ধভাবে তাদের ডাক্তারের উপর বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষার উপর চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা অন্ধভাবে ইসলামের শিক্ষার উপর বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি...'"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৭:

"... অতএব, পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো কেমন হয়েছে মিথ্যাবাদীদের পরিণাম।"

এটি এমন আত্মমগ্ন মনোভাব এড়িয়ে চলার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে যেখানে কেউ কেবল নিজের জীবন এবং বিশেষ করে নিজের সমস্যা নিয়েই চিন্তা করে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে সাধারণ ইতিহাস, তার নিজস্ব ব্যক্তিগত ইতিহাস এবং তার চারপাশের মানুষের অবস্থার মধ্যে পাওয়া শিক্ষাগুলি কাজে লাগাতে ব্যর্থ হবে। এই বিষয়গুলি থেকে শিক্ষা নেওয়া হল সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়গুলির মধ্যে একটি যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার আচরণ উন্নত করতে পারে এবং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এড়াতে পারে যাতে সে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে দেখে এবং ফলস্বরূপ তারা কীভাবে চাপ, মানসিক ব্যাধি, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতায় জর্জরিত হতে দেখে, যদিও তারা এই পৃথিবীর বিলাসিতা উপভোগ করে, সে পর্যবেক্ষককে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করতে শেখাবে এবং তারা নিশ্চিত হবে যে মনের শান্তি অনেক পার্থিব জিনিসপত্র রাখার মধ্যে নিহিত নয়। অথবা যখন কেউ একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখে, তখন তাদের নিজের সুস্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এবং তা হারানোর আগে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা উচিত। অতএব, ইসলাম মুসলমানদেরকে তাদের নিজস্ব বিষয়ে এতটাই মগ্ন থাকার পরিবর্তে পর্যবেক্ষক মানুষ হতে উৎসাহিত করে যে তারা অন্য কোনও কিছু প্রতি মনোযোগ দেয় না। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৩৭:

"... অতএব, পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো কেমন হয়েছে মিথ্যাবাদীদের পরিণাম।"

যে ব্যক্তি ইতিহাস এবং তার চারপাশের মানুষদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, সে বুঝতে পারবে যে, উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের একমাত্র উপায় হল ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৮:

"এই [কুরআন] সকল মানুষের জন্য স্পষ্ট বক্তব্য এবং আল্লাহভীরুদের জন্য পথনির্দেশনা ও উপদেশ।"

অন্যান্য অনেক ধর্ম এবং জীবনধারার বিপরীতে, ইসলাম ব্যতিক্রম ছাড়া সকল মানুষের জন্য একটি ধর্ম এবং জীবনধারা। এটি ইসলামের মধ্যে সমতার গুরুত্ব নির্দেশ করে। ইসলাম মানুষের মর্যাদা বিচার করে একটি একক মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে: তারা কতটা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মেনে চলে। এর মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

মানুষের মর্যাদা বিচারের অন্যান্য সকল মানদণ্ডের কোন মূল্য নেই, যেমন লিঙ্গ, জাতিগততা এবং সামাজিক শ্রেণী, এবং মুসলমানদের অবশ্যই এগুলি উপেক্ষা করতে হবে, অন্যথায় এটি মুসলিম জাতির মধ্যে বর্ণবাদ এবং অনৈক্যের জন্ম দেয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যেহেতু একজনের উদ্দেশ্য অন্যদের থেকে গোপন থাকে, তাই তারা বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে অন্যদেরকে অন্যদের চেয়ে ভালো বলে বিচার করতে পারে না এবং তাই অন্যদের বা নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে দাবি করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ একমাত্র আল্লাহই সকল মানুষের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মকাণ্ড জানেন। আন নাজম, আয়াত ৩২:

"... তাই তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করো না; তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁকে ভয় করো।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৩৮:

"এই[কুরআন] [সকল] মানুষের জন্য একটি স্পষ্ট বক্তব্য..."

উপরন্তু, পবিত্র কুরআন মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে, তার শিক্ষা সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য, তাদের অবস্থান, লিঙ্গ, বয়স, সামাজিক পটভূমি বা তারা যে সময়ে বাস করে তা নির্বিশেষে। মানুষের প্রকৃতি এবং সারাংশ পরিবর্তিত হলেই কেবল পবিত্র কুরআন তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু যেহেতু এটি সম্ভব নয়,

মানুষের প্রকৃতি চিরন্তন, তাই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং সম্প্রসারণে, মহানবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যও চিরন্তন। উদাহরণস্বরূপ, রাগ, লোভ, ঘৃণা, ভালোবাসা এবং হিংসার অনুভূতি চিরন্তন, যেমনটি মানুষ আদিকাল থেকে অনুভব করে আসছে এবং যুগের শেষ অবধি মানুষ অনুভব করে থাকবে। মানুষের চিরন্তন প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করার এই ক্ষমতা নিজেই পবিত্র কুরআনের একটি অলৌকিক ঘটনা যা অন্য কোনও ধর্ম বা জীবনধারার সাথে মেলে না।

কিন্তু ঠিক যেমন একটি রোডম্যাপ একজন ব্যক্তিকে কেবল তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নিয়ে যাবে, তেমনি পবিত্র কুরআন কেবল তাদেরই পথ দেখাতে পারে যারা বাস্তবে এটি অনুসরণ করে। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৩৮:

"...এবং একটি নির্দেশনা এবং নির্দেশনা..."

অতএব, যে ভাষায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা যায় না, তা সঠিক নির্দেশনার দিকে পরিচালিত করবে না। সঠিক নির্দেশনা পেতে হলে এর শিক্ষাগুলো বোঝার এবং বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে করে মানুষ প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। কিন্তু ১৩৮ নং আয়াতে যেমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, কেবলমাত্র তারাই ইসলামের শিক্ষা বাস্তবে বাস্তবায়ন করবে যারা মহান আল্লাহকে এবং তাঁর অবাধ্যতার পরিণতিকে ভয় করে। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, ১৩৮ নং আয়াত:

"...এবং আল্লাহ সম্পর্কে সচেতনদের জন্য পথনির্দেশনা ও উপদেশ।"

ইসলামী শিক্ষার মধ্যে পাওয়া স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণ অধ্যয়নের মাধ্যমে, যারা তাঁর আনুগত্য করে এবং যারা তা করে না, তাদের পরিণতি নিয়ে আলোচনা করে, আল্লাহর প্রতি ভয় এবং তাদের কর্মের পরিণতির ভয় গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়াও, এই অধ্যয়ন আল্লাহর একত্ব, মহাবিশ্বের উপর তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং বিচারের দিনে ব্যক্তির জবাবদিহিতার অনিবার্যতার প্রতি বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে। এবং, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এটি তখনও অর্জন করা হয় যখন কেউ অন্যদের জীবন পছন্দগুলি পর্যবেক্ষণ করে এবং এটি তাদের এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে কিনা। যখন কেউ অন্যদের তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে দেখে, তখন তারা স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যে এটি কীভাবে তাদের ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে এবং কীভাবে এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় নিয়ে যায়। ফলস্বরূপ, এই লোকেরা মানসিক ব্যাধি, যেমন হতাশা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতা অনুভব করে, এমনকি যদি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। অন্যদিকে, যখন কেউ তাদের লক্ষ্য করে যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তখন তারা দেখতে পাবে যে এটি কীভাবে তাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্য বজায় রাখে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেয় এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করে। কিন্তু যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ সম্পর্কে তাদের চেতনাকে শক্তিশালী করতে এবং তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করতে ব্যর্থ হয়, সে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন করবে না এবং পরিবর্তে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে, এমনকি তারা মৌখিকভাবে মহান আল্লাহতে বিশ্বাস করার দাবি করলেও। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক শান্তি পাবে না এবং তারা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে না। অধ্যায় 3 আলী ইমরান, আয়াত 139:

"সুতরাং তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, যদি তোমরা[সত্যিকারের] বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।"

উভয় জগতে শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাফল্য অর্জনের শর্ত হল প্রকৃত বিশ্বাস গ্রহণ করা। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত, এবং তাই এটি মৌখিকভাবে ইসলামে বিশ্বাস দাবি করার চেয়ে অনেক বেশি। যদি আজ মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব না থাকে, তবে এর অর্থ হল তারা প্রকৃত বিশ্বাসী নয়। অতএব, প্রতিটি মুসলমানকে মূল্যায়ন করতে হবে যে তারা কর্মের মাধ্যমে ইসলামে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করেছে কিনা, এবং প্রয়োজনে তাদের আচরণ সংশোধন করতে হবে যদি তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে।

উহুদের যুদ্ধে তাদের স্পষ্ট পরাজয়ের পর, মহান আল্লাহ, তারপর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, সান্ত্বনা ও আশ্বস্ত করেন। সূরা ৩, আলে ইমরান, আয়াত ১৩৯-১৪০:

"সুতরাং তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, যদি তোমরা[সত্যিকারের] মুমিন হও, তাহলে তোমরাই শ্রেষ্ঠ হবে। যদি তোমাদের কোন আঘাত স্পর্শ করে, তবে [বিরোধী] সম্প্রদায় ইতিমধ্যেই অনুরূপ আঘাত স্পর্শ করেছে..."

যখন উহদের যুদ্ধ শুরু হয়, তখন সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, দ্রুত অমুসলিম সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন যার ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হন। কিন্তু মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, উহদ পাহাড়ের সামনে অবস্থিত জাবাল আল রুমাহ নামক একটি ছোট পাহাড়ে অবস্থান করার নির্দেশ দেন, তারা বিশ্বাস করেন যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং আদেশ আর প্রযোজ্য নয়। যখন তারা যুদ্ধের গণীমত সংগ্রহের জন্য জাবাল আল রুমাহতে নেমে আসেন, তখন মুসলিম সেনাবাহিনীর পশ্চাদভাগ উন্মোচিত হয়ে যায়। অমুসলিম সেনাবাহিনী তখন একত্রিত হয় এবং উভয় পক্ষ থেকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে। এর ফলে অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, শহীদ হন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯-৩০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য মূল আয়াত এবং উহদের যুদ্ধের ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায় যে, মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপনের জন্য সর্বদা তাঁর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা আবশ্যিক। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করা অন্তর্ভুক্ত। এর থেকে যেকোনো বিচ্যুতি মানসিক শান্তি এবং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে বাধা সৃষ্টি করবে।

উহদের যুদ্ধে সাহাবীদের পরাজয়ের পর, আল্লাহ তাআলা তাদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে যে, বদরের যুদ্ধে যখন তারা তাঁর আনুগত্যের উপর অটল ছিল, তখন তিনি কীভাবে তাদের বিজয় দান করেছিলেন। এটি নির্দেশ করে যে, একজন ব্যক্তির উপর আল্লাহর অগণিত আশীর্বাদ সর্বদা স্মরণ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে কঠিন সময়ে। এটি ধৈর্যশীল থাকার একটি চমৎকার উপায়, কারণ এটি একজনকে তাদের পরিস্থিতি ইতিবাচকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে উৎসাহিত করে। অর্থাৎ, একজনের উচিত তাদের হারিয়ে যাওয়া পার্থিব আশীর্বাদের উপর মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে তাদের কাছে থাকা অসংখ্য পার্থিব আশীর্বাদগুলি পর্যবেক্ষণ করা। এটি তাদের ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা গ্রহণে উৎসাহিত করবে। নিয়তে

কৃতজ্ঞতা বলতে কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা বোঝায়। কারও কথার কৃতজ্ঞতা বলতে ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা বোঝায়। এবং কারও কাজের কৃতজ্ঞতা বলতে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। অধিকন্তু, ধৈর্যের অর্থ হলো নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, এই বিশ্বাসে যে তিনি কেবল তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক পথে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থন এবং করুণা লাভ করবে, যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদীসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এরপর মহান আল্লাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা বর্ণনা করেন যা এই পৃথিবীর জীবনের পরীক্ষার একটি অংশ। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪০:

" আর এই দিনগুলো [বিভিন্ন অবস্থার] আমি মানুষের মধ্যে পালান্ধ্রমে আবর্তন করি যাতে আল্লাহ ঈমানদারদের প্রকাশ করেন..."

এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষার একটি দিক হল, মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য এবং কঠিন উভয় সময়েই তার মৌখিক ঈমানের ঘোষণা বাস্তবায়িত করে কিনা। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে, একজনকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এবং কঠিন সময়ে, তাকে ধৈর্য ধরতে হবে। যারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসের প্রমাণ দেয়। অন্যদিকে, যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করে, যখনই তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করা হয়, তারা প্রমাণ করে যে তারা কেবল নিজেদেরই উপাসনা করে, যদিও তারা অন্যথা দাবি করে। অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

এবং ২২তম অধ্যায় আল হজ্জ, আয়াত ১১:

"আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে আল্লাহর ইবাদত করে এক প্রান্তে। যদি তাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তবে সে তাতে আশ্বস্ত হয়; আর যদি কোন পরীক্ষা তাকে স্পর্শ করে, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই হারিয়ে ফেলেছে। এটাই স্পষ্ট ক্ষতি।"

যখনই এই ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্যের সময় ভোগ করে, তখন ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে, তারা সেগুলোর অপব্যবহার করে। আর যখনই তারা কঠিন সময়ের সম্মুখীন হয়, তখন ধৈর্য ধারণ করার পরিবর্তে, তারা মৌখিক ও শারীরিকভাবে আল্লাহ সম্পর্কে অভিযোগ করে এবং তাঁর আনুগত্য করতে অস্বীকার করে। এই মুনাফিক আল্লাহ, মহান, তাদের মুখোমুখি হওয়া পরিস্থিতির বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। অতএব, এই আচরণ এড়িয়ে চলতে হবে এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়, তাদের অবশ্যই ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। এবং কঠিন সময়ে, তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে ধৈর্য ধরতে হবে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য অব্যাহত রাখতে হবে, জেনে রাখতে হবে যে তিনি কেবল তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

যুদ্ধের ক্ষেত্রে, আল্লাহ তাআলা কিছু লোককে শাহাদাতের সম্মানে সম্মানিত করার জন্য মনোনীত করেন যাতে তারা অন্যদের জন্য তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য আদর্শ হয়ে ওঠে, যার মধ্যে রয়েছে নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা। এবং একই সাথে তিনি সেইসব অন্যায়কারীদেরও উন্মোচন করেন যারা মহান আল্লাহর আনুগত্যকারীদের হত্যা

করে, যার ফলে উভয় জগতে তাদের শাস্তি নিশ্চিত হয়। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৪০:

"... আমরা মানুষের মধ্যে পালান্ধ্রমে আবর্তন করি যাতে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে প্রকাশ করেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করেন - আর আল্লাহ জালেমদের পছন্দ করেন না।"

এছাড়াও, এই আয়াতে উল্লেখিত অন্যায়কারীদের মধ্যে এমনও রয়েছে যারা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করলেও ইসলামে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়।

জালেমরা হয়তো উহদের যুদ্ধ থেকে পিছু হটে যাওয়া মুনাফিকদের কথাও বলতে পারে। যখন মহানবী (সাঃ) উহদের যুদ্ধে শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য মদীনা ত্যাগ করেন, তখন প্রথমে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার লোকদের সাথে যুদ্ধে অংশ নিতে সম্মত হন। তারা উহদের কাছাকাছি পৌঁছানোর সাথে সাথে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার ৩০০ সৈন্য নিয়ে পিছু হটে যান এবং মুসলিম সেনাবাহিনীতে ৩০০০ অমুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে ৭০০ সৈন্য অবশিষ্ট থাকে। তিনি এই সত্যটিকে ব্যবহার করেছিলেন যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনার অভ্যন্তরে যুদ্ধ করার পরামর্শ অনুসরণ করেননি, তার বন্ধুদের সাথে পিছু হটার জন্য। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে, যার সর্বদা মহানবী (সাঃ) এর আনুগত্য করতে হয়, তার জন্য এটি একটি খারাপ অজুহাত। তাছাড়া, যদি তিনি পরিকল্পনার বিরোধিতা করতেন, তাহলে তিনি মদিনাতেই থাকতে পারতেন কিন্তু পরিবর্তে তিনি উহদ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সাথে থাকা বেছে নিয়েছিলেন এবং শত্রুরা তাদের লক্ষ্য করতে পারতেন, তবুও তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে ত্যাগ করেছিলেন যাতে মুসলিমদের

সংকল্প দুর্বল হয় এবং অমুসলিম সেনাবাহিনীর সংকল্প শক্তিশালী হয়। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬-১৭ এবং ইমাম সাফি উর রহমানের, দ্য সিলড নেকটার, পৃষ্ঠা ২৫০-২৫১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ভণ্ডামির একটি দিক হলো যখন কেউ মৌখিকভাবে অন্যদের এবং তাদের ভালো প্রকল্পের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে, যেমন মসজিদ নির্মাণ, কিন্তু যখন সম্পদ দান করার মতো প্রকল্পে অংশ নেওয়ার সময় আসে, তখন মনে হয় যেন তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। একইভাবে, যখন মানুষ সুখের সময় পার করে, তখন তারা মৌখিকভাবে তাদের প্রতি তাদের আনুগত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু যখন মানুষ সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন এই ভণ্ডামিরা কোনও মানসিক বা শারীরিক সমর্থন দেয় না। বরং তারা তাদের সমালোচনা করে। মহানবী (সা.)-এর সময়ে মুনাফিকদের মনোভাব ছিল এটাই। সূরা ৪ আন-নিসা, আয়াত ৬২:

"তাহলে কেমন হবে যখন তাদের উপর তাদের কৃতকর্মের কারণে কোন বিপদ আসে এবং তারা তোমার কাছে আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, "আমরা কেবল সদাচরণ এবং আশ্রয়দানের ইচ্ছা করেছিলাম।"

অতএব, মুসলমানদের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে সমর্থন করে আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের অধিকার পূরণ করে। যে ব্যক্তি এটি করতে ব্যর্থ হবে সে দেখতে পাবে যে তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণা আল্লাহর দৃষ্টিতে খুবই কম। কারণ ঈমান হলো এমন একটি উদ্ভিদের মতো যাকে বৃদ্ধি পেতে হলে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা সূর্যালোকের মতো পুষ্টি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, তা বৃদ্ধি পেতে ব্যর্থ হয় এবং এমনকি মারাও যেতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি আনুগত্যের কাজ দিয়ে

পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে না এবং মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। অধ্যায় ৬১ আস সাফ, আয়াত ২-৩:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য বিষয় হলো, তোমরা যা বলো না, তা বলো।"

মহান আল্লাহ, মুসলমানদেরকে কষ্টের মধ্য দিয়েও আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র করেন।
৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪১:

"এবং যাতে আল্লাহ [পরীক্ষার মাধ্যমে] মুমিনদের পবিত্র করেন..."

এই আধ্যাত্মিক পবিত্রতার মধ্যে রয়েছে তাদের ছোটখাটো পাপ মুছে ফেলা, যা তারা সম্মুখীন হয়, সেই কষ্টের মধ্য দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ইমাম বুখারীর "আদাবুল মুফরাদ", ৪৯২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম কোন ধরনের শারীরিক অসুবিধার সম্মুখীন হয় না, তা সে যত বড়ই হোক না কেন, যেমন কাঁটা বিঁধলে, অথবা মানসিক চাপের মতো কোন মানসিক অসুবিধা, তবে আল্লাহ তাআলা তার পাপ মুছে ফেলেন। কিন্তু এই প্রতিদান পেতে হলে, কঠিন অবস্থার শুরু থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সুনানে আন নাসায়ী, ১৮৭০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে ভাগ্যকে মেনে নেওয়া ধৈর্য নয়, বরং এটি কেবল গ্রহণযোগ্যতা, যা সবচেয়ে অধৈর্য ব্যক্তিও অনুভব করে। কঠিন পরিস্থিতির শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মহান আল্লাহর

আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকাই হল ধৈর্য, যা কেউ যদি উভয় জগতেই সওয়াব অর্জন করতে চায়। সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, ছোট ছোট পাপ মুছে ফেলার মতো কষ্টের মুখোমুখি হওয়া, কিয়ামতের দিন ছোট ছোট পাপের জবাবদিহির মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে অনেক ভালো। যদি কেউ তাদের কষ্টের সাথে আন্তরিক অনুতাপ যোগ করে, তাহলে তারা তাদের ছোট ছোট এবং বড় পাপ মুছে ফেলবে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহ এবং যার উপর অন্যায় করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার পূরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪১:

"এবং যাতে আল্লাহ [পরীক্ষার মাধ্যমে] মুমিনদের পবিত্র করেন এবং কাফেরদের ধ্বংস করেন।"

কিন্তু এই আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে ব্যক্তি কষ্টের মুখোমুখি হওয়ার পেছনের এই জ্ঞানকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হবে, সে এমন ব্যক্তির মতো আচরণ করবে যে কষ্টের মুখোমুখি হওয়ার জন্য পুরস্কারে বিশ্বাস করে না এবং ফলস্বরূপ তারা মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতার মাধ্যমে অধৈর্যতা প্রদর্শন করবে। তাদের অধৈর্যতা তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে এবং ফলস্বরূপ, এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বাধা দেবে, এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে বাধা দেবে। অতএব, তাদের অধৈর্যতা তাদেরকে উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলার দিকে নিয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ মুসলিমদের স্বরণ করিয়ে দেন যে জান্নাত অর্জনের জন্য প্রকৃত আনুগত্য এবং সংগ্রাম প্রয়োজন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪২:

"অথবা তোমরা কি মনে করো যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনও তোমাদের মধ্যে কারা তাঁর পথে লড়াই করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল তা প্রকাশ করেননি?"

ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে পারে না, যেমন একজন ডাক্তার হওয়া, তেমনি প্রকৃত সংগ্রাম ও ত্যাগ ছাড়া কেউ এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি বা পরকালে জান্নাত লাভ করতে পারে না। এই সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্যে রয়েছে নিজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে মহান আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকে। অতএব, একজন ব্যক্তি তার প্রচেষ্টা অনুসারে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করবে। যদি তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য ন্যূনতম প্রচেষ্টা করে, তবে তাদের বিনিময়ে খুব বেশি আশা করা উচিত নয়। সূরা ৪৭ মুহাম্মদ, আয়াত ৭:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করবেন।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৪০-১৪২:

"যদি তোমাদের কোন আঘাত লাগে, তবে [বিরোধী] লোকদেরও ইতিমধ্যেই অনুরূপ আঘাত লেগেছে। আর এই দিনগুলো [বিভিন্ন অবস্থার] আমরা মানুষের মধ্যে পালানক্রমে পরিবর্তন করি যাতে আল্লাহ ঈমানদারদের প্রকাশ করেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে শহীদদেরকে নিজের কাছে গ্রহণ করেন- আর আল্লাহ জালেমদের পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ ঈমানদারদের [পরীক্ষার মাধ্যমে] পবিত্র করেন এবং কাফেরদের ধ্বংস করেন। নাকি তোমরা মনে করো যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনও তোমাদের মধ্যে কারা তাঁর পথে লড়াই করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল তা প্রকাশ করেননি?"

উহুদের যুদ্ধের সময়, যখন কিছু মুসলিম তীরন্দাজ তাদের অবস্থান থেকে নেমে আসে, যদিও তাদের আদেশ ছিল না, তখন মুসলিম সেনাবাহিনীর পিছনের অংশটি উন্মুক্ত হয়ে যায়। অমুসলিম সেনাবাহিনী তখন একত্রিত হয় এবং উভয় দিক থেকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে। এর ফলে অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, শহীদ হন এবং অমুসলিমরা তাদের দেহ বিকৃত করে। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯-৩০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটা স্পষ্ট যে, মুসলিমদের এত ক্ষতির মূল কারণ ছিল তীরন্দাজদের ভুল বিচারবুদ্ধি। তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে মহানবী (সা.)-এর অবাধ্য হয়েছিল, কারণ তারা বিশ্বাস করত যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং তাঁর আদেশ আর প্রযোজ্য হবে না। এই ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিম আন্তরিকভাবে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সাফল্য পাবে, কিন্তু যদি তারা তাঁর অবাধ্য হয়, তাহলে এই সমর্থন প্রত্যাহার করা হবে। ৪র্থ সূরা আন-নিসা, আয়াত ৮০:

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করল..."

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, ৩১ আয়াত:

“বলুন, [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], “যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।”

এবং ২৪ নূর অধ্যায়, ৬৩ নং আয়াত:

"তোমরা নিজেদের মধ্যে রাসূলের আহ্বানকে একে অপরের প্রতি আহ্বানের মতো মনে করো না। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে যায় তাদের অবশ্যই জানেন। অতএব, যারা তাঁর [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আদেশের বিরোধিতা করে তাদের সতর্ক থাকা উচিত, পাছে তাদের উপর কোন বিপদ আসে অথবা তাদের উপর কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসে।"

অধিকন্তু, নবীগণ, তাদের শত্রুদের উপর কখনও কখনও বিজয়ী হন এবং কখনও কখনও তাদের শত্রুরা বিজয়ী হন, যদিও চূড়ান্ত বিজয় সর্বদা নবীগণ, তাদের উপর

শান্তি বর্ষিত হোক। এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির কারণ হল প্রকৃত বিশ্বাসীদের মুনাফিক এবং সুবিধাবাদীদের থেকে পৃথক করা, যারা সর্বদা পার্থিব সুবিধা অর্জনের জন্য সফল দলে যোগ দেয়। যদি নবীগণ, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, সর্বদা জয়ী হন, তাহলে মুনাফিক এবং সুবিধাবাদীরা আন্তরিক বিশ্বাসীদের থেকে অনির্বাণ হয়ে যাবে। যদি নবীগণ, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, সর্বদা হেরে যান, তাহলে এটি তাদের মিশনকে বাধাগ্রস্ত করবে।

জয়-পরাজয়ের এই পরিবর্তনের আরেকটি কারণ হলো, বিশ্বাসীদের ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা উভয়ই গ্রহণ করতে শেখানো। যদি তারা সব সময় হেরে যায়, তাহলে তারা হয়তো ধৈর্যশীল হতে পারে কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কঠিন হবে। যদি তারা সব সময় জিতে যায়, তাহলে তারা হয়তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে কিন্তু প্রকৃত ধৈর্য ধারণ করতে তাদের কষ্ট করতে হবে। পরিস্থিতির পরিবর্তন তাদের ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা উভয়ই গ্রহণ করার সুযোগ করে দেয়: দুটি অংশ যা উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যিক। নিয়তে কৃতজ্ঞতা বলতে কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা জড়িত। একজনের কথার মধ্যে কৃতজ্ঞতা বলতে ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা জড়িত। এবং একজনের কাজে কৃতজ্ঞতা বলতে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা জড়িত। এছাড়াও, ধৈর্য বলতে নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, বিশ্বাস করা যে তিনি কেবল তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৪৩:

"আর তোমরা মৃত্যু[অর্থাৎ শাহাদাত] আসার আগেই তা কামনা করতে, আর তোমরা [এখন] তা[তোমার সামনে] দেখতে পেয়েছো, অথচ তোমরা তা দেখছিলো।"

যখন অমুসলিম সেনাবাহিনী উহুদের কাছাকাছি পৌঁছে, তখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একটি স্বপ্ন দেখেন যেখানে বলা হয়েছিল যে মুসলিম সেনাবাহিনীকে মদীনায় অবস্থান করতে হবে এবং শহরের ভেতরে শত্রুদের মোকাবেলা করতে হবে। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই এই পরিকল্পনার সাথে একমত হন কারণ তিনি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হতে চাননি। কিন্তু তরুণ সাহাবীরা, যারা বদরের যুদ্ধে দেখেননি, তারা তাকে এগিয়ে যাওয়ার এবং উহুদে অমুসলিম সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন, যা তিনি অবশেষে মেনে নেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর যুদ্ধের বর্ম পরিধান করার পর, তরুণ সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাদের ভুল বুঝতে পেরে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে মদীনার ভেতরে অমুসলিম সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাঁর প্রাথমিক পরামর্শে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তর দেন যে, মহান আল্লাহর শত্রুদের মোকাবেলা না করে একজন নবীর জন্য তাঁর যুদ্ধের বর্ম খুলে ফেলা ঠিক নয়। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মূল আয়াতটি ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে অগণিত প্রতিদান লাভের জন্য কষ্ট কামনা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে, কারণ কষ্টের সম্মুখীন হলে কেউ হয়তো অবিচল থাকতে পারে না। পরিবর্তে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপদেশ অনুসরণ করা উচিত, সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা কামনা করে এবং প্রার্থনা করে, কিন্তু যদি তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তাহলে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। সহিহ বুখারী, ২৯৬৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উহদের যুদ্ধের আগে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেননি, যদিও তাঁর স্বপ্নে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে মদিনাতে থাকাই উত্তম, কারণ তিনি শেষ সময় পর্যন্ত সকল নেতার জন্য একটি ভালো উদাহরণ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। একজন ভালো নেতা শত্রু সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়ার মতো বৈধ কারণ ছাড়া তাদের আদেশ পরিবর্তন করে অনিশ্চিত আচরণ করেন না। এই ধরনের আচরণের ফলে সৈন্যরা কেবল তাদের নেতার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে, যা যুদ্ধের সময় অত্যন্ত বিপজ্জনক। অতএব, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উহদের দিকে যাত্রা করার নির্দেশে অটল ছিলেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, জীবনে এমন একটি দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করা উচিত যার মাধ্যমে তারা তাদের বৈধ পার্থিব ও ধর্মীয় সিদ্ধান্তে অটল থাকে এবং কেবল প্রমাণ ও জ্ঞানের কারণেই পথ পরিবর্তন করে। যে ব্যক্তি অনিশ্চিত মনোভাব গ্রহণ করে সে কখনই তাদের গৃহীত কোনও সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে না, যার ফলে তাদের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং নিবেদিতপ্রাণ থাকার মাধ্যমে তারা যে সুবিধাগুলি অর্জন করতে পারত তার কিছু অংশ হারাবে। উপরন্তু, এই ব্যক্তি ক্রমাগত পিছনের দিকে তাকাবে, যদিও তারা ইতিহাস পরিবর্তন করতে পারবে না, যা তাদের সামনের দিকে তাকাতে এবং তাদের সুযোগ এবং বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উপকৃত হতে বাধা দেবে।

নিম্নলিখিত আয়াতটি ইসলামী ইতিহাসের দুটি বিখ্যাত ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। ৩য় সূরা আলে ইমরান, ১৪৪ নং আয়াত:

" মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বেও [অন্যান্য] রাসূল গত হয়েছেন। যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা তোমাদের পায়ের পাতায় ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি তার পায়ের পাতায় ফিরে যাবে সে কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না; তবে আল্লাহ কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।"

উহুদের যুদ্ধের সময় যখন কিছু মুসলিম তীরন্দাজ তাদের অবস্থান ত্যাগ করে, তখন অমুসলিম সেনাবাহিনী একত্রিত হয়ে উভয় পক্ষ থেকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে। মহানবী (সাঃ) শহীদ হয়েছেন বলে দাবি করা কণ্ঠস্বর শোনা গেলে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা আরও বেড়ে যায়। এর ফলে কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, আশা হারিয়ে ফেলেন কারণ তাদের শক্তি এবং অনুপ্রেরণা শহীদ হয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু একজন সাহাবী, আনাস বিন নাদর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, ঘোষণা করেন যে, মহানবী (সাঃ) শহীদ হলেও, আল্লাহ চিরঞ্জীব এবং তিনি মৃত্যুবরণ করতে পারবেন না। তাই তাদের উচিত মহানবী (সাঃ) যে বিষয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তার জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া। আনাস বিন নাদর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, শহীদ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যান। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯-৩১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একইভাবে, আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) বিশ্বাস করতেন যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া বেঁচে থাকার কোন কারণ নেই, তাই তিনি তার তরবারির খাপ ভেঙে ফেলেন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে না দেখা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। তারা পিছু হটতে না পারা পর্যন্ত তিনি তাকে রক্ষা করতে থাকেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রাঃ)

এর লেখা , আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৩-১৬৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শারীরিকভাবে আজ মুসলমানদের মধ্যে নেই, তবুও তাদের ইসলামের প্রকৃত দূত হয়ে তাঁর আদর্শের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এটি অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য শেখা এবং তার উপর আমল করা, যাতে কেউ প্রকৃত ইসলামী চরিত্রকে বহির্বিশ্বের কাছে গ্রহণ করতে পারে এবং তা প্রদর্শন করতে পারে। এটি অন্যান্য মুসলিম এবং অমুসলিমদের ইসলাম সম্পর্কে জানতে উৎসাহিত করবে যখন তারা মুসলমানদের ভালো আচরণ এবং তাদের প্রদত্ত মানসিক প্রশান্তি পর্যবেক্ষণ করবে। কিন্তু যদি কেউ ইসলামী শিক্ষা শিখতে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা হিংসা, অহংকার এবং লোভের মতো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে। তাদের খারাপ চরিত্র অন্যান্য মুসলিম এবং অমুসলিমদের ইসলাম থেকে নিরুৎসাহিত করবে। যেহেতু ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য, তাই উভয় জগতেই সকলকে জবাবদিহি করতে হবে। পরিশেষে, ইসলামের দূত হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করলে পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে একতাবদ্ধ হওয়া নিশ্চিত হবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকে, তার উপর প্রদত্ত অনুগ্রহের অপব্যবহার করে, সে মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে একত্রিত হবে না, কারণ তারা এই পৃথিবীতে কার্যত তাঁর অনুসরণ করেনি। এটা বোঝা সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে, যদি কেউ অন্যের থেকে ভিন্ন পথ গ্রহণ করে, তবে তারা তাদের যাত্রার শেষে একত্রিত হবে না। মনে রাখা উচিত যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলিও তাদের পবিত্র নবীদের, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, ভালোবাসা এবং সম্মান করার দাবি করে, কিন্তু তারা পরকালে তাদের সাথে একত্রিত হবে না কারণ তারা এই পৃথিবীতে কার্যত তাদের অনুসরণ করেনি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল, যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইন্তেকাল করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইন্তেকালের পর মদীনার লোকেরা প্রচণ্ড উদ্বেগ ও বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। তীব্র দুঃখের কারণে, প্রতিটি ব্যক্তি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ইন্তেকালের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) প্রথমে এটি বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জানান এবং দাবি করেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং ফিরে আসবেন, ঠিক যেমন হযরত মুসা (সাঃ) আল্লাহর সাথে একটি নিয়োগ করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ চল্লিশ দিনের জন্য তাঁর লোকদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন মসজিদে পৌঁছালেন, তখন তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মসজিদে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি সূরা আলে ইমরানের ৩ নং আয়াত ১৪৪ তেলাওয়াত করলেন:

" মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বেও [অন্যান্য] রাসূল গত হয়েছেন। যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা তোমাদের পায়ের পাতায় ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি তার পায়ের পাতায় ফিরে যাবে সে কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না; তবে আল্লাহ কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।"

তারপর বললেন: "মহান আল্লাহ, মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জীবিত করেছেন, তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক, এবং তাঁকে জীবিত রেখেছেন যতক্ষণ না তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেন, আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে স্পষ্ট করে তোলেন, তাঁর বার্তা পৌঁছে দেন এবং তাঁর পথে লড়াই করেন। এরপর আল্লাহ, মহান তাকে নিজের কাছে নিয়ে যান এবং তোমাদেরকে পথে রেখে যান। আর কেউ ধ্বংস হবে না, কেবল স্পষ্ট নিদর্শন এবং যন্ত্রণার পরে। যাদের পালনকর্তা আল্লাহ, মহান, তাদের

জানা উচিত যে, আল্লাহ, মহান জীবিত এবং কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। এবং যারা মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপাসনা করতেন, তাদের জানা উচিত যে, তিনি মারা গেছেন। আল্লাহ, মহান মানুষকে ভয় করো! তোমাদের ধর্মকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং তোমাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করো। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর বাণী পূর্ণ। আল্লাহ, মহান তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সমর্থন করে এবং তাঁর দ্বীনকে শ্রদ্ধা করে। আল্লাহর কিতাব আমাদের মধ্যে রয়েছে। এটি উভয়ই আলো এবং নিরাময়। এর মাধ্যমে, মহান আল্লাহ তাআলা মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে পথ প্রদর্শন করেছেন। এতে আল্লাহ তাআলা কোনটি হালাল এবং কোনটি হারাম তা বর্ণনা করা হয়েছে। সৃষ্টির মধ্যে কে আমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য অবতীর্ণ হয় তা আমাদের পরোয়া করে না। যারা আমাদের বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র লড়াই করব, ঠিক যেমন আমরা মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে লড়াই করেছি। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৪৮-৩৪৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বকর (রাঃ) যখন লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, তখন তারা সকলেই সত্য গ্রহণ করল। উমর (রাঃ) মাথা ঘোরা অনুভব করলেন এবং মাটিতে পড়ে গেলেন এবং অবশেষে মেনে নিলেন যে মহান নবী (সাঃ) আসলেই মারা গেছেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৪৮-৩৪৯ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রাঃ) এর "উমর ইবনে আল খাত্তাব, তাঁর জীবন ও সময়", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪১" - এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৪৪:

"... আর যে ব্যক্তি পশ্চাদপসরণ করে, সে কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না; কিন্তু আল্লাহ কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।"

আবু বকর (রাঃ) ১৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা করে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে মেনে চলার ঘোষণা ধারাবাহিক এবং কেবল তাদের নিজের মৃত্যুর মাধ্যমেই শেষ হয়। একজন মুসলিমকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে ইসলামে তাদের বিশ্বাসকে গ্রহণ এবং বাস্তবায়িত করে তারা কেবল নিজের উপরই অনুগ্রহ করছে। তারা মহান আল্লাহকে অনুগ্রহ করছে না, কারণ মানুষ তাঁকে গ্রহণ করুক বা প্রত্যাখ্যান করুক না কেন, তাঁর অসীম মর্যাদা পরিবর্তিত হয় না। একজন মুসলিম কেবল নিজেরই উপকার করে কারণ ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর কাজ করা তাদেরকে মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়। ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেয় এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করে। ১৪৪ নং আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, এভাবেই একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং এর মাধ্যমে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৪৪:

"... আর যে ব্যক্তি পশ্চাদপসরণ করে, সে কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না; কিন্তু আল্লাহ কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাস গ্রহণ বা বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয়, সে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য অর্জনে বাধা দেবে, এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় স্থাপন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে বাধা দেবে। এটি তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকে। ঠিক যেমন এই বিজ্ঞ রোগী ভাল মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার উপর কাজ করেন তিনিও ভাল হবেন। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ১৪৪:

"... আর যে ব্যক্তি পশ্চাদপসরণ করে, সে কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না; কিন্তু আল্লাহ কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, নিয়তে কৃতজ্ঞতা বলতে কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা বোঝায়। কথায় কৃতজ্ঞতা বলতে ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা বোঝায়। আর কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা বলতে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে খুশি করার জন্য যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে, তাকে সেই আশীর্বাদ ব্যবহার করা বোঝায়। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতার সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করে, সে উভয় জাহানে সওয়াব, আশীর্বাদ এবং মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব..."

এরপর আল্লাহ তাআলা সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, ইসলাম রক্ষার জন্য তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উৎসাহিত করেন। তাদেরকে মৃত্যুর অনিবার্যতা এবং কারও আচরণের দ্বারা এটি পরিবর্তন বা এড়ানো যায় না তা স্মরণ করিয়ে দেন। অতএব, মহান আল্লাহর আনুগত্য এড়ানোর কোনও অর্থ হয় না, কারণ এতে কারও জীবন বা এই পৃথিবীতে তাদের প্রাপ্ত রিযিক বৃদ্ধি পাবে না। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৫:

" আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু সম্ভব নয়, একটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেহেতু মৃত্যুর সময় অজানা এবং নির্দিষ্ট, তাই সময় শেষ হওয়ার আগেই তাকে যে সময় দেওয়া হয়েছে তা কাজে লাগাতে হবে। ৬৩ তম অধ্যায় আল মুনাফিকুন, আয়াত ১০-১১:

" আর আমি তোমাদের যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় করো, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই, তারপর সে বলবে, "হে আমার পালনকর্তা, যদি তুমি আমাকে কিছুক্ষণের জন্যও অবকাশ দিতে, তাহলে আমি দান করতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" কিন্তু যখন কোন ব্যক্তির সময় এসে যায়, তখন আল্লাহ তাকে বিলম্বিত করেন না। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা জানেন।"

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো সেই ব্যক্তি যে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এবং ফলস্বরূপ তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে না, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল স্থানে ফেলে দেয় এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হয়, এমনকি যদি তাদের কাছে পার্থিব বিলাসিতা থাকে। এই ফলাফল স্পষ্ট হয় যখন কেউ দেখে যে ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিরা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এবং ফলস্বরূপ তারা কীভাবে হতাশা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতার মতো গুরুতর মানসিক সমস্যা ভোগ করে। ১৮ আল কাহফ, আয়াত ১০৩-১০৪:

"বলুন, "আমরা কি তোমাদেরকে কর্মের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে অবহিত করব? [তারা] তারা যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে ব্যর্থ হয়েছে, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে, সে এই পৃথিবীতে প্রাপ্ত সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করবে: মানসিক শান্তি। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৫:

"... আর যে কেউ এই পৃথিবীর প্রতিদান কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে দান করব..."

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, সে নিশ্চিত করবে যে সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তার জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৫:

"... আর যে কেউ আখেরাতের প্রতিদান কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে দান করব। আর কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করব।"

এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে সাহায্য করার জন্য, তাদের দৃঢ় ঈমান অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত। দৃঢ় ঈমান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি নিশ্চিত করে যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে, স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময়, সর্বত্রই মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি শিখে এবং তার উপর আমল করে, যা

ব্যাখ্যা করে যে, আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। এই ব্যক্তি যখন তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয় তখন সহজেই আল্লাহকে অমান্য করবে, কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে, তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে বরং মহান আল্লাহর আনুগত্য করা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আনুগত্যগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং তাদের জীবনের মধ্যে প্রত্যেককে এবং সবকিছুকে সঠিকভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৪৫:

"... আর যে কেউ দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে দেব; আর যে কেউ আখেরাতের প্রতিদান কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে দেব। আর কৃতজ্ঞদেরকে আমরা পুরস্কৃত করব।"

সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার মতো পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করা ঐশ্বরিক প্রেমের লক্ষণ বলে বিশ্বাস করে কাউকে বোকা বানানো উচিত নয়। মহান আল্লাহ সকলকে পরীক্ষার জন্য পার্থিব জিনিসপত্র দান করেন। সূরা ৬৭ আল-মুলক, আয়াত ২:

"যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম..."

জীবনের পরীক্ষা হলো ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা হবে কিনা তা নিয়ে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি অনুগ্রহগুলো অপব্যবহার করে সে পার্থিব জিনিসপত্র, যেমন সম্পদ, পেতে পারে, কিন্তু তার প্রচেষ্টা থেকে সে রহমত এবং মানসিক শান্তির মতো কার্যকর কিছু পাবে না। ২৩শে অধ্যায় আল মু'মিনুন, ৫৫-৫৬ আয়াত:

"তারা কি মনে করে যে, আমরা তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যা দান করি, তা কি তাদের জন্য দ্রুত কল্যাণ ডেকে আনছি? বরং তারা তা উপলব্ধি করে না।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রদত্ত অনুগ্রহ সঠিকভাবে ব্যবহার করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, সে উভয় জগতেই রহমত, আশীর্বাদ এবং মানসিক শান্তি লাভ করবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৫:

"... আর যে কেউ দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে দেব; আর যে কেউ আখেরাতের প্রতিদান কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে দেব। আর কৃতজ্ঞদেরকে আমরা পুরস্কৃত করব।"

অধিকন্তু, এটি মহান আল্লাহর অসীম করুণার একটি অংশ যে তিনি উভয় জগতে মানসিক শান্তি একটি জিনিসের মধ্যে স্থাপন করেছেন: ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে। তিনি এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি অর্জনকে পরকালে মানসিক শান্তি অর্জনের চেয়ে ভিন্ন আচরণবিধিতে স্থাপন করতে পারতেন। এটি একজন ব্যক্তিকে এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি অথবা পরকালে মানসিক শান্তি অর্জনের মধ্যে একটি বেছে নিতে বাধ্য করত। অর্থাৎ, তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জন করতে সক্ষম হত না। তারা অন্য জগতে মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য এক ঘরের মানসিক শান্তি ত্যাগ করতে বাধ্য হত। অতএব, কোনও ব্যক্তিকে এই বিশ্বাসে বোকা বানানো উচিত নয় যে পরকালে মানসিক শান্তি অর্জনের অর্থ এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি ত্যাগ করা। যদি কোনও ব্যক্তি এই সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ হয়, তবে তারা সহজেই পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকে উপেক্ষা করবে কারণ তারা এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারবে না। ফলস্বরূপ, তারা এই পৃথিবীতে বা পরকালে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারবে না, কারণ তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। শয়তানের এই ফাঁদ এড়িয়ে চলতে হবে এবং এর পরিবর্তে বুঝতে হবে যে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি একটি জিনিসের মধ্যে নিহিত: ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৪৫:

"... আর যে কেউ দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে দেব; আর যে কেউ আখেরাতের প্রতিদান কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে দেব। আর কৃতজ্ঞদেরকে আমরা পুরস্কৃত করব।"

এই আয়াতটি আরও ইঙ্গিত করে যে, যেহেতু মহান আল্লাহ ইহকাল ও পরকালের নিয়ামত নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তাঁর অবাধ্যতার মাধ্যমে কেউ এই পৃথিবীতে বা পরকালে কোন কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, সে দেখতে পাবে যে এই পৃথিবীতে এবং পরকালে যা কিছু তাকে দেওয়া হয়েছে তা তার জন্য সান্ত্বনা ও শান্তির উৎস হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের অপব্যবহার করে তার অবাধ্য হয়, সে দেখতে পাবে যে তার যা কিছু আছে তা উভয় জগতে তার জন্য চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার উৎস হয়ে উঠেছে। এই দুটি ফলাফল অনিবার্য কারণ মহান আল্লাহ একাই উভয় জগতের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, যার মধ্যে রয়েছে মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মানসিক শান্তির আবাসস্থল।
অধ্যায় ৫৩ আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

উহুদের যুদ্ধে তাদের স্পষ্ট পরাজয়ের পর, মহান আল্লাহ সাহাবাদের (আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন) পুনরায় সান্ত্বনা ও আশ্বস্ত করলেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৬:

" আর কত নবী [যুদ্ধে] অংশ নিয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে অনেক ধর্মীয় পণ্ডিতের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর পথে তাদের উপর যা এসেছিল তার কারণে তারা কখনও আত্মবিশ্বাস হারাননি, দুর্বল হননি বা আত্মসমর্পণ করেননি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের লক্ষণ হলো, যখন কেউ সকল পরিস্থিতিতেই তাঁর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে, তা সে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে, যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলেন তাদের থেকে যারা করেন না তাদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য কঠিন সময়ের প্রয়োজন হয়, কারণ স্বাচ্ছন্দ্যের সময় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা প্রায়শই কঠিন সময়ে তাঁর আনুগত্য করার মতো কঠিন নয়। ২৯ সূরা আল আনকাবুত, আয়াত ২-৩:

"মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি, আর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা মিথ্যাবাদী।"

অতএব, সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, কারণ তিনি জানেন যে তিনি অবশেষে তাদের সহায়তা এবং স্বস্তি প্রদান করবেন। অধ্যায় ৬৫ তালাক, আয়াত ২:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই ঐশ্বরিক সাহায্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে নয়। এটি সর্বদা মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অনুসারে। অতএব, এই ঐশ্বরিক সাহায্য সেই সময় ঘটে যখন এটি মানুষের জন্য সর্বোত্তম এবং এমনভাবে যা তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, এই জেনে যে, তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য দান করা হবে, কোন না কোনভাবে, তা তাদের কাছে স্পষ্ট হোক বা না হোক। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৪৬:

" আর কত নবী [যুদ্ধে] অংশ নিয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে অনেক ধর্মীয় পণ্ডিতের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর পথে তাদের উপর যা এসেছিল তার কারণে তারা কখনও আত্মবিশ্বাস হারাননি, দুর্বল হননি বা আত্মসমর্পণ করেননি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।"

এই আয়াতটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার ইঙ্গিত দেয় যা ধৈর্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। যখন কেউ কোনও সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তার মনে রাখা উচিত যে তাদের আগে আরও অনেক মানুষ একই বা অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এই বাস্তবতা বোঝা একজনকে ধৈর্য ধরে থাকতে উৎসাহিত করবে কারণ তারা মনে রাখবে যে এই পৃথিবীতে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া এই পৃথিবীতে জীবনের একটি নীতি এবং বাস্তবতা যার মুখোমুখি সকল মানুষ হয়েছে এবং শেষ সময় পর্যন্ত হবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, ধৈর্য বলতে বোঝায় নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, বিশ্বাস করা যে তিনি কেবল তার জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৪৬:

" আর কত নবী [যুদ্ধে] অংশ নিয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে অনেক ধর্মীয় পণ্ডিতের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন..."

এই আয়াতটি ইঙ্গিত দেয় যে, মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকার জন্য ঈমানের দৃঢ়তা প্রয়োজন যা ঐশ্বরিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, দৃঢ় ঈমান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি নিশ্চিত করে যে, প্রতিটি পরিস্থিতিতে, স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময়, মহান আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকা নিশ্চিত করে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি শেখা এবং তার উপর আমল করা হলে দৃঢ় ঈমান অর্জন করা হয়, যা ব্যাখ্যা করে যে, আন্তরিকভাবে আল্লাহকে আনুগত্য করা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তার ঈমান দুর্বল হয়ে যাবে। এই ব্যক্তি যখন তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয় তখন সহজেই আল্লাহকে অমান্য করবে, কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে, তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে এবং তার পরিবর্তে আল্লাহকে আনুগত্য করা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমানের দৃঢ়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং তাদের জীবনের মধ্যে প্রত্যেককে এবং সবকিছুকে সঠিকভাবে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৪৬-১৪৭:

“... অনেক ধর্মীয় পণ্ডিতের সাথে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু আল্লাহর পথে তাদের উপর যা এসেছিল তার কারণে তারা কখনও আত্মবিশ্বাস হারাননি, দুর্বল হননি বা আত্মসমর্পণ করেননি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন। আর তাদের কথা ছিল এই যে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের পাপ এবং আমাদের কাজে অতিরিক্ত কাজ ক্ষমা করুন এবং আমাদের পাপ দূর করুন এবং কাফেরদের উপর আমাদের বিজয় দান করুন।"

এই আয়াতগুলো এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্দেশ করে যা প্রায়শই মুসলমানদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়। যদিও মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, তবুও এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রার্থনা কেবল তখনই সত্যিকার অর্থে কার্যকর হবে যখন কেউ আনুগত্যের কাজ করে, কারণ পবিত্র কুরআনের প্রতিটি প্রার্থনা, যেমন এই একটি, এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যে পাওয়া যায়, আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কাজ দ্বারা অনুপ্রাণিত। উপরন্তু, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি প্রার্থনা এমন একজন ব্যক্তি দ্বারা করা হয়েছিল যিনি আনুগত্যের কাজের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তারা তাদের জীবন জুড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করার জন্য প্রচেষ্টা করেছিলেন। এটি বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে প্রার্থনাগুলি কেবল তখনই সত্যিকার অর্থে কার্যকর যখন সেগুলি আনুগত্যের কাজের সাথে একত্রিত হয়। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম অলস মনোভাব গ্রহণ করেছে যার ফলে তারা প্রার্থনা করতে পারদর্শী কিন্তু কার্যত আল্লাহ, মহান আল্লাহর আনুগত্য করে না। কারণ, মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য ন্যূনতম শক্তি, সময় এবং অন্য কোনও সম্পদের প্রয়োজন হয় না, যেমন সম্পদ। ইসলামের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী থেকে এটা স্পষ্ট যে, দোয়া কার্যকর হওয়ার জন্য আনুগত্যের মাধ্যমে সমর্থন করা উচিত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ এবং তাঁর সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, স্পষ্টভাবে দেখায় যে তারা কীভাবে শারীরিকভাবে আল্লাহ, মহান

আল্লাহর আনুগত্য করেছিলেন, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে। তারা কখনও কেবল মুক্তি বা বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করতেন না, বরং আল্লাহ, মহানকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে কাজ করতে অস্বীকার করতেন। জামে আত তিরমিযী, ৩৪৯৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, দিনের মধ্যে দুটি বিশেষ সময় যখন আল্লাহ, মহান কর্তৃক প্রার্থনার ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়, উভয়ই আনুগত্যের সাথে সম্পর্কিত। প্রথম সময়টি ফরজ নামাজের পরে এবং দ্বিতীয়টি রাতের শেষ অংশে, যখন নফল নামাজ আদায় করা উচিত। উপরন্তু, নিম্নলিখিত আয়াতগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, দোয়া সম্পূর্ণ এবং কার্যকর হওয়ার জন্য আনুগত্যের মাধ্যমে সমর্থন করা উচিত। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ১০:

"... তাঁর দিকেই উত্তম কথা আরোহণ করে, আর সৎকর্ম তা উন্নীত করে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৮৬:

"... নিশ্চয়ই আমি নিকটবর্তী। প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় [আনুগত্যের মাধ্যমে] এবং আমার উপর বিশ্বাস রাখে যাতে তারা [সঠিকভাবে] সৎপথে পরিচালিত হতে পারে।"

আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে প্রার্থনার সমর্থন থাকা উচিত, তা না বোঝা মুসলমানদের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন না হওয়ার একটি

প্রধান কারণ, কারণ তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্ম পরিবর্তন করতে হবে। অধ্যায় ১৩ আর রা'দ, আয়াত ১১:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে..."

এছাড়াও, তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য তাদের কাছে থাকা সম্পদ, যেমন তাদের শক্তি, ব্যবহার করতে হবে এবং তারা কেবল প্রার্থনার উপর নির্ভর করতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ, বিবাহের সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপ নিতে হবে এবং এটিকে মহান আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনার সাথে যুক্ত করতে হবে। তারা কেবল মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনার উপর নির্ভর করে তাদের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য কার্যত পদক্ষেপ নেওয়া এড়িয়ে অলস আচরণ করতে পারে না। যেমনটি ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এই নিষ্ক্রিয় এবং ভুল মনোভাব ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী।

১৪৮ নং আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, কেবলমাত্র যখন কেউ তাদের প্রার্থনা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে শারীরিক আনুগত্যের মাধ্যমে সমর্থন করে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে, তখনই তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, ১৪৮ নং আয়াত:

"অতএব আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার প্রতিদান এবং আখেরাতের উত্তম প্রতিদান দান করলেন। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

এই আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, এই পৃথিবীর প্রতিদান কেবল তখনই ভালো যখন কেউ এই প্রতিদান, যেমন সম্পদ, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক উপায়ে ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি এর অপব্যবহার করে সে এই পৃথিবীতে বা পরকালে এর কোন উপকার পাবে না কারণ এটি উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অন্যদিকে, পরকালের প্রতিদান সর্বদা ভালো, কারণ পরকালের আশীর্বাদ কেউ অপব্যবহার করতে পারে না।

এছাড়াও, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যারা সৎকর্ম করে, তাদেরই আল্লাহর ভালোবাসা দেওয়া হয়। এই সৎকর্মের জন্য ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহর প্রতি বাস্তব আনুগত্যের প্রয়োজন এবং তাই এটি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণার বাইরেও বিস্তৃত।

পরিশেষে, যেহেতু এই আয়াতে উল্লেখিত কল্যাণ কোনওভাবেই সীমাবদ্ধ নয়, তাই একজন ব্যক্তির কাছে সৎকর্ম না করার কোনও অজুহাত নেই, কারণ এটি তার পার্থিব আশীর্বাদের সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত হয় না বরং এই আশীর্বাদগুলি কীভাবে ব্যবহৃত হয় তার দ্বারা নির্ধারিত হয়। অতএব, প্রতিটি ব্যক্তি সৎকর্ম করে, তার পার্থিব আশীর্বাদ যত কম হোক বা কম হোক, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক ব্যবহার করে মহান আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে পারে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৮:

"... আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৪৯-১৫১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرْدُّكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ
فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ
سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾

“হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা কাফেরদের আনুগত্য করো, তাহলে তারা তোমাদেরকে পশ্চাদপসরণে ফিরিয়ে দেবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো।”

কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

যারা কাফের, আমি তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব কারণ তারা আল্লাহর সাথে এমন কিছু শরীক করেছে যার কোন প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি। তাদের আবাসস্থল হবে আগুন, আর জালেমদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট।”

পবিত্র কুরআনে যখন আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের মৌখিক ঈমানের দাবি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া মৌখিক ঈমানের দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হলো সেই প্রমাণ এবং প্রমাণ যা অর্জন করা প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতেই পুরস্কার এবং রহমত লাভ করতে পারে। যেমন একটি ফলবান বৃক্ষ কেবল তখনই কার্যকর যখন তা ফল দেয়, তেমনি ঈমান কেবল তখনই কার্যকর যখন তা সংকর্ম করে। এই ক্ষেত্রে, আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে তারা অমুসলিমদের সাথে এমন দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে না তোলে যার ফলে তারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৪৯:

" হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা কাফেরদের আনুগত্য করো, তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের পশ্চাদপসরণে ফিরিয়ে দেবে..."

এই আয়াতের অর্থ এই নয় যে, একজন মুসলিম একজন অমুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে না কারণ এই আয়াত এবং অনুরূপ আয়াতগুলিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়ে অমুসলিমদের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের ধ্বংস কামনাকারী অমুসলিমদের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা সেই সময়ে বিশেষভাবে বিপজ্জনক ছিল, কারণ অমুসলিমরা ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করত।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে উপদেশ দেয় যে, মহান আল্লাহ অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন না। ৬০ তম সূরা আল মুমতাহানা, আয়াত ৮:

"যারা ধর্মের কারণে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের সাথে সদাচরণ করতে এবং তাদের সাথে ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন।"

বাস্তবে, মূল আয়াতটি মুসলমানদের সতর্ক করে যে, যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করতে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। বাস্তবে এটি মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৩৩ নম্বর হাদিসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, একজন মুসলিম তার বন্ধুর জীবনের পথে। এর অর্থ হল, একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীদের মধ্যে থাকা ভালো বা খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করবে, তা তার কাছে স্পষ্ট হোক বা না হোক। অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের সাহচর্য গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে উৎসাহিত করে।

তাছাড়া, মুসলিম ও অমুসলিম সকলের সাথে সদয় আচরণ করা একজন প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। একজন প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি এবং তার সম্পদ থেকে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি দূরে রাখে। সুনানে আন নাসায়ীর ৪৯৯৮ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, অন্যদের সাথে সুস্থ সামাজিক আচরণ এবং অন্যদের সাথে গভীর বন্ধুত্বের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গভীর বন্ধুত্ব সর্বদা একজন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করবে, সে তা বুঝতে পারুক বা না পারুক এবং এটি তার সঙ্গীর প্রতি ভালোবাসার কারণে তার বিশ্বাসের সাথে আপস করতে পারে, অন্যদিকে, অন্যদের সাথে ভালো সামাজিক আচরণ কখনই তাকে এই পর্যায়ে নিয়ে যাবে না। অতএব, মুসলমানদের সকলের সাথে ভালো চরিত্র এবং আচরণ গ্রহণ করা উচিত, তবে তাদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব সংরক্ষণ করা উচিত যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের দিকে উৎসাহিত করবে। কেবলমাত্র একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের জন্য এটি করতে পারে। অন্যদিকে, একজন অমুসলিম, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর অবাধ্য হতে উৎসাহিত করবে, যদিও তারা এটির ইচ্ছা নাও করে। এর কারণ হল একজন অমুসলিম একজন মুসলিমের চেয়ে আলাদা আচরণবিধি অনুসরণ করে। এবং একজন অমুসলিমের কাছে যে আচরণ গ্রহণযোগ্য তা ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত 149:

" হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা কাফেরদের আনুগত্য করো, তাহলে তারা তোমাদেরকে পশ্চাদপসরণে ফিরিয়ে দেবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো।"

যে মুসলিম আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়ে তাদের প্রদত্ত নিয়ামতের অপব্যবহার করে, সে উভয় জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করতে ব্যর্থ হবে। প্রদত্ত নিয়ামতের অপব্যবহার একজনকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেবে, এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল স্থানে ফেলবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার

জন্য প্রস্তুতি নিতে বাধা দেবে। অতএব, এই ব্যক্তি উভয় জগতেই কেবল চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধা ভোগ করবে, এমনকি যদি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। এই বাস্তবতা স্পষ্ট হয় যখন কেউ তাদের প্রদত্ত নিয়ামতের অপব্যবহারকারীদের, যেমন ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের, পর্যবেক্ষণ করে। অন্যদিকে, যারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত সঠিকভাবে আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত নিয়ামতের ব্যবহার করে সর্বদা তাঁর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে, তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করবে। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫০:

"কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।"

তারা মানসিক ও শারীরিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতির মাধ্যমে তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে মানসিক শান্তি লাভ করবে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের এমন একজন বিচক্ষণ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিচক্ষণ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন এবং তার জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থান দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ তায়াল। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও এত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান

করতে পারে না, তাদের পরামর্শ সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ তাদের জীবনের প্রতিটি জিনিস এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে না, কারণ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে। একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসের আকারে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তায়ালার মানুষকে ইসলামের শিক্ষাগুলি নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। কিন্তু এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি...'"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫০:

"কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।"

৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৪৯-১৫০:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা কাফেরদের আনুগত্য করো, তাহলে তারা তোমাদেরকে পশ্চাদপসরণে ফিরিয়ে দেবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।"

এই আয়াতগুলো আরও স্পষ্ট করে যে, একজন মুসলিম কেবল তখনই আল্লাহ তাআলার সুরক্ষা এবং সাহায্য লাভ করবে যখন তারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করবে। অন্যদিকে, যদি তারা তাঁর অবাধ্য হয় তবে তারা এই সুরক্ষা এবং সাহায্য হারাবে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য কেবল তার কর্মের মাধ্যমেই প্রকাশ পেতে পারে এবং তাই এটি মৌখিকভাবে তাঁর প্রতি বিশ্বাস ঘোষণা করার চেয়েও অনেক বেশি বিস্তৃত। অতএব, যদি কেউ তাঁর সুরক্ষা এবং সাহায্য পেতে চায়, তাহলে তাকে কার্যত আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে হবে। এই

আনুগত্যের মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। উপরন্তু, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর সুরক্ষা এবং সাহায্য মানুষের ইচ্ছা অনুসারে ঘটে না। এগুলি সর্বদা মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অনুসারে ঘটে। অতএব, এই সুরক্ষা এবং সাহায্য সেই সময় অনুসারে ঘটে যখন এটি মানুষের জন্য সর্বোত্তম এবং এমনভাবে ঘটে যা তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, এই জেনে যে, তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য দান করা হবে, কোন না কোনভাবে, তা তাদের কাছে স্পষ্ট হোক বা না হোক। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, যখন কেউ আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তখন এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বাধা দেয় এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় নিয়ে যায়। এই মনোভাব তাদের অসংখ্য মানসিক ব্যাধির দিকে পরিচালিত করবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫১:

"যারা কাফের, তাদের অন্তরে আমরা ভীতি সঞ্চার করব কারণ তারা আল্লাহর সাথে এমন কিছু শরীক করেছে যার কোন প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি..."

"আতঙ্ক" বলতে বিভিন্ন ধরনের মানসিক ব্যাধি বোঝায় যা মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে, যেমন দারিদ্র্য এবং একাকীত্বের চরম ভয়। যেহেতু মহান আল্লাহ তায়ালা একাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকে, সে সেই নির্দিষ্ট জিনিসটি অনুভব করবে যা তারা ভয় পায় এবং এটি তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে। ৫৩ সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

এবং ৯ম অধ্যায়, তাওবাহ, ৮২ নং আয়াতে:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ্ বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"]"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, তাই সকল মানুষের তৈরি আচরণবিধি এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ঐশ্বরিক আচরণবিধি মেনে চলতে হবে, কারণ একমাত্র তিনিই সর্বোত্তম আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা মানুষকে মানসিক ব্যাধি থেকে রক্ষা করে এবং পরিবর্তে উভয় জগতে তাদের মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। কিন্তু যারা মহান আল্লাহ, বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালককে মান্য করতে অস্বীকার করে এবং তার দ্বারা অনুমোদিত নয় এমন আচরণবিধি গ্রহণ করে, তারা উভয় জগতেই তাদের আচরণের শাস্তি ভোগ করবে। এই পৃথিবীতে, তারা মানসিক ব্যাধিতে জর্জরিত হবে এবং পরকালে তাদের জন্য অপেক্ষা করা শাস্তি আরও খারাপ হবে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫১:

" যারা কাফের, তাদের অন্তরে আমরা ভীতি সঞ্চার করব কারণ তারা আল্লাহর সাথে এমন কিছু শরীক করেছে যার কোন প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি। তাদের আবাসস্থল হবে আগুন, আর জালেমদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট।"

পরিশেষে, সমগ্র সৃষ্টি মহান আল্লাহর আওতাধীন এবং তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারাধীন, একজন ব্যক্তির তাঁর নিয়ম মেনে চলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট দেশের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তেমনি মহাবিশ্বের মালিকের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতেই তার সমস্যা হবে। একজন ব্যক্তি যদি তার নিয়ম মেনে চলতে না পারে তবে একটি দেশ ছেড়ে যেতে পারে কিন্তু এমন জায়গায় পালিয়ে যেতে পারবে না যেখানে মহান আল্লাহর নিয়ম ও এখতিয়ার প্রযোজ্য হয় না। একজন ব্যক্তি তার সমাজের নিয়ম পরিবর্তন করতে সক্ষম হতে পারে কিন্তু তারা কখনও মহান আল্লাহর নিয়ম পরিবর্তন করতে পারবে না। উপরন্তু, ঠিক যেমন একজন বাড়ির মালিক ঘরের নিয়ম নির্ধারণ করে, এমনকি অন্যরা এই নিয়মের প্রতি আপত্তি জানালেও, একইভাবে, মহাবিশ্ব মহান আল্লাহর, এবং তাই, তিনিই একমাত্র এই মহাবিশ্বের নিয়ম নির্ধারণ করেন, মানুষ এই নিয়ম পছন্দ করুক বা না করুক। অতএব, এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে, নিজের স্বার্থে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে সে মহান আল্লাহর নিয়ম মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। একজন ব্যক্তি হয় আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পিছনের হিকমতগুলি শেখার চেষ্টা করতে পারে, যাতে সে বুঝতে পারে যে কীভাবে সেগুলি তাদের এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য উপকারী এবং কীভাবে তারা উভয় জগতে মানসিক ও শারীরিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, অথবা সে তার আকাঙ্ক্ষার উপাসনা করতে পারে এবং ইসলামের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলামী নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তার উচিত উভয় জগতেই তার পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং কোনও আপত্তি, প্রতিবাদ বা অভিযোগ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ২৯:

"আর বলো, "সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, অতএব যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক; আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।" নিশ্চয়ই, আমরা জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে ঘিরে থাকবে। আর যদি তারা সাহায্যের জন্য ডাকে, তবে তাদের সাহায্যের জন্য ঘোলা তেলের মতো পানি ব্যবহার করা হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দেবে। পানীয় কত নিকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫১:

"যারা কাফের, তাদের অন্তরে আমরা ভীতি সঞ্চার করব কারণ তারা আল্লাহর সাথে এমন কিছু শরীক করেছে যার কোন প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি..."

এই আয়াতটি আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার সাথে সম্পর্কিত মানসিক ব্যাধিগুলি এড়াতে গুরুত্বের ইঙ্গিত দেয়, যা নির্দেশের দুটি উৎস: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসকে কঠোরভাবে মেনে চলার মাধ্যমে। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হবে, এমনকি যদি তা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে, তবুও তারা নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর তত কম কাজ করবে, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বর হাদীসে সতর্ক করে বলেছেন যে, যে বিষয় দুটি নির্দেশনার উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করবেন। উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর

যত বেশি কাজ করা হবে, তত বেশি তারা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে এমন জিনিসগুলিতে কাজ করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পা দেবে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"... সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [জাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫১:

"যারা কাফের, তাদের অন্তরে আমরা ভীতি সঞ্চার করব কারণ তারা আল্লাহর সাথে এমন কিছু শরীক করেছে যার কোন প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি। তাদের আবাসস্থল হবে আগুন, আর জালেমদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও এই আয়াতটি অমুসলিমদের কথা বলে শুরু হয়েছে, তবুও আখেরাতে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা অমুসলিমদের নয়, বরং অন্যায়কারীদের কথা বলে। অতএব, এটি মুসলমানদের সতর্ক করে যে, যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করে তাদের আচরণ গ্রহণ না করার জন্য। অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণা বাস্তবায়িত করতে হবে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। কিন্তু ১৫১ আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি তারা কার্যত এমন ব্যক্তির মতো আচরণ করতে পছন্দ করে যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, তবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলির অপব্যবহার করে, তাহলে তারা পরকালে তাদের সাথে যোগ দিতে পারে। উপরন্তু, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমান একটি গাছের মতো যাকে বৃদ্ধি পেতে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা সূর্যালোকের মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, তা বৃদ্ধি পেতে ব্যর্থ হয় এবং এমনকি মারাও যেতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি আনুগত্যের কাজ

দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে না এবং মৃত্যুর গুরুতর ঝুঁকিতে থাকে। এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫১:

"যারা কাফের, তাদের অন্তরে আমরা ভীতি সঞ্চার করব কারণ তারা আল্লাহর সাথে এমন কিছু শরীক করেছে যার কোন প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি। তাদের আবাসস্থল হবে আগুন, আর জালেমদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট।"

এই আয়াতটি উহুদের যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত। উহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের পর যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ মদিনায় ফিরে আসেন, তখন তারা জানতে পারেন যে মক্কার অমুসলিম নেতারা ইসলামকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মদিনার দিকে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবীগণকে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের গুরুতর ক্ষত এবং ক্লান্ত দেহ থাকা সত্ত্বেও, অমুসলিমদের পিছনে ধাওয়া করার জন্য বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তখন আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আলে ইমরানের ১৭২ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"যারা [ঈমানদাররা] আঘাত পাওয়ার পরও আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে। তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মা'বাদ ইবনে আবু মা'বাদ নামে এক ব্যক্তি মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সেনাবাহিনীর সাথে দেখা করে তাঁর সমবেদনা ও সেবা প্রদান করেন। মহানবী (সাঃ) তাকে অমুসলিম সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছাতে এবং মদীনা আক্রমণ থেকে তাদের নিরুৎসাহিত করতে বলেন। অবশেষে তিনি অমুসলিম সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছান এবং তাদেরকে মদীনা আক্রমণ না করার জন্য সতর্ক করেন কারণ মহানবী (সাঃ) একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন যারা তিক্ত পরিণতি পর্যন্ত লড়াই করার জন্য প্রস্তুত ছিল। এর মাধ্যমে, মহান আল্লাহ, অমুসলিমদের হৃদয়ে ভয় ঢেলে দেন যারা মক্কায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যদিও মহানবী (সাঃ) কে হত্যা করা এবং মদীনার বাইরে তাদের বাণিজ্য মূল সুরক্ষিত করার তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছিল। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫১:

"যারা কাফের, তাদের অন্তরে আমরা ভীতি সঞ্চার করব কারণ তারা আল্লাহর সাথে এমন কিছু শরীক করেছে যার কোন প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি। তাদের আবাসস্থল হবে আগুন, আর জালেমদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট।"

ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২৮৮-২৯১ এবং ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৩:১৫১, পৃষ্ঠা ৪২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি তাই ইঙ্গিত দেয় যে, মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মানসিক প্রশান্তির আবাস সহ সকল কিছুর উপর মহান আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার উপলব্ধি করার গুরুত্ব কতখানি। বিজয়ের পরেও, অমুসলিমদের কাছে ভয় ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না যার ফলে তারা তাদের মূল লক্ষ্য অর্জন না করেই মক্কায় ফিরে গিয়েছিল। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে যে পার্থিব সাফল্যই অর্জন করুক না কেন, তারা কখনও আল্লাহর অবাধ্যতার সাথে সম্পর্কিত মানসিক ব্যাধি, যেমন তাদের সবচেয়ে ঘৃণার অভিজ্ঞতার ভয়, থেকে মুক্তি পাবে না। অতএব, যদি তারা সমস্ত ভয় এবং মানসিক ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে চায় এবং উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অনুভব করতে চায়, তাহলে তাদের নিজেদের স্বার্থে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারা, আয়াত ৩৮-৩৯:

"... আর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হেদায়েত আসবে, তখন যারা আমার হেদায়েত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আর যারা কুফরী করবে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করবে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

অধ্যায় ৩ - আলী ইমরান, আয়াত ১৫২-১৫৮

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ
وَتَنَزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّا أَرَّكُمْ مَا تَحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ
يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ
عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

❖ إِذْ تَصْعِدُونَ وَلَا تَكُولُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي
أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبِتْكُمْ غَمًّا يَغْمِرُ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا
أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ
أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ
إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخَفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
مَا قَاتَلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ
وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا
وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا
غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي
وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

وَلَيْنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾
وَلَيْنَ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾

“আর আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন যখন তোমরা
তাঁর অনুমতিক্রমে তাদেরকে (শত্রুদের) হত্যা করছিলে, এমনকি যখন তোমরা
সাহস হারিয়ে ফেলেছিলে এবং [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত]
আদেশ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলে এবং তোমাদের প্রিয় জিনিসটি দেখানোর
পরেও অবাধ্য হয়েছিলে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ দুনিয়া কামনা করে, আর
কেউ কেউ আখেরাত কামনা করে। তারপর তিনি তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য
তাদের থেকে তোমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন,
আর আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।”

[স্মরণ করো] যখন তোমরা [পাহাড়ে পালিয়ে গিয়েছিলে] এবং কারো দিকে না
তাকিয়েই [পাহাড়ে] আরোহণ করেছিলে, যখন রসূল তোমাদেরকে পিছন থেকে
ডাকছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্টের উপর কষ্ট দিয়েছিলেন যাতে
তোমরা যা হারিয়েছে [বিজয় ও যুদ্ধের ধনসম্পদ] এবং যা তোমাদের উপর এসেছে

[আঘাত ও মৃত্যু] তার জন্য দুঃখ না করো। আর তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে
আল্লাহ[সম্পূর্ণ অবগত]।

তারপর কষ্টের পর তিনি তোমাদের উপর নিরাপত্তা নাযিল করলেন, তন্ময়
আকারে, তোমাদের একদলকে কারু করে ফেললেন, আর অন্য দল নিজেদের
ব্যাপারে চিন্তিত, আল্লাহকে সত্য ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে লাগলো, অজ্ঞতার চিন্তা
করতে লাগলো, বললো, "এ ব্যাপারে আমাদের কি কিছু করার আছে?" বলো,
"নিশ্চয়ই, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আল্লাহর।" তারা নিজেদের মনে এমন কিছু গোপন
করে যা তারা তোমাদের কাছে প্রকাশ করবে না। তারা বলে, "যদি আমরা এই
ব্যাপারে কিছু করতে পারতাম, তাহলে আমরা[আমাদের মধ্যে কেউ কেউ]
এখানেই নিহত হতাম না।" বলো, "যদিও তোমরা তোমাদের ঘরে থাকতে, যাদের
হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা তাদের মৃত্যুশয্যা বেরিয়ে আসতো।" [এটা]
যাতে আল্লাহ তোমাদের বুকের ভেতরে যা আছে তা পরীক্ষা করতে পারেন এবং
তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পবিত্র করতে পারেন। আর আল্লাহ বুকের ভেতরে
যা আছে তা জানেন।

উহাদের স্থানে দুই বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের
কিছু[অপরাধের] কারণে শয়তানই তাদেরকে পদস্থলিত করেছিল। কিন্তু আল্লাহ
তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল।

হে ঈমানদারগণ, তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা কাফের হয়েছে এবং যখন
তারা তাদের ভাইদের দেশে ভ্রমণ করেছিল অথবা যুদ্ধে বেরিয়েছিল, তখন তাদের
সম্পর্কে বলেছিল, "যদি তারা আমাদের সাথে থাকত, তবে তারা মারা যেত না এবং
নিহতও হত না।" আল্লাহ তাদের অন্তরে এই[ভ্রান্ত ধারণাকে] অনুতাপের কারণ
করে দেন। আর আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, আর আল্লাহ
তোমাদের কার্যকলাপ দেখেন।

আর যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ করো, তাহলে আল্লাহর
ক্ষমা ও করুণা তারা যা কিছু জমা করে তার চেয়ে উত্তম।

আর তোমরা মারা যাও অথবা নিহত হও, আল্লাহর কাছেই তোমাদের একত্রিত করা
হবে।"

উহুদের যুদ্ধ থেকে শেখার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আল্লাহ তাআলা আলোচনা করেছেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫২:

"আর আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন যখন তোমরা তাঁর অনুমতিক্রমে তাদেরকে হত্যা করছিলে, এমনকি যখন তোমরা সাহস হারিয়ে ফেললে এবং আদেশ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং অমান্য করলে..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মনের শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করবে। কিন্তু যখনই তারা তাঁর অবাধ্যতা চালিয়ে যাবে, তখন তারা মনের শান্তি বা সাফল্য পাবে না, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। এর কারণ হল যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করবে সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং তারা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে। অতএব, এই আনুগত্য উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অথচ, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করে, সে মানসিক ও শারীরিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জন করতে পারবে না, বরং সে তার জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচারের দিনে জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হবে। অতএব, তার অবাধ্যতা তাকে উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলার দিকে নিয়ে যাবে, এমনকি যদি সে পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে।
৯ম অধ্যায়, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক

হয়। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সুসম করতে এবং তার জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান কখনই এই ফলাফল অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের কারণে জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান আছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণের সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫২:

" আর আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন যখন তোমরা তাঁর অনুমতিক্রমে তাদেরকে হত্যা করছিলে, এমনকি যখন তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলেছিলে এবং আদেশ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলে এবং তোমাদের প্রিয় জিনিসটি দেখানোর পরেও অবাধ্য হয়েছিলে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই দুনিয়া কামনা করে, আবার কেউ কেউ আখেরাত কামনা করে..."

যখন উহদের যুদ্ধ শুরু হয়, তখন সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, দ্রুত অমুসলিম সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন যার ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হন। কিন্তু মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, উহদ পাহাড়ের সামনে অবস্থিত জাবাল আল রুমাহ নামক একটি ছোট পাহাড়ে অবস্থান করার নির্দেশ দেন, তারা বিশ্বাস করেন যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং আদেশ আর প্রযোজ্য নয়। যখন তারা যুদ্ধের গণীমত সংগ্রহের জন্য জাবাল আল রুমাহতে নেমে আসেন, তখন মুসলিম সেনাবাহিনীর পশ্চাদভাগ উন্মোচিত হয়ে যায়। অমুসলিম সেনাবাহিনী তখন একত্রিত হয় এবং উভয় পক্ষ থেকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে। এর ফলে অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, শহীদ হন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯-৩০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, কোন পাপ করেননি কারণ তারা বিশ্বাস করতেন যে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আদেশ আর প্রযোজ্য হবে না, তবুও যুদ্ধের গণীমত সংগ্রহের, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করার তাদের সৎ ও ধার্মিক ইচ্ছা সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ঘটনাটি অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসপত্র, যেমন অতিরিক্ত সম্পদের পিছনে ছুটতে না পারার গুরুত্ব নির্দেশ করে, এমনকি যদি কারো উদ্দেশ্য হয় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসারে তা ব্যবহার করা। অধ্যায় ৯, তওবা, আয়াত ৭৫-৭৭:

“আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, “যদি তিনি আমাদের তাঁর অনুগ্রহ থেকে দান করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই দান করব এবং আমরা অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব।” কিন্তু যখন তিনি

তাদের তাঁর অনুগ্রহ থেকে দান করলেন, তখন তারা তাতে কৃপণতা করল এবং অস্বীকৃতি জানিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। তাই তিনি তাদের অন্তরে মুনাক্কির শাস্তি দিলেন সেই দিন পর্যন্ত যখন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে— কারণ তারা আল্লাহর সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা ভঙ্গ করেছিল এবং যেহেতু তারা [অভ্যন্তরীণভাবে] মিথ্যা বলত।”

এই মনোভাব এড়িয়ে চলা উচিত কারণ জ্ঞান এবং দূরদর্শিতার অভাবের কারণে কেউ জানে না যে তার জন্য কোনটি সবচেয়ে ভালো। মানুষ প্রায়শই এমন জিনিস চায় যা তাদের জন্য চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং কখনও কখনও তারা এমন জিনিস অপছন্দ করে যা উভয় জগতেই তাদের জন্য কল্যাণের উৎস হয়ে ওঠে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

“...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।”

এই কারণেই ইসলাম মুসলমানদের পার্থিব বিষয়ে সাধারণ কল্যাণ কামনা করতে উৎসাহিত করে, কারণ তাদের কাছে এমন জ্ঞান নেই যে তাদের জন্য কী ভালো আর কী ক্ষতিকর। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২০০-২০১:

"... আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে দান করুন", আর আখেরাতে তার কোন অংশ থাকবে না। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"

অধিকন্তু, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহারের উপর মনোনিবেশ করার মাধ্যমে পরকালের লক্ষ্য রাখা সর্বদাই উত্তম, বরং আরও বেশি পার্থিব জিনিস, যেমন সম্পদ, অর্জনের উপর মনোনিবেশ করার পরিবর্তে, এমনকি যদি কেউ তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে চায়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা এই পৃথিবীর উপর মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে পরকাল এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার উপর মনোযোগ দেবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 152:

"...তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ দুনিয়া কামনা করে, আবার কেউ কেউ আখেরাতে কামনা করে..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি পরকালের জন্য কার্যত প্রস্তুতির চেয়ে বস্তুগত জগতের আনন্দ উপভোগকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি কেউ তাদের সমস্ত পার্থিব আকাঙ্ক্ষার পিছনে ছুটতে থাকে, তাহলে এটি কেবল তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এর ফলে মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে, এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় স্থাপন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে বাধা দেবে। তাই পার্থিব জিনিস উপভোগকে অগ্রাধিকার দেওয়া উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে।

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয়, সে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার মাধ্যমে তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব, পরকালকে অগ্রাধিকার দেওয়া উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫২:

"... অতঃপর তিনি তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য তাদের থেকে তোমাদের ফিরিয়ে দিলেন[পরাজিত]..."

এই পরীক্ষার একটি অংশ ছিল সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, পরাজয়ের পরেও আল্লাহর আনুগত্য অব্যাহত রাখবেন কিনা। মুসলমানদের অবশ্যই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, প্রতিটি পরিস্থিতিতে, স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা অসুবিধার সময়। বাস্তবে, অসুবিধার মুখোমুখি হওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকাই আসল পরীক্ষা, কারণ স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে আনুগত্য করা প্রায়শই সহজ। অসুবিধার মুখোমুখি হওয়া যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে আনুগত্য করে তাদের এবং যারা কেবল মৌখিকভাবে তাঁর প্রতি বিশ্বাসের দাবি করে তাদের মধ্যে পার্থক্য করে। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ২-৩:

"মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি, আর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা মিথ্যাবাদী।"

অতএব, কঠিন সময়ে ধৈর্যশীল থাকা উচিত। ধৈর্যের অর্থ হলো নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, এই বিশ্বাসে যে তিনি কেবল তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অধিকন্তু, দৃঢ় ঈমান গ্রহণের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত কারণ এটি তাদেরকে কঠিন সময়ে ধৈর্যশীল থাকতে এবং সুখের সময়ে কৃতজ্ঞ থাকতে সাহায্য করবে। দৃঢ় ঈমান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি নিশ্চিত করে যে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা কঠিন, প্রতিটি পরিস্থিতিতেই মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি শিখে এবং তার উপর আমল করে, যা ব্যাখ্যা করে যে, আন্তরিকভাবে আল্লাহকে আনুগত্য করলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাওয়া যায়। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। এই ব্যক্তি যখনই তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয় তখনই সহজেই আল্লাহকে অমান্য করবে, কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে, তাদের আকাঙ্ক্ষা

ত্যাগ করে আল্লাহর আনুগত্য করলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাওয়া যায়। অতএব, ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং তাদের জীবনের প্রতিটি জিনিসকে সঠিকভাবে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে।

যেহেতু মহান আল্লাহ পূর্ণতা দাবি করেন না, এমনকি যদি কেউ পাপ করে বা অধৈর্যের লক্ষণ দেখায় তবে তাকে ক্ষমা করা হবে যতক্ষণ না সে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তাদের আচরণ সংশোধন করে যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত 152:

"... আর তিনি তোমাদেরকে ইতিমধ্যেই ক্ষমা করে দিয়েছেন, আর আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহের অধিকারী।"

আন্তরিক তওবার মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার উপর অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লজ্জিত যেকোনো অধিকার পূরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫৩:

"[স্মরণ করে] যখন তোমরা [পালিয়ে] [পাহাড়ে] আরোহণ করেছিলে কারো দিকে না তাকিয়ে, যখন রাসূল তোমাদের পিছন থেকে ডাকছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্টের উপর কষ্ট দিয়েছিলেন..."

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এই আয়াতটি আবারও সকল ধরনের মানসিক ব্যাধি, যেমন দুঃখ-কষ্ট এড়াতে প্রতিটি পরিস্থিতিতে আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে। যেহেতু মহান আল্লাহ একাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে মানসিক শান্তি পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

উপরন্তু, যখন কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তখন সে ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা লাভ করতে পারে না এবং তার জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে তারা ভুল পথে চালিত করে। অতএব, একজনের ভারসাম্যহীন এবং অসংগঠিত জীবন চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে। একজন ব্যক্তির জীবন বইয়ের একটি লাইব্রেরির মতো। যদি বইগুলি সঠিক ক্রমে স্থাপন করা হয়, তবে একটি নির্দিষ্ট বই অনুসন্ধান করার সময় ব্যক্তি ন্যূনতম চাপের সম্মুখীন হবে। অন্যদিকে, যদি বইগুলি অসংগঠিত হয়, তবে একটি নির্দিষ্ট

বই অনুসন্ধান করার সময় তার চাপের সম্মুখীন হবে। যদি কেউ মহান আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তবে সে হতাশা, মাদকাসক্তি এবং এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতার মতো মানসিক ব্যাধিতে আরও গভীরভাবে ডুবে যাবে। ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের এবং তারা কীভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তা পর্যবেক্ষণ করলে এই ফলাফল স্পষ্ট হয়। অধ্যায় ৯ তওবার ৮২ আয়াত:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫৩:

"[স্মরণ করো] যখন তোমরা [পলায়ন করে] [পাহাড়ে] আরোহণ করেছিলে, কারো দিকে না তাকিয়ে, যখন রাসূল তোমাদের পিছন থেকে ডাকছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্টের উপর কষ্ট দিলেন, যাতে তোমরা যা হারিয়েছে [বিজয় ও যুদ্ধের ধনসম্পদ] অথবা যা তোমাদের উপর এসে পড়েছে [আঘাত ও মৃত্যু] তার জন্য দুঃখ না করো..."

দুঃখের পর দুঃখ বলতে সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, উল্লেখের যুদ্ধে শহীদ হওয়ার মিথ্যা বিশ্বাস করে। এর ফলে তাদের পরাজয় এবং তাদের নিজেদের আঘাতের কথা মনে পড়ে যায় এবং তাদের কেউ কেউ আশা হারিয়ে ফেলে কারণ তাদের শক্তি এবং অনুপ্রেরণা শহীদ হয়ে গেছে বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু একজন

সাহাবী, আনাস বিন নাদর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন, ঘোষণা করেন যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) শহীদ হলেও, আল্লাহ চিরঞ্জীব এবং তিনি মৃত্যুবরণ করতে পারবেন না। তাই তাদের উচিত নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যে বিষয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তার জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া। আনাস বিন নাদর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন, শহীদ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যান। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯-৩১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একইভাবে, আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) বিশ্বাস করতেন যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া বেঁচে থাকার কোন কারণ নেই, তাই তিনি তার তরবারির খাপ ভেঙে ফেলেন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে না দেখা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। তারা পিছু হটতে না পারা পর্যন্ত তিনি তাকে রক্ষা করতে থাকেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রাঃ) এর লেখা, আলী ইবনে আবু তালিব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৩-১৬৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ১৫৩ নং আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, কঠিন সময়ে ধৈর্য ধরে থাকার একটি চমৎকার উপায় হল কঠিন সময়ের সাথে তুলনা করা। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি পিঠের ব্যথায় ভুগছে সে তার কঠিন সময়ের তুলনা শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির সাথে করতে পারে। এটি তাদের ধৈর্য ধরে থাকতে এবং এমনকি যখনই তারা সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করবে। নিয়তে কৃতজ্ঞতা বলতে কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা জড়িত। কারো কথায় কৃতজ্ঞতা বলতে ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা জড়িত। এবং কারো কাজে কৃতজ্ঞতা বলতে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে খুশি করার জন্য যেভাবে নেয়ামত দান করা হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। এছাড়াও, ধৈর্য বলতে নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, বিশ্বাস করা যে তিনি কেবল তার জন্য যা সর্বোত্তম তা

বেছে নেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। ২য় সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক পথে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থন এবং করুণা লাভ করবে, যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কেউ যদি কোন কঠিন সময়ে ধৈর্য ধরে সঠিক মনোভাব অবলম্বন করে এবং বুঝতে পারে যে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারত, অথবা যদি তারা অধৈর্যতা অবলম্বন করে এবং মহান আল্লাহর অবাধ্য হয়, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে উভয় জগতেই তাদের প্রতিক্রিয়ার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৩:

"... আর তোমরা যা করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে [সম্পূর্ণ] অবগত।"

উহুদের যুদ্ধের কঠিন সময়ে, মহান আল্লাহ সাহাবাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, যা তাদের চাপ এবং উদ্বেগকে দূর করেছিল। আবু তালহা, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, এই আশীর্বাদ প্রাপ্তদের মধ্যে একজন ছিলেন। প্রশান্তি তন্দ্রার আকারে এসেছিল, যার ফলে তিনি যুদ্ধের সময় বেশ কয়েকবার তার তরবারি ফেলে দিয়েছিলেন। সূরা ৩ আলী ইমরান, আয়াত ১৫৪:

"অতঃপর কষ্টের পর তিনি তোমাদের কারো কারো উপর তন্দ্রার মতো প্রশান্তি নাযিল করলেন..."

ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার", পৃষ্ঠা ২৭৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি মনে রাখার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সম্মুখীন হওয়া কষ্ট সহজেই দূর হয়ে যাবে। মুসনাদে আহমাদের ২৮০৩ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অধ্যায় ৬৫ তালাকের ৭ নম্বর আয়াতে:

"... আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি আনবেন।"

পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্পর্কে অনিশ্চিত থাকা একজনকে অধৈর্য, অকৃতজ্ঞতা এবং এমনকি অবৈধ জিনিসের প্রতিও, যেমন অবৈধ রিষিকের প্রতিও পরিচালিত করতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সমস্ত অসুবিধা অবশেষে স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিস্থাপিত হবে, সে ধৈর্য ধরে ইসলামের শিক্ষার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে এই পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করবে। কিন্তু এই আস্থার ভিত্তি হল ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করা যাতে একজন ব্যক্তি দৃঢ় ঈমান অর্জন করতে পারে। যার ঈমান যত শক্তিশালী হবে, সে তত বেশি আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকবে, বিশেষ করে, কঠিন সময়ে, জেনে যে সে শীঘ্রই মুক্তি পাবে। তবে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই ঐশ্বরিক সাহায্য মানুষের ইচ্ছা অনুসারে নয়। এটি সর্বদা মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অনুসারে। অতএব, এই ঐশ্বরিক সাহায্য সেই অনুযায়ী ঘটে যখন এটি মানুষের জন্য সর্বোত্তম এবং এমনভাবে যা তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, এই জেনে যে, তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য দান করা হবে, কোন না কোনভাবে, তা তাদের কাছে স্পষ্ট হোক বা না হোক। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কিন্তু যদি কেউ ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা যখনই সমস্যার সম্মুখীন হবে তখনই আল্লাহর হুকুম নিয়ে প্রশ্ন তুলবে, কারণ তারা বুঝতে ব্যর্থ হবে যে তাঁর হুকুমের পিছনে সর্বদা প্রজ্ঞা রয়েছে এবং তারা মৃত্যুর অনিবার্যতার মতো কিছু অনিবার্য বাস্তবতা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৪:

"... আর একদল নিজেদের সম্পর্কে চিন্তিত ছিল, সত্য ব্যতীত আল্লাহকে অন্য কিছু ভাবতে লাগলো - অজ্ঞতার চিন্তা করতে লাগলো, তারা বললো, "এই ব্যাপারে আমাদের কি কিছু করার আছে?" বলো, "নিশ্চয়ই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আল্লাহর।" তারা নিজেদের মধ্যে এমন কিছু গোপন করে যা তারা তোমাদের কাছে প্রকাশ করবে না। তারা বলে, "যদি আমরা এই ব্যাপারে কিছু করতে পারতাম, তাহলে আমরা [অর্থাৎ, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ] এখানেই নিহত হতাম না।" বলো, "যদি তোমরা তোমাদের ঘরের ভেতরে থাকতে, তবুও যাদের হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা তাদের মৃত্যুশয্যা বেরিয়ে আসতো।"..."

কঠিন সময়ে ধৈর্যশীল থাকার একটি দিক হল ভাগ্যের বাস্তবতা মেনে নেওয়া। যদিও একজন ব্যক্তিকে সর্বদা তার কর্ম এবং পছন্দের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে এবং ভাগ্যকে দোষারোপ করা এড়িয়ে চলতে হবে, তবুও, কিছু ক্ষেত্রে যা ব্যক্তির কর্মের বাইরে, যেমন অসুস্থ হয়ে পড়া, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে মহান

আল্লাহর পছন্দের পিছনে হিকমত রয়েছে, যদিও তারা তা পালন না করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

উদাহরণস্বরূপ, পরীক্ষার মাধ্যমে, মহান আল্লাহ মানুষের ছোট ছোট পাপ মুছে দেন, যতক্ষণ না তারা ধৈর্য ধারণ করে। ইমাম বুখারীর "আদাব আল মুফরাদ", ৪৯২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অধিকন্তু, মানুষকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষাগুলি একজন প্রকৃত মুমিনকে এমন ব্যক্তির থেকে আলাদা করে যারা কেবল মৌখিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দাবি করে। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৪:

"...[এটা] যাতে আল্লাহ তোমাদের বুকের ভেতরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পবিত্র করেন..."

একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক হৃদয়ের পরিশুদ্ধি তখনই ঘটে যখন কেউ সফলভাবে কোনও কঠিন সময়ে ধৈর্য ধরে থাকে এবং পরবর্তী সময়ে সেই কঠিন সময়ের পিছনে কিছু প্রজ্ঞা লক্ষ্য করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, এই অভিজ্ঞতা মহান আল্লাহর পছন্দ সম্পর্কে মানুষের মনে থাকা যেকোনো নেতিবাচক চিন্তাভাবনাকে শুদ্ধ করবে, যাতে পরবর্তী সমস্যার মুখোমুখি হলে তারা আরও ধৈর্য ধারণ করতে পারে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর আরও দৃঢ় থাকতে পারে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫৪:

"... তারা বলে, “যদি আমরা এই ব্যাপারে কিছু করতে পারতাম, তাহলে আমরা [অর্থাৎ, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ] এখানেই নিহত হতাম না।” বলা, “যদি তোমরা তোমাদের ঘরের ভেতরেও থাকতে, তবুও যাদের হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা অবশ্যই তাদের মৃত্যুশয্যা বেরিয়ে আসত।” [এটা] যাতে আল্লাহ তোমাদের অন্তরের কথা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরের কথা পবিত্র করেন..."

মৃত্যুর মাধ্যমে প্রিয়জনকে হারানোর ক্ষেত্রে, একজনকে বুঝতে হবে যে মৃত্যু অনিবার্য এবং অপরিবর্তনীয়। মহান আল্লাহ, প্রিয়জনের মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করেন যাতে যারা সত্যিকার অর্থে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে তাদের থেকে যারা বিশ্বাস করে না তাদের আলাদা করা যায়। যারা সত্যিকার অর্থে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, যেহেতু মহান আল্লাহ, সমস্ত জিনিস এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনিই একমাত্র অধিকার রাখেন যে তারা কখন মারা যাবে এবং তাঁর কাছে ফিরে যাবে তা বেছে নেওয়ার। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারা, আয়াত ১৫৫-১৫৭:

"আর আমরা অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, জ্ঞান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে, কিন্তু ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা বিপদে পড়লে বলে, "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব।" এরাই তারা যাদের উপর তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও করুণা রয়েছে। আর তারাই সঠিক পথে পরিচালিত।"

যে ব্যক্তি এই বাস্তবতা গ্রহণ করবে সে তাঁর পছন্দগুলিকে গ্রহণ করবে এবং তাঁর আনুগত্যে দৃঢ় থাকবে, যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫৪:

"...[এটা] যাতে আল্লাহ তোমাদের বুকের ভেতরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পবিত্র করেন। আর আল্লাহ বুকের ভেতরে যা আছে তা জানেন।"

যেহেতু একমাত্র মহান আল্লাহই জানেন মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়ে তাদের বিশ্বাস এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি তাদের মনোভাবের বিষয়ে কী লুকিয়ে আছে, তাই মহান আল্লাহ সুনির্দিষ্ট অসুবিধার সমাধান করেন যার লক্ষ্য তাঁর প্রতি তাদের বিশ্বাস পরীক্ষা করা এবং তাদের মধ্যে থাকা নেতিবাচক চিন্তাভাবনাকে শুদ্ধ করা। এইভাবে মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে পবিত্র করে, আল্লাহ তাঁর প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং আনুগত্যকে শক্তিশালী করেন যাতে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তাঁর দেওয়া আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করার উপর দৃঢ় থাকে, যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। অতএব, যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তা উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জনের একটি উপায়। এটি সেনাবাহিনীর সৈন্যদের মতো যারা ব্যবহারিক অনুশীলনের মাধ্যমে মহান অসুবিধার সম্মুখীন হয় যাতে তারা বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে এমন ভাল সৈনিক হয়ে ওঠে।

পরিশেষে, সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলা কাউকে তার সীমার বাইরে পরীক্ষা করেন না, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাঁর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যে কোনও অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারে। এই আনুগত্যের মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮৬:

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপান না..."

বিপদের সময় কেউ আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকুক বা না থাকুক, তিনি তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত এবং উভয় জগতেই তাদের জবাবদিহি করবেন। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫৪:

"... আর আল্লাহ বুকের ভেতরে যা আছে তা সম্পর্কে অবগত।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫৫:

উহুদে] দুই সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার দিন পিছু হটেছিল, তাদের কিছু[দোষের] কারণে শয়তান তাদের পদচ্যুত করেছিল..."

বিশেষ করে, এটি উহুদের যুদ্ধে যখন তীরন্দাজরা অনিচ্ছাকৃতভাবে মহানবী (সাঃ)-এর অবাধ্যতা করেছিল, তখনই ঘটেছিল। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে, প্রত্যেকেই এই পৃথিবীতে এবং পরকালে তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করতে হবে। এই পৃথিবীতে, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরিণতি ভোগ করা প্রায়শই সূক্ষ্ম। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে অবাধ্যতা করে, তার প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তার মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা ভারসাম্যহীন

হয়ে পড়ে এবং সে তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় নিয়ে যায়। ফলস্বরূপ, তাদের জীবনের সবকিছু, যেমন তাদের পরিবার, বন্ধুবান্ধব, ক্যারিয়ার এবং সম্পদ, তাদের জন্য চাপের উৎস হয়ে ওঠে। যদি তারা আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তাহলে তারা তাদের জীবনের ভুল জিনিস এবং মানুষদের, যেমন তাদের স্ত্রীকে, তাদের চাপের জন্য দোষারোপ করবে। যখন তারা এই ভালো মানুষদের তাদের জীবন থেকে বাদ দেয়, তখন এটি তাদের মানসিক ব্যাধি বৃদ্ধি করবে যতক্ষণ না তারা হতাশা, মাদকাসক্তি এবং এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতায় ডুবে যায়। অন্যদিকে, পরকালে ব্যক্তির কর্মের পরিণতি অনেক স্পষ্ট এবং স্পষ্ট হবে। অতএব, উভয় জগতেই তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার অনিবার্যতা উপলব্ধি করা উচিত, অন্যথায়, তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকবে এবং উভয় জগতেই কষ্ট পাবে। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

কিন্তু সর্বদা যেমন, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ বেঁচে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত আন্তরিক অনুতাপ এবং সংস্কারের দরজা সর্বদা খোলা থাকে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫৫:

"...কিন্তু আল্লাহ ইতিমধ্যেই তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং সহনশীল।"

আন্তরিক তওবার মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার উপর অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লিঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার পূরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

যখন মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুমিনদের প্রতি আহ্বান জানান, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের মৌখিক ঈমানের দাবি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্মই হল সেই প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজন ব্যক্তির অর্জন করা প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার এবং রহমত লাভ করতে পারে। ঠিক যেমন একটি ফলবান বৃক্ষ কেবল তখনই কার্যকর যখন তা ফল দেয়, তেমনি ঈমান কেবল তখনই কার্যকর যখন তা সংকর্ম করে। এই ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ মুসলিমদের অমুসলিমদের বিশ্বাস এবং কর্ম গ্রহণ না করার জন্য উৎসাহিত করেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৬:

" হে ঈমানদারগণ, তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা কাফের হয়েছে এবং যখন তাদের ভাইরা দেশে ভ্রমণ করেছিল অথবা যুদ্ধে বেরিয়েছিল, তখন তাদের সম্পর্কে বলেছিল, "যদি তারা আমাদের সাথে থাকত, তাহলে তারা মারা যেত না বা নিহত হত না।" ...

এই আয়াতে উল্লেখিত অমুসলিমদের কথা বলা হয়তো মদিনায় বসবাসকারী মুনাফিক এবং আহলে কিতাবদের কথা বলা হচ্ছে, যাদের আত্মীয়স্বজন আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি এই বিষয়টি উপলব্ধি করার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে, যদিও আত্মীয়স্বজনরা প্রায়শই তাদের জন্য ভালো কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করে, তবুও ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তারা তাদের ভুল কাজ করার পরামর্শ দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্ত্রী হয়তো তার স্বামীকে পরামর্শ দিতে পারেন যে, যখন সে কাজ থেকে বাড়ি ফিরে আসে, তখন তাকে স্থানীয় মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ পড়ার পরিবর্তে বাড়িতে নামাজ পড়া উচিত। সে হয়তো বিশ্বাস করতে পারে যে, এভাবে সে একজন ভালো স্ত্রীর মতো আচরণ করছে কারণ সে তার স্বামীর ক্লান্তি বিবেচনা করছে, তবুও সে কেবল তার স্বামীকে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিচ্ছে। তাগাবুন, আয়াত ১৪:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, তাই তাদের থেকে সাবধান থাকো। কিন্তু যদি তোমরা ক্ষমা করো, উপেক্ষা করো এবং ক্ষমা করো, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

যদিও একজন ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন প্রায়শই তাদের জন্য ভালোর উদ্দেশ্য রাখে, তবুও তারা তাদের বিভ্রান্ত করতে পারে। অতএব, একজন মুসলিমের জন্য প্রথমে ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্যদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়। দ্বিতীয়ত, উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা নির্দেশিত, যখনই কেউ তাদের ভুল পরামর্শ দেয়, তখন তাদের উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সঠিক আচরণ কী তা নমন্যভাবে উপদেশ দেওয়া এবং তাদের উপর রাগান্বিত না হওয়া। পরিশেষে, একজন মুসলিমের জন্য ইসলামী

জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে থাকা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা সর্বদা একে অপরকে ভালো উপদেশ দিতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, অজ্ঞ লোকেরা প্রায়শই অন্যদের ভুল উপদেশ দেয়, এমনকি তাদের উদ্দেশ্য ভালো হলেও।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫৬:

" হে ঈমানদারগণ, তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা কাফের হয়েছে এবং যখন তাদের ভাইরা দেশে ভ্রমণ করেছিল অথবা যুদ্ধে বেরিয়েছিল, তখন তাদের সম্পর্কে বলেছিল, "যদি তারা আমাদের সাথে থাকত, তাহলে তারা মারা যেত না বা নিহত হত না।" ...

সর্বদা মনে রাখা উচিত যে মৃত্যুর সময় এবং স্থান নির্ধারিত হওয়ায়, মানুষের আচরণ এই পরিণতি পরিবর্তন করতে পারে না। অতএব, মহান আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করার কোনও অর্থ হয় না, এই মিথ্যা বিশ্বাসের সাথে যে এটি তাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারে। যদি কোনও ব্যক্তির অনিবার্য মৃত্যু এসে থাকে, তবে তার জন্য মহান আল্লাহর আনুগত্য করে মৃত্যুবরণ করা অনেক ভালো, এই আশায় যে এই চূড়ান্ত সংকর্ম তাকে ক্ষমা করে জান্নাত লাভের কারণ হতে পারে। এছাড়াও, একজন ব্যক্তির কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তার আচরণ অন্য ব্যক্তির মৃত্যুর সময় বা স্থান পরিবর্তন করতে পারে, যেমন আত্মীয়স্বজন। এটি বিশ্বাস করলে কেবল অনুশোচনা এবং শোক বৃদ্ধি পাবে এবং ধৈর্য ধারণে বাধা সৃষ্টি হবে। এর অর্থ এই নয় যে তাদের কর্মের জন্য দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়, যেমন বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানো যা অন্যের মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করে। তবে এর অর্থ হল যে যেখানে তারা কোনও ভুল করেনি, সেখানে তাদের ভিন্নভাবে আচরণ না করার জন্য নিজেকে দোষারোপ করা উচিত নয় এই বিশ্বাস করে যে তারা তাদের প্রিয়জনের মৃত্যু রোধ

করতে পারত। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও শিশু স্কুল ভ্রমণে মারা যায়, তবে একজন মা বিশ্বাস করবেন না যে তিনি যদি তার সন্তানকে বাড়িতে রাখেন তবে তারা বেঁচে যেত। মৃত্যুর সময় এবং স্থান নির্ধারিত হওয়ায়, এইভাবে চিন্তা করা ভুল এবং কেবল শয়তানের দরজা খুলে দেয়, যে ব্যক্তিকে অধৈর্য দেখাতে এবং ভাগ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে উৎসাহিত করবে। সুনান ইবনে মাজাহ, ৪১৬৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৬:

"... অতএব আল্লাহ তাদের অন্তরে এই [ভুল ধারণা] অনুশোচনার কারণ করে দেন। আর আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান..."

অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, যেহেতু একমাত্র আল্লাহই জীবন ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তিনি সর্বদা মানুষের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়, তাদের অবশ্যই তাদের প্রিয়জনের মৃত্যুর অনিবার্যতা মেনে নিতে হবে। এটি তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে ধৈর্য ধরে থাকতে এবং ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করবে। কিন্তু যদি তারা এই সত্যটি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা অধৈর্য হয়ে পড়বে এবং আল্লাহ, মহানের অবাধ্য হবে। এবং এটি উভয় জগতে তাদের চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলা বৃদ্ধি করবে। যে পথই বেছে নাও, উভয় জগতেই তাদের জন্য জবাবদিহি করতে হবে কারণ তারা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচতে পারবে না। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫৬:

"... আর আল্লাহ তোমাদের কাজ দেখেন।"

এরপর মহান আল্লাহ মুসলিমদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, সর্বদা তাঁর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, বিশেষ করে জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে, এবং এর সাথে সম্পর্কিত পুরস্কার, সমস্ত পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করার চেয়ে অনেক ভালো। কারণ পরকালের আশীর্বাদ সর্বদা স্থায়ী এবং নিখুঁত হবে। অন্যদিকে, পার্থিব আশীর্বাদ সর্বদা অসম্পূর্ণ এবং ক্ষণস্থায়ী হবে। যে ব্যক্তি এই পার্থক্যটি বোঝে সে সর্বদা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করার চেয়ে, এমনকি যদি এটি তাদের মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় তবেও, মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকাকে পছন্দ করবে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত 157:

"আর যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ করো, তাহলে আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা তারা যা কিছু জমা করে তার চেয়ে উত্তম।"

আর যেহেতু সকল মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো তাদের চূড়ান্ত জবাবদিহিতার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া, তারা যতদিনই বেঁচে থাকুক না কেন, তাই তাঁর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকার জন্য আরও বেশি আগ্রহী হওয়া উচিত। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৮:

"আর তোমরা মারা যাও অথবা নিহত হও, আল্লাহর কাছেই তোমাদের একত্রিত করা হবে।"

এছাড়াও, সহীহ মুসলিমের ৭২৩২ নম্বর হাদীসে, নবী মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি যে অবস্থায় মারা গেছেন, সেই অবস্থায়ই তাকে পুনরুত্থিত করা হবে। সুতরাং, যদি তারা একজন অনুগত মুসলিম হিসেবে মারা যান, তাহলে বিচারের দিন তাদের একজন অনুগত মুসলিম হিসেবে পুনরুত্থিত করা হবে। এবং তাদের মৃত্যুর অবস্থা তাদের জীবনযাপনের ধরণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। যদি কেউ একজন অনুগত মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করেন, তাহলে তারা একজন অনুগত মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করবেন এবং পরবর্তীতে একজন অনুগত মুসলিম হিসেবে পুনরুত্থিত হবেন। অতএব, সর্বদা মহান আল্লাহকে কার্যত আনুগত্য করে একজন অনুগত মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন নিশ্চিত করতে হবে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত সঠিক আশীর্বাদ ব্যবহার করা জড়িত।

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৫৯-১৬০

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَأْمُرْ بِهِمْ لَخَلَفُ مَا كُنْتَ قَفًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا تُفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾
إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

“সুতরাং আল্লাহর রহমতে আপনি[অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাদের প্রতি কোমল ছিলেন। আর যদি আপনি[কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। অতএব, তাদের ক্ষমা করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করুন। আর যখন আপনি সিদ্ধান্ত নেন, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ[তাঁর উপর নির্ভরকারীদের] ভালোবাসেন।

যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাভূত হতে পারবে না; আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তাহলে তাঁর পরে আর কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহর উপরই মুমিনদের নির্ভর করা উচিত।”

উহুদের যুদ্ধের পর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কখনও সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, ভৎসনা করেননি বা তিরস্কার করেননি, যারা তাদের অবস্থান ত্যাগ করেছিলেন এবং উহুদের যুদ্ধে তাদের পরাজয়ের দিকে পরিচালিত করেছিলেন। এরপর আল্লাহ, মহিমাম্বিত, সূরা আলে ইমরানের ১৫৯ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"অতএব আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল ছিলে। আর যদি তুমি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতে, তাহলে তারা তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। অতএব, তাদের ক্ষমা করো, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাদের সাথে পরামর্শ করো। আর যখন তুমি সিদ্ধান্ত নিবে, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ [তাঁর উপর নির্ভরকারীদের] ভালোবাসেন।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী (সা.) এমন সংকটময় সময়ে সেনাবাহিনী ত্যাগ করার জন্য মুনাফিকদের সমালোচনাও করেননি। এতে তারা কেবল ক্রোধে পতিত হতো এবং ইসলাম থেকে আরও দূরে সরে যেত। পরিবর্তে তিনি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও দয়া প্রদর্শন করতে থাকেন এই আশায় যে তারা এই করুণার কাজটিকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করবে এবং আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে এবং ইসলাম গ্রহণ করবে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর " প্রভুর (সা.)-এর নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২০৩-১২০৪-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি সকল পরিস্থিতিতেই নম্রতা এবং ভদ্রতা প্রদর্শনের গুরুত্ব নির্দেশ করে। অন্যদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা, যেমন আত্মীয়স্বজনদের, কঠোর মনোভাব গ্রহণের চেয়ে সঠিক পথ দেখানোর ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকর উপায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৭০১

নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯:

" অতএব আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল ছিলে। আর যদি তুমি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতে, তাহলে তারা তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

অন্যদের প্রতি কঠোর আচরণ তাদের সঠিক নির্দেশনা অনুসরণ করতে নিরুৎসাহিত করবে। দুঃখের বিষয় হল, এই কঠোরতাই প্রধান কারণ, যখন অমুসলিম এবং মুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে শেখা থেকে নিরুৎসাহিত হয়, যখন তারা মুসলমানদের কঠোর মনোভাব দেখে, বিশেষ করে যারা অন্যদের ইসলামের দিকে আহ্বান করার জন্য জোর দেয়, যদিও তাদের কাছে সঠিক ইসলামী জ্ঞান বা আচরণ নেই। মুসলিমদের জন্য সঠিক ইসলামী আচরণ এবং জ্ঞান গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা বাইরের বিশ্বের কাছে ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে যাতে অমুসলিম এবং অন্যান্য মুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে আরও জানতে উৎসাহিত হয়। যেহেতু বাইরের বিশ্বের কাছে ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য, তাই উভয় জগতেই তারা এর জন্য দায়ী থাকবে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর অবাধ্যতা, যেমন পাপের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা উচিত, কিন্তু এই কঠোরতার মধ্যেও মানুষের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা উচিত। এটাই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্র। তিনি পাপ কর্মের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু মানুষের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাদেরকে নম্রতার সাথে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করেছিলেন।

উপরন্তু, আলোচ্য মূল ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর তাঁর সাহাবীদের সমালোচনা করার অধিকার ছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, কিন্তু তিনি তা করার অধিকারকে নম্রতার দৃষ্টিতে ত্যাগ করেছিলেন। এটি ইঙ্গিত করে যে, নম্রতার একটি দিক হল অন্যদের জন্য কাজ সহজ করার জন্য নিজের অধিকার ত্যাগ করা। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম বিপরীত মনোভাব গ্রহণ করেছেন যেখানে তারা সর্বদা তাদের পূর্ণ অধিকার এবং অন্যদের কাছ থেকে আরও বেশি দাবি করে। এই মনোভাব মানুষের মধ্যে, যেমন বিবাহিত দম্পতি এবং আত্মীয়দের মধ্যে ঝগড়ার একটি প্রধান কারণ। একজন মুসলিমকে অবশ্যই আল্লাহর অধিকার সম্পর্কে বেশি চিন্তিত হতে হবে এবং অন্যদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করতে হবে। উপরন্তু, তাদের নিজেদের অধিকার পূরণের চেয়ে মানুষের অধিকার পূরণের বিষয়ে বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত। আল্লাহ, মহান, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে তারা মানুষের অধিকার পূরণ করেছে কিনা এবং তিনি অন্যদেরও জিজ্ঞাসা করবেন যে তারা তাদের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই সেই বিষয়ের প্রতি উদ্বিগ্ন থাকতে হবে যা আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করবেন, অর্থাৎ অন্যদের অধিকার, তাদের নিজস্ব অধিকার নয়। অধিকন্তু, সর্বদা নিজের অধিকারের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করলে একজন ব্যক্তি কেবল দুঃখিত এবং তিক্ত হবেন, কারণ তারা সর্বদা বিশ্বাস করবেন যে কেউ তাদের অধিকার সঠিকভাবে পূরণ করে না, বিশেষ করে যখন এই প্রত্যাশাগুলি ইসলামী জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অতএব, এই ব্যক্তি এই পৃথিবীতে কখনও সন্তুষ্ট হবে না কারণ তারা সর্বদা বিশ্বাস করবে যে তাদের অধিকার অন্যরা পূরণ করেনি। এছাড়াও, এই মনোভাব গ্রহণ করলে কেবল অন্যরা তাদের থেকে দূরে সরে যায়, কারণ এই ধরনের ব্যক্তির প্রতি বিরক্ত হওয়া সহজ, এমনকি যদি তারা তাদের প্রিয়জন হয়, যেমন একজনের বাবা-মা।

উপরন্তু, ইসলাম মুসলমানদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যের ভুল ক্ষমা করতে শেখায়। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯:

"... তাহলে তাদের ক্ষমা করো..."

এটি তাদেরকে ক্ষমা করার জন্য মহান আল্লাহর দিকে পরিচালিত করবে। ২৪তম অধ্যায় আন নূর, আয়াত ২২:

"...এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

সর্বদা মনে রাখা উচিত যে মানুষ যেহেতু ফেরেশতা নয়, তাই তারা ভুল করতে বাধ্য, ঠিক যেমন তারা নিজেরাই ভুল করে। এবং যেমন তারা চায় যে মহান আল্লাহ এবং মানুষ তাদের ভুল ক্ষমা করুক, তেমনি তাদের অন্যদের ভুলও ক্ষমা করতে শেখা উচিত। এটা বোধগম্য যে একজন ব্যক্তি অন্যকে ক্ষমা করার জন্য সংগ্রাম করতে পারে যা চলমান, যেমন ট্র্যাফিক দুর্ঘটনার পরে অক্ষম হয়ে যাওয়া। যদি তারা এই ক্ষেত্রেও ক্ষমা করার চেষ্টা করতে পারে তবে তাদের জন্য পুরস্কার আরও বেশি হবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কারও সাথে করা অন্যায় চলমান নয়, একজন ব্যক্তির উচিত অন্যদের ক্ষমা করা এবং ক্ষোভ পুষে রাখা নয়। যে ব্যক্তি এই ধরনের ক্ষোভ পুষে রাখে তার ভয় করা উচিত যে, আল্লাহ, মহামহিম, কিয়ামতের দিন তাদের কর্ম পরীক্ষা করবেন, ঠিক যেমন তারা এই পৃথিবীতে মানুষের ভুল পরীক্ষা করে ধরে

রেখেছে। যার কর্ম বিচারের দিন যাচাই করা হবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। সহীহ বুখারীতে ১০৩ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যদের ক্ষমা করার অর্থ হল নিজেকে অন্যদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়। ধৈর্য এবং অন্যদের ক্ষমা করার অর্থ এমন নিষ্ক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করা নয় যার মাধ্যমে কেউ অন্যদের তাদের উপর অন্যায় করতে দেয় এবং তারা আবার ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। এই নিষ্ক্রিয় মনোভাবের সাথে ইসলামের শিক্ষার কোনও সম্পর্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ, একজন মহিলা যিনি তার স্বামীর দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন, তাকে নিজেকে এবং তার সন্তানদের রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে, এমনকি যদি এর জন্য পুলিশকে ডেকে তাকে ছেড়ে দেওয়াও হয়। নিজেকে এবং তার সন্তানদের তার ক্ষতি থেকে রক্ষা করার এবং তার জীবন চালিয়ে যাওয়ার পরে, সে এই পৃথিবীতে, সরকারের মাধ্যমে ন্যায়বিচার চাইতে পারে এবং বিচারের দিনে আল্লাহর কাছে ন্যায়বিচার চাইতে পারে। কিন্তু যদি সে তার বিরুদ্ধে করা অতীতের ভুলের জন্য তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করতে পারে, তাহলে তার ক্ষমা হবে।

উপরন্তু, একজন মুসলিমকে কেবল অন্যদের ভুল ক্ষমা করার পরামর্শ দেওয়া হয়নি, বরং তাদের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯:

"... এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো..."

যে ব্যক্তি এভাবে অন্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে, সে উভয় জাহানে মহান আল্লাহর রহমত লাভ করবে। সুনানে আবু দাউদের ৪৯৪১ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও, যে ব্যক্তি অন্যদের অনুপস্থিতিতে তাদের জন্য ভালো কিছু, যেমন তাদের ক্ষমা, তার জন্য ফেরেশতাদের দোয়া কবুল করা হবে। সহীহ মুসলিমের ৬৯২৭ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এভাবে আচরণ করা অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ, যা সহীহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিস অনুসারে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক সাহায্যের মতো সামর্থ্য অনুসারে অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত। অন্যদের প্রতি আন্তরিকতা অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল তাদের সাথে এমন আচরণ করা যা তারা নিজেরাও অন্যদের দ্বারা আচরণ করা হোক তা চায়।

মহান আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতে আদেশ করেছেন, যাদের ভুল উল্হদের যুদ্ধে পরাজয়ের দিকে পরিচালিত করেছিল। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯:

"...এবং এই বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো..."

এটি ইঙ্গিত দেয় যে অতীতে করা ভুলের কারণে কারও ভালো দিক, যেমন তার ভালো পরামর্শ, উপেক্ষা না করার গুরুত্ব কত। সম্প্রসারিতভাবে, একজন ব্যক্তি যখনই কোনও পাপ করে তখন তার অতীতের ভালো দিক ভুলে যাওয়া উচিত নয়। একমাত্র মহান আল্লাহই জানেন যে একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা তার ভালো কাজ মুছে দেয় কিনা, তাই একজন মুসলিমের উচিত নয় যে একজন ব্যক্তির ভালো কাজ তার কৃত পাপের কারণে মুছে গেছে। পরিবর্তে, একজনের সর্বদা অন্যদের ভালো দিক মনে রাখা উচিত যাতে তারা তাদের ভুল উপেক্ষা করে এবং তাদের আন্তরিকভাবে

অনুতপ্ত হতে এবং তাদের আচরণ সংশোধন করতে উৎসাহিত করে। এই মনোভাব অন্যদের পাপের জন্য নিন্দা করার চেয়ে তাদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯:

"...এবং এই বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো..."

যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন ঐশী নির্দেশিত এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তবুও তাঁকে অন্যদের সাথে পরামর্শ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এটি নিজের কাজে অন্যদের সাথে পরামর্শ করার গুরুত্বকে নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে, নিম্নলিখিত আয়াতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সৎকর্মের সাথে অন্যদের সাথে পরামর্শ করাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। সূরা ৪২ আশ শুরা, আয়াত ৩৮:

"এবং যারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ মেনে নিয়েছে, নামায কায়েম করেছে, তাদের কাজকর্ম পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন ব্যক্তির উচিত তাদের বিষয়বস্তুতে কার সাথে পরামর্শ করা উচিত তা সাবধানতার সাথে নির্বাচন করা এবং এই ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত যারা তাদের বিষয়ে জ্ঞানী। উদাহরণস্বরূপ, যার চিকিৎসা সমস্যা আছে তার উচিত চিকিৎসা জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা, যেমন একজন চিকিৎসা চিকিৎসক। এবং যিনি ধর্মীয় পরামর্শ চান তার উচিত ধর্মীয় জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা, যেমন একজন পণ্ডিতের সাথে। দুঃখের বিষয় হল, পার্থিব বিষয়ে, মুসলিমরা প্রায়শই বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে তারা প্রায়শই যে কোনও অজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ অনুসরণ করে। উপরন্তু, কেবলমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, কারণ তারাই একমাত্র প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং তারা কখনও অন্যদেরকে কোনও পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহকে অমান্য করার পরামর্শ দেবে না। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ২৮:

"... আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, কেবল তারাই ভয় করে..."

অতএব, কেবলমাত্র তাদের সাথেই পরামর্শ করা উচিত যারা সঠিক জ্ঞানের অধিকারী এবং যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। অন্যথায় তারা অন্ধভাবে তাদের অনুসরণ করবে যারা তাদের বিভ্রান্ত করবে, যদিও এটি তাদের উদ্দেশ্য নয়। ১৫৯ আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, যদিও তাদের বিষয়ে সঠিক ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা উচিত, তবুও ব্যক্তিটির নিজেরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত কারণ সিদ্ধান্তের পরিণতি তাদের ভোগ করতে হবে। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯:

"...এবং এই বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো। এবং যখন তুমি সিদ্ধান্ত নিবে..."

দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম অন্যদের কাছ থেকে তাদের পরামর্শ মেনে চলার প্রত্যাশা করে, যদিও তাদের পরামর্শের পরিণতি তাদের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে না, যেমন বাবা-মা তাদের সন্তানকে সম্ভাব্য জীবনসঙ্গী সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া। একজন উপদেষ্টার ভূমিকা অন্য ব্যক্তির উপর তাদের মতামত বা পছন্দ চাপিয়ে দেওয়া নয়। তাদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে আন্তরিকভাবে অন্যদের পরামর্শ দিতে হবে, তবে তারা যাকে পরামর্শ দিচ্ছেন তাকে তাদের নিজস্ব পছন্দ করার সুযোগ দিতে হবে, কারণ তাদের পছন্দের পরিণতি ভোগ করতে হবে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা এমন একটি সিদ্ধান্ত নেবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং তা করার পরে তাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, একমাত্র মহান আল্লাহ যে সিদ্ধান্ত নেবেন তা তাদের জন্য সর্বোত্তম হবে, এমনকি যদি তারা ফলাফলের পিছনের প্রজ্ঞাগুলি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত, সঠিকভাবে আল্লাহ প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে, মহান আল্লাহর আনুগত্য অব্যাহত রাখবে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত 159:

"... আর যখন তুমি সিদ্ধান্ত নিবে, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করো। নিশ্চয়ই, আল্লাহ [তাঁর উপর] নির্ভরকারীদের ভালোবাসেন।"

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহর পছন্দ মেনে নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা অধৈর্য হয়ে পড়বে এবং প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তাঁর অবাধ্য হবে। এটি তাদের চাপ এবং ঝামেলা আরও বাড়িয়ে তুলবে, কারণ তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হবে এবং তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল স্থানে ফেলবে।

এরপর মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দেন, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে, কারণ এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই তাঁর সমর্থন পাবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬০:

" যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাভূত হতে পারবে না..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ঐশ্বরিক সাহায্য তখনই পাওয়া যায় যখন মুসলমানরা প্রকৃত ঈমান গ্রহণের শর্ত পূরণ করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৯:

"সুতরাং তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, যদি তোমরা [সত্যিকারের] বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।"

এর মধ্যে রয়েছে কর্মের মাধ্যমে তাদের মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করা। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। যদি মুসলমানরা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী না হয় তবে এর কারণ হল তারা প্রকৃত বিশ্বাসের শর্ত পূরণ করেনি।

যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে, তাহলে সে পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও সাফল্য এবং মানসিক শান্তি পাবে না, কারণ সে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচতে পারবে না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬০:

"... কিন্তু যদি তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহলে তাঁর পরে কে আছে যে তোমাকে সাহায্য করতে পারে?"...

এবং অধ্যায় ৫৩ আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

অধিকন্তু, যখন কেউ আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়, তখন তাকে প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করে, এটি তাকে একটি ভারসাম্যহীন মানসিক ও শারীরিক অবস্থার দিকে নিয়ে যায় এবং তার জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় নিয়ে যায়। এটি উভয় জগতেই তাদের চাপ এবং ঝামেলা বৃদ্ধি করবে। সূরা তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ্ বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"]"

অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সুস্থ করতে এবং তার জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান কখনই এই ফলাফল অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের কারণে জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান আছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণের সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে তাদের জন্য যে ঐশ্বরিক সাহায্য প্রদত্ত হয় তা মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে হয় না। এটি সর্বদা মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অনুসারে হয়। অতএব, এই ঐশ্বরিক সাহায্য সেই অনুযায়ী ঘটে যখন এটি মানুষের জন্য সর্বোত্তম এবং এমনভাবে যা তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, এই জেনে যে, তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য দান করা হবে, কোন না কোনভাবে, তা তাদের কাছে স্পষ্ট হোক বা না হোক। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৬০:

"... আর মুমিনদের আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার অর্থ হলো ইসলামের শিক্ষা অনুসারে একজন ব্যক্তিকে তিনি যে সম্পদ দিয়েছেন তা ব্যবহার করা এবং তারপর এই কথা মেনে নেওয়া যে, মহান আল্লাহ তার জন্য সর্বোত্তম ফলাফল বেছে নেবেন, এমনকি যদি তারা তাঁর পছন্দের পিছনের হিকমত পর্যবেক্ষণ নাও করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন অসুস্থ ব্যক্তির উচিত তাদের জন্য উপলব্ধ বৈধ ওষুধ গ্রহণ করা এবং তারপর তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে কিনা তা বিবেচনা করে আল্লাহর পছন্দ মেনে নেওয়া। অতএব, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার অর্থ হল প্রদত্ত সম্পদ পরিত্যাগ করা নয়। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬০:

"... আর মুমিনদের আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত।"

পরিশেষে, এই আয়াতটি আরও ইঙ্গিত করে যে, কেবলমাত্র প্রকৃত মুমিনরাই সঠিকভাবে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করবে এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলবে। ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা বলতে বোঝায় আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখা, একই সাথে উভয় জগতে তাঁর রহমত ও ক্ষমার আশা করা। ইসলামে এই মনোভাবের কোন মূল্য নেই। অন্যদিকে, প্রকৃত আশা বলতে বোঝায় আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং নিজের আচরণ সংশোধন করা এবং তারপর উভয় জগতে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করা। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পার্থক্যটি আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, একজনকে অবশ্যই এই পার্থক্যটি উপলব্ধি করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে তারা মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার প্রকৃত আশা গ্রহণ করবে এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ ইসলামে এর কোন মূল্য নেই।

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৬১ - ১৬৪

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَيَسَّرُ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِرَاطٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

"কোন নবীর জন্য এটা সম্ভব নয় যে তিনি [যুদ্ধের মাল সম্পর্কে] বিশ্বাসঘাতকতা করবেন। আর যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করবে, [অবৈধভাবে গ্রহণ করবে], সে কিয়ামতের দিন যা নিয়েছে তা নিয়ে আসবে। তারপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"

তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির পিছনে ছুটে, সে কি তার মতো যে আল্লাহর ক্রোধ নিজের উপর আনে এবং যার ঠিকানা জাহান্নাম? আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!

আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা বিভিন্ন এবং তারা যা কিছু করে আল্লাহ তা দেখেন।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের উপর [মহান অনুগ্রহ করেছেন] যখন তিনি তাদের মধ্যে তাদেরই একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ

পাঠ করেন, তাদের পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন,
যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।"

আয়াত ১৬১ অবতীর্ণ হয় এবং কেউ কেউ মন্তব্য করেন যে সম্ভবত নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এটি নিয়েছিলেন। জামে আত তিরমিযী, ৩০০৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে। যদি এই বক্তব্যটি কোন সাহাবী (রাঃ) দ্বারা করা হয়ে থাকে, তাহলে এর অর্থ হল তারা ধরে নিয়েছিল যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এটিকে কেবল তার অধিকার হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ, তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর কোন পাপের অভিযোগ আনেননি। অন্যদিকে, যদি বিবৃতিটি কোন মুনাফিক বা আহলে কিতাবদের দ্বারা করা হয়ে থাকে, তাহলে তারা তাকে পাপের অভিযোগ এনে তা করেছিলেন। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ১৬১:

"কোন নবীর জন্য এটা [যোগ্য] নয় যে তিনি [যুদ্ধের মাল সম্পর্কে] অবিশ্বস্ততা করবেন..."

এই ঘটনাটি অন্যদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা করার আগে তাদের সন্দেহের সুবিধা দেওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদের ৪৯৯৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে পরামর্শ দিয়েছেন যে, অন্যদের সম্পর্কে ইতিবাচকভাবে চিন্তা করা মহান আল্লাহ তায়ালার সঠিক উপাসনার একটি দিক। অর্থাৎ, এটি তাঁর আনুগত্যের একটি দিক। অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই অনুমান এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এর ফলে প্রায়শই পাপ হয়, যেমন গীবত, অপবাদ এবং অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। ৪৯ সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ১২:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক [নেতিবাচক] অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কিছু অনুমান পাপ..."

বরং, একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের কথা ও কাজকে ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যদি না এর স্পষ্ট প্রমাণ অন্যথায় থাকে। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিমকে অবশ্যই সরল ও নির্বোধ হতে হবে, কারণ ব্যবসায়িক লেনদেনের মতো প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের সতর্কতার সাথে প্রবেশ করতে হবে, কিন্তু একই সাথে তাদের প্রমাণ ছাড়াই অন্যদের খারাপ ধারণা করা উচিত নয়। অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা ভাঙা এবং সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার দিকে পরিচালিত করে, কারণ এই ক্ষেত্রে মানুষের সামাজিকীকরণ এবং অধিকার পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। যারা অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন এবং যারা এই ধরনের আচরণ করেন তাদের সাথে আচরণ করেন তাদের পক্ষে এটি কঠিন হয়ে পড়ে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৬১:

"কোন নবীর জন্য এটা [যোগ্য] নয় যে তিনি [যুদ্ধের মাল সম্পর্কে] অবিশ্বস্ততা করবেন..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলিমদের অবশ্যই নবীদের উপর তাদের ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করতে হবে, যেমন তাদের আমানত এবং প্রতিশ্রুতি পূরণ করার মাধ্যমে। তাদের এবং আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং তাদের এবং অন্যান্য মানুষের মধ্যে আমানত পূরণ করতে হবে। আল্লাহ, মহিমান্বিত, একজন ব্যক্তিকে যে প্রতিটি আমানত দিয়েছেন তা হল একটি আমানত যা সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত এই আমানতগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। উপরন্তু, মানুষের মধ্যে আমানত উভয়ের মধ্যে সম্মত শর্ত অনুসারে

পূরণ করতে হবে। এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে এমন আচরণ করে যা তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়। যেহেতু ইসলাম একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি, তাই যে আমানতগুলি পূরণ করতে হবে তার মধ্যে ধর্মীয় আমানত, যেমন তাকে প্রদত্ত আমানত এবং পার্থিব আমানত, যেমন ব্যবসায়িক চুক্তি। যে ব্যক্তি আমানত এবং প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তাকে উভয় জগতেই এর জন্য দায়ী করা হবে। এই পৃথিবীতে, একজন ব্যক্তি তাদের আমানতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করে তা তাদের জন্য চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, অবৈধ উপায়ে অর্জিত যেকোনো সম্পদ বা পার্থিব জিনিসপত্র তার ধারকদের জন্য কেবল অভিশাপ হয়ে উঠবে কারণ অবৈধভাবে অর্জিত জিনিসপত্র দিয়ে তারা যে সমস্ত সৎকর্ম করে তা আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করবেন এবং যদি তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয় তবে উভয় জগতেই তাদের পাপ এবং শাস্তি বৃদ্ধি করবে। কারণ ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল উপার্জন এবং ব্যবহার, ঠিক যেমন ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি হল নিয়ত। যদি কারো ভিত্তি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তা থেকে যা কিছু আসে তা দুর্নীতিগ্রস্ত হবে এবং তাই আল্লাহ তাআলা তা প্রত্যাখ্যান করবেন, এমনকি যদি তা ভালো কাজও হয়। বিচারের দিনে যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে তার পরিণতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না। অধ্যায় ১৭ আল ইসরা, আয়াত ৩৪:

"...এবং [প্রত্যেক] অঙ্গীকার পূর্ণ করো। নিশ্চয় অঙ্গীকার সর্বদা [যার বিষয়ে] জিজ্ঞাসা করা হবে।"

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৬১:

"... আর যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, [অবৈধভাবে গ্রহণ করে], সে কিয়ামতের দিন যা নিয়েছে তা নিয়েই আসবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"

অতএব, এই আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা সর্বদা সঠিক আচরণ করবে এবং ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে, মনে রেখে যে তাদের প্রতিটি উদ্দেশ্য, কথা এবং কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকাকালীন সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে তাদের জীবনের মধ্যে রাখবে। অতএব, এই মনোভাব উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতাকে অপব্যবহার করে তাদের প্রদত্ত অনুগ্রহের অপব্যবহার করে ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে না, সে তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল স্থানে রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। অতএব, এই মনোভাব উভয় জগতেই চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করবে, এমনকি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও। অধ্যায় 3 আলী ইমরান, আয়াত 162:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির পিছনে ছুটছে সে কি তার মতো যে আল্লাহর ক্রোধ নিজের উপর আনে এবং যার ঠিকানা জাহান্নাম? আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।"

অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সুষম করতে এবং তার জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান কখনই এই ফলাফল অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের কারণে জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান আছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণের সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৬১:

"... আর যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, [অবৈধভাবে গ্রহণ করে], সে কিয়ামতের দিন যা নিয়েছে তা নিয়েই আসবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"

এছাড়াও, এই আয়াতটি সহীহ মুসলিমের ৭২৩২ নম্বর হাদিসের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি যে অবস্থায় মারা গেছেন, সেই অবস্থাতেই তাকে পুনরুত্থিত করা হবে। সুতরাং যদি তারা একজন অনুগত মুসলিম হিসেবে মারা যান, তাহলে তাকে বিচারের দিন একজন অনুগত মুসলিম হিসেবে পুনরুত্থিত করা হবে। এবং তার মৃত্যুর অবস্থা তার জীবনযাপনের ধরণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। যদি কেউ একজন অনুগত মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করেন, তাহলে তিনি একজন অনুগত মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করবেন এবং পরবর্তীতে একজন অনুগত মুসলিম হিসেবে পুনরুত্থিত হবেন। অতএব, একজন ব্যক্তিকে সর্বদা আল্লাহ তাআলার কার্যত আনুগত্য করে একজন অনুগত মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন নিশ্চিত করতে হবে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে বর্ণিত সঠিক অনুগ্রহগুলো ব্যবহার করা জড়িত। একজন ব্যক্তিকে একজন অবাধ্য মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করার এবং তারপর একজন অনুগত মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করার এবং পুনরুত্থিত হওয়ার আশা করার মূর্থতা এড়িয়ে চলতে হবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬২:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির পিছনে ছুটছে সে কি তার মতো যে আল্লাহর ক্রোধ নিজের উপর আনে এবং যার ঠিকানা জাহান্নাম? আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।"

এই আয়াতটি ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার ভ্রান্ত বিশ্বাসকে দূর করে। ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার অর্থ হলো উভয় জগতে তাঁর রহমত ও ক্ষমার আশা করে আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকা। ইসলামে এই মনোভাবের কোন মূল্য নেই। অন্যদিকে, প্রকৃত আশা হলো আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং নিজের আচরণ সংশোধন করা এবং তারপর উভয় জগতে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা

করা। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এই পার্থক্যটি আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, এই পার্থক্যটি উপলব্ধি করা উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার প্রতি প্রকৃত আশা গ্রহণ করে এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ ইসলামে এর কোন মূল্য নেই। ৩য় অধ্যায় আলী ইমরান, আয়াত ১৬২:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির পিছনে ছুটছে সে কি তার মতো যে আল্লাহর ক্রোধ নিজের উপর আনে এবং যার ঠিকানা জাহান্নাম? আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।"

পরিশেষে, সমগ্র সৃষ্টি মহান আল্লাহর আওতাধীন এবং তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারাধীন, একজন ব্যক্তির তাঁর নিয়ম মেনে চলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট দেশের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তেমনি মহাবিশ্বের মালিকের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতেই তার সমস্যা হবে। একজন ব্যক্তি যদি তার নিয়ম মেনে চলতে না পারে তবে একটি দেশ ছেড়ে যেতে পারে কিন্তু এমন জায়গায় পালিয়ে যেতে পারবে না যেখানে মহান আল্লাহর নিয়ম ও এখতিয়ার প্রযোজ্য হয় না। একজন ব্যক্তি তার সমাজের নিয়ম পরিবর্তন করতে সক্ষম হতে পারে কিন্তু তারা কখনও মহান আল্লাহর নিয়ম পরিবর্তন করতে পারবে না। উপরন্তু, ঠিক যেমন একজন বাড়ির মালিক ঘরের নিয়ম নির্ধারণ করে, এমনকি অন্যরা এই নিয়মের প্রতি আপত্তি জানালেও, একইভাবে, মহাবিশ্ব মহান আল্লাহর, এবং তাই, তিনিই একমাত্র এই মহাবিশ্বের নিয়ম নির্ধারণ করেন, মানুষ এই নিয়ম পছন্দ করুক বা না করুক। অতএব, এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে, নিজের স্বার্থে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে সে মহান আল্লাহর বিধান মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। একজন ব্যক্তি হয় আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের

পিছনের হিকমতগুলি শেখার চেষ্টা করতে পারে, যাতে সে বুঝতে পারে যে কীভাবে সেগুলি তাদের এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য উপকারী এবং কীভাবে তারা উভয় জগতে মানসিক ও শারীরিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, অথবা সে তার আকাঙ্ক্ষার উপাসনা করতে পারে এবং ইসলামের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলামী নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তার উচিত উভয় জগতেই তার পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং কোনও আপত্তি, প্রতিবাদ বা অভিযোগ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৬২:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির পিছনে ছুটছে সে কি তার মতো যে আল্লাহর ক্রোধ নিজের উপর আনে এবং যার ঠিকানা জাহান্নাম? আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।"

মনের শান্তির পথ এবং চাপ ও অসুবিধার পথ মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব, কোন পথ অনুসরণ করতে চান তা মানুষের উপর নির্ভর করে। তবে তাদের জানা উচিত যে উভয় জগতেই প্রতিটি ব্যক্তিকে তার উদ্দেশ্য, কথা এবং কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৬৩:

"আল্লাহর কাছে তাদের বিভিন্ন মর্যাদা রয়েছে, আর তারা যা কিছু করে আল্লাহ তা দেখেন।"

এই আয়াতটি মানুষের মধ্যে আশা জাগায় কারণ প্রতিটি ব্যক্তিরই তাদের আচরণ উন্নত করার শক্তি এবং ক্ষমতা থাকে যাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সৎকর্মশীলদের সর্বদা আরও ভালো করার সুযোগ থাকবে যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা অন্তর্ভুক্ত। এবং অসৎকর্মকারীর সর্বদা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া এবং তাদের চরিত্র সংশোধন করার সুযোগ থাকবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জনের স্তরে পৌঁছাতে পারে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহ এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং মানুষের প্রতি লজ্জিত যেকোনো অধিকারের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। মর্যাদা বৃদ্ধির পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস শেখা এবং তার উপর আমল করা। পরবর্তী আয়াতে এটি নির্দেশ করা হয়েছে। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৬৪:

" নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের উপর [মহান] অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের মধ্যে তাদেরই একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদের পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।"

প্রথমত, লক্ষ্য করার বিষয় হলো, মহান আল্লাহর অনুগ্রহ কৃতজ্ঞতার সাথেই পূরণ করতে হবে। কারো কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হলো ভালো কথা বলা অথবা নীরব থাকা। আর কারো কাজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হলো, তাকে প্রদত্ত অনুগ্রহগুলো এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন, যেমনটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৬৪:

" নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের উপর[মহান] অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের মধ্যে তাদেরই একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করতেন..."

এই আয়াতটি আরও ইঙ্গিত করে যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য থেকে কেবল মুমিনরাই উপকৃত হবে। কারণ মুমিনদের ঈমান ইসলামী জ্ঞানের উপর নিহিত, অন্যদিকে মুসলিমদের ঈমান অন্যদের অনুকরণের উপর নিহিত, যেমন তার পিতামাতা। অতএব, একজন মুসলিম যতক্ষণ ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন এবং বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে না, ততক্ষণ সে তা থেকে ততটা উপকৃত হবে না। সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ১৪:

" বেদুইনরা বলে, "আমরা ঈমান এনেছি।" বোলো, "তোমরা[এখনও] ঈমান আননি; বরং বোলো, 'আমরা আত্মসমর্পণ করেছি, কারণ ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি..."

অতএব, একজন ব্যক্তিকে ইসলামী শিক্ষা শেখার এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে একজন বিশ্বাসীর স্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস থেকে সর্বাধিক উপকৃত হতে পারে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৬৪:

" নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের উপর[মহান] অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের মধ্যে তাদেরই একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন..."

এটি মক্কার অমুসলিমদের মনে করিয়ে দেয় যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের কাছে অপরিচিত ছিলেন না কারণ তিনি নবুওয়ত ঘোষণার আগে তাদের মধ্যে তাঁর জীবনের চল্লিশ বছর অতিবাহিত করেছিলেন। তারা তাঁকে তাদের সমাজের মধ্যে বিশ্বস্ত ও সৎ ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করতেন এবং সর্বদা তাঁর অতুলনীয় চরিত্রের প্রশংসা করতেন, এটাই তাদের তাঁর বাণী গ্রহণের জন্য যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর শৈশবে মহানবী (সাঃ) সর্বদা মহান আল্লাহর সুরক্ষায় ছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে জাহেলিয়াতের যুগে অর্থাৎ ইসলামের পূর্ববর্তী সময়ে যেসব মন্দ কাজ ছড়িয়ে পড়েছিল, তা থেকে রক্ষা করেছিলেন। যখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পরিণত বয়সে পৌঁছেছিলেন, তখন তিনি তাঁর জাতির মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, চরিত্র ও খ্যাতিতে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম, প্রতিবেশীদের মধ্যে সর্বোত্তম, সবচেয়ে বিচক্ষণ, কথাবার্তায় সবচেয়ে সৎ এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। এই কারণে, তিনি মক্কার লোকদের মধ্যে বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ইমাম ইবনে কাথিরের "দ্য লাইফ অফ দ্য প্রফেট", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় ১০ ইউনুস, আয়াত ১৬:

"... কারণ আমি এর আগে তোমাদের মধ্যে এক জীবনকাল কাটিয়েছি। তাহলে কি তোমরা বুঝতে পারবে না?"

তবুও, মক্কার অনেক অমুসলিম নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যবাদিতা প্রত্যাখ্যান করেছিল, যা তারা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিল, কারণ তারা তাদের সমাজে তাদের সামাজিক অবস্থান হারানোর ভয়ে এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকার ভয়ে। সূরা ৪৩ আয যুখরুফ, আয়াত ৭৮:

"আমরা তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যের প্রতি বিমুখ ছিলো।"

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৫১:

"যেমন আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি..."

এটি এই বিষয়টিকেও নির্দেশ করতে পারে যে আহলে কিতাবরা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং পবিত্র কুরআনকে চিনতে পেরেছিলেন যেমনটি তাদের ঐশী গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

ইসলাম গ্রহণের জন্য এটাই যথেষ্ট কারণ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাদের অনেকেই সমাজে তাদের সামাজিক অবস্থান হারানোর ভয়ে এবং মহান আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতগুলোর অপব্যবহার থেকে বিরত থাকার ভয়ে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এরপর মহান আল্লাহ তাআলা একজন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরণের উদ্দেশ্য নির্দেশ করেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬৪:

"... যখন তিনি তাদের মধ্যে তাদেরই একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করতেন এবং তাদের পবিত্র করতেন..."

নিজের নিয়তকে শুদ্ধ করার প্রক্রিয়া, যাতে তারা কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে, নিজের কথা শুদ্ধ করে, যাতে তারা কেবল ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে এবং নিজের কাজ শুদ্ধ করে, যাতে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে, কেবল তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামী শিক্ষা শেখে এবং তার উপর আমল করে। কেবল এমন ভাষায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শোনা যায় যা সে বোঝে না। কেবল যখন কেউ তার মন ও শরীরকে এভাবে পবিত্র করে, তখনই সে উভয় জগতেই মানসিক ও শারীরিক শান্তি অর্জন করতে পারবে। এই শুদ্ধিকরণ নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচার দিবসে তার জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হবে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৬৪:

"...তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা, তাদের পবিত্র করা এবং তাদেরকে কিতাব শিক্ষা দেওয়া..."

এই বইটি সেই আইন ও আচরণবিধির কথা উল্লেখ করতে পারে যা সমাজের প্রতিটি সদস্যকে মেনে চলতে হবে যাতে সমাজে মানসিক শান্তি ও ন্যায়বিচার ছড়িয়ে পড়ে। মানবসৃষ্ট আইন ও আচরণবিধির সমস্যা হল যে, একদল লোককে অন্য দলের চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়ে তারা সর্বদা পক্ষপাতদুষ্ট থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, সমাজের দরিদ্র সদস্যদের চেয়ে ধনীদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। ১৬৪ নং আয়াতে ঐশ্বরিক আচরণবিধি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের একটি দিককে প্রজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ৩য় অধ্যায় আলী ইমরান, ১৬৪ নং আয়াত:

"...তাদের কাছে তাঁর আয়াত তিলাওয়াত করা, তাদের পবিত্র করা এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেওয়া..."

জ্ঞান একজন ব্যক্তিকে শেখায় যে কীভাবে তার জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয় যাতে সে নিজের এবং উভয় জগতের অন্যদের উপকার করতে পারে। জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ যেকোনো জ্ঞান বা আচরণবিধিকে খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞানকে অন্যদের উপকারের জন্য সঠিকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন ওষুধ তৈরি করা, অথবা মানুষের ক্ষতি করার জন্য অপব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন অস্ত্র তৈরি করা। এই জ্ঞান ভালো নৈতিকতা এবং বৈশিষ্ট্যের আকার ধারণ করতে পারে, যেমন উদারতা, ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা,

যাতে একজন ব্যক্তি তাদের জীবনে সঠিকভাবে প্রদত্ত আচরণবিধি প্রয়োগ করার জন্য উৎসাহিত হয়।

উপরন্তু, ১৬৪ নং আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেহেতু মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার পাশাপাশি সমাজের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত, তাই একমাত্র যিনি একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা মানুষের প্রকৃতির জন্য নিখুঁতভাবে তৈরি এবং সর্বোত্তম ফলাফল অর্জনের জন্য সমাজের অভ্যন্তরীণ সকল ধরনের সমস্যা সংশোধন করে, তিনি হলেন সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ মহান আল্লাহ। একমাত্র মহান আল্লাহই মানবজাতিকে তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শেখাতে পারেন যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে। সমস্ত মানব-নির্মিত আচরণবিধি এই ফলাফল অর্জন করতে পারে না কারণ তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের অভাব রয়েছে। যদি কেউ মানব-নির্মিত আচরণবিধি অনুসারে জীবনযাপন করতে থাকে তবে তারা ভুলের মধ্যে বাস করবে যার ফলে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলির অপব্যবহার করবে, যা তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন থেকে বিরত রাখবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল স্থানে ফেলবে। ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখলেই বোঝা যাবে যে, যেসব সমাজ আল্লাহ তাআলার দেওয়া আচরণবিধি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেছে, তাদের মধ্যে কীভাবে ন্যায়বিচার ও শান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬৪:

"... যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, তাই একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার বিরোধিতাও করে। তাদের এমন একজন বিচক্ষণ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকে। এই বিচক্ষণ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, তিনিও ভালো থাকবেন। অন্যদিকে, যদি একজন ব্যক্তি সেই অজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করেন যিনি তাদের ডাক্তারের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে তারা উভয় জগতেই দুর্বল মানসিক স্বাস্থ্যে ভুগবেন, এমনকি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও। সূরা তওবার ৯, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ্ বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার

কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অতএব, এই পরিণতি কেবল তখনই এড়ানো যেতে পারে যখন কেউ ইসলামী শিক্ষা শিখবে এবং তার উপর আমল করবে, সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৬৪:

"...তিনি তাদের মধ্যে তাদেরই একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করতেন, তাদের পবিত্র করতেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিতেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।"

এই আয়াতটি আরও ইঙ্গিত করে যে, কেউ যখন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সাঃ)-এর হাদীসের শিক্ষা কঠোরভাবে মেনে চলবে, তখনই কেবল স্পষ্ট বিভ্রান্তি এড়ানো সম্ভব। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হবে, এমনকি যদি তা সংকর্মের দিকে পরিচালিত করে, তবুও তারা পথনির্দেশনার দুটি উৎসের উপর তত কম কাজ করবে, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই মহানবী (সাঃ) সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বর হাদীসে সতর্ক করে বলেছেন যে, যে বিষয় দুটি পথনির্দেশনার উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করবেন। উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হবে, তত বেশি তারা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলিতে কাজ করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পা দেবে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করবে

যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৬৫-১৭৫

أَوَلَمَّا أَصَبْتُمْ مَصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتَيِّ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعَنَكُمُ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ اقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

❖ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ

عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا

اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مَنْ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمَسَّ سُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

﴿١٧٤﴾

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

ওহদের দিনে] তোমাদের উপর একটি[একক] বিপদ এসেছিল, যদিও তোমরা [বদরের যুদ্ধে শত্রুদের] দ্বিগুণ আঘাত করেছিলে, তখন তোমরা কেন বললে, “এটা কোথা থেকে?” বলো, “এটা তোমাদের নিজেদের কাছ থেকে।” নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

উহুদে) দুই সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিল, সেদিন তোমাদের উপর যা আঘাত এসেছিল তা আল্লাহর অনুমতিক্রমেই হয়েছিল, যাতে তিনি (প্রকৃত) ঈমানদারদেরকে প্রকাশ করতে পারেন।

আর যাতে তিনি মুনাফিকদের স্পষ্ট করে দেন। কারণ তাদের বলা হয়েছিল, “এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো অথবা [অন্তত] প্রতিরক্ষা করো।” তারা বলল, “যদি আমরা জানতাম যে যুদ্ধ হবে, তাহলে আমরা তোমাদের সাথে থাকতাম।” তারা সেদিন ঈমানের চেয়ে কুফরের বেশি কাছাকাছি ছিল, তারা মুখে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে ছিল না। আর তারা যা গোপন করে, আল্লাহ তা ভালো জানেন।

যারা ঘরে বসে তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলেছিল, "যদি তারা আমাদের কথা মানত, তাহলে তাদের হত্যা করা হত না।" বলো, "তাহলে তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে প্রতিহত করো।"

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের পালনকর্তার কাছে জীবিত, রিযিকপ্রাপ্ত।

আল্লাহ তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পরবর্তীদের সম্পর্কে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের সুসংবাদ পাচ্ছে যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও অনুগ্রহের সুসংবাদ পায় এবং [এই সত্যের] যে আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

যারা আঘাত পাওয়ার পরও আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

যাদেরকে লোকেরা [মুনাফিকরা] বলেছিল, "নিশ্চয়ই, লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে জড়ো হয়েছে, তাই তাদের ভয় করো।" কিন্তু এতে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেল এবং তারা বলল, "আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক।"

অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এলো, কোন অনিশ্চয়তা তাদের স্পর্শ করেনি। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসারী হলো, আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

"এ তো কেবল শয়তান, যে তার সমর্থকদের ভয় দেখায়। অতএব, যদি তোমরা [প্রকৃতপক্ষে] বিশ্বাসী হও, তবে তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো।"

যখন উহদের যুদ্ধ শুরু হয়, তখন সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, দ্রুত অমুসলিম সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন যার ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হন। কিন্তু মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, উহদ পাহাড়ের সামনে অবস্থিত জাবাল আল রুমাহ নামক একটি ছোট পাহাড়ে অবস্থান করার নির্দেশ দেন, তারা বিশ্বাস করেন যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং আদেশ আর প্রযোজ্য নয়। যখন তারা যুদ্ধের গণীমত সংগ্রহের জন্য জাবাল আল রুমাহতে নেমে আসেন, তখন মুসলিম সেনাবাহিনীর পশ্চাদভাগ উন্মোচিত হয়ে যায়। অমুসলিম সেনাবাহিনী তখন একত্রিত হয় এবং উভয় পক্ষ থেকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে। এর ফলে অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, শহীদ হন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯-৩০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ, মহিমাম্বিত, সাহাবাদের (আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন) স্মরণ করিয়ে দেন যে, ইতিমধ্যেই থাকা আশীর্বাদগুলির উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব। সূরা ৩, আলে ইমরান, আয়াত ১৬৫:

"যখন [উহদের দিনে] তোমাদের উপর একটি [একক] বিপদ এসেছিল, যদিও তোমরা [বদরের যুদ্ধে শত্রুদের] দ্বিগুণ আঘাত করেছিলে, তখন তোমরা কেন বলেছিলে, "এটা কোথা থেকে?"..."

এটি কঠিন সময়ে ধৈর্য এবং এমনকি কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করার একটি চমৎকার উপায়, কারণ কেউ যদি কোন একটি কঠিন সমস্যার উপর মনোযোগ না দিয়ে তার অগণিত আশীর্বাদের উপর মনোযোগ দেয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, নিয়তে কৃতজ্ঞতা বলতে কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা বোঝায়। কারো কথায় কৃতজ্ঞতা বলতে ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা বোঝায়। আর কারো কাজের

কৃতজ্ঞতা বলতে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে খুশি করার জন্য যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা বোঝায়। অধিকন্তু, ধৈর্য বলতে নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা বোঝায়, বিশ্বাস করা যে তিনি কেবল তার জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। ২য় সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক পথে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থন এবং করুণা লাভ করবে, যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদীসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৬৫:

"যখন[উহদের দিনে] তোমাদের উপর একটি[একক] বিপদ এসেছিল, যদিও তোমরা [বদরের যুদ্ধে শত্রুদের] দ্বিগুণ আঘাত করেছিলে, তখন তোমরা কেন বলেছিলে, "এটা কোথা থেকে?"..."

এছাড়াও, সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, যেহেতু এই পৃথিবী পরীক্ষার জায়গা, এমনকি যদি তারা আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে, তবুও তারা এখনও সমস্যার সম্মুখীন হবে। এটা বিশ্বাস করা ভুল যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য করলে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহর আনুগত্য করলে একজন ব্যক্তি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তার জীবনের সাথে সঠিকভাবে স্থাপন করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতেই মানসিক শান্তি পাবে, সে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা অসুবিধার। অতএব, মহান আল্লাহর আনুগত্য করলে, কাউকে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া থেকে বিরত রাখা যায় না, বরং এটি তাকে সেই অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার মানসিক শক্তি প্রদান করে যাতে সে মানসিক শান্তি অনুভব করে। অন্যদিকে, মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করলে কেবল একজন ব্যক্তিই একটি ভারসাম্যহীন মানসিক ও শারীরিক অবস্থা লাভ করবে এবং তার জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল পথে চালিত করবে। অতএব, এই মনোভাব উভয় জগতেই চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, তাদের অবাধ্যতা তাদের মুখোমুখি হওয়া অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক শক্তি অর্জনে বাধা সৃষ্টি করবে। এটি তাদের মানসিক ব্যাধিগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলবে যতক্ষণ না তারা হতাশা, মাদকাসক্তি এবং এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতায় ডুবে যাবে।

উপরন্তু, নিজের আচরণের কারণে সৃষ্ট অসুবিধা মোকাবেলার একটি দিক হল নিজের ভুলের দায়িত্ব নেওয়া। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৬৫:

" যখন [উহাদের দিনে] তোমাদের উপর একটি [একক] বিপদ এসেছিল, যদিও তোমরা [বদরের যুদ্ধে শত্রুকে] দ্বিগুণ আঘাত করেছিলে, তখন তোমরা কেন বললে, "এটা কোথা থেকে?" বলো, "এটা তোমাদের নিজেদের কাছ থেকে।" ..."

প্রতিটি পরিস্থিতিতে দায়িত্ব গ্রহণ করা ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার এবং নিজের আচরণ উন্নত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়। কিন্তু যখন কেউ দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে এবং পরিবর্তে তাদের খারাপ আচরণের জন্য অজুহাত তৈরি করে, তখন তারা অনিবার্যভাবে একই ভুল আবার করবে। ভুলের এই চক্র তাদের জন্য কেবল চাপ সৃষ্টি করবে কারণ তারা উভয় জগতেই তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করে পালাতে পারবে না। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৬৫:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহ সকল কিছু উপর ক্ষমতাবান।"

এরপর মহান আল্লাহ মুসলিমদের স্বরণ করিয়ে দেন যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া মহাবিশ্বের কোন কিছুই ঘটে না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬৬:

"আর যেদিন দুই সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিল, সেদিন তোমাদের উপর যা আঘাত এসেছিল তা আল্লাহর অনুমতিতেই হয়েছিল..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই বাস্তবতা স্বরণ করলে একজন ব্যক্তি সর্বদা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে উৎসাহিত হবে, এমনকি যদি তারা মানুষকে বিরক্তও করে। এর কারণ হল, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মানুষের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন, যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে, মানুষ তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। একজন মুসলিমকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিকভাবে বর্ণিত অনুগ্রহগুলি ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদেরকে সমর্থন এবং স্বস্তি প্রদান করবেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অধ্যায় ৬৫ তালাক, আয়াত ২:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই ঐশ্বরিক সাহায্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে নয়। এটি সর্বদা মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অনুসারে। অতএব, এই ঐশ্বরিক সাহায্য সেই সময় ঘটে যখন এটি মানুষের জন্য সর্বোত্তম এবং এমনভাবে যা তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, এই জেনে যে, তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য দান করা হবে, কোন না কোনভাবে, তা তাদের কাছে স্পষ্ট হোক বা না হোক। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

এরপর আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার পরীক্ষার একটি অংশ হলো অসুবিধার মুখোমুখি হওয়া যাতে যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস রাখে, তারা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যায় যারা কেবল মৌখিকভাবে তাঁর উপর বিশ্বাসের দাবি করে। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৬৬-১৬৭:

" আর যেদিন দুই সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিল, সেদিন তোমাদের উপর যা আঘাত এসেছিল তা আল্লাহর অনুমতিক্রমেই হয়েছিল যাতে তিনি [সত্যিকারের] বিশ্বাসীদেরকে প্রকাশ করতে পারেন। এবং যাতে তিনি মুনাফিকদেরকে প্রকাশ করতে পারেন..."

অতএব, যখনই তারা সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন তাদের প্রতিক্রিয়া এবং কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করে বিচার করতে হবে যে তারা প্রকৃত মুমিন কিনা। একজন প্রকৃত মুমিন স্বাচ্ছন্দ্য এবং অসুবিধা উভয় সময়েই মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকবে। অন্যদিকে, একজন মুনাফিক যখনই তাদের আকাউক্ষার বিরোধিতা করে, তখন সহজেই মহান আল্লাহর অবাধ্য হবে। সূরা ২২ আল হজ্জ, আয়াত ১১:

"আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে আল্লাহর ইবাদত করে এক প্রান্তে। যদি তাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তবে সে তাতে আশ্বস্ত হয়; আর যদি কোন পরীক্ষা তাকে স্পর্শ করে, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই হারিয়ে ফেলেছে। এটাই স্পষ্ট ক্ষতি।"

সকল পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে সাহায্য করার জন্য, তাদের দৃঢ় ঈমান গ্রহণ করা উচিত। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি শেখা এবং সেগুলি অনুসরণ করা হলে দৃঢ় ঈমান অর্জন করা সম্ভব হয়, যা ব্যাখ্যা করে যে, আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। এই ব্যক্তি যখনই তাদের আকাউক্ষার বিপরীত হয় তখনই সহজেই আল্লাহকে অমান্য করবে কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে, তাদের আকাউক্ষা ত্যাগ করে এবং আল্লাহর আনুগত্য করলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত হয়। এর একটি উদাহরণ ১৬৭ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

যখন মহানবী (সাঃ) উল্লেখের যুদ্ধে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য মদীনা ত্যাগ করেন, তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই তার ৩০০ সৈন্য নিয়ে মুসলিমদের সংকল্পকে দুর্বল করার

লক্ষ্যে পিছু হটে যান। আবদুল্লাহ বিন হারাম, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন, মুনাফিকদেরকে অন্তত মদীনা রক্ষা করার জন্য আহ্বান জানান, যদিও তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করতে আগ্রহী নাও হয়। কিন্তু এতে কাপুরুষদের উপর কোন প্রভাব পড়েনি, যারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। এরপর তিনি তাদের সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্য যথেষ্ট হবেন এবং সেনাবাহিনীর মুনাফিকদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ, মহিমান্বিত, এই মুহূর্ত সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের ১৬৭ নং আয়াত নাজিল করেন:

"এবং যাতে তিনি মুনাফিকদের স্পষ্ট করে দেন। কারণ তাদের বলা হয়েছিল, "এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো অথবা [অন্তত] প্রতিরক্ষা করো।" তারা বলল, "যদি আমরা জানতাম যে যুদ্ধ হবে, তাহলে আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম।" তারা সেদিন ঈমানের চেয়ে কুফরের বেশি কাছাকাছি ছিল, তারা মুখে যা বলে তা তাদের অন্তরে ছিল না। আর তারা যা গোপন করে তা আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।"

ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার" বইয়ের ২৫০-২৫২ পৃষ্ঠায় এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলিমকে সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকার মাধ্যমে এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ যখন কারো ইচ্ছার বিরোধিতা করা হয় তখন তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করা মুনাফিকির একটি দিক। যে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট দলের মতো আচরণ করে তাকে তাদের মধ্যে গণ্য করা হয়, যদিও তারা মৌখিকভাবে অন্যথা দাবি করে। সুনান আবু দাউদের ৪০৩১ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। উপরন্তু, আলোচ্য মূল আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এই

মুনাফিক মনোভাব ধরে রাখে তার ঈমান হারানোর বড় ঝুঁকি রয়েছে। ৩য় অধ্যায়
আলে ইমরান, আয়াত ১৬৭:

"... সেদিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরের বেশি কাছাকাছি ছিল। তারা মুখে এমন
কথা বলছিল যা তাদের অন্তরে ছিল না। আর আল্লাহ্ ভালো জানেন তারা যা গোপন
করে।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমান হলো এমন একটি গাছের মতো যাকে বেড়ে
ওঠার জন্য আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা
সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি না পেলেও বেড়ে উঠতে পারে না এবং এমনকি মারাও
যেতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার
ঈমানও বেড়ে উঠতে পারে না এবং মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তির সাথে তার বাহ্যিক চেহারা
অনুসারে আচরণ করা হয়, এমনকি যদি তা তার অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার সাথে
সাংঘর্ষিক হয়। যদি কোন ব্যক্তি মৌখিকভাবে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে,
তাহলে সমাজ তাকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করবে, যদি না সে স্পষ্টভাবে কোন কুফরী
করে। কিন্তু পরকালে, মহান আল্লাহ মানুষের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা এবং বাহ্যিক
কর্মকাণ্ড অনুসারে বিচার করবেন। অতএব, মুনাফিকের মতো আচরণ করা এড়িয়ে
চলতে হবে কারণ এটি এই পৃথিবীতে অন্যদের বোকা বানাতে পারে কিন্তু পরকালে,
তারাই বোকা হবে কারণ তাদের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা অনুসারে আচরণ করা হবে,
যার মূল ভিত্তি অবিশ্বাস। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারাহ, আয়াত ৮-৯:

"আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, "আমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছি", কিন্তু তারা মুমিন নয়। তারা আল্লাহ ও মুমিনদের সাথে প্রতারণা করার কথা ভাবে, কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে প্রতারণা করে না এবং তারা তা উপলব্ধি করে না।"

এবং ৫৭তম অধ্যায় আল হাদিদ, আয়াত ১৩-১৫:

"[একই দিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদের বলবে, "আমাদের জন্য অপেক্ষা করো, যাতে আমরা তোমাদের আলো থেকে কিছু লাভ করতে পারি।" বলা হবে, "তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান করো।" আর তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হবে যার একটি দরজা থাকবে, যার ভেতরে রহমত থাকবে, কিন্তু বাইরে থাকবে আযাব। তারা [অর্থাৎ, মুনাফিকরা] তাদেরকে [অর্থাৎ, মুনাফিকদের] ডাকবে, "আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?" তারা বলবে, "হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেদেরকে কষ্ট দিয়েছিলে এবং [আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের] অপেক্ষা করেছিলে এবং সন্দেহ করেছিলে, এবং কামনা-বাসনা তোমাদেরকে প্রতারণিত করেছিল যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ এসেছিল। আর প্রতারণক [অর্থাৎ, শয়তান] তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারণিত করেছিল। তাই আজ তোমাদের কাছ থেকে বা যারা কাফের তাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ নেওয়া হবে না। তোমাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। এটি তোমাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত, এবং নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।"

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৬৭:

"...সেদিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরের বেশি কাছাকাছি ছিল। তারা মুখে এমন কথা বলত যা তাদের অন্তরে ছিল না। আর আল্লাহ তাদের গোপন কথা সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।"

যারা ইসলামে তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণা বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয়, তাদের নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় যে তারা আসলে একজন মুসলিম। সত্য হল, যদি কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক হৃদয়ে মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস থাকে, তবে তা তাদের কর্মে কোন না কোনভাবে প্রতিফলিত হবে। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত ৫২ নম্বর হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, অবিশ্বাসী ব্যক্তির মুসলিম হওয়ার দাবি করলেও তাদের কর্মে ইসলাম প্রদর্শন করবে না। এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে, অন্যথায় যে ব্যক্তি মুসলিম বলে দাবি করে সে কিয়ামতের দিন অমুসলিম হিসেবে প্রকাশিত হতে পারে। এটি আরও সমর্থন করে নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা যেখানে ঈমানের পরিবর্তে ইসলামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম একজন ব্যক্তির কর্মে, মহান আল্লাহকে আনুগত্য করার মাধ্যমে, যখন ঈমান তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ে প্রদর্শিত হয়। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ৮৫:

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবনব্যবস্থা কামনা করে, তার কাছ থেকে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৬৮:

"যারা ঘরে বসে তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলত, "যদি তারা আমাদের কথা মানত..."

এই আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তির মদিনায় বসবাসকারী মুনাফিক এবং আহলে কিতাবদের কথা বলতে পারেন যাদের আত্মীয়স্বজন আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি এই বিষয়টি উপলব্ধি করার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে, যদিও আত্মীয়স্বজনরা প্রায়শই তাদের জন্য ভালো কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করে, তবুও ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তারা তাদের ভুল কাজ করার পরামর্শ দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্ত্রী হয়তো তার স্বামীকে পরামর্শ দিতে পারেন যে, যখন সে কাজ থেকে বাড়ি ফিরে আসে, তখন তাকে স্থানীয় মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ পড়ার পরিবর্তে বাড়িতে নামাজ পড়া উচিত। সে হয়তো বিশ্বাস করতে পারে যে, এভাবে সে একজন ভালো স্ত্রীর মতো আচরণ করছে কারণ সে তার স্বামীর ক্লান্তি বিবেচনা করছে, কিন্তু সে কেবল তার স্বামীকে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিচ্ছে, তার উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। তাগাবুন, আয়াত ১৪:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, তাই তাদের থেকে সাবধান থাকো। কিন্তু যদি তোমরা ক্ষমা করো, উপেক্ষা করো এবং ক্ষমা করো, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

যদিও একজন ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন প্রায়শই তাদের জন্য ভালোর উদ্দেশ্য রাখে, তবুও তারা তাদের বিভ্রান্ত করতে পারে। অতএব, একজন মুসলিমের জন্য প্রথমে ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্যদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়। দ্বিতীয়ত, উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা নির্দেশিত, যখনই কেউ তাদের ভুল পরামর্শ দেয়, তখন তাদের উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সঠিক আচরণ কী তা নম্রভাবে উপদেশ দেওয়া এবং তাদের উপর রাগান্বিত না হওয়া। পরিশেষে, একজন মুসলিমের জন্য ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে থাকা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা সর্বদা একে অপরকে ভালো উপদেশ দিতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, অজ্ঞ লোকেরা প্রায়শই অন্যদের ভুল উপদেশ দেয়, এমনকি তাদের উদ্দেশ্য ভালো হলেও।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৬৮:

"যারা ঘরে বসে তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলত, "যদি তারা আমাদের কথা মানত..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যখন কেউ আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকে এবং কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পরীক্ষায় পতিত হয়, তখন অন্যরা তাদের পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে যাতে তারা বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য করা সঠিক পছন্দ নয় কারণ এটি তাদের কঠিন পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে পারেনি। কেউ কেউ তাদেরকে এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টাও করবে। এই দুটি পরিস্থিতিই মহান আল্লাহর দ্বারা পরীক্ষার একটি দিক। অতএব, সাফল্য এবং মানসিক প্রশান্তি অর্জনের জন্য, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তিনি যে আনুগত্য দিয়েছেন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তাঁর আনুগত্যে দৃঢ় থাকতে হবে। তাদের মনে রাখতে হবে যে, যেহেতু তিনিই একমাত্র সবকিছু নিয়ন্ত্রণ

করেন, তাই মনের শান্তি এবং সাফল্য কেবল তাঁর আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত। উপরন্তু, তাদের মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ, কেবলমাত্র সেই জিনিসটিই বেছে নেন যা মানুষের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, তাদের অবশ্যই প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাঁর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৬৮:

"যারা ঘরে বসে তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলেছিল, "যদি তারা আমাদের কথা মানত, তাহলে তাদের হত্যা করা হত না।" বলুন, "তাহলে তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে প্রতিহত করো।"

মৃত্যুর মাধ্যমে প্রিয়জনকে হারানোর ক্ষেত্রে, একজনকে বুঝতে হবে যে মৃত্যু অনিবার্য এবং অপরিবর্তনীয়। মহান আল্লাহ, প্রিয়জনের মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করেন যাতে যারা সত্যিকার অর্থে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে তাদের থেকে যারা বিশ্বাস করে না তাদের আলাদা করা যায়। যারা সত্যিকার অর্থে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, যেহেতু মহান আল্লাহ, সমস্ত জিনিস এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনিই একমাত্র অধিকার রাখেন যে তারা কখন মারা যাবে এবং তাঁর কাছে ফিরে যাবে তা বেছে নেওয়ার। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারা, আয়াত ১৫৫-১৫৭:

"আর আমরা অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে, কিন্তু ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা বিপদে পড়লে বলে, "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব।" এরাই তারা যাদের উপর তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও করুণা রয়েছে। আর তারাই সঠিক পথে পরিচালিত।"

যে ব্যক্তি এই বাস্তবতা গ্রহণ করবে সে তাঁর পছন্দগুলিকে গ্রহণ করবে এবং তাঁর আনুগত্যে দৃঢ় থাকবে, যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৬৮:

"... বলুন, "তাহলে তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে প্রতিহত করো।"

সর্বদা মনে রাখা উচিত যে মৃত্যুর সময় এবং স্থান নির্ধারিত হওয়ায় তাদের আচরণ এই পরিণতি পরিবর্তন করতে পারে না। অতএব, মহান আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করার কোনও অর্থ হয় না, এই মিথ্যা বিশ্বাসের সাথে যে এটি তাদের মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারে। যদি কোনও ব্যক্তির অনিবার্য মৃত্যু এসে থাকে, তবে তাদের জন্য মহান আল্লাহর আনুগত্য করে মৃত্যুবরণ করা অনেক ভালো, এই আশায় যে এই চূড়ান্ত সংকর্মই তাদের ক্ষমা এবং জাহ্নাম লাভের কারণ হতে পারে। এছাড়াও, কোনও ব্যক্তির কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তাদের আচরণ অন্য ব্যক্তির মৃত্যুর সময় বা স্থান পরিবর্তন করতে পারে, যেমন আত্মীয়স্বজন। এটি বিশ্বাস করা কেবল অনুশোচনা এবং শোক বৃদ্ধি করবে এবং ধৈর্য ধারণে বাধা দেবে। এর অর্থ এই নয় যে তাদের কর্মের জন্য দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়, যেমন বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানো যা অন্যের মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করে। তবে এর অর্থ হল যে যেখানে তারা কোনও ভুল করেনি, তাদের ভিন্নভাবে আচরণ না করার জন্য নিজেকে দোষারোপ করা উচিত নয় এই বিশ্বাস করে যে তারা তাদের প্রিয়জনের মৃত্যু রোধ করতে পারত। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও শিশু স্কুল ভ্রমণে মারা যায়, তবে একজন মা বিশ্বাস করবেন না যে তিনি যদি তার সন্তানকে বাড়িতে রাখতেন তবে তারা বেঁচে যেত। মৃত্যুর সময় এবং স্থান নির্ধারিত হওয়ায়, এইভাবে চিন্তা করা ভুল এবং কেবল শয়তানের দরজা খুলে দেয়, যে ব্যক্তিকে অধৈর্য দেখাতে এবং ভাগ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে উৎসাহিত করবে। সুনান ইবনে মাজাহ, ৪১৬৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, যেহেতু একমাত্র মহান আল্লাহই জীবন ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তিনি সর্বদা মানুষের জন্য যা সর্বোত্তম

তা বেছে নেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়, তবুও তাদের প্রিয়জনের মৃত্যুর অনিবার্যতা মেনে নিতে হবে। এটি তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে ধৈর্য ধরে থাকতে এবং ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করবে। কিন্তু যদি তারা এই সত্যটি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা অধৈর্য হয়ে পড়বে এবং মহান আল্লাহকে অমান্য করবে। এবং এটি উভয় জগতেই তাদের চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলা বৃদ্ধি করবে। যে পথই বেছে নিন না কেন, উভয় জগতেই তাদের এর জন্য দায়ী করা হবে কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচতে পারবে না।

এছাড়াও, একজন ব্যক্তিকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে এই পৃথিবীতে মৃত্যু তার অস্তিত্বের একটি মাত্র পর্যায়। আসল এবং স্থায়ী জীবন হলো পরকালের জীবন। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে এই অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। সূরা ১৫ আল হিজর, আয়াত ৯৯:

"আর তোমার রবের ইবাদত করো যতক্ষণ না তোমার কাছে নিশ্চিত (অর্থাৎ মৃত্যু) আসে।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৬৯:

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের পালনকর্তার কাছে জীবিত, রিযিকপ্রাপ্ত।"

অধিকন্তু, এই বাস্তবতা বোঝা একজনকে তার প্রিয়জনের মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার সময় ধৈর্য ধারণ করতে উৎসাহিত করবে। যদিও কেউই গ্যারান্টি দিতে পারে না যে একজন মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশীর্বাদ লাভ করা হয়েছে, তবুও ইসলাম মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয় যে যারা ইতিমধ্যেই মারা গেছেন তাদের জন্য মহান আল্লাহর রহমতের উপর আশা রাখতে। তাদের আশা থাকা উচিত যে তারা পরকালে তাদের অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট এবং তারা এই পৃথিবীতে জীবন থেকে বঞ্চিত না হয়। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৬৯-১৭০:

"... বরং, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে জীবিত, রিযিক পাচ্ছে। আল্লাহ তাদের তাঁর অনুগ্রহে যা দিয়েছেন তাতে আনন্দিত..."

যারা এই পৃথিবীতে জীবিত আছেন তাদের অবশ্যই তাদের সাথে যোগ দিতে আগ্রহী হতে হবে যারা ইতিমধ্যেই চলে গেছেন, ঠিক যেমন তারা মারা গেছেন এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছেন, তারা তাদের প্রিয়জনদের সাথে পুনরায় মিলিত হতে চান। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭০:

"...এবং তাদের পরবর্তীদের সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে যারা এখনও তাদের সাথে যোগ দেয়নি..."

অতএব, এই পবিত্র পুনর্মিলনের জন্য আগ্রহী হতে হবে এবং মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এর জন্য বাস্তবিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তিনি তাদেরকে যে আশীর্বাদ দিয়েছেন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেওয়ার মাধ্যমে। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭০:

"আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পরবর্তীদের সম্পর্কে সুসংবাদ পাচ্ছে যারা এখনও তাদের সাথে যোগ দেয়নি..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও প্রতিটি মুসলিম আখেরাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের সাথে একতাবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, কিন্তু তারা কেবল তখনই তা করতে পারবে যদি তারা এই পৃথিবীতে তাদের পথ অনুসরণ করে। এই পথে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। কিন্তু যারা তাদের মৌখিক দাবিকে কাজে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় তারা পরকালে তাদের সাথে একত্রিত হবে না, ঠিক যেমন পূর্ববর্তী জাতিগুলি তাদের পবিত্র নবীগণকে ভালোবাসার দাবি করে, তারা পরকালে তাদের সাথে একত্রিত হবে না কারণ তারা বাস্তবে এই পৃথিবীতে তাদের পথ অনুসরণ করেনি।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৭০:

"... তাদের পরবর্তীদের সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি - যে তাদের উপর কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই আয়াতের অর্থ এই নয় যে, কেউ সমস্যার সম্মুখীন হবে না, কারণ সমস্যার সম্মুখীন হওয়া এই পৃথিবীর পরীক্ষার একটি অংশ। এর অর্থ হল, যদিও কেউ উদ্বেগ, চাপ এবং দুঃখের সময় অনুভব করতে পারে, তবুও এই অনুভূতিগুলি কখনই চরম হবে না, যেমন ভয় এবং শোক। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি এই নেতিবাচক অনুভূতিগুলিকে কাটিয়ে উঠবে এবং সকল পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখবে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি কার্যত ঐশ্বরিক নির্দেশনা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়, সে চরম আবেগ এবং নেতিবাচক অনুভূতির সম্মুখীন হবে, যেমন ভয় এবং শোক, যা তাদের সারা জীবন ধরে তাদের উপর প্রভাব ফেলবে। ফলস্বরূপ, তারা একটি ভারসাম্যহীন

মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার সাথে বসবাস করবে। এটি উভয় জগতেই কেবল আরও চাপ, উদ্বেগ এবং ঝামেলার দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ্ বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"]"

মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয় সৃষ্টি করেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন, যা হলো মনের শান্তির আবাসস্থল। অতএব, যদি কেউ আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে, তাহলে তিনি তাকে মানসিক শান্তি দান করবেন, এমনকি যদি তারা নিয়মিত সমস্যার সম্মুখীন হয়। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি তাঁর অবাধ্য হয়, সে কেবল চাপ, উদ্বেগ এবং হতাশা পাবে, এমনকি যদি তার পায়ের কাছে পৃথিবী থাকে। এই সত্যটি তার কাছে স্পষ্ট যে ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করে। অতএব, মনের শান্তির সাথে পার্থিব জিনিসের কোনও সম্পর্ক নেই, যেমন খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব, পরিবার, ক্যারিয়ার বা বন্ধুবান্ধব। মনের শান্তি সরাসরি ঐশ্বরিক নির্দেশনা গ্রহণ এবং বাস্তবে অনুসরণ করার সাথে সম্পর্কিত যাতে কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারে যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর উপর শান্তি ও শান্তি বর্ষিত হোক।

পরিশেষে, কাউকে এই বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে ঐশ্বরিক নির্দেশনা তাদের সুখী জীবন লাভে বাধা দেবে। ঐশ্বরিক নির্দেশনা নিশ্চিত করে যে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করতে পারে। অন্যদিকে, ঐশ্বরিক নির্দেশনা উপেক্ষা করলে একজন ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলির অপব্যবহার করবে, যা উভয় জগতেই চাপ এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করবে। ঐশ্বরিক নির্দেশনা একজন ডাক্তারের মতো যিনি একজন রোগীর উপর তিক্ত ওষুধ এবং খাদ্যতালিকাগত বিধিনিষেধ লিখে দেন যাতে তারা ভাল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করতে পারে। ঠিক যেমন রোগী তার ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং তার উপর কাজ করে, সে ভাল শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার উপর কাজ করে সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করে। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত 171:

"তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও অনুগ্রহের সুসংবাদ পায় এবং [এই সত্যের] যে আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।"

যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, সে উভয় জগতেই তার নিয়ত, কথা এবং কর্মের মাধ্যমে উপকৃত হবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭১:

"... আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট হতে দেন না।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে বৃথা বা পাপপূর্ণ উপায়ে, সে দেখতে পাবে যে তার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে, কারণ এটি তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে না, এমনকি যদি তাদের পার্থিব বিলাসিতাও থাকে। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ১০৩-১০৪:

"বলুন, "আমরা কি তোমাদেরকে কর্মের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে অবহিত করব? [তারা] তারা যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে ব্যর্থ হয়েছে, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৭১:

"... আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট হতে দেন না।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তিকে পার্থিব আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে, তাই ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করে এই পুরস্কার অর্জনের জন্য তাদের প্রচেষ্টা করা ছাড়া আর কোন অজুহাত থাকে না। উপরন্তু, তাদের মনে রাখতে হবে যে, তারা যদি এই পৃথিবীতে তাদের সৎকর্মের সুফল লক্ষ্য নাও করে, তবুও তারা উভয় জগতেই মানসিক প্রশান্তি রূপে এর সুফল পাবে, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অতএব, যত বেশি সম্ভব সৎকর্ম করার চেষ্টা করা উচিত, তা সে যত বড়ই হোক বা এই পৃথিবীতে তার জন্য সওয়াব লাভ করুক না কেন।

উহুদের যুদ্ধের পর যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ মদিনায় ফিরে আসেন, তখন তারা জানতে পারেন যে মক্কার অমুসলিম নেতারা ইসলামকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মদিনার দিকে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের গুরুতর ক্ষত এবং ক্লান্ত দেহ থাকা সত্ত্বেও, অমুসলিমদের পিছনে ধাওয়া করার জন্য বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তখন আল্লাহ, মহিমাম্বিত, সূরা আলে ইমরানের ১৭২ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"যারা [ঈমানদাররা] আঘাত পাওয়ার পরও আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে। তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মা'বাদ ইবনে আবু মা'বাদ নামে এক ব্যক্তি মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সেনাবাহিনীর সাথে দেখা করে তাঁর সমবেদনা ও সেবা প্রদান করেন। মহানবী (সাঃ) তাকে অমুসলিম সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছাতে এবং মদীনা আক্রমণ থেকে তাদের নিরুৎসাহিত করতে বলেন। অবশেষে তিনি অমুসলিম সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছান এবং তাদেরকে মদীনা আক্রমণ না করার জন্য সতর্ক করেন কারণ মহানবী (সাঃ) একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন যারা তিক্ত পরিণতি পর্যন্ত লড়াই করার জন্য প্রস্তুত ছিল। এর মাধ্যমে, মহান আল্লাহ, অমুসলিমদের হৃদয়ে ভয় ঢেলে

দেন যারা মক্কায়ে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যদিও মহানবী (সাঃ) কে হত্যা করা এবং মদীনার বাইরে তাদের বাণিজ্য মূল সুরক্ষিত করার তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছিল। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫১:

"যারা কাফের, তাদের অন্তরে আমরা ভীতি সঞ্চার করব কারণ তারা আল্লাহর সাথে এমন কিছু শরীক করেছে যার কোন প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি। তাদের আবাসস্থল হবে আগুন, আর জ্বালেমদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট।"

অমুসলিম নেতা আবু সুফিয়ান একটি বাণিজ্য কাফেলার মাধ্যমে মহানবী (সাঃ) এর কাছে বার্তা পাঠান যে, অমুসলিম সেনাবাহিনী আরও বেশি সমর্থন সংগ্রহ করেছে এবং মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত। তিনি আশা করেছিলেন যে এই মিথ্যা তথ্য মহানবী (সাঃ) কে তাদের তাড়া করা থেকে বিরত রাখবে। তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে, কারণ তারা তাদের তাড়া করেছিল কিন্তু অমুসলিমরা তাদের নাগালের বাইরে চলে যায়। এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা আলে ইমরানের ১৭৩-১৭৪ আয়াত নাজিল করেছেন:

"যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, 'নিশ্চয়ই, লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে জড়ো হয়েছে, তাই তাদের ভয় করো।' কিন্তু এতে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেল এবং তারা বলল, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক।' অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এল, কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করল, আর আল্লাহই মহা অনুগ্রহের অধিকারী।"

ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২৮৮-২৯১ এবং ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৩:১৫১, পৃষ্ঠা ৪২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, এমনকি চাপ ও অসুবিধার সময়েও, তাদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের প্রতি তাদের মহান উৎসাহের ইঙ্গিত দেয়। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও আনুগত্য করা এত কঠিন নয়। আসল পরীক্ষা তখনই হয় যখন কেউ সমস্যার মুখোমুখি হয় এবং ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও আনুগত্য করে। অতএব, অসুবিধার মুখোমুখি হওয়াই সেই পরীক্ষা যা তাদের মধ্যে পার্থক্য করে যারা আল্লাহ, মহিমাম্বিত, বিশ্বাস করার দাবিতে সত্যবাদী এবং যারা তা করে না। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ২-৩:

"মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি, আর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা মিথ্যাবাদী।"

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৭২:

"যারা [ঈমানদাররা] আঘাত পাওয়ার পরও আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে। তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।"

অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই স্বাচ্ছন্দ্য ও অসুবিধা উভয় সময়েই আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকার মাধ্যমে তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণা প্রমাণ করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। এর ফলে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসবে। অন্যথায়, এই আয়াতগুলি দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, তারা দেখতে পাবে যে তাদের সাথে এই পৃথিবীতে এবং পরকালে মিথ্যাবাদীর মতো আচরণ করা হচ্ছে যদি তারা তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়। এটি নির্ধারণ করার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না যে, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ উভয় জগতেই মিথ্যাবাদী বলে গণ্য করেন, তিনি এই পৃথিবীতে বা পরকালে মানসিক শান্তি পাবেন না।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৭৩:

"যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, "নিশ্চয়ই, লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, তাই তাদেরকে ভয় করো।"..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, যখনই কেউ আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার চেষ্টা করে, তখন অন্যরা তাকে সমালোচনা করবে এবং এই পৃথিবীতে সাফল্য অর্জন করতে চাইলে তাকে তাদের আনুগত্য ত্যাগ করতে উৎসাহিত করবে। বিশেষ করে এই যুগে, যত বেশি আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার চেষ্টা করবে, তত বেশি বিরোধিতার মুখোমুখি হবে। তবে সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, এবং তাঁর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মানসিক শান্তি অর্জন থেকে কোনও কিছুই বাধা দিতে পারবে না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৩:

"...কিন্তু এটি তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছিল এবং তারা বলেছিল, "আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক।"

তাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে যতক্ষণ তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর নির্ভর করবে, তিনি তাদের কষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন এবং উভয় জগতে তাদের মানসিক শান্তি দান করবেন, কারণ তিনিই একমাত্র বিশ্বজগতের বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করেন। অধ্যায় ৬৫ তালাক, আয়াত ২:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৭৪:

"অতএব তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এলো, কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি। এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করলো, আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই ঐশ্বরিক সাহায্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে নয়। এটি সর্বদা মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অনুসারে। অতএব, এই ঐশ্বরিক সাহায্য সেই সময় ঘটে যখন এটি মানুষের জন্য সর্বোত্তম এবং এমনভাবে যা তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, এই জেনে যে, তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য দান করা হবে, কোন না কোনভাবে, তা তাদের কাছে স্পষ্ট হোক বা না হোক। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৭৪:

"অতএব তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এলো, কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি। এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করলো, আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।"

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আল্লাহকে খুশি করার জন্য সঠিক নিয়ত গ্রহণ করে এবং ইসলামী শিক্ষা অনুসারে কাজ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করবে, যদিও এটি তার বা অন্যদের কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু যদি কেউ ভুল নিয়ত গ্রহণ করে এবং অন্য কোনও কারণে কাজ করে, তাহলে সে এই পুরস্কার এই পৃথিবীতে বা পরকালে পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। উপরন্তু, যদি কেউ সঠিক নিয়ত গ্রহণ করে কিন্তু পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে কাজ না করে, তাহলে তার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না কারণ মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তার কর্মের মূলে এই দুটি দিকনির্দেশনা থাকতে হবে। সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বর হাদীসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য, মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য একটি সৎ নিয়তের সাথে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সৎকর্মের সমন্বয় করতে হবে।

যখন অন্যরা আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যকে চ্যালেঞ্জ করে, তখন তাদের নেতিবাচক মন্তব্য এবং সমালোচনা উপেক্ষা করা উচিত, কারণ এই নেতিবাচকতার উৎস হল শয়তান, যে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে নিরুৎসাহিত করতে চায়। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৫:

"এটা তো কেবল শয়তান যে তার সমর্থকদের ভয় দেখায়..."

শয়তানের বিশ্বজগতের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই এবং সে কেবল তার কুমন্ত্রণা এবং মানব সাহায্যকারীদের মাধ্যমে মানুষকে ভয় দেখায়। অতএব, একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর নির্ভর করতে হবে, কারণ তিনিই একমাত্র বিশ্বজগতের বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন যে কে মানসিক শান্তি পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম অধ্যায় আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

এবং অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৭৫:

"...তাই তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা [প্রকৃতপক্ষে] বিশ্বাসী হও।"

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে, একজন প্রকৃত মুমিনের লক্ষণ হলো, সমাজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো বাইরের শক্তির সমালোচনার মুখেও তারা আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকে এবং আল্লাহর অবাধ্যতার প্রতি উৎসাহিত হয়। এই ধরনের সময়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানসিকতা গ্রহণ করা এড়িয়ে চলতে হবে, যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের অনুসরণ করে যারা আল্লাহর অবাধ্যতাকে উৎসাহিত করে এমন বিষয়গুলি মেনে চলে। মনে রাখতে হবে যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনোভাব প্রায়শই সঠিক হয় না, এমনকি যদি তা সঠিক বলে মনে হয়। পরিবর্তে, একজনকে বিশ্বাস করতে হবে যে, যেহেতু আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, সবকিছু জানেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য তিনিই একমাত্র আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন। সমস্ত মানব-নির্মিত আচরণবিধি কখনই এই পরিণতির দিকে পরিচালিত করবে না কারণ তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের অভাব রয়েছে, এমনকি যদি অধিকাংশ মানুষ সেগুলি অনুসরণ করে। আল্লাহ, সর্বশক্তিমানকে আনুগত্য করার সংগ্রামে তাদের সহায়তা করার জন্য তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করতে হবে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ ও প্রমাণাদি শেখা এবং তার উপর আমল করা হলে দৃঢ় ঈমান অর্জন করা সম্ভব হয়, যেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ব্যক্তি যখনই তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে, তখন সহজেই আল্লাহকে অমান্য করবে কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে, তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে বরং আল্লাহকে মেনে চলা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক

ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং প্রত্যেককে এবং সবকিছুকে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে মানসিক শান্তি পাবে।

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৭৬-১৭৮

وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ
حِطًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ
عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾

“আর যারা কুফরীতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়, তাদের জন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না।
নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ চান যে তিনি
তাদেরকে আখেরাতে কোন অংশ না দেন এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

নিঃসন্দেহে যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফর ক্রয় করে, তারা কখনও আল্লাহর কোন
ক্ষতি করতে পারবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আর যারা অবিশ্বাস করে তারা যেন কখনও মনে না করে যে, আমি তাদের জন্য
[ভোগের] সময় বাড়িয়ে দেই, তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। আমরা তাদের জন্য
এটি কেবল এজন্যই বাড়িয়ে দেই যাতে তারা পাপে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্য
রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।”

যেহেতু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সকল মানুষের জন্য সঠিক পথনির্দেশনা লাভের জন্য আকুল ছিলেন যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে, তাই পবিত্র কুরআন জুড়ে মহান আল্লাহ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ইসলামী শিক্ষা উপেক্ষা করে তাদের দ্বারা দুঃখিত না হন। ৯ম অধ্যায়, তাওবাহ, আয়াত ১২৮:

"নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদের কষ্ট তাঁর জন্য কষ্টকর; তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন এবং মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও করুণাময়।"

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৭৬:

" আর যারা কুফরীতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায় তাদের জন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না..."

প্রথমত, সকল নবী-রাসূল (সাঃ) সকল মানুষের কল্যাণ ও সাফল্য কামনা করার ঐতিহ্য বহন করেছেন। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই অন্যান্য মুসলিম ও অমুসলিমদের প্রতি একই মনোভাব পোষণ করতে হবে। দুঃখের বিষয় হল, অজ্ঞতার কারণে, অনেক মুসলিম অমুসলিমদের প্রতি যত্নশীল মনোভাবের পরিবর্তে কঠোর মনোভাব পোষণ করে, যার ফলে তারা উভয় জগতেই তাদের সাফল্য কামনা করে। এই আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই তাদের কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে, ঠিক যেমনটি নবী-রাসূল (সাঃ) করেছিলেন। এটি সর্বোত্তমভাবে প্রদর্শিত হয়

যখন কেউ ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর আমল করার ব্যাপক এবং সর্বব্যাপী সুবিধাগুলি দেখায়। এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন কেউ নিজেরাই ইসলামী শিক্ষা শিখে এবং তার উপর আমল করে। অতএব, প্রতিটি মুসলিমকে ইসলামী আচরণবিধি এবং আচরণ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের কর্মের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের কাছে ইসলামের শিক্ষা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এটি অন্যান্য মুসলিম এবং অমুসলিমদের হৃদয়কে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করবে, যা তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অন্যদিকে, যে মুসলিম ইসলামী শিক্ষা শিখতে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয়, সে বহির্বিশ্বের কাছে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে এবং ফলস্বরূপ তারা অন্যান্য মুসলিম ও অমুসলিমদের ইসলাম থেকে নিরুৎসাহিত করবে, যা পবিত্র নবীগণের (সাঃ) আচরণের পরিপন্থী। যেহেতু বহির্বিশ্বের কাছে ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা সকল মুসলমানের কর্তব্য, তাই উভয় জগতেই তাদের এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৭৬:

" আর যারা কুফরীতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায় তাদের জন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না..."

এই আয়াতটি এও নির্দেশ করে যে, অন্যদের উপর সঠিক নির্দেশনা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, তা মেনে নেওয়ার গুরুত্ব কতটা। সূরা ৮৮ আল গাশিয়াহ, আয়াত ২১-২২:

"সুতরাং স্মরণ করিয়ে দাও যে তুমি কেবল একটি স্মরণ করিয়ে দাও। তুমি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নও।"

একজন মুসলিমের ভূমিকা হলো অন্যদের তাদের কাজ এবং কথার মাধ্যমে, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজনদের, সঠিক আচরণ করতে উৎসাহিত করা , কিন্তু তারা প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনে সঠিক পথ বেছে নিতে বাধ্য করতে পারে না। প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে তাদের নিজস্ব পথ বেছে নেওয়া উচিত এবং তাদের পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে যদি তারা সঠিক বা ভুল পথ বেছে নেয়, তাহলে তারা মহান আল্লাহর কোন উপকার বা ক্ষতি করবে না। তারা কেবল তাদের পছন্দের সুবিধা বা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৬:

"...নিশ্চয়ই, তারা কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না..."

এর থেকে স্পষ্ট যে, ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর আমল করে মানুষ আল্লাহ, মহান আল্লাহ বা ইসলামের কোন উপকার করে না। ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে তারা আল্লাহ, মহান আল্লাহর কোন ক্ষতি করে না। অতএব, একজন ব্যক্তির এই অহংকারী মনোভাব এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি তাদের ইচ্ছার বিপরীত হলে ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবং উপেক্ষা করতে উৎসাহিত করে কেবল বিভ্রান্ত করবে। অতএব, একজনকে বুঝতে হবে যে ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করার সুবিধা অথবা ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করার ক্ষতি কেবল তাদেরই প্রভাবিত করবে। এর কারণ হল যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার উপর আমল করে সে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। এটি তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করবে এবং

তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করবে। অতএব, সঠিক পথ বেছে নেওয়ার ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করতে পছন্দ করে সে অনিবার্যভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এর ফলে মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্যহীনতা তৈরি হবে, এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় স্থাপন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে বাধা দেবে। অতএব, এই পথ উভয় জগতেই চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে, এমনকি যদি কেউ পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, এমনকি যদি তা তার আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের এমন একজন বিচক্ষণ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিচক্ষণ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন তিনিও ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন। কারণ একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন এবং তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ তায়াল। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও এত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ তাদের জীবনের প্রতিটি জিনিস এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে না, কারণ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে। একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসের আকারে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তায়াল। মানুষকে ইসলামের

শিক্ষাগুলি নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। কিন্তু এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

অতএব, উভয় জগতেই মানুষ কষ্ট ও চাপ ছাড়া আর কিছুই অনুভব করবে না, এমনকি যদি তার পার্থিব বিলাসিতাও থাকে কারণ সে মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচতে পারবে না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৬:

"... আল্লাহ চান যে তিনি তাদের পরকালে কোন অংশ না দেন, এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"

মনের শান্তির পথ এবং মানসিক চাপের পথ মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব, যে ব্যক্তি মানসিক শান্তির পথের চেয়ে মানসিক চাপের পথ বেছে নেয়, তার নিজের জন্য দোষারোপ করার মতো আর কেউ নেই এবং তারা তাদের পছন্দের পরিণতি থেকে রেহাই পাবে না। যারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, যেমন ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তির যারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করার পরেও হতাশা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতার মতো মানসিক ব্যাধিতে জর্জরিত জীবনযাপন করে, তাদের পর্যবেক্ষণ করলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ১৭৭:

"নিশ্চয়ই যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফর ক্রয় করে, তারা কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

এই আয়াতটি আরও স্পষ্ট করে যে মানুষের স্বভাব আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং সঠিক পথনির্দেশের সাথে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারীতে ৪৭৭৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি মানুষ ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। তাই একে অবিশ্বাস ও পথভ্রষ্টতার সাথে বিনিময় করা অস্বাভাবিক এবং এটি একজন ব্যক্তির মানসিক ব্যাধিতেও অবদান রাখে কারণ তারা যে প্রকৃতির উপর তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে চ্যালেঞ্জ করে। যে ব্যক্তি তাদের স্রষ্টা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করে স্বেচ্ছায় তাদের স্বভাবকে বিকৃত করে, সে উভয় জগতেই তাদের শাস্তি ভোগ করেছে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৭৭:

"নিশ্চয়ই যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফর ক্রয় করে, তারা কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

এই আয়াতটি আরও সতর্ক করে যে, একজন মুসলিম যখন আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণা বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা তাদের ঈমান হারাতে পারে। অতএব, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমান একটি গাছের মতো যাকে বৃদ্ধি পেতে হলে আনুগত্যের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা সূর্যালোকের মতো পুষ্টি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, তা বৃদ্ধি পেতে ব্যর্থ হয় এবং এমনকি মারাও যেতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি আনুগত্যের মাধ্যমে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমানও বৃদ্ধি পাবে না এবং মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। মহানবী (সা.)-এর যুগে মদিনায় বসবাসকারী আহলে কিতাবদের আচরণ ছিল এই, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যদিও তারা এর সত্যতা স্বীকার করেছিল। সূরা ৬ আল আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে ঈমান ত্যাগ করেছিল কারণ তারা জানত যে ইসলাম তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার থেকে বিরত রাখবে। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে কাজে সমর্থন না করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে।

এরপর আল্লাহ, যারা তাঁর অবাধ্যতায় অবিচল থাকে, তাদেরকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি তাদেরকে যেসব পার্থিব জিনিস দিয়েছেন, যেমন সময় এবং সম্পদ, সেগুলো যখন তারা অপব্যবহার করবে, তখন উভয় জগতেই তাদের জন্য কেবল চাপ এবং দুর্দশার কারণ হয়ে উঠবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৮:

"আর যারা অবিশ্বাস করে তারা যেন কখনও মনে না করে যে, আমরা তাদের জন্য [ভোগের] সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি, তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। আমরা তাদের জন্য এটি কেবল এজন্যই বাড়িয়ে দিচ্ছি যাতে তারা পাপে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"

অতএব, এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে, পার্থিব বিলাসিতা অর্জন এবং উপভোগ করা এই পৃথিবীতে প্রকৃত সাফল্যের লক্ষণ নয়। বাস্তবে, একজন ব্যক্তিকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা কেবল একটি পরীক্ষা যে সে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে সেগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করছে কিনা। সূরা আল মুলক, আয়াত ২:

" যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম..."

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, যদি আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা উভয় জগতেই তাদের মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। কিন্তু যদি তাদের অপব্যবহার করা হয়, তাহলে উভয় জগতেই তারা তাদের চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, সাফল্যের ভুল সংজ্ঞা গ্রহণ করা এড়িয়ে চলতে হবে এই বিশ্বাস করে যে এর সাথে পার্থিব বিলাসিতা অর্জন এবং উপভোগ করা জড়িত। প্রকৃত সাফল্য একজন ব্যক্তির কাছে কত পার্থিব জিনিস আছে এবং উপভোগ করা তার উপর নির্ভর করে না, বরং এটি পার্থিব আশীর্বাদগুলি কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার সাথে সম্পর্কিত, তার পরিমাণ নির্বিশেষে। যে ব্যক্তি এই বাস্তবতা বুঝতে ব্যর্থ হয় সে পার্থিব আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করার পরিবর্তে ভুলভাবে আরও পার্থিব বিলাসিতা অর্জন এবং উপভোগ করার দিকে মনোনিবেশ করবে এবং ফলস্বরূপ সে এই পৃথিবীতে বা পরকালে মানসিক শান্তি পাবে না। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত 178:

"আর যারা অবিশ্বাস করে তারা যেন কখনও মনে না করে যে, আমরা তাদের জন্য [ভোগের] সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি, তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। আমরা তাদের জন্য

এটি কেবল এজন্যই বাড়িয়ে দিচ্ছি যাতে তারা পাপে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"

অধিকন্তু, এই আয়াতে এই ভুল মনোভাবের বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে যে, কেউ যদি আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে এবং কেবল শাস্তি পায়নি অথবা তার শাস্তি স্বীকার করেনি বলে তার উপর অত্যাচার করে, তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না। বিলম্বিত শাস্তি মোটেও শাস্তি না পাওয়ার সমান নয়। অতএব, আল্লাহ তাআলা যে অবকাশ দেন তা কাজে লাগাতে হবে যাতে তিনি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হন এবং তাদের চরিত্র সংশোধন করতে পারেন যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শাস্তি লাভ করতে পারেন। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, আল্লাহ তাআলার ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও ঝামেলার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ তাআলা এবং মানুষের প্রতি লজ্জিত যেকোনো অধিকার পূরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। যদি কেউ তাদের প্রদত্ত অবকাশ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা কেবল আল্লাহর প্রদত্ত অনুগ্রহের অপব্যবহার করে তাদের অবাধ্যতা বৃদ্ধি করবে, যার ফলে উভয় জগতেই তাদের চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধা বৃদ্ধি পাবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৮:

"আর যারা অবিশ্বাস করে তারা যেন কখনও মনে না করে যে, আমরা তাদের জন্য [ভোগের] সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি, তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। আমরা তাদের জন্য এটি কেবল এজন্যই বাড়িয়ে দিচ্ছি যাতে তারা পাপে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"

পরিশেষে, সমগ্র সৃষ্টি মহান আল্লাহর আওতাধীন এবং তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারাধীন, একজন ব্যক্তির তাঁর নিয়ম মেনে চলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট দেশের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তেমনি মহাবিশ্বের মালিকের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতেই তার সমস্যা হবে। একজন ব্যক্তি যদি তার নিয়ম মেনে চলতে না পারে তবে একটি দেশ ছেড়ে যেতে পারে কিন্তু এমন জায়গায় পালিয়ে যেতে পারবে না যেখানে মহান আল্লাহর নিয়ম ও এখতিয়ার প্রযোজ্য হয় না। একজন ব্যক্তি তার সমাজের নিয়ম পরিবর্তন করতে সক্ষম হতে পারে কিন্তু তারা কখনও মহান আল্লাহর নিয়ম পরিবর্তন করতে পারবে না। উপরন্তু, ঠিক যেমন একজন বাড়ির মালিক ঘরের নিয়ম নির্ধারণ করে, এমনকি অন্যরা এই নিয়মের প্রতি আপত্তি জানালেও, একইভাবে, মহাবিশ্ব মহান আল্লাহর, এবং তাই, তিনিই একমাত্র এই মহাবিশ্বের নিয়ম নির্ধারণ করেন, মানুষ এই নিয়ম পছন্দ করুক বা না করুক। অতএব, এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে, নিজের স্বার্থে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে সে মহান আল্লাহর নিয়ম মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। একজন ব্যক্তি হয় আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পিছনের হিকমতগুলি শেখার চেষ্টা করতে পারে, যাতে সে বুঝতে পারে যে কীভাবে সেগুলি তাদের এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য উপকারী এবং কীভাবে তারা উভয় জগতে মানসিক ও শারীরিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, অথবা সে তার আকাঙ্ক্ষার উপাসনা করতে পারে এবং ইসলামের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলামী নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তার উচিত উভয় জগতেই তার পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং কোনও আপত্তি, প্রতিবাদ বা অভিযোগ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ২৯:

"আর বলো, "সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, অতএব যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক; আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।" নিশ্চয়ই আমরা জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে ঘিরে থাকবে। আর যদি তারা

সাহায্যের জন্য ডাকে, তবে তাদের সাহায্যের জন্য ঘোলা তেলের মতো পানি ব্যবহার করা হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দেবে। পানীয় কত নিকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট।"

অধ্যায় ৩ - আলী ইমরান, আয়াত ১৭৯-১৮৬

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٩﴾

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخُلُوْنَ بِمَآءِ اتَّهَمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَاللّٰهُ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٨٠﴾

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَّاۗءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاۗءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿١٨١﴾

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اَيْدِيَكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلٰمٍ لِّلْعٰبِدِ ﴿١٨٢﴾

الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ عٰهَدَ اِلَيْنَا اَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يٰتِيَنَا بِقُرْاٰنٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوْا بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿١٨٤﴾

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ
النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

﴿ تَبْلُغُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصِيرُوا تَتَّقُوا فَإِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ ﴿١٨٦﴾

“আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই [অবস্থায়] ছেড়ে দেবেন না যেখানে তোমরা [বর্তমানে]
আছো, যতক্ষণ না তিনি মন্দকে ভালো থেকে আলাদা করেন। আর আল্লাহ
তোমাদের কাছে অদৃশ্য বিষয় প্রকাশ করবেন না। বরং [বরং] আল্লাহ তাঁর
রসূলদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, তাই আল্লাহ এবং তাঁর রসূলদের উপর
বিশ্বাস স্থাপন করো। আর যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো এবং তাঁকে ভয় করো,
তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

আর যারা আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা লোভের সাথে গ্রহণ
করে, তারা যেন কখনও মনে না করে যে, এটি তাদের জন্য ভালো। বরং এটি
তাদের জন্য আরও খারাপ। কিয়ামতের দিন তারা যা লোভ করে রেখেছে তা
তাদের গলায় বেষ্টিত হবে। আর আসমান ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই।
তোমরা যা করছো, আল্লাহ তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

আল্লাহ অবশ্যই তাদের কথা শুনেছেন যারা বলেছিল, "নিশ্চয়ই আল্লাহ দরিদ্র, আর
আমরা ধনী।" আমরা তাদের কথা এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যার কথা লিপিবদ্ধ
করব এবং বলব, "জ্বলন্ত আগুনের আযাব আশ্বাদন করো।"

এটা তোমার হাত যা প্রেরণ করেছে তার জন্য এবং আল্লাহ কখনও [তাঁর] বান্দাদের
প্রতি অন্যায় করেন না।

যারা বলেছিল, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে আমরা কোন রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করব না যতক্ষণ না তিনি আমাদের কাছে এমন কুরবানী নিয়ে আসেন যা [আকাশ থেকে] আগুন গ্রাস করবে।" বলুন, "আমার পূর্বেও রাসূলগণ তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এবং তোমরা যা বলছ তা নিয়ে এসেছিলেন। তাহলে তোমরা কেন তাদেরকে হত্যা করলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?"

অতঃপর যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], তাহলে তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, যারা স্পষ্ট প্রমাণ, বিধি-বিধান এবং আলোকিত কিতাব নিয়ে এসেছিলেন।

প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, আর তোমাদেরকে কেবল কিয়ামতের দিন তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। অতএব যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে সফল হবে। আর এই পার্থিব জীবন তো ছলনার ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের নিজেদের পরীক্ষা অবশ্যই হবে। তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে এবং আল্লাহর সাথে শিরককারীদের কাছ থেকে তোমরা অবশ্যই অনেক গালিগালাজ শুনতে পাবে। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে অবশ্যই এটি দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"

মহান আল্লাহ মুসলিমদের স্বরণ করিয়ে দেন যে, যারা সত্যিকার অর্থে তাঁর উপর বিশ্বাস করে, তাদের থেকে যারা কেবল মৌখিকভাবে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপনের দাবি করে, তাদেরকে তিনি আলাদা করার একটি উপায় হিসেবে সমস্যার মুখোমুখি হন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৯:

"আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই [অবস্থায়] রাখবেন না যেখানে তোমরা [বর্তমানে] আছো যতক্ষণ না তিনি মন্দকে ভালো থেকে আলাদা করেন..."

অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা কঠিন, প্রতিটি পরিস্থিতিতেই মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। বাস্তবে, অসুবিধার মুখোমুখি হওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকাই আসল পরীক্ষা, কারণ স্বাচ্ছন্দ্যের সময় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা প্রায়শই সহজ। এই আনুগত্যের মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ২-৩:

"মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি, আর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা মিথ্যাবাদী।"

অতএব, কঠিন সময়ে ধৈর্যশীল থাকা উচিত। ধৈর্যের অর্থ হলো নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, এই বিশ্বাসে যে তিনি কেবল তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

নিয়াতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হলো শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করা। কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হলো ভালো কথা বলা অথবা নীরব থাকা। আর কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হলো পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করা।

অধিকন্তু, দৃঢ় ঈমান গ্রহণের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত কারণ এটি তাদেরকে কঠিন সময়ে ধৈর্যশীল থাকতে এবং সুখের সময়ে কৃতজ্ঞ থাকতে সাহায্য করবে। দৃঢ় ঈমান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি নিশ্চিত করে যে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা কঠিন, প্রতিটি পরিস্থিতিতেই মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি শিখে এবং তার উপর আমল করে, যা ব্যাখ্যা করে যে, আন্তরিকভাবে আল্লাহকে আনুগত্য করলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাওয়া যায়। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। এই ব্যক্তি যখনই তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয় তখনই সহজেই

আল্লাহকে অমান্য করবে, কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে, তাদের আকাউক্ষা ত্যাগ করে আল্লাহর আনুগত্য করলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাওয়া যায়। অতএব, ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং তাদের জীবনের প্রতিটি জিনিসকে সঠিকভাবে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে।

অধিকন্তু, যার ঈমান যত শক্তিশালী হবে, সে তার সমস্যার পেছনের হিকমতগুলো তত বেশি উপলব্ধি করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, যার ঈমান দৃঢ় হবে, সে বোঝে যে ধৈর্যের সাথে সমস্যার মুখোমুখি হওয়া তার ছোট ছোট পাপগুলোকে মুছে ফেলে। ইমাম বুখারীর "আদাবুল মুফরাদ", ৪৯২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর সাথে তাদের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে ধৈর্যের সাথে সমস্যার মুখোমুখি হয়ে নিজের ছোট ছোট পাপগুলো মুছে ফেলা অনেক ভালো। কিন্তু ১৭৯ নম্বর আয়াতে যেমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, দৃঢ় ঈমান একজন মুসলিমকে এও শিক্ষা দেয় যে, এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষার একটি অংশ হলো, তাদের অভিজ্ঞতার পেছনের সমস্ত হিকমত নবীদের (সা.) প্রদত্ত ঐশ্বরিক জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের কাছে প্রকাশিত হবে না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, ১৭৯ নম্বর আয়াত:

"... আল্লাহ তোমাদের কাছে অদৃশ্য বিষয় প্রকাশ করবেন না। বরং আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন..."

একজন মুসলিমের উচিত সেই অহংকারী মনোভাব এড়িয়ে চলা যেখানে তারা দাবি করে যে, মহান আল্লাহ তাদের সকল সমস্যার পিছনের প্রজ্ঞা তাদের কাছে প্রকাশ করুন। মহান আল্লাহ তাঁর পছন্দের জন্য কারও কাছে ব্যাখ্যা দাবী করেন না, কারণ তিনি হলেন বিশ্বজগতের স্রষ্টা, মালিক এবং প্রভু এবং সৃষ্টি কেবল তাঁর দাস। এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার একটি অংশ হল এই পরিস্থিতিতে নম্রতা অবলম্বন করা এবং স্বীকার করা যে, মহান আল্লাহ সর্বদা জ্ঞানের সাথে জিনিসগুলি বেছে নেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। এই সত্যটি মনে রাখা একজনকে কঠিন সময়ে নম্র এবং ধৈর্যশীল থাকতে সাহায্য করবে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৭৯:

"আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই [অবস্থায়] ছেড়ে দেবেন না যেখানে তোমরা [বর্তমানে] আছো, যতক্ষণ না তিনি মন্দকে ভালো থেকে আলাদা করেন। আর আল্লাহ তোমাদের কাছে অদৃশ্য বিষয় প্রকাশ করবেন না। বরং [পরিবর্তে], আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন..."

যেহেতু সাধারণ মানুষকে অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হয়নি, যেমন নবীগণ (সাঃ) - এর উপর বর্ষিত হোক, তাই তাদের উচিত অন্য মানুষ ভালো না খারাপ তা নিয়ে অনুমান করা থেকে বিরত থাকা।

সুনানে আবু দাউদের ৪৯৯৩ নম্বর হাদিসে মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, অন্যদের সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তা করা আল্লাহ তাআলার সঠিক উপাসনার একটি দিক। অর্থাৎ, এটি তাঁর আনুগত্যের একটি দিক। একজন মুসলিমকে অবশ্যই অনুমান এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এর ফলে প্রায়শই পাপ হয়, যেমন গীবত, অপবাদ এবং অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। সূরা ৪৯, আল হুজুরাত, আয়াত ১২:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক [নেতিবাচক] অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কিছু অনুমান পাপ..."

বরং, একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের কথা ও কাজকে ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যদি না এর স্পষ্ট প্রমাণ অন্যথায় থাকে। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিমকে অবশ্যই নির্বোধ এবং বিশ্বাসঘাতক হতে হবে, কারণ তাদের প্রতিটি পরিস্থিতিতে সতর্কতার সাথে প্রবেশ করতে হবে, যেমন ব্যবসায়িক লেনদেন, কিন্তু একই সাথে তাদের প্রমাণ ছাড়াই অন্যদের খারাপ ধারণা করা উচিত নয়। অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা ভাঙা এবং সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার দিকে পরিচালিত করে, কারণ এই ক্ষেত্রে মানুষের সামাজিকীকরণ এবং অধিকার পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। যারা অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন এবং যারা এই ধরনের আচরণ করেন তাদের সাথে আচরণ করেন তাদের পক্ষে এটি কঠিন হয়ে পড়ে।

মহান আল্লাহর পছন্দসমূহ প্রজ্ঞার উপর ভিত্তি করে, তা মেনে নিলে একজন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে আল্লাহ এবং তাঁর পবিত্র নবীগণের উপর বিশ্বাস করতে উৎসাহিত হবে, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৯:

"... তাই তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান আন..."

আল্লাহর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস বলতে বোঝায়, মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ঘোষণাকে কাজে সমর্থন করা। যে ব্যক্তি আল্লাহকে তার প্রভু বলে বিশ্বাস করে, সে অবশ্যই তার দাসত্ব গ্রহণ করবে। একজন প্রকৃত বান্দা নিজের সন্তুষ্টি খোঁজে না, এবং অন্যরাও তাকে খুশি করবে বলে আশা করে না। তারা অন্য সকল বিষয়ের উপর তার প্রভুর সন্তুষ্টি এবং আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেবে, যেমন মানুষের আনুগত্য ও অনুসরণ, নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি। একজন বান্দা যা চায় তা হল তার প্রভুকে খুশি করা। উপরন্তু, একজন বান্দা স্বীকার করে যে তার নিজের জীবন সহ তার যা কিছু আছে তা তার স্রষ্টা ও প্রভু, মহান আল্লাহর। অতএব, তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা দ্রুত ব্যবহার করবে। একজন প্রকৃত বান্দা বুঝতে পারবে যে, যেহেতু মহান আল্লাহ তাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক এবং সকল কিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক, তাই তাঁর অবাধ্যতা করে তারা মনের শান্তি লাভ করতে পারে না, কারণ তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল সহ সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্যে কঠোর পরিশ্রম করবে, কারণ এটিই উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

একজন ব্যক্তি যত বেশি এইভাবে কাজ করবে, মহান আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস তত বেশি দৃঢ় হবে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে নিশ্চিত হবে যে বিচারের দিনে তাকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এটি তাকে বাস্তবিকভাবে প্রস্তুতির মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করতে আরও উৎসাহিত করবে, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। অতএব, যে ব্যক্তি মৌখিকভাবে আল্লাহকে এবং বিচার দিবসকে বিশ্বাস করার দাবি করে কিন্তু কার্যত আল্লাহকে আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়, যার ফলে কার্যত বিচার দিনের জন্য প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়, তাকে অবশ্যই তার বিশ্বাস পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে, কারণ তাদের সৎকর্মের অভাব আল্লাহকে এবং শেষ দিবসকে বিশ্বাস না করার প্রমাণ।

পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস দ্বারা নির্দেশিত মহাবিশ্বের মধ্যে নিদর্শনাবলী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ এবং বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ মহাবিশ্বের মধ্যে অসংখ্য সুষম ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, যেমন পৃথিবী থেকে সূর্যের নিখুঁত দূরত্ব, জলচক্র, সমুদ্রের ঘনত্ব, যা জাহাজগুলিকে তাদের উপর দিয়ে চলতে দেয় এবং তাদের মধ্যে সমুদ্রের জীবনকে বিকশিত হতে দেয়, এবং আরও অনেক ব্যবস্থা, তখন তারা একজন স্রষ্টার হাত পর্যবেক্ষণ করবে। এত নিখুঁত সুষম ব্যবস্থা এলোমেলো ঘটনার

পরিণতি হতে পারে না। উপরন্তু, যদি একাধিক ঈশ্বর থাকত তবে এটি বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করত কারণ প্রতিটি ঈশ্বর মহাবিশ্বের মধ্যে ভিন্ন কিছু চাইতেন। এটি স্পষ্টতই ঘটনা নয় এবং তাই একক ঈশ্বর, মহান আল্লাহকে নির্দেশ করে।
অধ্যায় 21 আল আশ্বিয়া, আয়াত 22:

"যদি তাদের মধ্যে [অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের] আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত..."

মহাবিশ্বের মধ্যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে যা বিচার দিবসের আগমনের ইঙ্গিত দেয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, তখন সে একটি প্রধান জিনিস লক্ষ্য করবে যা ভারসাম্যহীন, তা হল মানুষের কর্ম। সৎকর্মকারী এই পৃথিবীতে তাদের পূর্ণ প্রতিদান পায় না এবং মন্দকর্মকারী তাদের পূর্ণ শাস্তি পায় না, এমনকি যদি তাদের কোন সরকার দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়। এটা বোঝা যুক্তিসঙ্গত যে একক স্রষ্টা, মহান আল্লাহ, যিনি এই মহাবিশ্বের অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থার ভারসাম্য বজায় রেখেছেন, তিনি একদিন মানুষের কর্মেরও ভারসাম্য বজায় রাখবেন, যা এই পৃথিবীর প্রধান ভারসাম্যহীন জিনিস। কর্মের এই ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য, মানুষের কর্মের প্রথমেই অবসান হতে হবে। এটিই বিচারের দিন যখন মানুষের কর্মের বিচার এবং চিরতরে ভারসাম্য বজায় রাখা হবে।

অধিকন্তু, আল্লাহ, মহিমান্বিত, বৃষ্টি ব্যবহার করে একটি মৃত পতিত ভূমিকে জীবন দান করেন এবং সৃষ্টির জন্য একটি মৃত বীজকে জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তোলেন। একইভাবে, মহিমান্বিত আল্লাহ, মানুষ নামক মৃত বীজকে, যাকে মাটিতে সমাহিত করা হয়, জীবন দান করতে পারেন এবং করবেন, যেমন মৃত বীজ থেকে অঙ্কুরিত

হয়ে প্রাণ ফিরে আসে। ঋতু পরিবর্তন স্পষ্টভাবে পুনরুত্থানকে দেখায়। উদাহরণস্বরূপ, শীতকালে, গাছের পাতা মারা যায় এবং ঝরে পড়ে এবং গাছটি প্রাণহীন দেখায়। কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে, পাতাগুলি আবার গজায় এবং গাছটি প্রাণে পূর্ণ দেখায়। সমস্ত প্রাণীর ঘুম জাগরণ চক্র পুনরুত্থানের আরেকটি উদাহরণ। ঘুম মৃত্যুর বোন, কারণ ঘুমন্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলি কেটে ফেলা হয়। মহান আল্লাহ, তারপর একজন ব্যক্তির আত্মা তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন যদি তারা বেঁচে থাকার জন্য নির্ধারিত হয় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিকে আবার জীবন দান করে। অধ্যায় 39 আয-যুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ মানুষের আত্মা তাদের মৃত্যুর সময় কবজ করেন এবং যারা মারা যায় না তাদের নিদ্রাকালে কবজ করেন। অতঃপর যাদের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদের তিনি ধরে রাখেন এবং অন্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

এই এবং আরও অনেক উদাহরণের উপর চিন্তা করলে মানুষের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা এবং বিচারের দিনে এর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৭৯:

"... তাই তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান আন..."

মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, মুসলিম হিসেবে গণ্য হতে হলে অবশ্যই তাঁর সকল পবিত্র নবীর উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। এটি ছিল আহলে কিতাবদের সরাসরি সমালোচনা, যারা কিছুতে বিশ্বাস করত এবং কিছুকে প্রত্যাখ্যান করত, তবুও তারা মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাসী বলে দাবি করত। ৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ১৫০-১৫১:

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, "আমরা কিছুতে বিশ্বাস করি এবং কিছুতে অবিশ্বাস করি" এবং এর মাঝামাঝি কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। তারাই প্রকৃত কাফের। এবং আমরা কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৭৯:

"... অতএব, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান আন..."

পবিত্র নবীগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো তাদের জীবনধারা, আচরণ এবং শিক্ষা অনুসরণ করা, যা পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে আলোচিত হয়েছে। তাদের সুন্দর আচরণের সারসংক্ষেপ, পরিপূর্ণতা এবং পরিপূর্ণতা এসেছে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মহৎ আচরণের মাধ্যমে। অতএব, তাঁর জীবন, শিক্ষা এবং মহৎ চরিত্র সম্পর্কে বাস্তবিকভাবে জ্ঞান অর্জন এবং তার

উপর আমল করার মাধ্যমে তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে সমর্থন করা উচিত।
সূরা ৩৩ আল আহযাব, আয়াত ২১:

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, ৩১ আয়াত:

"বলুন, [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এবং ৫৯তম অধ্যায় আল হাশর, ৭ম আয়াত:

"... আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

অতএব, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার দাবি করা, কিন্তু তাঁর শিক্ষা ও চরিত্র অনুসারে কাজ না করা এই মৌখিক দাবির পরিপন্থী। ঠিক যেমন সকলেই বিচার দিবসে তাঁর সুপারিশের আশা করে, তেমনি তাদের ভয় করা উচিত যে যদি তারা তাঁর ঐতিহ্য এবং তিনি যা এনেছিলেন, অর্থাৎ পবিত্র কুরআন, তা শিখতে এবং কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিচার দিবসে তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন। সূরা ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৩০:

"আর রাসূল বলেছেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

যদি কেউ বিচারের দিনে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের পরিবর্তে তাঁর সুপারিশ কামনা করে, তাহলে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং তার ঐতিহ্যের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি এমনভাবে ব্যবহার করবে যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যার ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসবে।

উপরন্তু, মৌখিকভাবে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার দাবি করা, কিন্তু তাঁর চরিত্র ও আচরণ অনুসরণ না করা ইসলামে কোন মূল্য রাখে না, যেমন পূর্ববর্তী জাতিগুলিও তাদের পবিত্র নবীদের ভালোবাসার দাবি করে। কিন্তু যেহেতু তারা কার্যত তাদের শিক্ষা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই পরকালে তাদের সাথে একত্রিত হবে না। অতএব, যে ব্যক্তি পরকালে মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের সাথে একত্রিত হতে চায়, তাকে অবশ্যই কার্যত তাঁর শিক্ষা ও চরিত্র অনুসরণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে।

যারা সঠিকভাবে আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং তাঁর পবিত্র নবীগণের উপর বিশ্বাস করে, তারাই তাকওয়া অবলম্বন করবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৯:

"... আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাঁকে ভয় করে, তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান।"

এই মহান পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে উভয় জগতে মানসিক শান্তি লাভ করা। যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে সে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) -এর হাদীসে বর্ণিত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্য নিশ্চিত করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং তাঁর পবিত্র নবীগণ, সাঃ-এর উপর সঠিকভাবে বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হয়, সে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এটি তাদের একটি ভারসাম্যহীন মানসিক ও শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করবে, এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল স্থানে ফেলবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুতি নিতে বাধা দেবে। অতএব, এই আচরণ তাদের উভয় জগতে মানসিক শান্তির মহান পুরস্কার পেতে বাধা দেবে। পরিবর্তে, তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও, চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধায় ভরা জীবনযাপন করবে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের

চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সুষম করতে এবং তার জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান কখনই এই ফলাফল অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের কারণে জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান আছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণের সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..'"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের সঠিক অপব্যবহার করতে পছন্দ করে তারা মানসিক প্রশান্তি পাবে না এবং তাদের কাছে থাকা পার্থিব জিনিসপত্র উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ, বামেলা এবং অসুবিধার উৎস হয়ে উঠবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮০:

" আর যারা[লোভের বশে] আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দিয়েছেন তা ত্যাগ করে, তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য ভালো। বরং এটি তাদের জন্য আরও খারাপ। কিয়ামতের দিন তাদের ঘাড়ে তারা যা ত্যাগ করেছে তা ঝুলিয়ে রাখা হবে..."

ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা নিশ্চিত করতে হবে যাতে তারা এই পরিণতি এড়াতে পারে এবং উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে।

এছাড়াও, সহীহ বুখারীতে ১৪০৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসের সাথে ১৮০ নম্বর আয়াতটিও যুক্ত। নবী মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তাদের ফরজ দান করে না, তাকে একটি বড় বিষাক্ত সাপের মুখোমুখি হতে হবে যা কিয়ামতের দিন তাদেরকে ক্রমাগত কামড়াতে থাকবে। এরপর তিনি ৩য় সূরা আলে ইমরানের ১৮০ নম্বর আয়াতটি পাঠ করেন:

"আর যারা [লোভের বশে] আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দিয়েছেন তা দান করে না, তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য ভালো। বরং এটি তাদের জন্য আরও খারাপ। কিয়ামতের দিন তাদের ঘাড়ে তারা যা দান করেছে তা দিয়ে তাদের গলা বেষ্টিত করা হবে..."

অতএব, এই হাদিসটি মুসলমানদেরকে তাদের ফরজ দান সঠিকভাবে আদায় করার জন্য সতর্ক করে। ফরজ দান হল একজন ব্যক্তির মোট আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং শুধুমাত্র তখনই দেওয়া হয় যখন একজন ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকে। ফরজ দান দানের একটি লক্ষ্য হল এটি একজন মুসলিমকে মনে করিয়ে দেয় যে তাদের কাছে থাকা সম্পদ তাদের নয়, অন্যথায় তারা যেভাবে ইচ্ছা তা ব্যয় করতে স্বাধীন হবে। সম্পদ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে দান করেছেন, তাই তাঁর সন্তুষ্টি অনুসারে ব্যবহার করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি দান কেবল একটি ঋণ যা তার ন্যায্য মালিক, মহান আল্লাহ তাআলাকে পরিশোধ করতে হবে। এটি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ তাদের প্রদত্ত দানগুলিকে

এমনভাবে ব্যবহার করে যা আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে এমন আচরণ করে যেন তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদ, যেমন তাদের সম্পদ, তাদেরই এবং তাই ফরজ দান থেকে বিরত থাকে, সে শান্তির সম্মুখীন হবে, ঠিক যেমন পার্থিব ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ ব্যক্তি শান্তির সম্মুখীন হয়। উপরন্তু, এই পৃথিবীতে, যে সম্পদে তারা ফরজ দান করতে ব্যর্থ হয় তা তাদের চাপ এবং দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা মনে রাখতে ব্যর্থ হয় যে, মহান আল্লাহ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের উপর তার অধিকার রয়েছে। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ্ বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"]

মহান আল্লাহ সকল মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, যেহেতু তিনি মহাবিশ্বের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনিই এর মালিক এবং সমগ্র সৃষ্টির মৃত্যু হলে সকল কিছু তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮০:

"... আর আসমান ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই.."

বাস্তবে, মানুষ যখন মারা যাবে এবং কবরে পৌঁছাবে, তখন তার কাছে কেবল তার ভালো এবং খারাপ কাজই থাকবে। তাকে প্রদত্ত সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদ অবশেষে তাদের ছেড়ে যাবে। যেহেতু এটি একটি অনিবার্য বাস্তবতা, তাই ইসলামী শিক্ষা অনুসারে সঠিকভাবে সেগুলি ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত, যাতে সেগুলি অপব্যবহার না করে বরং ভাল কাজই থাকে যা তাকে খারাপ কাজ এবং অনুশোচনা থেকে বঞ্চিত করবে। অধ্যায় ৪৭ আল-ফজর, আয়াত ২৩-২৪:

"এবং সেদিন জাহান্নামকে সামনে আনা হবে- সেদিন মানুষ স্বরণ করবে, কিন্তু স্বরণ তার জন্য কেমন হবে? সে বলবে, "হায়, আমি যদি আমার জীবনের জন্য [কিছু কল্যাণ] আগে পাঠাতাম।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮০:

"... আর আসমান ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই.."

যখন একজন মুসলিম সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তার যা কিছু আছে তা মহান আল্লাহর, তখন তার কাছে থাকা আশীর্বাদগুলো, যেমন দান, আল্লাহর অনুগ্রহে সঠিকভাবে ব্যবহার করা সহজ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব গ্রহণ করে সে বুঝতে পারে যে তারা কেবল আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ফেরত দিচ্ছে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৫৪:

"হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদের যা রিষিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করো..."

এই আচরণ অহংকারের মাধ্যমে তাদের দানশীলতার সৎকর্ম নষ্ট করা থেকেও রক্ষা করে। অহংকার একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করায় যে তারা দান করে আল্লাহ এবং অভাবীদের প্রতি অনুগ্রহ করছে। কিন্তু একইভাবে একজন ব্যক্তি গর্ব ছাড়াই ব্যাংক ঋণ ফেরত দেয়, মুসলমানদের বুঝতে হবে যে তাদের দান হল আল্লাহ প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের একটি উপায়। উপরন্তু, অভাবীরা তাদের দান গ্রহণ করে দাতার প্রতি অনুগ্রহ করছে। অভাবীরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়ার একটি উপায়, এবং তাদের ছাড়া এটি অসম্ভব। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে তাদের সম্পদ তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং শক্তির মাধ্যমে জমা হয়েছে, তাহলে তাদের বুঝতে হবে যে এই জিনিসগুলিও আল্লাহ প্রদত্ত। অতএব, সম্পদের মতো আশীর্বাদের আকারে এই ঋণ অবশ্যই আল্লাহর কাছ থেকে ফেরত দিতে হবে, অন্যথায় তাদের এমন শাস্তির সম্মুখীন হতে হতে পারে যা এই পৃথিবীতে শুরু হবে এবং পরকালেও অব্যাহত থাকবে।

যখন কেউ দান করে, তখন তার লেনদেন কোন অভাবী ব্যক্তির সাথে হয় না, বরং তা হয় মহান আল্লাহর সাথে। যখন কোন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর সাথে ব্যবসা করে, তখন তারা এমন এক অকল্পনীয় লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে যা তাদের এই দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত করবে। আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে এটি নির্দেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২৪৫:

"কে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, যাতে তিনি তার জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন?"

কেউ যদি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পছন্দ করে বা না করে, তবে তাদের এই সিদ্ধান্তের পরিণতি এই পৃথিবীতে এবং পরকালেও ভোগ করতে হবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮০:

"... আর আল্লাহ, তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে [সম্পূর্ণ] অবহিত।"

ইসলাম গ্রহণে মানুষকে নিরুৎসাহিত করার জন্য, আহলে কিতাবদের কিছু পণ্ডিত বোকামি করে দাবি করেছিলেন যে, যদি ইসলাম সত্য হত, তাহলে মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করতে বলতেন না এবং তাদের কাছ থেকে ঋণও চাইতেন না। তাই তারা বলেছিলেন যে এর অর্থ হল, মহান আল্লাহ অভাবী, যখন তারা ধনী। এটি তাফসীর ইবনে কাসির, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৪-এ আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারাহ, আয়াত ২৪৫:

"কে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, যাতে তিনি তার জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন?"

এবং অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮১:

"আল্লাহ অবশ্যই তাদের কথা শুনেছেন যারা বলেছিল, "নিশ্চয়ই আল্লাহ দরিদ্র, আর আমরা ধনী!"..."

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেন যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। মানুষের আনুগত্য থেকে মহান আল্লাহ কোন উপকার লাভ করেন না এবং তাদের অবাধ্যতাও মহান আল্লাহর কোন ক্ষতি করে না। ১৭ সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৭:

"[এবং বললেন], "যদি তোমরা ভালো করো, তাহলে নিজেদের জন্যই ভালো করো; আর যদি মন্দ করো, তাহলে নিজেদের জন্যই করো!"..."

অতএব, এমন অহংকারী মনোভাব গ্রহণ করা এড়িয়ে চলা উচিত যেখানে তারা মনে করে যে তারা মহান আল্লাহকে আনুগত্য করে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করছে। এই অহংকার কেবল তখনই তাদের পথভ্রষ্ট করবে যখন তাদের ইচ্ছা ইসলামী শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হবে। এই বোকা ঠিক সেই অজ্ঞ রোগীর মতো যে এমন আচরণ করে যেন তারা তাদের ডাক্তারের প্রতি অনুগ্রহ করছে, তাদের চিকিৎসা পরামর্শ শুনে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে। এই বোকা রোগী যখন তাদের ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক হবে তখনই তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ উপেক্ষা করবে, যা কেবল তাদের ক্ষতির দিকেই নিয়ে যাবে। বরং একজন জ্ঞানী রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি বোঝেন যে তাদের ডাক্তার তাদের সাহায্য করছেন এবং তাই তাদের নিজের স্বার্থে তাদের চিকিৎসা পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন।

আল্লাহ, মহান, আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে আলেমদের এবং সম্প্রসারিতভাবে যারা তাদের মনোভাব গ্রহণ করে তাদের সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, উভয় জগতেই তাদের মনোভাবের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮১:

"... আমরা তাদের কথা এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যার কথা লিপিবদ্ধ করব এবং বলব, "জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আশ্বাদন করো।"

নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর যুগে মদিনায় বসবাসকারী আহলে কিতাবরা কেবল তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল এবং প্রকৃতপক্ষে কখনও কোন নবীকে হত্যা করেনি। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কর্মকাণ্ডকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিল, যারা নবীদের হত্যা করেছিল, তাই মহান আল্লাহ তাদের সাথে একত্রিত করেছিলেন।

এটি অন্যদের অন্ধভাবে অনুসরণ না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে কারণ তারা যাদের মনোভাব এবং আচরণকে সমর্থন করে এবং অনুকরণ করে তাদের হিসাবে গণ্য করা হবে। সুনানে আবু দাউদের ৪০৩১ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, যদি মুসলমানরা আহলে কিতাবদের মনোভাব গ্রহণ করে যারা বিশ্বাস করত যে তারা ঐশী শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর আমল করে আল্লাহকে অনুগ্রহ করছে, তাহলে পরকালে তাদেরও তাদের সাথে মিলিত হতে পারে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮১:

"আল্লাহ অবশ্যই তাদের কথা শুনেছেন যারা বলেছিল, "নিশ্চয়ই আল্লাহ দরিদ্র, আর আমরা ধনী।" আমরা তাদের কথা এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যার কথা লিপিবদ্ধ করব এবং বলব, "জ্বলন্ত আগুনের আযাব আস্বাদন করো।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও এই লোকেরা স্পষ্টতই নিন্দুক ছিল, তবুও মহান আল্লাহ তাদের তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেননি। বরং, তিনি তাদের অবকাশ দিয়েছিলেন যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। এটি নির্দেশ করে যে, মহান আল্লাহ প্রদত্ত অবকাশকে কাজে লাগিয়ে তাদের সময় শেষ হওয়ার আগে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া এবং আচরণ সংশোধন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, বিলম্বিত শাস্তি মোটেও শাস্তি না পাওয়ার মতো নয়। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ করা, মহান আল্লাহ এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একজনকে আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তিনি আবার একই বা অনুরূপ পাপ করবেন না এবং আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লজ্জিত যেকোনো অধিকার পূরণ করবেন। কিন্তু যদি কেউ তাদের প্রদত্ত অবকাশ ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের নিজেরাই দোষারোপ করার কেউ নেই, কারণ প্রতিটি ব্যক্তি তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মের পরিণতি ভোগ করবে এবং মহান আল্লাহ তাদের উপর মোটেও অন্যায় করবেন না। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮২:

"এটা তোমার হাত যা প্রেরণ করেছে তার জন্য এবং আল্লাহ কখনও [তাঁর] বান্দাদের প্রতি অন্যায় করেন না।"

এরপর আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদের আরেকটি কৌশলের কথা উল্লেখ করেন, যারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ থেকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেছিলেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৩:

"[তারা] যারা বলেছিল, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে আমরা কোন রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করব না যতক্ষণ না তিনি আমাদের কাছে এমন কুরবানী নিয়ে আসেন যা [আকাশ থেকে] আগুন গ্রাস করবে।" বলুন, "তোমাদের কাছে আমার পূর্বে রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এবং তোমরা যা বলছ তা নিয়ে এসেছিলেন। তাহলে তোমরা কেন তাদেরকে হত্যা করলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?"

আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাদের কৌশল প্রকাশ করে দিয়েছেন পূর্ববর্তী নবীদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, যারা তাদের জন্য স্পষ্ট প্রমাণ এবং ঐশ্বরিক অলৌকিক ঘটনা নিয়ে এসেছিলেন, তবুও তারা তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ক্ষতি করেছে। তারা এইভাবে আচরণ করেছে কারণ তারা ঐশ্বরিক শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে চায়নি এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থের ভুল ব্যাখ্যা করে অর্জিত সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদা হারানোর ভয়ে। তারা পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছ থেকে একটি অলৌকিক ঘটনা দাবি করেছে, যদিও তারা স্পষ্টভাবে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেছে। তাদের ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থগুলিতে শিক্ষিত হওয়ার সাথে সাথে তারা পবিত্র কুরআনের লেখক, মহান আল্লাহকে চিনতে পেরেছে। এবং তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ

(সাঃ) কে চিনতে পেরেছে, যেমনটি তাদের ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা 6 আল আন'আম, আয়াত 20:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের[নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

অধিকন্তু, আহলে কিতাব এবং মক্কার অমুসলিম উভয়ই জানত যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) পূর্ববর্তী ঐশী কিতাব অধ্যয়ন করেননি এবং তাই তাঁর পক্ষে পবিত্র কুরআন জাল করা অসম্ভব ছিল। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ৪৮:

"আর তুমি এর আগে কোন কিতাব পাঠ করেনি এবং তোমার ডান হাতে কোন কিতাব লিখে রাখোনি। তাহলে [অর্থাৎ, অন্যথায়] মিথ্যাবাদীদের সন্দেহের কারণ হত।"

মুসলমানদের তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি উভয় জগতেই কেবল সমস্যা সৃষ্টি করবে। মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা যে পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করে, তা উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচতে পারবে না। উপরন্তু, যখন তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে, তখন এটি তাদের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার ভারসাম্যহীন করে তুলবে, এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় স্থাপন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুতি নিতে বাধা দেবে। এটি উভয় জগতে তাদের চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধা বৃদ্ধি করবে। নিম্নলিখিত আয়াতে এটি সতর্ক করা হয়েছে কারণ এটি আহলে কিতাবদের সমালোচনা হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে যারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে আলোচনা করা তাদের ঐশী গ্রন্থের মধ্যে জ্ঞান গোপন করেছিল। এটি ইমাম আল ওয়াহিদীর, আসবাব আল নুযুল, 3:180, পৃষ্ঠা 44-এ আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 3 আলী ইমরান, আয়াত 180:

" আর যারা [লোভের বশে] আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দিয়েছেন তা ত্যাগ করে, তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য ভালো। বরং এটি তাদের জন্য আরও খারাপ। কিয়ামতের দিন তাদের ঘাড়ের তারা যা ত্যাগ করেছে তা ঝুলিয়ে রাখা হবে..."

অধ্যায় 3 আলী ইমরান, আয়াত ১৮৩:

“[তারা] যারা বলেছিল, “নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে আমরা কোন রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করব না যতক্ষণ না তিনি আমাদের কাছে এমন কুরবানী নিয়ে আসেন যা [আকাশ থেকে] আগুন গ্রাস করবে।” বলুন, “তোমাদের কাছে আমার পূর্বে রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এবং তোমরা যা বলছ তা নিয়ে এসেছিলেন। তাহলে তোমরা কেন তাদেরকে হত্যা করলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?”

প্রাচীনকালে, যে ব্যক্তি কোন কাজের জন্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চাইত, সে তাঁর উদ্দেশ্যে কুরবানী পেশ করত। যদি কুরবানী কবুল হত, তাহলে আকাশ থেকে নেমে আসা আগুন তা ভস্মীভূত করত। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের মাধ্যমে তা রহিত হয়ে যায়, যা আহলে কিতাবরা জানত কিন্তু তারা তা গোপন রেখেছিল। এছাড়াও, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দ্বারা প্রদর্শিত আরও অনেক অলৌকিক ঘটনা ছিল, যা তাঁর নবুওয়তের প্রমাণ দিয়েছিল, যার মধ্যে একটি ছিল আহলে কিতাবদের ক্ষেত্রে তাঁর এবং পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত বর্ণনা তাদের ঐশী গ্রন্থে। এটি তাফসীর আল কুরতুবী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০৭-২০৮-এ আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও, এটা বুঝতে হবে যে ইসলামের কাজ মানুষের ইচ্ছা ও ইচ্ছা পূরণ করা নয়। ইসলামের সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ ইসলামী শিক্ষার মধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং যে ব্যক্তি খোলামেলা ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে এর কাছে আসে সে নিঃসন্দেহে সেগুলি চিনবে এবং গ্রহণ করবে। কিন্তু যারা কেবল তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করতে চায় এবং পশুর মতো জীবনযাপন করতে চায়, তারা ইসলামের সত্য গ্রহণ করবে না, এমনকি যদি তারা অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, যেমন তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তা করেনি। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই, মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলে লাভবান হয় না এবং মানুষ অঙ্গীকার করলেও ক্ষতি হয় না। উপকার ও ক্ষতি কেবল মানুষকেই প্রভাবিত করে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮৪:

"অতএব যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তাহলে তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, যারা স্পষ্ট প্রমাণ, বিধি-বিধান এবং আলোকিত কিতাব নিয়ে এসেছিলেন।"

অতএব, পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট প্রমাণ এবং শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য শেখার মাধ্যমে মানসিক শান্তি অর্জনের মাধ্যমে উভয় জগতেই নিজেদের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করা উচিত। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব, এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮৪:

"অতএব যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তাহলে তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, যারা স্পষ্ট প্রমাণ, বিধি-বিধান এবং আলোকিত কিতাব নিয়ে এসেছিলেন।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পবিত্র কুরআন এবং তাঁর নিজস্ব ঐতিহ্যের মাধ্যমে এই তিনটি জিনিসই লাভ করেছিলেন।

পবিত্র কুরআনের বাক্যাংশগুলি অতুলনীয় এবং এর অর্থগুলি সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর শব্দ এবং আয়াতগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অন্য কোনও গ্রন্থ এটিকে অতিক্রম করতে পারে না। পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী জাতিগুলির ইতিহাস বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছে যদিও মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) ইতিহাসে শিক্ষিত ছিলেন না। এটি প্রতিটি সৎকাজের আদেশ দেয় এবং প্রতিটি মন্দকে নিষেধ করে। যা একজন ব্যক্তি এবং সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে, যাতে ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা এবং শান্তি প্রতিটি ঘর এবং সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা যেকোনো মিথ্যা এড়িয়ে চলে, কবিতা, গল্প এবং উপকথার বিপরীতে। সমস্ত আয়াত উপকারী এবং ব্যবহারিকভাবে একজনের জীবনে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এমনকি যখন পবিত্র কুরআনে একই গল্প পুনরাবৃত্তি করা হয়, তখনও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরা হয়। অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থের বিপরীতে, পবিত্র কুরআন বারবার অধ্যয়ন করলে একজন ব্যক্তিকে বিরক্ত করে না। পবিত্র কুরআন প্রতিশ্রুতি এবং সতর্কীকরণ প্রদান করে এবং অনস্বীকার্য এবং স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে তাদের সমর্থন করে। পবিত্র কুরআন যখন এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যা বিমূর্ত বলে মনে হতে পারে, যেমন ধৈর্য অবলম্বন করা, তখন এটি সর্বদা এটিকে তার জীবনে বাস্তবায়নের একটি সহজ এবং ব্যবহারিক উপায় প্রদান করে। এটি মানুষকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে উৎসাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে, যার ফলে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। এটি উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং প্রকৃত সাফল্য কামনাকারী ব্যক্তির জন্য সরল পথকে স্পষ্ট এবং আকর্ষণীয় করে তোলে। পবিত্র কুরআনের জ্ঞান চিরন্তন কারণ এটি প্রতিটি সমাজ এবং যুগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি প্রতিটি মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক সমস্যার জন্য একটি নিরাময় যখন এটি সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়। এটি একজন ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি সমস্যার সমাধান প্রদান করে। কেবল ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করা এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা

বাস্তবায়নকারী সমাজগুলি কীভাবে এর সর্বব্যাপী এবং কালজয়ী শিক্ষা থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। শতাব্দী পেরিয়ে গেছে কিন্তু পবিত্র কুরআনের একটি অক্ষরও পরিবর্তন করা হয়নি, যেমনটি আল্লাহ তাআলা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইতিহাসের অন্য কোনও গ্রন্থে এই গুণটি নেই। অধ্যায় ১৫ আল হিজর, আয়াত ৯:

"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ, কুরআন] নাযিল করেছি এবং অবশ্যই, আমরাই এর রক্ষণাবেক্ষণকারী।"

মহান আল্লাহ তাআলা একটি সমাজের মূল সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলোর সকলের বাস্তব প্রতিকারের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। মূল সমস্যাগুলো সংশোধন করার মাধ্যমে, এগুলো থেকে উদ্ভূত অসংখ্য শাখা-প্রশাখার সমস্যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআন এভাবেই একজন ব্যক্তি এবং সমাজের উভয় জগতে সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ের সমাধান করেছে। সূরা আন নাহল, আয়াত ৮৯:

"...এবং আমরা আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি সবকিছুর স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ..."

এটি মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর দান করা সর্বশ্রেষ্ঠ কালজয়ী অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু যারা সত্যের সন্ধান করে এবং তার উপর আমল করে, কেবল তারাই এর দ্বারা উপকৃত হবে, আর যারা তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং এর

থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করে, তারা উভয় জগতেই কেবল ক্ষতির সম্মুখীন হবে।
অধ্যায় ১৭ আল-ইসরা, আয়াত ৮২:

*"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও
রহমত, কিন্তু এটি জালেমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।"*

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীস থেকে কেবল তখনই উপকৃত হবেন যখন তারা আন্তরিকভাবে সেগুলোর উপর আমল করবেন। যে ভাষায় পবিত্র কুরআন বোঝা যায় না, সেই ভাষায় কুরআন তেলাওয়াত করলে এর উদ্দেশ্য পূরণ হয় না, কারণ এটি একটি নির্দেশনার বই, তেলাওয়াত করার বই নয়। অতএব, যখন তারা তা বুঝতে এবং তার উপর আমল করতে পারবে, তখনই কেবল উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবে, যার ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসবে। কিন্তু যারা ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করে এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তারা দেখতে পাবে যে তারা একটি ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা ভোগ করে, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল স্থানে রাখে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়। এটি তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেবে। ধনী ও বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করলে এবং তারা কীভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এবং ফলস্বরূপ, তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। এমনকি যদি কেউ এই সত্যকে অস্বীকার করে এবং তাদের আশীর্বাদের অপব্যবহার অব্যাহত রাখে, তবুও তারা মৃত্যু এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতা থেকে বাঁচতে পারবে না, এমনকি যদি তাদের পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবন দেওয়া হয়। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮৫:

" প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, এবং তোমাদেরকে কেবল কিয়ামতের দিন পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে..."

পরকালে, কেবল দুটি সুপরিচিত গন্তব্য রয়েছে। যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্যকে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মাধ্যমে গ্রহণ করে এবং ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করবে। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮৫:

"... অতএব যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে[সফল] হবে..."

কিন্তু যারা তাদের উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে এবং প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে জীবনের পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়, তারা উভয় জগতেই চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধা ছাড়া আর কিছুই পাবে না, যদিও এই সত্যটি তাদের কাছে এই পৃথিবীতে স্পষ্ট নাও হয়। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮৫:

"... আর এই পার্থিব জীবন তো কেবল প্রতারণার ভোগ ছাড়া আর কী!"

দৃঢ় ঈমান অর্জনের মাধ্যমে এই বাস্তবতা মেনে নিতে হবে। দৃঢ় ঈমান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি নিশ্চিত করে যে মানুষ প্রতিটি পরিস্থিতিতে, স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা কঠিন, আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি শিখে এবং তার উপর আমল করে, যা ব্যাখ্যা করে যে, আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। এই ব্যক্তি যখন তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয় তখন সহজেই আল্লাহকে অমান্য করবে, কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে, তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে আল্লাহর আনুগত্য করা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আনুগত্যগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং তাদের জীবনের মধ্যে প্রত্যেককে এবং সবকিছুকে সঠিকভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮৫:

"... আর এই পার্থিব জীবন তো কেবল প্রতারণার ভোগ ছাড়া আর কী।"

অন্যদের পছন্দ এবং তাদের পছন্দের ফলে তাদের মুখোমুখি হওয়া পরিণতি পর্যবেক্ষণ করে এই বাস্তবতাকে স্বীকৃতি ও গ্রহণ করতে হবে। যারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যে এটি কীভাবে তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, যারা তাদের প্রদত্ত অনুগ্রহের অপব্যবহার করে, তারা যখন তাদের পর্যবেক্ষণ করে, তখন তারা স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যে এটি কীভাবে তাদের চাপ, অসুবিধা এবং মানসিক ব্যাধি, যেমন হতাশা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতার দিকে পরিচালিত করে, এমনকি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও। এই পার্থক্যটি বুঝতে হলে ইসলামিক শিক্ষার বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের কেবল খোলামেলা এবং নিরপেক্ষ মন নিয়ে অন্যদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮৫:

"... আর এই পার্থিব জীবন তো কেবল প্রতারণার ভোগ ছাড়া আর কী।"

অতএব, পার্থিব আকাঙ্ক্ষার দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে বরং এই পৃথিবীতে জীবনের উদ্দেশ্যকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তা সঠিকভাবে পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। অধ্যায় ৬৭ আল মুলক, আয়াত ২:

" যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম..."

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৮৬:

"তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের নিজেদের পরীক্ষা অবশ্যই হবে..."

ইসলামিক শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করলেই কেবল এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। একমাত্র এটিই নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকার মাধ্যমে।

১৮৬ নং আয়াতে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, যখনই কেউ মহান আল্লাহকে মেনে চলার চেষ্টা করবে, তখনই তাকে তার জীবনের বিভিন্ন উপাদান, যেমন পরিবার, বন্ধুবান্ধব, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি দ্বারা চ্যালেঞ্জ এবং সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, ১৮৬ নং আয়াত:

"... আর তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে ভাগ করে নেয় তাদের কাছ থেকে অনেক গালি শুনতে পাবে..."

যখন কেউ তার চারপাশের লোকেদের থেকে ভিন্ন পথ বেছে নেয়, তখন তার জীবনে তার নিজের পথ সম্পর্কে খারাপ লাগে এবং ফলস্বরূপ তারা মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের প্রতি তাদের নিষ্ঠার জন্য তাদের সমালোচনা করে। দুঃখের বিষয় হল, এই সমালোচনা প্রায়শই প্রথমে তার নিজের আত্মীয়দের কাছ থেকে আসে।

এছাড়াও, সমাজের অন্যান্য উপাদান, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি, সেই ব্যক্তির সমালোচনা করবে যে মহান আল্লাহকে মেনে চলার চেষ্টা করে, কারণ ইসলামের প্রসার তাদেরকে সম্পদ অর্জন এবং প্রভাব বিস্তার থেকে বিরত রাখে। ইসলাম যেসব শিল্পের সমালোচনা করে, যেমন অ্যালকোহল এবং বিনোদন শিল্প, সমাজের মধ্যে মানুষকে ইসলাম গ্রহণ থেকে নিরুৎসাহিত করার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করতে মুসলিমদের নিরুৎসাহিত করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালায়। এটি একটি প্রধান কারণ যে সামাজিক মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতিতে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণা এত ব্যাপক।

পরিশেষে, যখনই কেউ ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করার চেষ্টা করে, যার মধ্যে রয়েছে নিজের আকাউন্স নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে, তখন অন্যান্য লোকেরা যারা তাদের সমস্ত আকাউন্স অনুসরণ করে পশুর মতো জীবনযাপন করতে চায় তারা অনুভব করবে যে ইসলাম এবং মুসলমানরা তাদের পশুর মতো দেখাচ্ছে। ফলস্বরূপ, তারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ থেকে এবং মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষা অনুশীলন থেকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করবে যাতে তারা তাদের মতো আচরণ

করে পশুসুলভ জীবনযাপন করে যেখানে তারা তাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করে। এই লোকেরা ইসলামের নির্দিষ্ট উপাদানগুলিকে লক্ষ্য করবে যাতে অন্যদের তা থেকে নিরুৎসাহিত করা যায়, যেমন নারীদের জন্য ইসলামিক পোশাক কোড। সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন যে কেউ তাদের দুর্বল এবং খালি সমালোচনার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারে যে তাদের একমাত্র সমস্যা ইসলামের সাথে এবং এটি কীভাবে একজনকে তাদের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা ইসলামে নারী পোশাক কোডের সমালোচনা করে কিন্তু অন্য কোনও পোশাক কোডের সমালোচনা করে না যা সমাজের প্রতিটি দিকের মূল উপাদান, যেমন পুলিশ বাহিনী, সেনাবাহিনী, হাসপাতাল কর্মী, স্কুল এবং ব্যবসা। তাদের কেবল নারীদের ইসলামিক পোশাক কোড নিয়েই সমস্যা আছে এবং সমাজের মধ্যে অন্য কোনও পোশাক কোড নেই তা স্পষ্টভাবে তাদের দুর্বল এবং ভিত্তিহীন সমালোচনা দেখায়। বাস্তবে, ইসলাম এবং মুসলমানরা তাদেরকে পশুর মতো দেখায় এবং ফলস্বরূপ তারা যেভাবেই পারে ইসলামের সমালোচনা করে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮৬:

"... আর তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে ভাগ করে নেয় তাদের কাছ থেকে অনেক গালি শুনতে পাবে..."

কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, কারণ তিনি জানেন যে তিনি তাকে মনের শান্তি দেবেন যা তাকে মানুষের সমালোচনা থেকে রক্ষা করবে। অন্যদিকে, মানুষকে খুশি করার জন্য মহান আল্লাহর অবাধ্যতা কেবল মনের শান্তি নষ্ট করবে কারণ একজন ব্যক্তি অনিবার্যভাবে তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এটি তাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে বাধা দেবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত 186:

"...কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহকে ভয় করো - তাহলে অবশ্যই এটি দৃঢ় সংকল্পের বিষয়।"

একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সংগ্রাম ও ত্যাগ ছাড়া যেমন পার্থিব সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়, যেমন ডাক্তার হওয়া, তেমনি সংগ্রাম ও ত্যাগ ছাড়া উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। অতএব, এমন সরল মনোভাব গ্রহণ করা উচিত নয় যেখানে তারা বিশ্বাস করে যে, তারা কেবল মৌখিকভাবে তাঁর প্রতি বিশ্বাসের দাবি করার কারণেই, মহান আল্লাহ তাদেরকে মানসিক শান্তি দেবেন। ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে, মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করা, উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৮৭-১৮৯

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ مُمْنًا قَلِيلًا فِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

“আর[স্মরণ করো], যখন আল্লাহ কিতাবপ্রাপ্তদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, “তোমরা অবশ্যই তা মানুষের কাছে স্পষ্ট করে বলবে[অর্থাৎ ব্যাখ্যা করবে] এবং গোপন করবে না।” কিন্তু তারা তা তাদের পিছন দিকে ফেলে দিল এবং সামান্য মূল্যে তা বিক্রি করে দিল। আর যা তারা কিনেছিল তা কতই না নিকৃষ্ট!”

আর কখনও মনে করো না যে, যারা নিজেদের কৃতকর্মে আনন্দিত হয় এবং যা করেনি তার জন্য প্রশংসা পেতে পছন্দ করে, তারা শাস্তি থেকে নিরাপদ বলে মনে করো না, বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আর আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই, আর আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।”

আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, আহলে কিতাবদের কিছু আলেমের সমালোচনা করেছেন যারা তাদের প্রদত্ত ঐশ্বরিক জ্ঞান সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৭:

" আর[স্মরণ করো], যখন আল্লাহ কিতাবপ্রাপ্তদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, "তোমরা অবশ্যই তা মানুষের কাছে স্পষ্ট করে বলবে এবং গোপন করবে না।" কিন্তু তারা তা তাদের পিছন দিকে ফেলে দিল এবং সামান্য মূল্যে তা বিনিময় করল..."

তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশী গ্রন্থ থেকে জ্ঞান সম্পাদনা, ভুল ব্যাখ্যা এবং গোপন করেছিল, পার্থিব লাভের জন্য, যেমন নেতৃত্ব এবং সম্পদ। এছাড়াও, এই আয়াতটি বিশেষভাবে তাদের ঐশী গ্রন্থের মধ্যে থাকা জ্ঞানের কথাও উল্লেখ করতে পারে যেখানে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের[নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

তারা এইভাবে আচরণ করেছিল কারণ তারা জানত যে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর আমল করলে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে বাধ্য করা হবে, যা তাদের আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী। তারা আরও ভয় পেয়েছিল যে ইসলাম গ্রহণের ফলে তারা তাদের ঐশ্বরিক শিক্ষার সাথে আপস করে তাদের সমাজে অর্জিত সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদা হারাবে। উপরন্তু, আহলে কিতাবরা ছিলেন পবিত্র নবী ইসহাকের বংশধর, যেখানে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন পবিত্র নবী ইসহাকের ভাই হযরত ইসমাইল (সাঃ) এর বংশধর। যেহেতু আহলে কিতাবরা, বিশেষ করে ইহুদিরা, বংশের প্রতি ভালোবাসায় আবদ্ধ ছিল, যা তাদের ঈমানের কেন্দ্রীয় দিক, তাই তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে গ্রহণ বা অনুসরণ করতে পারত না, কারণ তিনি ছিলেন ভিন্ন বংশ থেকে। তারা এমন কাউকে গ্রহণ এবং অনুসরণ করতে পারত যা তাদের বংশের ছিল না কারণ এটি তাদের বংশের নীচে ছিল কারণ এটি মানবজাতির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দূর করবে, একটি বিশ্বাস যা তারা তৈরি করেছিল।

মুসলমানদের তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি উভয় জগতেই কেবল সমস্যা সৃষ্টি করবে। মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা যে পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করে, তা উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচতে পারবে না। উপরন্তু, যখন তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে, তখন এটি তাদের মানসিক এবং শারীরিক ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি করবে, এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় স্থাপন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে বাধা দেবে। এটি উভয় জগতেই তাদের চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধা বৃদ্ধি করবে। তৃতীয় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৭-১৮৮:

"... কিন্তু তারা তা তাদের পিঠের পিছনে ফেলে দিল এবং সামান্য মূল্যে তা বিনিময় করল। আর যা তারা কিনেছে তা কতই না নিকৃষ্ট। আর কখনও মনে করো না যে, যারা নিজেদের কৃতকর্মে আনন্দিত হয় এবং যা করেনি তার জন্য প্রশংসা পেতে পছন্দ করে, তারা কখনোই শাস্তি থেকে নিরাপদ বলে মনে করো না, এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

এবং ৯ম অধ্যায়, তাওবাহ, ৮২ নং আয়াতে:

"তাহলে তারা যেন অল্প হেসে ফেলে এবং [তারপর] অনেক কাঁদে, কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ।" তারা আগে আয় করত।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় কেন উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮৭:

"আর যখন আল্লাহ কিতাবপ্রাপ্তদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, "তোমরা অবশ্যই তা মানুষের কাছে স্পষ্ট করে বলবে এবং গোপন করবে না।" কিন্তু তারা তা তাদের পিঠের পিছনে ফেলে দিল এবং সামান্য মূল্যে তা বিক্রি করে দিল। আর যা তারা কিনেছে তা কতই না নিকৃষ্ট।"

দুঃখের বিষয় হল, কিছু মুসলিম পণ্ডিত ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামী জ্ঞানের ভুল ব্যাখ্যা করে এবং তাদের চিন্তাধারার সাথে সাংঘর্ষিক ঐশ্বরিক জ্ঞান নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে চলে। তারা তাদের অনুসারীদের হারানোর ভয়ে এই আচরণ করে, যারা তাদের উপহার এবং অস্বাভাবিক সম্মান প্রদান করে। যে পণ্ডিত এই পদ্ধতিতে আচরণ করেন তাকে সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৫৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে জাহান্নামের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এছাড়াও, মুসলমানদের অবশ্যই অন্যদের অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে বিভ্রান্ত হওয়া এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা পবিত্র কুরআনের সঠিক শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর দৃঢ় থাকবে, অন্যদের মতামত অন্ধভাবে অনুসরণকারী পশুর মতো আচরণ করার পরিবর্তে। ইসলাম এই কারণে অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ করার তীব্র নিন্দা করে এবং তাই মুসলমানদেরকে বোঝার সাথে ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং আমল করার জন্য উৎসাহিত করে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৮৮:

" আর কখনও মনে করো না যে, যারা নিজেদের কৃতকর্মে আনন্দিত হয় এবং যা করেনি তার জন্য প্রশংসা পেতে পছন্দ করে, তারা শাস্তি থেকে নিরাপদ বলে মনে করো না, বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

যারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়ে প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করে, তারা উভয় জগতেই শাস্তির সম্মুখীন হবে, যদিও এই পৃথিবীতে তাদের শাস্তি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। এই পৃথিবীতে, তাদের মনোভাব তাদের মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বাধা দেবে এবং এর ফলে তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল স্থানে ফেলবে। ফলস্বরূপ, তাদের জীবনের সবকিছু, যেমন তাদের পরিবার, বন্ধুবান্ধব, কর্মজীবন এবং সম্পদ, তাদের জন্য চাপের উৎস হয়ে উঠবে। যদি তারা আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তাহলে তারা তাদের জীবনের ভুল জিনিস এবং মানুষদের, যেমন তাদের স্ত্রীকে, তাদের চাপের জন্য দোষারোপ করবে। যখন তারা এই ভালো মানুষদের তাদের জীবন থেকে বাদ দেয়, তখন এটি কেবল তাদের মানসিক ব্যাধি বৃদ্ধি করবে যতক্ষণ না তারা হতাশা, মাদকাসক্তি এবং এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতায় ডুবে যায়। এই ফলাফলটি বেশ স্পষ্ট যখন কেউ তাদের প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার অব্যাহত রাখে, যেমন ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তির, এমনকি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও। যদি কেউ তাদের প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার অব্যাহত রাখে, তাহলে তারা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত হবে না। অতএব, পরকালে তারা যে শাস্তির মুখোমুখি হবে তা এই

পৃথিবীতে তাদের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে অনেক খারাপ হবে। এই পরিণতি এড়াতে হবে আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের নিজের জন্য ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভাল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন তিনিও ভাল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন। কারণ একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন এবং তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ, মহিমান্বিত। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও এত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ তাদের জীবনের প্রতিটি জিনিস এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে না, কারণ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে। একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালাই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসের আকারে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ইসলামের শিক্ষাগুলি নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন

না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। কিন্তু এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৮:

" আর কখনও মনে করো না যে, যারা নিজেদের কৃতকর্মে আনন্দিত হয় এবং যা করেনি তার জন্য প্রশংসা পেতে পছন্দ করে, তারা শাস্তি থেকে নিরাপদ বলে মনে করো না, বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

অন্যের কাছ থেকে প্রশংসা চাওয়া একজন ব্যক্তির খারাপ উদ্দেশ্যের স্পষ্ট লক্ষণ। যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে না, সে তার কাছ থেকে কোনও প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একজন ব্যক্তির ভালো উদ্দেশ্যের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যে সে মানুষের কাছ থেকে কোনও প্রশংসা, প্রশংসা বা প্রতিদান চায় না।

কাজ না করে প্রশংসা চাওয়া বলতে এমন লোকদেরও বোঝানো যেতে পারে যারা মৌখিকভাবে ইসলামে ঈমানের দাবি করে কিন্তু কার্যত আল্লাহকে মেনে চলার মাধ্যমে তাদের দাবি অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয় এবং তারপরও উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা আশা করে। এটি ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং ইসলামে এর কোন মূল্য নেই। ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা হল মহান আল্লাহর অবাধ্যতা চালিয়ে যাওয়া, একই সাথে উভয় জগতে তাঁর রহমত ও ক্ষমা আশা করা। অন্যদিকে, প্রকৃত আশা হল মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং নিজের আচরণ সংশোধন করা এবং তারপর উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করা। এই পার্থক্যটি জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, এই পার্থক্যটি উপলব্ধি করা উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার প্রকৃত আশা গ্রহণ করে এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ ইসলামে এর কোন মূল্য নেই।

কাজ না করে প্রশংসা চাওয়া তাদের কথাও বলতে পারে যারা তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষ এবং শিক্ষকদের নিয়ে গর্ব করে এবং বিশ্বাস করে যে তারা তাদের উভয় জগতের শাস্তি থেকে রক্ষা করবে, এমনকি যদি তারা নিজেরাই আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিটি ব্যক্তিকে তার নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে এবং তার আত্মীয় বা শিক্ষক, সে যতই ধার্মিক হোক না কেন, তাকে জবাবদিহি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। ৩১ সূরা লুকমান, আয়াত ৩৩:

"হে মানবজাতি, তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো এবং সেই দিনকে ভয় করো, যখন কোন পিতা তার পুত্রের কোন উপকারে আসবে না এবং কোন পুত্রও তার পিতার কোন উপকারে আসবে না।"

এবং ৫৩ নজম অধ্যায়, ৩৯ নং আয়াত:

"এবং মানুষের জন্য কেবল তাই [কল্যাণ] আছে যার জন্য সে চেষ্টা করে।"

যদিও কিয়ামতের দিন সুপারিশ একটি বাস্তবতা, তবুও এটি কেবল তখনই মানুষকে সাহায্য করবে যখন তারা এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে। পবিত্র কুরআনে এটি নির্দেশিত হয়েছে। সূরা ৪০, গাফির, আয়াত ৮:

"হে আমাদের পালনকর্তা, তাদেরকে স্থায়ী বাসস্থানের জান্নাতে প্রবেশ করাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ এবং তাদের পূর্বপুরুষ, স্ত্রী-পত্নী এবং সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরও..."

যদি কেউ এমন অলস মনোভাব গ্রহণ করে যার মাধ্যমে তারা মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য উপেক্ষা করে এবং তারপর বিচারের দিনে অন্য কারো কাছ থেকে তাদের রক্ষা করার আশা করে, তাহলে তারা হতাশ হবে, কারণ এই মনোভাব সুপারিশের ধারণাকে উপহাস করে এবং তাই অত্যন্ত অসম্মানজনক।

অতএব, এমন অলস মনোভাব গ্রহণ করা এড়িয়ে চলতে হবে যেখানে তারা আল্লাহর দরবারে অন্যদের উপর সুপারিশ করার উপর নির্ভর করে, বরং আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। এর মধ্যে রয়েছে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টিজনক, যেমন ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, এই মনোভাব ছিল, যদিও তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন যিনি বিচারের দিনে তাদের জন্য সুপারিশ করবেন বলে আশা করেছিলেন, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

অতএব, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহ তাআলার আন্তরিক আনুগত্যের সঠিক মনোভাব গ্রহণ করা উচিত, কারণ তারা উভয় জগতেই তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মের পরিণতি ভোগ করতে পারে না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৯:

"আর আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই, আর আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

পরিশেষে, সমগ্র সৃষ্টি মহান আল্লাহর আওতাধীন এবং তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারাধীন, একজন ব্যক্তির তাঁর নিয়ম মেনে চলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট দেশের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তেমনি মহাবিশ্বের মালিকের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতেই তার সমস্যা হবে। একজন ব্যক্তি যদি তার নিয়ম মেনে চলতে না পারে তবে একটি দেশ ছেড়ে যেতে পারে কিন্তু এমন জায়গায় পালিয়ে যেতে পারবে না যেখানে মহান আল্লাহর নিয়ম ও এখতিয়ার প্রযোজ্য হয় না। একজন ব্যক্তি তার সমাজের নিয়ম পরিবর্তন করতে সক্ষম হতে পারে কিন্তু তারা কখনও মহান আল্লাহর নিয়ম পরিবর্তন করতে পারবে না। উপরন্তু, ঠিক যেমন একজন বাড়ির মালিক ঘরের নিয়ম নির্ধারণ করে, এমনকি অন্যরা এই নিয়মের প্রতি আপত্তি জানালেও, একইভাবে, মহাবিশ্ব মহান আল্লাহর, এবং তাই, তিনিই একমাত্র এই মহাবিশ্বের নিয়ম নির্ধারণ করেন, মানুষ এই নিয়ম পছন্দ করুক বা না করুক। অতএব, এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে, নিজের স্বার্থে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে সে মহান আল্লাহর নিয়ম মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। একজন ব্যক্তি হয় আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পিছনের হিকমতগুলি শেখার চেষ্টা করতে পারে, যাতে সে বুঝতে পারে যে কীভাবে সেগুলি তাদের এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য উপকারী এবং কীভাবে তারা উভয় জগতে মানসিক ও শারীরিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, অথবা সে তার আকাঙ্ক্ষার উপাসনা করতে পারে এবং ইসলামের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলামী নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তার উচিত উভয় জগতেই তার পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং কোনও আপত্তি, প্রতিবাদ বা অভিযোগ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ২৯:

"আর বলো, "সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, অতএব যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক; আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।" নিশ্চয়ই, আমরা জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে ঘিরে থাকবে। আর যদি তারা সাহায্যের জন্য ডাকে, তবে তাদের সাহায্যের জন্য ঘোলা তেলের মতো পানি ব্যবহার করা হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দেবে। পানীয় কত নিকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট।"

অধ্যায় ৩ – আলী ইমরান, আয়াত ১৯০-২০০ , ২০০

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

رَبَّنَا وَءَاثِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتِي بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَنَ عَنْهُمْ

سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ

حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾

مَتَّعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزِلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشَعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

“নিশ্চয়ই, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে
বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

যারা দাঁড়িয়ে, বসে অথবা শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর
সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে এবং বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি এগুলো
অনর্থক সৃষ্টি করোনি; তুমি পবিত্র, পবিত্র, অতএব আমাদেরকে আগুনের
আযাব থেকে রক্ষা করো।"

হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে, তাকে তুমি
অপমানিত করেছ, আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা একজন আহবানকারীকে ঈমানের দিকে
আহ্বান করতে শুনেছি, যিনি বলছেন, 'তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান
আন', আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা, অতএব আমাদের পাপ
ক্ষমা করো এবং আমাদের পাপসমূহ দূর করে দাও এবং আমাদেরকে
সৎকর্মশীলদের সাথে মৃত্যু দান করো।

হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের যা
প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদের দান করো এবং কিয়ামতের দিন আমাদের
অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না।"

অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিলেন, "আমি তোমাদের মধ্যে কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম কখনও বিনষ্ট করব না, তা সে পুরুষ হোক বা নারী। তোমরা একে অপরের অংশ। অতএব যারা হিজরত করেছে, তাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আমার পথে কষ্ট পেয়েছে, যুদ্ধ করেছে অথবা নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের পাপ মোচন করব এবং অবশ্যই তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান হিসেবে, আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম প্রতিদান।"

সারা দেশে কাফেরদের [নিরবচ্ছিন্ন] চলাচলে প্রতারিত হবেন না।

[এটা] সামান্য ভোগ মাত্র; তারপর তাদের [চূড়ান্ত] আবাসস্থল জাহান্নাম, এবং কত নিকৃষ্ট সেই বিশ্রামস্থল।

কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আবাসস্থল হিসেবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা মুত্তাকীদের জন্য উত্তম।

আর নিশ্চয়ই আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর প্রতি এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর বিশ্বাস করে, আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হয়ে। তারা আল্লাহর আয়াতকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে না। তাদের জন্য তাদের প্রতিদান তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।

হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, অবস্থান করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

মহান আল্লাহ বিশ্বজগতে দুই ধরনের নিদর্শন স্থাপন করেছেন যা ইসলামের সত্যতা নির্দেশ করে, যেমন তাঁর একত্ববাদ এবং বিচার দিবস। এই নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসের মধ্যে পাওয়া যায়। খোলামেলা ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে অধ্যয়ন করলে এই নিদর্শনগুলি স্পষ্টভাবে ইসলামের সত্যতা নির্দেশ করে। অন্যান্য নিদর্শনগুলি সৃষ্টির মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। যে ব্যক্তি উন্মুক্ত ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিশ্বজগতের বিভিন্ন সৃষ্টির উপর চিন্তা করে সে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯০:

"নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে..."

যখন কেউ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং অসংখ্য নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মহাবিশ্ব সৃষ্টিকারী এবং টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব একমাত্র একজনই পালন করেন। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী থেকে সূর্যের নিখুঁত দূরত্ব একটি স্পষ্ট লক্ষণ, কারণ সূর্য যদি পৃথিবী থেকে সামান্য কাছে বা আরও দূরে থাকত তবে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হত। একইভাবে, পৃথিবীকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যা একটি সুষম এবং বিশুদ্ধ বায়ুমণ্ডল তৈরি করে যা এতে জীবনকে বিকাশের সুযোগ দেয়। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৯০:

"... এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন নিদর্শন..."

দিন ও রাতের নিখুঁত সময় এবং সারা বছর ধরে তাদের বিভিন্ন দৈর্ঘ্য মানুষকে তাদের থেকে সর্বাধিক সুবিধা পেতে সাহায্য করে। যদি দিনগুলি দীর্ঘ হত, তাহলে মানুষ দীর্ঘ ঘণ্টার জন্য ক্লান্ত হয়ে পড়ত। যদি রাতগুলি দীর্ঘ হত, তাহলে মানুষের জীবিকা নির্বাহ এবং জ্ঞানের মতো অন্যান্য দরকারী জিনিসপত্র অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকত না। যদি রাতগুলি ছোট হত, তাহলে মানুষ সর্বোত্তম স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে পারত না। দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ফসলের উপরও প্রভাব ফেলত, যা মানুষ এবং প্রাণীর জীবিকার উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলত। মহাবিশ্বের মধ্যে দিন ও রাত এবং অন্যান্য ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা নিখুঁত সামঞ্জস্যের সাথে কাজ করে তাও স্পষ্টভাবে আল্লাহর একত্বকে নির্দেশ করে, কারণ একাধিক ঈশ্বর বিভিন্ন জিনিস কামনা করবেন, যা মহাবিশ্বের মধ্যে বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 21 আল আশ্বিয়া, আয়াত 22:

"যদি তাদের মধ্যে [অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের] আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত..."

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... এবং [বড়] জাহাজ যা সমুদ্রে চলাচল করে যা মানুষের উপকার করে এবং যা আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন..."

যখন কেউ পুরোপুরি সুষম জলচক্র পর্যবেক্ষণ করে, তখন এটি স্পষ্টভাবে একজন স্রষ্টার ইঙ্গিত দেয়। সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয়, উপরে উঠে ঘনীভূত হয়ে পাহাড়ের উপর নেমে আসে অম্লীয় বৃষ্টিপাতের জন্য। এই পর্বতগুলি অম্লীয় বৃষ্টিপাতকে নিষ্ক্রিয় করে যাতে মানুষ এবং প্রাণীরা তা ব্যবহার করতে পারে। যদি এই নিখুঁত সুষম ব্যবস্থায় কোনও পরিবর্তন আনা হয়, তাহলে তা পৃথিবীর মানুষ এবং প্রাণীদের জন্য বিপর্যয়ের কারণ হবে। সমুদ্রের লবণ সমুদ্রের মৃত প্রাণীদের এটি দূষিত হতে বাধা দেয়। যদি সমুদ্রকে দূষিত হতে দেওয়া হয়, তাহলে সমুদ্রের জীবন সম্ভব হবে না এবং সমুদ্রের অপবিত্রতা স্থলভাগের জীবনকেও আচ্ছন্ন করে ফেলবে। সমুদ্র এবং সমুদ্রের মধ্যে জল এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে সমুদ্রের জীবন এর মধ্যে বিকাশ লাভ করতে পারে এবং ভারী জাহাজগুলি এর উপরে চলাচল করতে পারে। যদি জলের গঠন কিছুটা ভিন্ন হত, তাহলে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিত যার ফলে হয় সমুদ্রের জীবন জলের মধ্যে বিকাশ লাভ করত অথবা জাহাজগুলিকে এর উপরে চলাচল করতে দিত, তবে উভয়ই একই সাথে সম্ভব হত না। এমনকি আজও, সমুদ্রপথে পরিবহন এখনও বিশ্বজুড়ে পণ্য পরিবহনের সবচেয়ে সাধারণ উপায়। তাই পৃথিবীতে জীবনের জন্য এই নিখুঁত ভারসাম্য অপরিহার্য।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... এবং আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, যার মাধ্যমে পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন..."

কিয়ামতের দিন মানুষের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা অস্বীকার করা একটি অদ্ভুত দাবি, যখন দিন, মাস এবং বছর জুড়ে পুনরুত্থানের অনেক উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে একটি মৃত অনুর্বর ভূমিকে জীবন

দান করেন এবং সৃষ্টির জন্য একটি মৃত বীজকে জীবন্ত করে তোলেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ, মানুষ নামক মৃত বীজকে, যাকে মাটিতে সমাহিত করা হয়, জীবন দান করতে পারেন এবং করবেন, যেমন মৃত বীজ থেকে জীবন্ত অঙ্কুরিত হয়। ঋতু পরিবর্তন স্পষ্টভাবে পুনরুত্থানের ইঙ্গিত দেয়। উদাহরণস্বরূপ, শীতকালে, গাছের পাতা মারা যায় এবং ঝরে পড়ে এবং গাছটি প্রাণহীন দেখায়। কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে, পাতাগুলি আবার গজায় এবং গাছটি প্রাণে পূর্ণ দেখায়। রাত এবং দিনের পরিবর্তন মানুষকে জীবন এবং মৃত্যু চক্রের কথাও মনে করিয়ে দেয়। রাতে সবকিছু অন্ধকার এবং স্থির হয়ে যায় এবং তাই মৃত্যুর সূচক। দিনের শুরু হল যখন সবকিছু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং পৃথিবী জীবন এবং কার্যকলাপে পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তাই জীবনের সূচক। সমস্ত প্রাণীর ঘুম জাগ্রত চক্র পুনরুত্থানের আরেকটি উদাহরণ। ঘুম হলো মৃত্যুর বোন, কারণ ঘুমন্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ, তারপর, যদি কোন ব্যক্তির বেঁচে থাকার নিয়ত থাকে, তাহলে তিনি তার আত্মাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিকে আবারও জীবন দান করেন। সূরা ৩৯ আয-যুমার, আয়াত ৪২:

"আল্লাহ মানুষের আত্মা তাদের মৃত্যুর সময় কবজ করেন এবং যারা মারা যায় না তাদের নিদ্রাকালে কবজ করেন। অতঃপর যাদের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদের তিনি ধরে রাখেন এবং অন্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

এই এবং আরও অনেক উদাহরণের উপর চিন্তা করলে বিচারের দিনে চূড়ান্ত পুনরুত্থানের সম্ভাবনা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত পায়।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... এবং তাতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন প্রতিটি ধরনের জীবন্ত প্রাণীকে..."

বিবর্তন হলো এক ধরনের মিউটেশন, যা স্বভাবতই অসম্পূর্ণ। কিন্তু যখন কেউ অসংখ্য প্রজাতি পর্যবেক্ষণ করে, তখন তারা দেখতে পাবে যে তাদের সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তারা যে পরিবেশে বাস করে সেখানেই তারা বেঁচে থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উটকে উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করার এবং জল পান না করে দীর্ঘ সময় ধরে বেঁচে থাকার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। তারা মরুভূমির জীবনের জন্য নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছে। অধ্যায় ৮৮ আল গাশিয়াহ, আয়াত ১৭:

"তাহলে কি তারা উটের দিকে তাকায় না - কিভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে?"

ছাগলটিকে এমন নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে তার শরীরের ভেতরের দূষিত পদার্থগুলি তার উৎপাদিত দুধ থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়। দুটির মিশ্রণ দুধকে পান করার অযোগ্য করে তুলবে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৬৬:

"আর অবশ্যই, তোমাদের জন্য পশুপালনের ক্ষেত্রে একটি শিক্ষা রয়েছে। আমরা তোমাদেরকে তাদের পেটের মধ্যে যা আছে তা থেকে - মলমূত্র ও রক্তের মধ্যে - বিশুদ্ধ দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।"

প্রতিটি প্রজাতির একটি নির্দিষ্ট জীবনকাল দেওয়া হয়েছে যা একটি প্রজাতিকে অন্য প্রজাতিকে পরাজিত করতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, মাছদের জীবনকাল খুবই কম, ৩-৪ সপ্তাহ, এবং ৫০০টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। যদি তাদের জীবনকাল দীর্ঘ হত, তাহলে মাছদের সংখ্যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যেত এবং তারা এই পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত প্রজাতিকে ছাপিয়ে যেত। অন্যদিকে, অন্যান্য প্রাণী যাদের জীবনকাল খুব দীর্ঘ তাদের মাত্র কয়েকটি সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে। আবার এটি তাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ করে দেয়। এই সবকিছুই দুর্ঘটনা হতে পারে না এবং বিবর্তন প্রক্রিয়াও এর ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... এবং [তাঁরা] আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বাতাস এবং মেঘের পরিচালনা..."

বায়ু পরাগায়নের জন্য বাতাস অপরিহার্য, যা ফসল, গাছপালা এবং গাছের বংশবৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়। প্রাচীনকালে, সমুদ্র ভ্রমণের জন্য বাতাস অপরিহার্য ছিল, যা আজও বিশ্বজুড়ে পণ্য পরিবহনের প্রধান মাধ্যম। সৃষ্টির জন্য জল সরবরাহ করার জন্য বৃষ্টির মেঘগুলিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরিত করার জন্য বাতাসের প্রয়োজন হয়, যা ছাড়া তারা বাঁচতে পারে না। পৃথিবীর মধ্যে বাতাসের একটি নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়, কারণ বাতাসের অভাব সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং বাতাসের বৃদ্ধিও সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। একইভাবে, বৃষ্টিও পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ, কারণ খুব কম বৃষ্টিপাত খরা এবং দুর্ভিক্ষের দিকে পরিচালিত

করে এবং খুব বেশি বৃষ্টিপাত ব্যাপক বন্যার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 23 আল মু'মিনুন, আয়াত 18:

"আর আমরা আকাশ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং তা পৃথিবীতে স্থাপন করেছি। এবং অবশ্যই, আমরা তা প্রত্যাহার করতে সক্ষম।"

এই নিখুঁতভাবে সুষম ব্যবস্থা এলোমেলো হতে পারে না এবং স্পষ্টভাবে স্রষ্টার হাত দেখায়।

অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত ১৯০-১৯১:

"নিশ্চয়ই, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে অথবা শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে..."

বোধগম্য ব্যক্তির হলে তারা যারা এই পৃথিবীতে তাদের উৎপত্তি এবং উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার এবং বোঝার চেষ্টা করেন। এই চিন্তাভাবনা অনিবার্যভাবে তাদের স্রষ্টা, মহান আল্লাহকে স্মরণ করার দিকে পরিচালিত করবে, কারণ তাদের সৃষ্টি কোনও এলোমেলো এবং অর্থহীন ঘটনা নয়। উপরন্তু, যারা সঠিকভাবে আল্লাহকে

বিশ্বাস করে, তারা সারা দিন তাকে ক্রমাগত স্মরণ করবে। তারা তাদের উদ্দেশ্যের মাধ্যমে তাকে স্মরণ করবে, কারণ তারা কেবল তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে এবং তাই মানুষের কাছ থেকে কোনও কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদান চায় না। তারা তাদের কথাবার্তায়, ভালো কথা বলে অথবা নীরব থেকে আল্লাহকে স্মরণ করে, যেমনটি ইসলামের শিক্ষায় নির্দেশিত হয়েছে, যেমন সহীহ মুসলিমের ১৭৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। তারা তাদের কর্মে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তিনি যে আশীর্বাদ দিয়েছেন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে, মহান আল্লাহকে স্মরণ করে। যে ব্যক্তি এইভাবে আল্লাহকে স্মরণ করে, সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থাপন করে মানসিক শান্তি অর্জন করবে। অধ্যায় ১৩ আর রা'দ, আয়াত ২৮:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

যত বেশি মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করবে, তত বেশি তারা মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করবে। যারা এই সমস্ত নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার উপর চিন্তা করবে তারা যুক্তিসঙ্গতভাবে এমন একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারবে না যিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। উপরন্তু, যখন কেউ এই নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে অন্যান্য ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে, তখন তারা একটি প্রধান জিনিস লক্ষ্য করবে যা ভারসাম্যহীন, তা হল মানুষের কর্ম। সৎকর্মকারী এই পৃথিবীতে তাদের পূর্ণ পুরস্কার পায় না এবং মন্দকর্মকারী তাদের পূর্ণ শাস্তি পায় না, এমনকি যদি তাদের সরকার দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়। এটা বোঝা যুক্তিসঙ্গত যে একক স্রষ্টা, মহান আল্লাহ, যিনি এই মহাবিশ্বের অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থার ভারসাম্য বজায় রেখেছেন, একদিন মানুষের কর্মেরও ভারসাম্য বজায় রাখবেন, যা এই পৃথিবীর প্রধান ভারসাম্যহীন জিনিস। কর্মের এই ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য, মানুষের কর্মের প্রথমেই সমাপ্তি ঘটতে হবে। এটিই বিচারের দিন যখন মানুষের কর্মের বিচার এবং চিরতরে ভারসাম্য বজায় রাখা হবে। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ১৭১:

"... আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির প্রতি চিন্তা করো, [বলে], "হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি এগুলোকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেনি; তুমি [এরকম কিছু উপরে] পবিত্র; তাহলে আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।"

কিন্তু যারা ইতিমধ্যেই তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে ব্যবহার করার এবং তাদের বা অন্যদের ইচ্ছা অনুসারে আচরণবিধি অনুসারে জীবনযাপন করার মনস্থির করেছে, তারা মহাবিশ্বের মধ্যে এমন লক্ষণগুলি উপলব্ধি করবে না বা প্রভাবিত হবে না যা স্পষ্টভাবে আল্লাহর একত্ব, আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্যের গুরুত্ব এবং অনিবার্য বিচার দিবসকে নির্দেশ করে। অতএব, এই ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলির অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা একটি ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা পাবে এবং তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় রাখবে। অতএব তাদের মনোভাব তাদের এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে এবং পরিবর্তে তারা এই পৃথিবীতে একটি দুঃখজনক এবং হতাশাজনক জীবনযাপন করবে, এমনকি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও। সূরা তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

যদি তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহারের মনোভাব ধরে রাখে, তাহলে তারা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হবে। অতএব, পরকালে তাদের শাস্তি এই পৃথিবীর শাস্তির চেয়ে অনেক খারাপ এবং আরও অপমানজনক হবে এবং কিছুই তাদের এ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯২:

"হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে, তাকে তুমি অপমানিত করেছ, আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।"

অতএব, নিজেদের স্বার্থে, এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে হবে যাতে তারা তাদের সময় শেষ হওয়ার আগেই উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৩:

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা একজন আহবানকারীকে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, [বলছে] 'তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন,' এবং আমরা ঈমান এনেছি..."

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়, সে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা মনের শান্তি অর্জন করবে এবং মহান আল্লাহ তাদের কৃত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৩:

"...হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের পাপ ক্ষমা করুন এবং আমাদের পাপগুলো আমাদের থেকে দূর করে দিন..."

আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছ থেকে পরিপূর্ণতা দাবি করেন না। বরং তিনি আশা করেন যে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে এবং যখনই তারা কোনও পাপ করে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে এবং তাদের আচরণ সংশোধন করবে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একজনকে আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তিনি আবার একই বা অনুরূপ পাপ করবেন না এবং আল্লাহ তাআলা এবং মানুষের প্রতি লজ্জিত যেকোনো অধিকারের ক্ষতিপূরণ দেবেন। ১৯৩ নম্বর আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে ব্যক্তি এইভাবে জীবনযাপন করবে সে একজন বাধ্য

মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করবে। যে ব্যক্তি একজন বাধ্য মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করবে সে একজন বাধ্য মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে। এবং যে ব্যক্তি একজন বাধ্য মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে সে একজন বাধ্য মুসলিম হিসেবে পুনরুত্থিত হবে। সহিহ মুসলিমের ৭২৩২ নম্বর হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ৩ নম্বর অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৯৩:

"... এবং আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে মৃত্যু দান করুন।"

মহান আল্লাহ, এই বাধ্য মুসলিমদের পরকালেও তাদের মানসিক ও শারীরিক শান্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন, ঠিক যেমন তিনি তাদের দুনিয়াতে দিয়েছিলেন এবং তাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন, যার ফলে তাদেরকে পরকালে অপমান ও শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৪:

"হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি তোমার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা আমাদের দান করো এবং কিয়ামতের দিন আমাদের অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি কার্যত আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয় এবং তার পরিবর্তে প্রদত্ত নিয়ামতগুলোর অপব্যবহার করে, সে একজন বাধ্য মুসলিমের মতো বাঁচবে না। অতএব, সে একজন বাধ্য মুসলিম হিসেবে মারা যাবে না এবং ফলস্বরূপ, বিচারের দিনে তাকে একজন বাধ্য মুসলিম হিসেবে পুনরুত্থিত করা হবে না।

প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যক্তি তার ঈমান ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার বিরাট ঝুঁকিতে রয়েছে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমান একটি গাছের মতো যাকে বেড়ে ওঠা এবং বেঁচে থাকার জন্য আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, সে মারা যাবে, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও মারা যাবে যে তাকে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

এই পরিণতি এড়াতে হলে এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে সাড়া দিয়ে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব, এই আচরণ নিশ্চিত করবে যে তাদের প্রতিটি উদ্দেশ্য, কথা এবং কাজ উভয় জগতেই কল্যাণের দিকে পরিচালিত করবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৫:

" আর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিলেন, "আমি তোমাদের মধ্যে কোন শ্রমিকের পরিশ্রম কখনও বিনষ্ট হতে দেব না..."

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, সে নিশ্চিত করবে যে তারা পার্থিব সাফল্য পেলেও এই পৃথিবীতে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নষ্ট করবে, কারণ তাদের আচরণ তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেবে এবং এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে। এটি তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে

মনের শান্তি সমস্ত পার্থিব জিনিসকে মূল্য দেয়, যেমন খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং একটি ক্যারিয়ার। মনের শান্তি ছাড়া এই জিনিসগুলির কোনও প্রকৃত মূল্য নেই। এটি স্পষ্ট হয় যখন কেউ তাদের লক্ষ্য করে যারা পার্থিব জিনিসের অধিকারী কিন্তু মানসিক শান্তি পায় না। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ১০৩-১০৪:

"বলুন, "আমরা কি তোমাদেরকে কর্মের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে অবহিত করব? [তারা] তারা যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে ব্যর্থ হয়েছে, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।"

যেহেতু ১৯৫ নং আয়াতে উল্লেখিত কল্যাণ সীমাবদ্ধ করা হয়নি, তাই এটি মুসলমানদের জন্য সৎকর্ম না করার কোন অজুহাত রাখে না। উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জন করা একজন ব্যক্তি কত পার্থিব আশীর্বাদ পেয়েছে তার সাথে সম্পর্কিত নয় বরং এটি তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি কীভাবে ব্যবহার করে তার সাথে সম্পর্কিত, তাকে অনেক আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছিল নাকি কয়েকটি। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৯৫:

" অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিলেন, "আমি তোমাদের মধ্যে কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম কখনও বিনষ্ট করব না, তা সে পুরুষ হোক বা নারী, তোমরা একে অপরের অংশ..."

এই আয়াতটি আরও স্পষ্ট করে যে সাফল্য, মানসিক শান্তি এবং শ্রেষ্ঠত্ব লিঙ্গ, জাতিগততা বা সামাজিক মর্যাদার মতো পার্থিব মানদণ্ডের উপর নির্ভর করে না। ইসলাম মানুষের মর্যাদা একটি মাত্র মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে বিচার করে: তারা কতটা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মেনে চলে। এর মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

মানুষের মর্যাদা বিচারের অন্যান্য সকল মানদণ্ডের কোন মূল্য নেই, যেমন লিঙ্গ, জাতিগততা এবং সামাজিক শ্রেণী, এবং মুসলমানদের অবশ্যই এগুলি উপেক্ষা করতে হবে, অন্যথায় এটি মুসলিম জাতির মধ্যে বর্ণবাদ এবং অনৈক্যের জন্ম দেয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যেহেতু একজনের উদ্দেশ্য অন্যদের থেকে গোপন থাকে, তাই তারা বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে অন্যদেরকে অন্যদের চেয়ে ভালো বলে বিচার করতে পারে না এবং তাই অন্যদের বা নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে দাবি করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ একমাত্র আল্লাহই সকল মানুষের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মকাণ্ড জানেন। আন নাজম, আয়াত ৩২:

"...তাই তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করো না; তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁকে ভয় করো।"

অতএব, এই পৃথিবীতে তাদের নিয়ত, কথা এবং কর্ম যাতে নষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য, মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৫:

“...অতএব যারা হিজরত করেছে, তাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আমার পথে তাদের ক্ষতি করা হয়েছে, যুদ্ধ করা হয়েছে অথবা নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের পাপ মোচন করব এবং অবশ্যই তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান হিসেবে, এবং আল্লাহর কাছেই রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান।”

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে দৃঢ় থাকে, স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণ করে, সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করবে, যদিও তা স্পষ্ট নয়। নিয়তে কৃতজ্ঞতা বলতে কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা বোঝায়। নিজের কথায় কৃতজ্ঞতা বলতে ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা বোঝায়। এবং নিজের কাজে কৃতজ্ঞতা বলতে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে খুশি করার জন্য যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা বোঝায়। এছাড়াও, ধৈর্য বলতে নিজের কথা বা কর্মের অভিযোগ এড়ানো এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা বোঝায়, বিশ্বাস করে যে তিনি কেবল তার জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

“...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।”

অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক পথে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থন এবং করুণা লাভ করবে, যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকার জন্য দৃঢ় ঈমান অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি শেখা এবং সেগুলি অনুসরণ করা হলে দৃঢ় ঈমান অর্জন করা সম্ভব, যেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। এই ব্যক্তি যখন তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয় তখন সহজেই আল্লাহকে অমান্য করবে কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে, তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে আল্লাহর আনুগত্য করা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং তাদের জীবনের মধ্যে প্রত্যেককে এবং সবকিছুকে সঠিকভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে।

অধিকন্তু, যার ঈমান যত শক্তিশালী, সে তার সমস্যার পেছনের হিকমতগুলো তত বেশি উপলব্ধি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যার ঈমান দৃঢ়, সে বোঝে যে ধৈর্যের

সাথে সমস্যার মুখোমুখি হওয়া তার ছোটখাটো পাপ মুছে ফেলে। ইমাম বুখারীর "আদাবুল মুফরাদ", ৪৯২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর সাথে তাদের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে ধৈর্যের সাথে সমস্যার মুখোমুখি হয়ে নিজের ছোটখাটো পাপ মুছে ফেলা অনেক ভালো। উপরন্তু, দৃঢ় ঈমান একজন মুসলিমকে এও শিক্ষা দেয় যে এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষার একটি অংশ হল যে তাদের অভিজ্ঞতার পিছনে থাকা সমস্ত হিকমত নবীদের (সাঃ) প্রদত্ত ঐশ্বরিক জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের কাছে প্রকাশিত হবে না।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৯৫:

“...অতএব যারা হিজরত করেছে, তাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আমার পথে তাদের ক্ষতি করা হয়েছে, যুদ্ধ করা হয়েছে অথবা নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের পাপ মোচন করব এবং অবশ্যই তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান হিসেবে, এবং আল্লাহর কাছেই রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান।”

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, অসুবিধার মুখোমুখি হওয়া এমন একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে আল্লাহ, যারা সত্যিকার অর্থে তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, তাদের থেকে যারা কেবল মৌখিকভাবে তাঁর উপর বিশ্বাস রাখার দাবি করে, তাদের আলাদা করেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৯:

"আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই[অবস্থায়] রাখবেন না যেখানে তোমরা[বর্তমানে] আছো যতক্ষণ না তিনি মন্দকে ভালো থেকে আলাদা করেন..."

অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা কঠিন, প্রতিটি পরিস্থিতিতেই মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। বাস্তবে, অসুবিধার মুখোমুখি হওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকাই আসল পরীক্ষা, কারণ স্বাচ্ছন্দ্যের সময় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা প্রায়শই সহজ। এই আনুগত্যের মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ২-৩:

"মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি, আর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা মিথ্যাবাদী।"

এরপর মহান আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করে দেন যে, তিনি যে অবকাশ তাদেরকে দিচ্ছেন, তা দ্বারা তারা যেন বোকা না হয়, কারণ এটি কেবল সীমিত সময়ের জন্য। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৬:

"পৃথিবী জুড়ে কাফেরদের[নিরবচ্ছিন্ন] চলাচলে প্রতারণিত হবেন না।"

অতএব, সময় শেষ হওয়ার আগেই আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে এবং তাদের আচরণ সংশোধন করে তিনি যে অবকাশ দিয়েছেন তা কাজে লাগাতে হবে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি লজ্জিত যেকোনো অধিকারের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। কিন্তু যদি কেউ তাদের প্রদত্ত অবকাশ ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের এই বিশ্বাসে প্রতারণিত করা উচিত নয় যে তাদের পছন্দের জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না, কারণ এই জবাবদিহিতা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটেনি। বিলম্বিত শাস্তি মোটেও শাস্তি না দেওয়ার মতো নয়। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৭৭:

"[এটা] সামান্য ভোগ; তারপর তাদের [চূড়ান্ত] আবাসস্থল জাহান্নাম, এবং সেই বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট!"

অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে এবং তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তাকে এই বিশ্বাসে প্রতারণিত করা উচিত নয় যে সে সাফল্য এবং মানসিক শান্তি পাবে। তার অবাধ্যতা কেবল তাদের মানসিক এবং শারীরিক ভারসাম্যহীনতাই ভোগ করবে, এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে এবং এটি তাদেরকে বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুতি নিতে বাধা দেবে। অতএব, তারা মানসিক শান্তি পাবে না এবং পরিবর্তে দুঃখ, ঝামেলা এবং অসুবিধায় ভরা জীবনযাপন করবে, এমনকি যদি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। এই ফলাফলটি বেশ স্পষ্ট যখন কেউ তাদের প্রদত্ত

আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে দেখে, যেমন ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তির। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত 197:

"[এটা] সামান্য ভোগ; তারপর তাদের [চূড়ান্ত] আবাসস্থল জাহান্নাম, এবং সেই বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট!"

পরিশেষে, সমগ্র সৃষ্টি মহান আল্লাহর আওতাধীন এবং তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারাধীন, একজন ব্যক্তির তাঁর নিয়ম মেনে চলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট দেশের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তেমনি মহাবিশ্বের মালিকের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতেই তার সমস্যা হবে। একজন ব্যক্তি যদি তার নিয়ম মেনে চলতে না পারে তবে একটি দেশ ছেড়ে যেতে পারে কিন্তু এমন জায়গায় পালিয়ে যেতে পারবে না যেখানে মহান আল্লাহর নিয়ম ও এখতিয়ার প্রযোজ্য হয় না। একজন ব্যক্তি তার সমাজের নিয়ম পরিবর্তন করতে সক্ষম হতে পারে কিন্তু তারা কখনও মহান আল্লাহর নিয়ম পরিবর্তন করতে পারবে না। উপরন্তু, ঠিক যেমন একজন বাড়ির মালিক ঘরের নিয়ম নির্ধারণ করে, এমনকি অন্যরা এই নিয়মের প্রতি আপত্তি জানালেও, একইভাবে, মহাবিশ্ব মহান আল্লাহর, এবং তাই, তিনিই একমাত্র এই মহাবিশ্বের নিয়ম নির্ধারণ করেন, মানুষ এই নিয়ম পছন্দ করুক বা না করুক। অতএব, এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে, নিজের স্বার্থে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে সে মহান আল্লাহর নিয়ম মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। একজন ব্যক্তি হয় আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পিছনের হিকমতগুলি শেখার চেষ্টা করতে পারে, যাতে সে বুঝতে পারে যে কীভাবে সেগুলি তাদের এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য উপকারী এবং কীভাবে তারা উভয় জগতে মানসিক ও শারীরিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, অথবা সে তার আকাঙ্ক্ষার উপাসনা করতে পারে এবং ইসলামের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলামী নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তার উচিত উভয় জগতেই তার পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং কোনও আপত্তি, প্রতিবাদ বা অভিযোগ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ২৯:

"আর বলো, "সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, অতএব যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক; আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।" নিশ্চয়ই, আমরা জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে ঘিরে থাকবে। আর যদি তারা সাহায্যের জন্য ডাকে, তবে তাদের সাহায্যের জন্য ঘোলা তেলের মতো পানি ব্যবহার করা হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দেবে। পানীয় কত নিকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট।"

অতএব, এই পরিণতি এড়াতে হবে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব, এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৯৮:

"যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আবাসস্থল হিসেবে..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হলো কার্যত তাঁর আনুগত্য করা এবং কাজেই বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করা। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমান হলো এমন একটি উদ্ভিদের মতো যাকে বেড়ে ওঠা এবং বেঁচে থাকার জন্য আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। যেভাবে একটি উদ্ভিদ সূর্যালোকের মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, সে মারা যাবে, ঠিক তেমনিভাবে যে ব্যক্তি আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমানও মারা যেতে পারে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। অতএব, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তিনি তাদেরকে যে আশীর্বাদ দিয়েছেন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে সমর্থন করে এই পরিণতি এড়াতে হবে। এটিই ধার্মিকতা এবং উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৯৮:

"... আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্য উত্তম।"

এরপর আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে এমন সৎকর্মশীলদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা ইসলাম গ্রহণের আগে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করেছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পরেও আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য অব্যাহত রেখেছিলেন, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৯:

"আর নিশ্চয়ই, আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর উপর এবং আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর বিশ্বাস করে..."

এই আয়াতটি আরও স্পষ্ট করে যে, সকল আহলে কিতাব একইভাবে আচরণ করতেন না। তাদের অনেকেই আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলতেন, যার অর্থ হল, আল্লাহকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টিজনক, যেমন ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এটি সেই গোষ্ঠীর কিছু সদস্যের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীর বিচার না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ এটি প্রায়শই বৈষম্যের দিকে পরিচালিত করে, যেমন বর্ণবাদ।

৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৯৯:

"আর নিশ্চয়ই, আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর প্রতি এবং আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর বিশ্বাস করে, আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হয়ে..."

মহান আল্লাহর প্রতি বিনয়ের একটি দিক হলো, নিজের পার্থিব আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তার পরিবর্তে, ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করা। অহংকারী ব্যক্তি এটি করতে সক্ষম হবে না কারণ তারা ধরে নেয় যে তাদের জীবন এবং তাদের প্রতিটি অনুগ্রহ তাদের

নিজস্ব প্রচেষ্টা এবং বুদ্ধিমত্তার সরাসরি ফলাফল, যদিও মহান আল্লাহই তাদের প্রতিটি অনুগ্রহ দান করেছেন। সূরা আয-যুমার, আয়াত ৪৯:

"... অতঃপর যখন আমরা তাকে আমাদের পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ দান করি, তখন সে বলে, "এটা আমাকে কেবল [আমার] জ্ঞানের কারণেই দেওয়া হয়েছে।" বরং এটি একটি পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।"

অতএব, এই সত্যটি স্বীকার করা এবং গ্রহণ করা উচিত যে তাদের প্রতিটি আশীর্বাদ মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত। অতএব, তাঁর আনুগত্য অনুসারে এগুলি ব্যবহার করাই কেবল ন্যায্যসঙ্গত। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে তাকে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি দেওয়া হবে।

নম্রতা অবলম্বন করলে পার্থিব লাভের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ঐশ্বরিক শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করা থেকেও বিরত থাকবে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৯৯:

"...কিতাবধারীদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর প্রতি এবং আপনার প্রতি অবতীর্ণ এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের উপর বিশ্বাস রাখে, বিনয়ীভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তারা আল্লাহর আয়াতকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে না..."

মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করে কেউ যা কিছু লাভ করে, তা সর্বদাই তার মনের শান্তি এবং সাফল্যের তুলনায় খুবই সামান্য হবে যদি সে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করত। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা যা কিছু পার্থিব জিনিস লাভ করবে, তা উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ এবং ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও, মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচতে পারবে না। ৫৩ সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

এবং ৯ম অধ্যায়, তাওবাহ, ৮২ নং আয়াতে:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধিকন্তু, যখন কেউ মহান আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়, তখন তারা অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এর ফলে তারা মানসিক ও শারীরিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে, তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে বাধা দেবে। ফলস্বরূপ, তারা দুঃখ, চাপ এবং ঝামেলার জীবনযাপন করবে এবং পরকালে তাদের শান্তি আরও ভয়াবহ হবে।

৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ১৯৯:

"...কিতাবধারীদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর প্রতি এবং আপনার প্রতি অবতীর্ণ এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের উপর বিশ্বাস রাখে, বিনয়ীভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তারা আল্লাহর আয়াতকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে না..."

দুঃখের বিষয় হল, কিছু মুসলিম পণ্ডিত ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামী শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করেন যাতে এটি তাদের চিন্তাধারার সাথে খাপ খায় এবং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামী জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা এড়িয়ে যান যা তাদের চিন্তাধারার সাথে সাংঘর্ষিক। তারা তাদের অনুসারীদের হারানোর ভয়ে এই আচরণ করে, যারা তাদের উপহার এবং অস্বাভাবিক সম্মান প্রদান করে। যে পণ্ডিত এই পদ্ধতিতে আচরণ করেন তাকে সুনান ইবনে মাজাহ, ২৫৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে জাহান্নামের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এছাড়াও, মুসলমানদের অবশ্যই অন্যদের অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে বিভ্রান্ত হওয়া এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা পবিত্র কুরআনের সঠিক শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর দৃঢ় থাকবে, অন্যদের মতামত অন্ধভাবে অনুসরণকারী পশুর মতো আচরণ করার পরিবর্তে। ইসলাম এই কারণে অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ করার তীব্র সমালোচনা করে এবং তাই মুসলমানদেরকে বোঝার সাথে ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং আমল করার জন্য উৎসাহিত করে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা শেখার এবং সে অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করে, সে নিশ্চিত করবে যে সে মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে মেনে চলবে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৯:

"... তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের পুরস্কার রয়েছে..."

কেউ আনুগত্যের পথ বেছে নিয়ে থাকুক, যা মানসিক প্রশান্তির দিকে নিয়ে যায়, অথবা তারা আল্লাহর অবাধ্যতার পথ বেছে নিয়ে থাকুক, যা উভয় জগতেই দুর্দশার দিকে নিয়ে যায়, তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মের পরিণতি উভয় জগতেই ভোগ করতে হবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৯:

"... নিশ্চয়ই, আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।"

সঠিক ও ভুল পথের পার্থক্য ব্যাখ্যা করার পর, মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে সঠিক পথে কঠোর পরিশ্রম করার আহ্বান জানিয়েছেন যাতে তারা মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। যখন মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুমিনদের প্রতি আহ্বান জানান,

তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের মৌখিক ঈমানের দাবি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া মৌখিক ঈমানের দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্মই হল প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজন ব্যক্তির অর্জন করা প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার এবং রহমত লাভ করতে পারে। ঠিক যেমন একটি ফলবান বৃক্ষ কেবল তখনই কার্যকর যখন তা ফল দেয়, তেমনি ঈমান কেবল তখনই কার্যকর যখন তা সংকর্ম করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২০০:

" হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধরো..."

ধৈর্য হলো যখন কেউ তাদের কাজ বা কথার মাধ্যমে তাদের অসুবিধা সম্পর্কে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলে এবং তাদের কঠিন পরীক্ষার সময় মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট করে। ধৈর্যশীল হওয়ার মূল হল ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা। কেউ যত বেশি ইসলামী জ্ঞান শিখবে এবং তার উপর আমল করবে, তত বেশি তারা বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ যা কিছু বেছে নেন তা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই সর্বোত্তম, এমনকি যদি তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়, কারণ তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তার পিছনে রয়েছে জ্ঞান যা তাদের কাছ থেকে লুকানো থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী শিক্ষার মধ্যে এমন অনেক ঘটনা আলোচনা করা হয়েছে, যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের গল্প, যাকে তার ভাইয়েরা অল্প বয়সেই তার পিতামাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, অন্ধকার ও গভীর কূপে ফেলে দিয়েছিল, শিশু দাস হিসেবে বিক্রি করে দিয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু এই প্রতিটি ঘটনা তাকে কিছু শিক্ষা অর্জন করতে সাহায্য করেছিল যা তাকে মিশরের জনগণকে এক বিশাল দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত করেছিল। যদি তিনি তার মুখোমুখি

হওয়া কষ্টগুলো সহ্য না করতেন, তাহলে তিনি লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচাতে পারতেন না। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

এই জ্ঞানের উপর বিশ্বাস রাখা এবং তাই, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা, ঈমানের একটি অংশ। সুখের সময় মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখা এবং তাঁর প্রশংসা করা সহজ, কিন্তু আসল পরীক্ষা তখনই হয় যখন কেউ সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তবুও তাঁর আনুগত্য করে এবং তাঁর প্রশংসা করে।

ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করলে একজন ব্যক্তি তাদের কষ্টের তুলনা অন্যদের সাথে করতে পারে, যারা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ছিল এবং যারা আরও বেশি কষ্ট সহ্য করেছিল। এই তুলনা তাদের নিজেদের কষ্টকে ছোট করে দেখতে সাহায্য করে যা তাদের ধৈর্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। এটি তখনও অর্জন করা যেতে পারে যখন কেউ তাদের সময়ের মধ্যে অন্যান্য মানুষদের পর্যবেক্ষণ করে যারা তাদের চেয়েও বেশি কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছে।

ইসলামী শিক্ষা একজনকে ভাগ্যের গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করে এবং কীভাবে তার জীবনে প্রতিটি ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে, তা সে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা কঠিন,

তা অনিবার্য। অনিবার্য এবং অনিবার্য কিছু নিয়ে অভিযোগ করার ফলে কোনও কল্যাণ হবে না। একজন ব্যক্তি কেবল সেই অগণিত প্রতিদান হারাবে যা সে পেতে পারে যদি সে অনিবার্য সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। সূরা আয-যুমার, আয়াত ১০:

"...ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান বিনা হিসাব[অর্থাৎ, সীমা] দেওয়া হবে।"

অতএব, একজন ব্যক্তির সামনে ধৈর্যের সাথে একটি অনিবার্য ঘটনার মুখোমুখি হয়ে অগণিত পুরস্কার লাভ করা অথবা অধৈর্যের সাথে একটি অনিবার্য ঘটনার মুখোমুখি হয়ে তার প্রাপ্ত পুরস্কার হারাবার মধ্যে একটি পছন্দ করার সুযোগ রয়েছে। যেভাবেই হোক তারা অনিবার্য ঘটনার মুখোমুখি হবে, তাই উভয় জগতেই এর থেকে লাভবান হওয়া যুক্তিসঙ্গত। আল হাদিদ অধ্যায় ৫৭, আয়াত ২২-২৩:

"পৃথিবীতে অথবা তোমাদের উপর এমন কোন বিপদ আসে না যা আমরা তা সৃষ্টি করার পূর্বেই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকে - নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর জন্য সহজ। যাতে তোমরা যা হারিয়ে ফেলেছ তার জন্য হতাশ না হও..."

ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করলে একজন ব্যক্তি বুঝতে পারে যে এই পৃথিবীতে তারা যা চায় তা তাদের জন্য সর্বোত্তম নয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

প্রতিটি ব্যক্তির জীবনেই এই সত্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে। এমন অনেক জিনিস আছে যা একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে চান যে এটি তার জন্য সর্বোত্তম, তবে সেই জিনিসগুলি তার জন্য চাপের কারণ হয়ে ওঠে। এবং এমন অনেক জিনিস আছে যা একজন ব্যক্তি অপছন্দ করেন যে এটি তার জন্য খারাপ, কেবল সেই জিনিসগুলি তার জন্য মঙ্গলের কারণ হয়ে ওঠে। যে ব্যক্তি এটি বোঝে সে তার আকাঙ্ক্ষার বিপরীত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সময় কম অধৈর্য হবে, কারণ সে বুঝতে পারে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া তার জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তার কাছে স্পষ্ট নাও হয়।

উপরন্তু, যেমন তাপের মাধ্যমে সোনাকে বিশুদ্ধ করা হয়, তেমনি মানুষ অসুবিধার মুখোমুখি হয়ে মানসিক শক্তি অর্জন করে। যারা সহজ জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তারা বিবাহের সমস্যার মতো সাধারণ এমনকি ছোটখাটো সমস্যার মুখোমুখি হলে প্রায়শই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। পরীক্ষার মাধ্যমে, মহান আল্লাহ একজন মুসলিমের মানসিক অবস্থাকে শক্ত করেন যাতে তারা ভবিষ্যতের অসুবিধাগুলি সহজেই মোকাবেলা করতে পারে।

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, সকল পরিস্থিতিতে, এমনকি স্বস্তির সময়েও ধৈর্য ধারণ করা আবশ্যিক। স্বস্তির সময়ে, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে

যাতে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ, যেমন সুস্বাস্থ্য বা বেতন বৃদ্ধি, অপব্যবহার থেকে বিরত থাকে।

এই পৃথিবীতে সমস্যা মোকাবেলা করার পিছনে আরও অনেক জ্ঞান রয়েছে যা ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, মুসলমানদের জন্য এটি অধ্যয়ন করা, শেখা এবং সেগুলি অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করে যাতে তারা উভয় জগতেই অগণিত প্রতিদান লাভ করতে পারে। একজন ব্যক্তির প্রতিটি পরিস্থিতিতে ধৈর্যশীল থাকা উচিত, ঠিক যেমন একজন জ্ঞানী রোগী তার ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং তার উপর কাজ করে জেনে যে এটি তার জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাকে তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়।

ধৈর্য মানে একজন ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন না। ধৈর্যের একটি দিক হল পরিস্থিতি মোকাবেলা করা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তা সংশোধন করার চেষ্টা করা। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্ত্রী যিনি তার স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন, তার নিজেকে এবং তার সন্তানদের রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, যেমন তার স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। এইভাবে আচরণ করা ধৈর্যের পরিপন্থী নয়, অন্যদিকে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার সাথে ধৈর্য বা ইসলামের কোনও সম্পর্ক নেই। একইভাবে, কান্নার মতো আবেগ প্রকাশ করা ধৈর্যের পরিপন্থী নয় কারণ নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর শোকে এত বেশি কেঁদেছিলেন যে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তবুও তিনি কখনও মহান আল্লাহ কর্তৃক সমালোচিত হননি।
অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ৮৪:

" আর তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, "হায়, ইউসুফের জন্য আমার দুঃখ!" এবং দুঃখে তার চোখ সাদা হয়ে গেল, কারণ সে[এটা] দমনকারী ছিল।"

এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে মহানবী (সাঃ) তাঁর পুত্র ইব্রাহিম (রাঃ)-এর মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন। সুনানে আবু দাউদের ৩১২৬ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কারো কথা ও কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা প্রদর্শন ধৈর্যের পরিপন্থী। এর বাইরে অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য এবং মানব প্রকৃতির অংশ, যেমন কান্নাকাটি এবং দুঃখ অনুভব করা।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২০০:

"হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধরো এবং ধৈর্য ধরো..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, কষ্টের শুরু থেকেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। সহিহ বুখারির ১৩০২ নম্বর হাদিসে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ধৈর্য দেখানো প্রকৃত ধৈর্য নয়, এটি কেবল গ্রহণযোগ্যতা যা স্বাভাবিকভাবেই সকলের সাথে ঘটে। একজন মুসলিমকে কষ্টের শুরু থেকেই ধৈর্য ধরে তাদের কথাবার্তা এবং কর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে তারা অধৈর্যের লক্ষণ না দেখায় এবং এই মনোভাব বজায় রাখতে হবে যতক্ষণ না তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, কারণ ধৈর্যের পুরস্কার সহজেই হারাতে পারে।

অধিকন্তু, ধৈর্য ধারণের অর্থ হলো প্রতিটি পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকা, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এবং কঠিন সময়ে ধৈর্য প্রদর্শন করা। অতএব, ইসলামকে এমন একটি পোশাকের মতো বিবেচনা করা উচিত নয় যা তারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে পরতে এবং খুলতে পারে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে কেবল তাদের ইচ্ছার উপাসনা করছে, যদিও তারা অন্যথা দাবি করে। অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকার জন্য একজন ব্যক্তির দৃঢ় ঈমান অর্জন করতে হবে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি শেখা এবং সেগুলি অনুসরণ করা হলে দৃঢ় ঈমান অর্জন করা সম্ভব হয়, যা ব্যাখ্যা করে যে, আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। এই ব্যক্তি যখন তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয় তখন সহজেই আল্লাহকে অমান্য করবে কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে, তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে পরিবর্তে আল্লাহকে মেনে চলা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আনুগত্যগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা

অর্জনের মাধ্যমে এবং তাদের জীবনের মধ্যে প্রত্যেককে এবং সবকিছুকে সঠিকভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে।

অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২০০:

"হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো এবং দৃঢ়ভাবে অবস্থান করো..."

যখন কেউ তার চারপাশের লোকদের থেকে ভিন্ন পথ বেছে নেয়, তখন তার জীবনে তার নিজের পথ সম্পর্কে খারাপ লাগে এবং ফলস্বরূপ তারা মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের প্রতি তাদের নিষ্ঠার জন্য তাদের সমালোচনা করে। দুঃখের বিষয় হল, এই সমালোচনা প্রায়শই প্রথমে তার নিজের আত্মীয়দের কাছ থেকে আসে।

এছাড়াও, সমাজের অন্যান্য উপাদান, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি, সেই ব্যক্তির সমালোচনা করবে যে মহান আল্লাহকে মেনে চলার চেষ্টা করে, কারণ ইসলামের প্রসার তাদেরকে সম্পদ অর্জন এবং প্রভাব বিস্তার থেকে বিরত রাখে। ইসলাম যেসব শিল্পের সমালোচনা করে, যেমন অ্যালকোহল এবং বিনোদন শিল্প, সমাজের মধ্যে মানুষকে ইসলাম গ্রহণ থেকে নিরুৎসাহিত করার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করতে মুসলিমদের নিরুৎসাহিত করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালায়। এটি একটি প্রধান কারণ যে সামাজিক মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতিতে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণা এত ব্যাপক।

পরিশেষে, যখনই কেউ ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করার চেষ্টা করে, যার মধ্যে রয়েছে নিজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে, তখন অন্যান্য লোকেরা যারা তাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করে পশুর মতো জীবনযাপন করতে চায় তারা অনুভব করবে যে ইসলাম এবং মুসলমানরা তাদের পশুর মতো দেখাচ্ছে। ফলস্বরূপ, তারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ থেকে এবং মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষা অনুশীলন থেকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করবে যাতে তারা তাদের মতো আচরণ করে পশুসুলভ জীবনযাপন করে যেখানে তারা তাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করে। এই লোকেরা ইসলামের নির্দিষ্ট উপাদানগুলিকে লক্ষ্য করবে যাতে অন্যদের তা থেকে নিরুৎসাহিত করা যায়, যেমন নারীদের জন্য ইসলামিক পোশাক কোড। সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন যে কেউ তাদের দুর্বল এবং খালি সমালোচনার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারে যে তাদের একমাত্র সমস্যা ইসলামের সাথে এবং এটি কীভাবে একজনকে তাদের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা ইসলামে নারী পোশাক কোডের সমালোচনা করে কিন্তু অন্য কোনও পোশাক কোডের সমালোচনা করে না যা সমাজের প্রতিটি দিকের মূল উপাদান, যেমন পুলিশ বাহিনী, সেনাবাহিনী, হাসপাতাল কর্মী, স্কুল এবং ব্যবসা। তাদের কেবল নারীদের ইসলামিক পোশাক কোড নিয়েই সমস্যা আছে এবং সমাজের মধ্যে অন্য কোনও পোশাক কোড নেই তা স্পষ্টভাবে তাদের দুর্বল এবং ভিত্তিহীন সমালোচনা দেখায়। বাস্তবে, ইসলাম এবং মুসলমানরা তাদেরকে পশুর মতো দেখায় এবং ফলস্বরূপ তারা যেভাবেই পারে ইসলামের সমালোচনা করে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ২০০:

"হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, অবস্থান করো এবং আল্লাহকে ভয় করো..."

কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, এই জেনে যে তিনি তাকে মনের শান্তি দেবেন যা তাকে মানুষের সমালোচনা থেকে রক্ষা করবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২০০:

"... ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, অবস্থান করো এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"

অন্যদিকে, মানুষকে খুশি করার জন্য মহান আল্লাহকে অমান্য করলে কেবল মানসিক শান্তি নষ্ট হবে কারণ একজন ব্যক্তি অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থাকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে বাধা দেবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল পথে পরিচালিত করবে। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সংগ্রাম ও ত্যাগ ছাড়া যেমন পার্থিব সাফল্য অর্জন করা যায় না, যেমন ডাক্তার হওয়া, তেমনি সংগ্রাম ও ত্যাগ ছাড়া উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করা যায় না। অতএব, এমন নির্বোধ মনোভাব গ্রহণ করা উচিত নয় যেখানে তারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ, কেবল মৌখিকভাবে তাঁর প্রতি বিশ্বাসের দাবি করার কারণেই, তাদেরকে মানসিক শান্তি দেবেন। ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে, মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করা, উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সংকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ২০০:

"হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, অবস্থান করো এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে প্রকৃত সাফল্য উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জনের মধ্যে নিহিত কারণ এটি সমস্ত পার্থিব জিনিসকে মূল্য দেয়। এবং যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, মানসিক শান্তি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে।

অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সুসম করতে এবং তার জীবনের

সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান কখনই এই ফলাফল অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ সকল ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের কারণে জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান আছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণের সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি...'"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই[একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২০০:

"হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, অবস্থান করো এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাহাবীদের উপর।

ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক

500+ FREE English Books & Audiobooks / كتب عربية / اردو كتب / Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

<https://shaykhpod.com/books/>

Backup Sites for eBooks: <https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/>
<https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books>
<https://shaykhpod.weebly.com>
<https://archive.org/details/@shaykhpod>

YouTube: <https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists>

AudioBooks, Blogs, Infographics & Podcasts: <https://shaykhpod.com/>

অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
অডিওবুকস : <https://shaykhpod.com/books/#audio>
ছবি: <https://shaykhpod.com/pics>
সাধারণ পডকাস্ট: <https://shaykhpod.com/general-podcasts>
পডওয়ান: <https://shaykhpod.com/podwoman>
পডকিড: <https://shaykhpod.com/podkid>
উর্দু পডকাস্ট: <https://shaykhpod.com/urdu-podcasts>
লাইভ পডকাস্ট: <https://shaykhpod.com/live>

ইমেলের মাধ্যমে প্রতিদিনের ব্লগ এবং আপডেট পেতে সাবস্কাইব করুন:
<http://shaykhpod.com/subscribe>

